মহাবিশ্বের সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

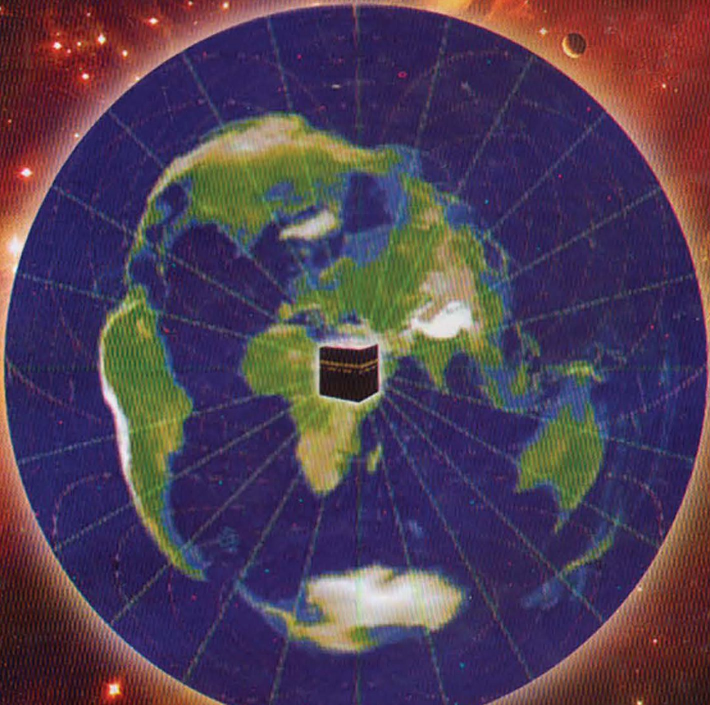

ড. ঈসা মাহদী

মহাবিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

ড. ঈসা মাহদী

Ahsan Publication

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার

www.nagorikpathagar.org

মহাবিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

ড. ঈসা মাহদী

ISBN : 978-984-8808-28-3

গ্রন্থস্বত্ব
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রোপ্রাইটর
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

প্রকাশকাল
জানুয়ারী-২০১২ ঈসায়ী
সফর-১৪৩৩ হিজরী
পৌষ-১৪১৮ বাংলা

প্রচ্ছদ, টাইপ সেটিং ও অলংকরণ
আহসান কম্পিউটার হাউজ
কাটাবন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

পরিবেশনায়
তবলিগী কুতুবখানা
ইসলামি টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : চারশত টাকা মাত্র

Mohabissher Sorbokaler Sorboshereshtho Mohamanab (The Greatest man of the Universe in History) Written by Dr. Iesa Mahdi Published by Ahsan Publication. Book & Computer Complex 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100. First Edition January-2012 Price **Tk. 400.00** only **AP-82**

www.nagorikpathagar.org

তোহ্ফা

মাকে– যার প্রেরণায় লেখালেখি করি এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিক প্রতিটি নর-নারীকে। যারা বিশ্বাস করেন, তাঁর মহান জীবনের সফল অনুকরণের মাঝেই সকল মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের সফলতা।

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

প্রশংসা কেবলমাত্রই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যাঁর অনুগ্রহে এ মূল্যবান সীরাত বা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী গ্রন্থ মহাবিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হলো, আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর অসংখ্য দরূদ (প্রশান্তি) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে এ গ্রন্থটি।

প্রিয় পাঠক! মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।' (সূরা কলম, আয়াত-৪)। বিশ্বস্রষ্টা ও সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসা লাভে ধন্য হন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সারা পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মুসলিম প্রতিদিন আযান, ইকামত, নামায ইত্যাদিতে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে। সাথে সাথে অনেক অমুসলিমও তাঁর প্রশংসা করে। তাঁর কর্মের সার্থকতার তুলনা তিনি নিজেই। তিনি মাত্র দু'দশকে অসভ্য, বর্বর আরবকে সভ্য, অনুকরণীয় করে তোলেন। এটা যেকোন বিচারে অনন্য সাধারণ অর্জন। দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে তাঁর আদর্শের স্থায়িত্ব ও বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর দুর্দমনীয় প্রভাব, যুগোপযোগিতায় তাঁর দুর্লভ সমাধান, আধুনিকতায় তাঁর ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানে তাঁর মহা অর্জন, প্রজ্ঞায় তাঁর অধিকার, সবার হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর আসন ইত্যাদি কোন কিছুই ম্লান হয়ে যায়নি। কী মহিমা ছিল তাঁর জীবনে, কীভাবে তিনি এত শক্তিশালী, কেন তিনি আজও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এসব জানার উৎসাহ অনেকের, তাঁর ধারে কাছেও নেই পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তিত্ব।

সীরাত বা জীবন বৃত্তান্ত রচনার সর্বপ্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত কত জন যে তাঁর সীরাত রচনা করেছেন তার হিসাব বলা একেবারেই অসম্ভব। মুসলিম প্রধান এলাকা বাদ দিলেও তাঁকে নিয়ে শুধু ইউরোপে রচিত হয়েছে হাজার হাজার সীরাতগ্রন্থ। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে দামেস্কের 'আল মুকতাবিস' পত্রিকা এক গণনায় লিখেছিল, ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ১৩শত গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ বাংলাতেও প্রায় এক হাজার সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মহানবীকে নিয়ে ৯১টি নাত রচনা করেন। বাঙালী মুসলিম মহিলা বেগম সারা তৈফুর রচিত সর্বপ্রথম রাসূল চরিত 'স্বর্গের জ্যোতি।' এ রচনার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখিকার প্রশংসা করেন। এভাবে নবীকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত জাতির বিবেক নামক লেখকরা সীরাত গ্রন্থ রচনা করবে। এটাও আমাদের নবীর একটি মু'জেযা।

'মহাবিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব' গ্রন্থটি লিখে ড. ঈসা মাহদী সম্মানিত সীরাত রচয়িতাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তার জীবনের এই একটি মাত্র কাজ নাজাতের অসিলাও হতে পারে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নবীর আলোচনা এ গ্রন্থে এটা বেশ বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আরেকটি জিনিস বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, নবীর জীবনকে প্রত্যেক বছর ভাগ ভাগ করে আলোচনা করা। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। তিনি নবীকে নিয়ে লেখা ওয়েব সাইটসমূহ থেকেও বেশ উপকৃত হয়েছেন।

এ গ্রন্থটি দেখে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইসলামী আলোচক ও লেখক মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজাকেও ধন্যবাদ জানাই। তারপরেও মানুষ হিসেবে ভুল থাকতে পারে। জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে যুক্ত সবাইকে মহান আল্লাহ পুরস্কৃত করুন। আমীন ॥

নবীকে নিয়ে লেখা **আবদুল মান্নান সৈয়দ**-এর কয়েকটি লাইন দিয়ে শেষ করছি–

'আকাশের সূর্য কারো সাধ্য আছে ঢেকে রাখতে পারে?
চাঁদের আলোকে কারো সাধ্য আছে রাখবে থামিয়ে?
তুমি ব্যাপ্ত হ'লে এই পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
সূর্য ও চাঁদের মতন।'

বিনীত

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

প্রকাশক

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন বা সীরাত পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন গ্রন্থ, ইতিহাস, লেখা, গবেষণা, তাফসীর ঘেটে বা বিশ্লেষণ করে যতটুকু পারা যায় সেটাই সম্বল। তবে আল-কুরআন এবং হাদীসের গ্রন্থসমূহকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে কঠিন পথ কিছুটা সহজ হয়ে যায়। গ্রন্থের লেখক বা সংকলক সে নিরিখেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ যতটুকু সাহায্য করেছেন ততটুকুই বলা বা লেখা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহপাকের নির্দেশনা চমৎকার ও দৃষ্ট। আল্লাহপাক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল-কুরআনে এভাবে বর্ণনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, হে মানবগণ! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রকৃত স্বরূপ কি? এক দিকে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, অপরদিকে তিনি পৃথিবীর মানুষ। রক্ত মাংস দিয়ে গড়া তাঁর শরীর। এক দিকে তিনি স্রষ্টার, অপরদিকে তিনি সৃষ্টির। তাই প্রশ্ন জাগে, আমরা তাঁকে এখন কোন আলোকে গ্রহণ করব? কোন চোখে দেখব? তিনি কি মানুষ না অতি মানুষ? এ প্রশ্নের জবাবে কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর বিশ্বনবী গ্রন্থে লেখেন, "যাঁহার জীবনে এত অতি মানবিক উপাদান রহিয়াছে তাঁহাকে শুধুই মানুষ বলিতে পারি কি? তবে কি তিনি মানুষ ছিলেন না? তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? তাহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ইতিহাসের আলোকে সমুজ্জ্বল। কে ইহা অস্বীকার করিবে? অতএব, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহারা কেবল মাত্র অতি মানবরূপে মানব গণ্ডীর ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবেন, তাহারাও যেমন ভুল করিবেন। আবার যাহারা তাঁহাকে আমাদের মত মাটির মানুষ বলিয়া ধরার ধুলায় নামাইয়া আনিবেন তাহারাও ঠিক তেমনি ভুল করিবেন।"

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষ ও অতি মানুষের মিশ্রিত রূপ; সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে তিনি ছিলেন মাধ্যম বা বাহক। একদিকে যেমন তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চমৎকারভাবে কবি তার ভাষায় ব্যক্ত

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। এ উভয় দৃষ্টিকোণের কথাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। আপনি বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আবার আল-কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত একজন মানুষ, যার উপর অহী নাযিল হয়। (সূরা আল কাহাফ)

বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহর তরফ হতে তিনি প্রেরিত রাসূল। আবার মানুষের পক্ষ হতে তিনি একজন মানুষ। তার দু'টি নাম মুহাম্মদ ও আহমদ থেকেও এ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় অর্থাৎ স্রষ্টার দিক হতে তিনি মুহাম্মদ বা চরম প্রশংসিত। আবার সৃষ্টির দিক দিয়ে তিনিই আহমদ বা আল্লাহর অতি প্রশংসাকারী। পৃথিবীতে তথা মহাবিশ্বে যত মানুষ এসেছে বা আসবে, তাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ এবং মানবীয় দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে নয়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই সর্ববিবেচনায় তিনিই মহাবিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

মানুষের ইহ ও পরকালীন শান্তি, সুখ, সফলতা রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথে। এটা বলা হয়েছে মহাবিশ্বের একমাত্র এবং শুধুমাত্র বিশুদ্ধতম গ্রন্থ, ঐশি কিতাব ও মহান স্রষ্টার বাণী আল কুরআনে। আর আল কুরআনকে অধ্যয়ন, পড়া, বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করতে হলেও বিশ্বনবীর জীবনকে পড়তে, জানতে ও মানতে হবে। তাই সর্ববিবেচনায় বিশ্বনবীর বিশুদ্ধতম জীবন রচিত বা সীরাত অধ্যয়ন করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং জরুরী দায়িত্ব।

আসুন, সকল ভাষাভাষীই, সকল বর্ণের, সকল শ্রেণীর, সকল পেশার জন্য গ্রহণীয়, অনুসরণীয়, অনুকরণীয় জীবন চরিত অধ্যয়ন করি।

ড. ঈসা মাহদী
লেখক

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

<u>প্রথম খণ্ড</u>

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত সীরাত	**১৭**
বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	১৭
সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	১৯
পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	২৩
এক নজরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র	২৬
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়	২৬
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারাবাহিক জীবন	২৬
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে-মেয়ের পরিচয়	৩৪
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের পরিচয়	৩৪
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের গড়ন	৩৬
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক	৩৭
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদ্য	৩৮
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার্য জিনিসপত্র	৩৯
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসতবাড়ি	৪০
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন কাজ	৪১
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য কাজকর্ম	৪২
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী রাষ্ট্র	৪৩
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল	৪৬
• বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনে আলোচিত আয়াতসমূহ	৪৭

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিস্তৃত সীরাত ৪৯

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কার জীবন ৪৯

- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ৪৯
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুকাল ৫৩
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিশোরকাল ৬০
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সা.) যৌবনকাল ৬৫
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবসায়িক জীবন ৬৮
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহিত জীবন ৭৪
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাংসারিক জীবন ৭৬
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামাজিক জীবন ৮৫

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মক্কার জীবন ৮৮

- নবুওয়াতের ১ম বছর (৬১০ খ্রীষ্টাব্দ) ৮৮
- নবুওয়াতের ২য় বছর (৬১১ খ্রীষ্টাব্দ) ৯৯
- নবুওয়াতের ৩য় বছর (৬১২ খ্রীষ্টাব্দ) ১০১
- নবুওয়াতের ৪র্থ বছর (৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ) ১০২
- নবুওয়াতের ৫ম বছর (৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৩
- নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর (৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৬
- নবুওয়াতের ৭ম বছর (৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ১০৯
- নবুওয়াতের ৮ম বছর (৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ) ১১০
- নবুওয়াতের ৯ম বছর (৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) ১১২
- নবুওয়াতের ১০ম বছর (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ) ১১২
- নবুওয়াতের ১১তম বছর (৬২০ খ্রীষ্টাব্দ) ১১৬
- নবুওয়াতের ১২তম বছর (৬২১ খ্রীষ্টাব্দ) ১১৭

www.nagorikpathagar.org

- নবুওয়াতের ১৩তম বছর (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) ১২২

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত পরবর্তী মদীনার সার্বিক পরিস্থিতি ১২৩

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও পরিণতি ১৩৯

হিজরত পরবর্তী মদীনা হতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচালিত মূল যুদ্ধসমূহ ১৪৩

- বদর যুদ্ধ (২য় হিজরী, ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১৪৩
- ওহুদের যুদ্ধ (৩য় হিজরী, ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ১৭৫
- আহযাব বা পরিখা যুদ্ধ (৫ম হিজরী, ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ২৩৩
- বনু কুরাইযার যুদ্ধ (৫ম হিজরী, ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ২৩৮
- হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ষ্ঠ হিজরী, ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ২৪০

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বময় দাওয়াত ও তাবলীগের বিকাশ ২৪৬

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৪৮

মিসরের বাদশাহ মোকাওকিসের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫০

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫২

রোম সম্রাট কায়সারের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫৪

বাহরাইনের শাসনকর্তা মোনযের এর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫৭

ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া এর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫৭

দামেশকের শাসনকর্তা হারেস এর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫৮

আম্মানের বাদশাহ জেফারের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র ২৫৯

- খায়বারের যুদ্ধ (৭ম হিজরী, ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২৬০
- মক্কা বিজয় (৮ম হিজরী, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ২৬৩
- মক্কা বিজয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্ণতা অর্জন ২৬৬
- হুনাইনের যুদ্ধ (৮ম হিজরী, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ২৬৭
- মুতার যুদ্ধ (৮ম হিজরী, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ২৭১
- তাবুকের যুদ্ধ (নবম হিজরী, ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ২৭৮

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জ (দশম হিজরী, ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ২৮২

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সামরিক অভিযান (একাদশ হিজরী, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ২৮৯

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর মদীনার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী ২৯০

- ১ম হিজরী (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯০
- ২য় হিজরী (৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯৮
- ৩য় হিজরী (৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০৫
- ৪র্থ হিজরী (৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০৭
- ৫ম হিজরী (৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০৯
- ৬ষ্ঠ হিজরী (৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ৩১৫
- ৭ম হিজরী (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ৩২২
- ৮ম হিজরী (৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ) ৩৩২
- ৯ম হিজরী (৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ৩৪০
- ১০ম হিজরী (৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ৩৫৮

www.nagorikpathagar.org

- ১১তম হিজরী (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ৩৬৯

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল ৩৭৩

শেষ কথা ৩৮৪

<u>তৃতীয় খণ্ড</u>

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের গবেষণা ও বিশ্লেষণ ৩৮৬

বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বাভাস ৩৮৬

- হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া ৩৮৬
- ঈসা (আ.) এর সুসংবাদ ৩৮৭
- মা আমিনার স্বপ্ন ৩৮৮
- সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন বার্তা ৩৮৮
- বাইবেলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বাভাস ৩৮৯
- বেদ ও পুরাণে (হিন্দু ধর্মে) আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৯২
- বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৯৪
- পার্সী ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৯৪
- ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৯৫
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সত্যবিকাশে আরব ভূমি ৩৯৫

কর্মে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় ৩৯৬

পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী ৩৯৯

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা বা মি'রাজ ৪০০

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত/নির্দেশিত সকল যুদ্ধ এবং অভিযানসমূহ ৪১৮

- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণকৃত গাযাওয়াত বা ধর্মীয় যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪১৯
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত সায়ারা এবং বয়ূসসমূহ ৪৩১

www.nagorikpathagar.org

- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমরনীতি ৪৫৪
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর দক্ষতা ও কৌশল ৪৫৫
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ৪৫৮
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক সৌন্দর্য ৪৬১
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ ৪৭১
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের দুঃখ কষ্ট ৪৭৮
- ইসলামের প্রারম্ভিক রাষ্ট্রের নীতি বা মদীনা সনদ ৪৭৮
- ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা ৪৭৯
- ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ভয়াবহ নির্যাতন ভোগকারী সাহাবা ৪৮২
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে ইসলামের প্রথম হিজরত ও প্রথম আকাবা ৪৮৪
- ইসলামের প্রথম হিজরতকারী সাহাবাদের দল ৪৮৯
- ইসলামের প্রথম আকাবার বাইয়াতকারী সাহাবা ৪৯০
- ইসলামের প্রথম (অর্থাৎ বদরের) যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সাহাবা ৪৯১
- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবা ৪৯১
- উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.) ৪৯১
- নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) ৪৯৩
- উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ৪৯৪
- ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ৪৯৫
- ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) ৫০০
- ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি (রা.) ৫০৩
- ইসলামের চতুর্থ খলিফা মহাবীর হযরত আলী (রা.) ৫০৬

মক্কার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা ৫০৯

www.nagorikpathagar.org

- মক্কার ইতিহাস ৫০৯
- বাইতুল্লাহর প্রতি দৃষ্টির ফযীলত ৫২৪
- বাইতুল্লাহর তওয়াফের ফযীলত ৫২৬
- বাইতুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ ক'টি বৈশিষ্ট্য ৫২৯
- হিজরে ইসমাঈলের/হাতীমের মর্যাদা ৫৩৩
- যমযম কূপের ইতিহাস ৫৩৪
- যমযমের পানির বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত ৫৩৬
- যমযমের পানি পান করার আদব ৫৪১

মদীনার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা ৫৪২

<u>চতুর্থ খণ্ড</u>

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের উৎসসমূহ ৫৪৯

(ক) ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন ৫৫০

(খ) সাহাবীদের কাব্যকীর্তি সম্বলিত গ্রন্থসমূহ ৫৫৩

(গ) পবিত্র হাদিস গ্রন্থসমূহ ৫৫৪

(ঘ) সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থসমূহ ৫৫৬

(ঙ) প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ৫৬০

(চ) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলী সম্বলিত গ্রন্থসমূহ ৫৬১

(ছ) শামায়েল গ্রন্থসমূহ ৫৬১

(জ) মক্কা-মদীনা ও কা'বার ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ৫৬২

(ঝ) সীরাত সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা গ্রন্থসমূহ ৫৬৩

- বাংলা ভাষায় সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে রচিত উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ ৫৬৩

www.nagorikpathagar.org

- বাংলায় অনূদিত সীরাত সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ৫৭৪
- শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলায় লিখিত উল্লেখযোগ্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী গ্রন্থসমূহ ৫৮০
- বাংলায় বিশ্বনবীর তথ্যপঞ্জী, স্মরণিকা, গ্রন্থ ও পত্রিকাসমূহ ৫৮৩
- অন্যান্য ভাষায় (বিশেষভাবে ইংরেজী) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থসমূহ ৫৮৪
- উল্লেখযোগ্য ওয়েব সাইটসমূহ ৫৮৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম খণ্ড

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত সীরাত

বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

স্বামী বিবেকানন্দ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈশ্বর প্রেরিত অবতার (Prophet) হিসেবেই চিহ্নিত করে উচ্চ মর্যাদার আসন দেন এবং বলেন, "কৃষ্ণের প্রাচীন বাণী বুদ্ধ, খ্রিষ্ট ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয়। খ্রিষ্টানরা যীশুর নামে রাজনীতি এবং পারসিকরা দ্বৈতভাবে প্রচার করছে দেখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের ঈশ্বর এক। যা কিছু আছে, সব কিছুরই প্রভু তিনি। ঈশ্বরের সাথে অন্য কারও তুলনা হয় না। বাস্তবে এটাই হচ্ছে সকল ধর্মের মূলকথা।" বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল বলেন, "মুহাম্মদকে মনে হয়েছিল প্রমাণ হয়ে জ্বলে উঠেছে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত"। বিখ্যাত পণ্ডিত মাইকেল এইচ হার্ট তার সাড়া জাগানো 'দি হান্ড্রেড' নামক গ্রন্থে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে প্রথম স্থানে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়' লেখা আছে, পৃথিবীর ধর্মনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

জন ডেভেনপোর্ট বলেন, "কোন ধর্মনেতা বা বিজয়ীর জীবনই বিস্তৃতি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সাথে তুলনা হতে পারে না।" বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থ কুরআন চৌদ্দশ-বছর পরও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে, এ ঘোষণা আল্লাহপাক কুরআনেই দিয়েছেন। "আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তার বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আনআম ঃ ১১৫)

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে কম্পিউটারলব্ধ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে (ড. রাশাদ খলীফা)। "আল-কুরআন ১৯ সংখ্যার বন্ধনে আবদ্ধ। কুরআনের ১টি হরফও এদিক সেদিক হলে এই হিসাব মিলবে না।" এছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কেউ মুখস্থ রাখে না বা রাখতে পারে না। একমাত্র কুরআন শরীফই আল্লাহর অশেষ রহমতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মুসলমান আরবীতেই অবিকল মুখস্থ রাখছে। এমনকি বাচ্চা শিশু-কিশোর-কিশোরীও হুবহু কুরআন মুখস্থ রাখতে পারছে এবং ভবিষ্যতে এর ব্যতিক্রম হবে না।

ইংরেজ লেখক ড. স্প্রীঙ্গার তার "লাইফ অফ মুহাম্মদ" গ্রন্থে আরব জাতি ও বিশ্বনবী মুহাম্মদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাস্তবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান জীবনাদর্শ বা সীরাতুন নবী এমন এক মহাসমুদ্র, যার কুল-কিনারা নির্ধারণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, "আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের পর থেকে এ নশ্বর জগত ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বাধিক কলুষমুক্ত ও সুপবিত্র ছিলেন এবং বিশ্বের সর্বস্তরের সকল মানুষের জন্যে তিনি ছিলেন অনুপম অনুকরণীয় আদর্শ।" বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেমের নমুনা পাবেন এ হাদীস থেকে ঃ "একদিন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিয়ামত কখন হবে? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ধ্বংস! তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুত করেছ? সে বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি এবং এছাড়া আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তাঁর সাথে যাকে ভালবাস।" এ হাদীস বর্ণনা করে আনাস (রা.) বলেন যে, "ইসলামে দাখিল হওয়ার পর মুসলমানদেরকে অন্য কোন জিনিসে বা বিষয়ে এ সংবাদের চেয়ে বেশি খুশি হতে দেখিনি!" (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসলমানদের চোখে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই প্রিয় ছিলেন এবং থাকবেন। যুদ্ধের ময়দানে সাহাবীরা নিজেদের বুক পেতে দিয়েছেন। তীর বিদ্ধ হয়েছেন। তবুও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ থেকে এক ফোটা রক্ত ঝরতে দেননি। ওহুদের যুদ্ধের বিবরণে ইতিহাস হয়ে আছে সেসব ঘটনা। যার পুনরাবৃত্তি হয়নি বা হবেও না। বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতটাই ভালবাসতেন ও তাঁর আনুগত্য করতেন।

www.nagorikpathagar.org

সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বেদ, পুরাণ, যিন্দাবেস্তা, দিঘানিকায়া, তাওরাত, যাবুর, বাইবেল- পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী ও তাঁর আগমনের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণপ্রথার কুসংস্কারে নিমজ্জিত কৌলিন্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদ পাঠ ও পৌরহিত্যের একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণের ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পক্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শেষ এবং প্রতিশ্রুত রাসূল ও ঋষি- এ মহাসত্য জানা বা উদঘাটন করা সম্ভব ছিল না। অপরপক্ষে খৃষ্টানদের পুরাতন ও নতুন নিয়মের বাইবেলের দ্বারা একত্ববাদী গসপেলে শেষ ও শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন বার্তা উল্লিখিত ছিল। কিন্তু ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজকীয় দণ্ডাজ্ঞাবলে তা ধ্বংস ও গোপন করার কারণে খ্রিষ্টান জাতিতে শেষ নবীর আগমন বার্তা জনসাধারণ জানতে পারেনি। কিন্তু মহাসত্য এই যে, সত্য কখনই চাপা থাকে না। তাই বোধকরি ১৫শত বছরের গোপনকৃত বার্ণাবাসের গসপেল খ্রিষ্টান বিশপ ফ্রা মেরিনো কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে। অপরদিকে আই টি এর আধুনিক যুগে বেদ পাঠও আর গোপন নেই। ফলে সত্যকে ঠেকানোর কোন পথই খোলা নেই। আল-কুরআনের বাণী সত্য প্রমাণিত হচ্ছে ঃ "সত্য সমাগত মিত্যা অপসারিত, মিথ্যা চিরকালই অপসারিত হবে।" (১৭ : ৯)

প্রফেসর ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় (ভারতের প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরিচালক, শাশ্বত বেদান্ত প্রকাশ সংঘ) হিন্দি ভাষায় তিনটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থগুলোর একত্রে বাংলা সংকলনের নাম "বেদ ও পুরাণে হযরত মুহাম্মদ"। অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়। বর্ণিত গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় লিখেছেন, "ঐতিহাসিক বিষয়ে গবেষণা করার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অন্তরে সবর্দা পোষণ করি। বেদ, বাইবেল ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে যে ঋষি ও মহামানবের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাতে, সর্বসম্মতভাবে মুহাম্মদই প্রমাণিত হন। অতঃপর আমার অন্তরে এ প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, সত্য প্রকাশ করা আবশ্যক। আমি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার পক্ষপাতি নই। বেদসমূহে দ্বাদশ পত্নীধারী এক উষ্ট্রারোহী ব্যক্তির আগমনের কথা বলা হয়েছে যার নাম নরাশংস হবে। আমার মতে নরাশংস শব্দ এমন নর অর্থাৎ ব্যক্তিকে সূচিত করে যার নামের অর্থ হবে "প্রশংসিত"। মুহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

আরবী শব্দ এবং এর অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত। অতএব নরাশংস এবং মুহাম্মদ একার্থবোধক শব্দ। বেদ, পুরাণ এবং উপনিষদে আল্লাহ, রাসূল, মুহাম্মদ ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। অর্থবেদীয় উপনিষদে আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) : ঠিক সে সময় মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি, যার বাস মরুস্থলে, শিষ্যগণসহ আবির্ভূত হবেন। হে আমাদের প্রভু, হে জগতগুরু তোমার প্রতি আমাদের স্তুতিবাদ। জগতের সমুদয় কলুষতা নাশ করার উপায়সমূহ তুমি জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও। অল্লোপনিষদের অন্য এক জায়গায় উল্লেখ আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী । তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থেই হিন্দুধর্ম কথাটির উল্লেখ নেই। সনাতন ধর্ম নামে সেখানে এটা বর্ণিত হয়েছে। এ ধর্মের মূল গ্রন্থ, বেদ, গীতা, পুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে শেষ অবতার বা শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের একসেবা দ্বিতীয় মূলমন্ত্রটি ইসলামের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতিধ্বনি। তা হচ্ছে 'ইল্লা কবর ইল্লা ইল্লাল্লোত ইলাল্লাং' অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরীস্থ সূক্ষ্ম পদার্থের স্রষ্টা আল্লাহ। আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রভু। একমাত্র আল্লাহকেই আল্লাহ বলে আহবান কর। পাশাপাশি শেষ ঋষি বা মহামানবের নাম 'আহমদ' এর উল্লেখ রয়েছে ঋগবেদের 'কীরি' শব্দের মধ্যে। আবার কলির অবতারও তিনিই। সামবেদে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গন্ধও নেই। সেখানে বলা হয়েছে, ঐ মহামানবের নামের প্রথম অক্ষর ম ও শেষ অক্ষর দ এবং তিনি বৃষ মাংস ভক্ষণ সর্বকালের জন্য বৈধ করবেন। তিনিই হবেন বেদ অনুযায়ী ঋষি অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সেই মহামানব।

ঋজুবেদে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ আছে এভাবে 'আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ এবং বরস্য।' অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং পরম বরণীয়। ভাগবত পুরাণের ১২-২-২০ শ্লোকের অর্থ হচ্ছে ঃ তিনি বেগবান অশ্ব দ্বারা বিচরণকারী, অপ্রতিম, কান্তিময়, লিংগের অগ্রভাগ ছেদিত, রাজার বেশে অগণিত দুশমনকে সংহার করবেন। তিনিই শেষ ঋষি অথার্ৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অপরদিকে শেষ মহাঋষি (কল্কির) বা শেষনবীর পিতার নাম বিষুযশা (বিষু-স্রষ্টার গুণবাচন নাম আর যশা অর্থ- দাস। অর্থাৎ এ শব্দের অর্থ আল্লাহর দাস। যেমনটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার আরবী

www.nagorikpathagar.org

নাম আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস)। তার (কল্কির) মাতার নাম সুমতি (যার অর্থ শান্ত এবং মননশীল স্বভাব। যেমনটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতার আরবী নাম আমিনা, যার অর্থও মননশীল স্বভাব।

শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব'-এর ৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ যে সব লোক সৎপথ ছেড়ে দিয়ে শয়তানির পথে গেছে রাসূল তাদের শাফায়াত করবেন না। গ্রন্থ সাহেবের ১৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ বর্তমানে বেদ পুরাণের যুগ শেষ হয়েছে। এখন কুরআনই সমস্ত মানুষের একমাত্র পথ প্রদর্শক ঐশীগ্রন্থ। কেন মানুষ বর্তমানে অশান্তিময় নরকের পথে ধাবমান। এর একমাত্র কারণ চিরস্থায়ী, সত্য, শাশ্বত ইসলামের নবীর প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস নেই। একই ধর্মগ্রন্থের ২২১ থেকে ২২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে (যার ভাবার্থ হচ্ছে) ঃ একমাত্র কলেমা তৈয়্যব সর্বদা পড়বে। তা ভিন্ন সংগের সাথী কিছুই নেই। যে তা পড়বে না, সে দোযখে যাবে। বে নামাযীর স্বভাব ঠিক কুকুরের ন্যায়, যে রত থাকে সমুদয় পার্থিব অপকারিতায়। পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য যে একবারও যায় না মসজিদে।

ইরানী বা ফার্সী (অগ্নি উপাসকদের) জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'যিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'। এ ধর্মের প্রবর্তক হলেন জরথুষ্ট (প্রায় ৬০০ খৃঃ পূর্ব)-এ ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। আহমদ শব্দটির উল্লেখ আছে। যিন্দাবস্তায় পৃষ্ঠা ১৬০ (ম্যাক্সমূলার অনূদিত)-এ উল্লেখ আছে : আমি ঘোষণা করছি হে স্পিতাম জথুস্ট্র পবিত্র আহমদ নিশ্চয় আসবে। যার নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে। 'দসাতির' গ্রন্থেও একই ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। যখন ফার্সীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হবে। তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবে। যার শিষ্যরা পারস্য দেশ জয় এবং দুর্ধর্ষ পারসিক জাতিকে পরাজিত করবে। মন্দিরে অগ্নিপূজা না করে তারা কাবা ঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে। কাবা প্রথামুক্ত হবে। সে মহাপুরুষের শিষ্যরা বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ 'দিঘানিকায়া' তে ঘোষণা করা হয়েছে, যখন মানুষ বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আর এক বুদ্ধের আবির্ভাব হবে। তার নাম হবে মৈত্রেয়' অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ। এখানে এ মৈত্রেয় শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনিই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম) একমাত্র ধর্ম প্রচারক যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন বা জগতের করুণার আধার নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। সিংহল হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্যে, উপরের কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে ঃ ভিক্ষু আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদের উপদেশ দেবে? বুদ্ধ বললেন, আমি শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আরেকজন বুদ্ধ আসবেন। তিনি আমার চেয়েও পবিত্র এবং অধিকতর আলোক প্রাপ্ত। তিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত ও পথ প্রচার করবেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে আমরা কিভাবে চিনতে পারব? বুদ্ধ জবাব দিলেন, তার নাম হবে মৈত্রেয়। (গসপেল অব বুদ্ধা কেরাস)

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ পুরাতন নিয়ম বাইবেলের ৩৯ খানা পুস্তকের মধ্যে 'পেন্টাটিটশ' নামক মাত্র পাঁচখানি মূসার (আ.) নিকট তৌরাত নামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ পুস্তকের দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ এবং ১৯ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, "তখন সদা প্রভু আমাকে (মূসাকে) বললেন-তোমরা ভালই বলেছ। আমি ওদের জন্য ওদের (ইসরাঈলদের) ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদি (নবী) উৎপন্ন করব এবং তাঁর মুখে আমার বক্তব্য দিব।" এখানে উল্লেখ্য যে, মূসা (আ.) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়েই একত্ববাদী। অপরপক্ষে খৃষ্টীয় মতে যীশুখৃষ্ট (আ.) ত্রিত্ববাদী দর্শন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মূসা (আ.) এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়েই নবী এবং শাসনকর্তা ছিলেন। তাদের জীবদ্দশায় দেশবাসী তাদের নবী, নেতা ও শাসনকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছিল। অপরপক্ষে যীশুকে (আ.) তাঁর জীবদ্দশায় দেশবাসী স্বীকৃতি দেয়নি। আবার মূসা (আ.) ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মযুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু যীশু (আ.) শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে ধৃত হয়েছেন অর্থাৎ যীশু (আ.) মূসার ন্যায় নন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসার ন্যায়।

পুরাতন নিয়ম বাইবেলের শলমনের পরমগীত অধ্যায়ের ৫ম সংগীতের ১৬ নং শ্লোকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু পাদ্রীগণ বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের প্রণীত অনুবাদে, "অতিশয় মনোহর" (মুহাম্মদ এর অর্থ করছেন) বাস্তবে সঠিক অনুবাদ হবে "অতিশয় প্রশংসিত"। বস্তুতঃ হিব্রু ও আরবী ভাষায় মুহাম্মদের অর্থ প্রশংসিত। মনোহর নয়। ড. মরিস বুকাইলি তার বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ''বাইবেলের নতুন নিয়মের প্রথম তিনটি সুসমাচারে যীশুর গুরুত্বপূর্ণ

www.nagorikpathagar.org

ভাষণ এবং তৎসংক্রান্ত বর্ণনার অনুপস্থিতির কারণ যেমন রহস্যময় তেমনি দুর্বোধ্য।" আসলে এ ভাষণটি বাদ দেবার মূল কারণ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীকৃতিকে অস্বীকার করা। যোহানের গসপেলেও বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও সত্যাশ্রয়ীদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাইবেলে কি বলা হয়েছে? বাংলা বাইবেলে যোহান ১৬,১৩-১৪ এ বলা হয়েছে ঃ "পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা যখন আসবেন; তখন তিনি পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে সত্যে নিয়ে যাবেন। কারণ তিনি আপনা হতে কিছু বলবেন না। ঈশ্বরের কাছ থেকে যা শোনবেন তাই বলবেন। আগামী ঘটনা তোমাদেরকে জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন।" এখানে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, এ সত্যের আত্মা কে? এ মহামানব কে? তিনি নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এভাবেই সব ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতের শেষ ভরসা, সর্বশেষ নবী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ করুণার আঁধার ও মহাঋষি। সকল মত, পথ ও আদর্শের ঊর্ধ্বে স্রষ্টার প্রতিনিধির নামই আহমদ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর কাছেই স্রষ্টা প্রেরণ করেছেন আল-কুরআন। তাঁর ধর্মের নামই ইসলাম। দ্বীন ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ও শুধুমাত্র মুক্তির পথ। তথা স্রষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন। কেননা ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোতে অন্যান্য ধর্মমত ও পথ বাতিল হয়ে গেছে। সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখেই আল-কুরআনের আদর্শ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথেই ফিরে আসতে হবে পৃথিবীর সব মানুষকে।

পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

"তিনি উম্মী নবী, তাঁর কথা লিপিবদ্ধ আছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে" (৭/১৫৭)। "তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী" (৬৮/৪)। "তিনি তোমাদেরই মত মানুষ, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়।" (১৮/১১৩)। "তাঁর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (৩৩/২১)। "তিনি ছিলেন ইয়াতীম, নিঃস্ব এবং মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণকারী। আল্লাহ তাঁকে আশ্রয় দেন, অভাবমুক্ত করেন এবং পথের দিশা দেন।" (৯৩/৬-৮)। "তিনি এমন এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন। যারা ঈমান আনে ও ভাল

www.nagorikpathagar.org

কাজ করে তাদের আঁধার থেকে আলোতে আনার জন্য।" (৬৫/১১) "যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তো আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কাজ তো কেবল প্রচার করে যাওয়া" (৪২/৪৮)। "আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তো তাদের উপর কর্মনিয়ন্ত্রক নন। (৮৮/২১-২২) "আপনি প্রচার করুন- যা আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।" (৫/৬৭)। "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে বলতে বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়, তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র আল্লাহ। অতএব তার পথই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (৪১/৬)। "হে আহলে কিতাব! তোমরা শুধু এ কারণেই আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি" (৫/৫৯)। "আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই। কেউ আমাকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই। তিনি ছাড়া আমার কোন আশ্রয় নেই। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচার ও তাঁর বাণী পৌঁছানই আমাকে বাঁচাবে"। (৭২/২০-২৩)।

আল্লাহ বলেন, "হে নবী! প্রত্যেক জাতির জন্যে যেরূপ পথ প্রদর্শক ছিলেন, আপনিও পথ প্রদর্শক হিসেবে মানুষের জন্যে সতর্ককারী" (সূরা আল রা'আদ)। "হে নবী! আমি আপনাকে বিশ্ব মানবের প্রতি সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল সাবা)। "হে নবী! আমি আপনাকে সত্যসহ সু-সংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল বাকারা)। "হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা আল যারিয়াত)। "হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা নিশ্চয়ই উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।" (সূরা আল-যারিয়াত)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে নবীকে এভাবে বলতে শিখিয়েছেন, "আপনি বলুন হে দুনিয়ার মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আল আনআম)। "হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও

www.nagorikpathagar.org

সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে আছে মহানুগ্রহ। আপনি কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না। তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করবেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন।" (৩৩/৪৫-৪৮)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন "আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। এরা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে এদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল– তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ। তারপর আমি কাফিরদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শাস্তি।" (৩৫/২৪-২৬ এবং ১৩/৩০-৩১)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা এসেছে আল-কুরআন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল আহযাব : ২১)। "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল আম্বিয়াঃ ১০৭)। কট্টর অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই আশ্বস্ত করেছেন এভাবে, "নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে আপনি সতর্ক করুন আর না করুন, কোন অবস্থাতেই তাঁরা ঈমান আনবে না।" (সূরা আল বাকারা : ৬)। "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।" (সূরা আল বাকারা : ১১৯) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে আবৃত্তি করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেন।" (সূরা আল বাকারা : ১৫১)। নবীর মর্যাদার ব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফিরিশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পেশ করছেন" (৩৩ : ৫৬)।

www.nagorikpathagar.org

এক নজরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়

নাম ঃ মুহাম্মদ (আল্লাহর পক্ষ থেকে আহমদ)

পিতা ঃ আবদুল্লাহ

মাতা ঃ আমেনা বিনতে ওয়াহাব

দাদা ঃ আবদুল মুত্তালিব

দাদি ঃ ফাতেমা বিনতে আমর

নানা ঃ ওয়াহাব ইবনে মান্নাফ

নানি ঃ বারা বিনতে আবদুল উযযা

চাচা ঃ ৯ জন। হারেছ, যুবায়ের, আবু তালিব, হামযা, আবু লাহাব, গাইদাক, মাকহুম, সাফারক, আব্বাস।

ফুফু ঃ ৬ জন। বায়েজা, বাররা, আতিকা, ছাফিয়া, আরোয়া, উমাইয়া।

ভাই-বোন ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ভাই-বোন ছিল না। তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাবা-মার অন্য কোন সন্তান নেই।

বংশ ঃ আরবের সবচেয়ে নামকরা ও মর্যাদাপূর্ণ কুরাইশ বংশ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারাবাহিক জীবন

জন্ম ঃ ১২ রবিউল আউয়াল, ২৯ আগস্ট ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে, সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মায়ের গর্ভে ঃ তখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিতা ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমনের পথে ২৫ বছর বয়সে, মদীনায় মারা যান।

প্রথম থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত বিশ্বনবী, মা আমিনা ও দুধমাতা হালিমার ঘরে অবস্থান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর মা, দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সংবাদ দিলে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে নাতির নাম রাখেন মুহাম্মদ। মা আমেনা দৈব (ফিরিশতা মারফত) নির্দেশে নাম রাখেন আহমদ। সপ্তম দিনে নাতির খাতনা করান (এ রকম আরবের রেওয়াজ ছিল)।

www.nagorikpathagar.org

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি খাতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মা আমেনা ৭ দিন দুধপান করানোর পর আবু লাহাবের দাসী সাওবিয়া তাকে ৮ দিন দুধ পান করান। আরবের নিয়ম মোতাবেক ধাত্রী হালিমা সাদিয়ার (রা.) কাছে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। দু'বছর বয়স হলে হালিমা দুধ পান বন্ধ করিয়ে মা আমেনার কাছে ফেরত দেন। তার ইচ্ছে ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু দিন তার কাছে থাকুক। মা আমেনা এ ইচ্ছা পূরণ করে ছেলেকে আবার হালিমার কাছে ফিরিয়ে দেন। চার বছর পর্যন্ত দুধ মাতা হালিমার (রা.) ঘরে শিশুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালিত-পালিত হন।

চার বছর বয়সে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনাচাক (বক্ষ বিদীর্ণ) হয়েছিল। সিনাচাক ঘটনার পর হালিমা ভীত হয়ে শিশু মুহাম্মদকে তার মায়ের কোলে দিয়ে যান।

ছয় বছর বয়সে মা আমেনা স্বামীর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। সাথে ছেলে মুহাম্মদ, শ্বশুর আবদুল মুত্তালিব ও স্বামীর রেখে যাওয়া দাসী উম্মে আয়মান ছিলেন। যিয়ারত শেষে মক্কা ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমেনা মারা যান। লালন-পালনের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে দাদা আবদুল মুত্তালিবের উপর।

আট বছর ঃ দাদা আবদুল মুত্তালিব মারা যান। দাদা মারা যাওয়ার পর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবা আব্দুল্লাহ ও চাচা আবু তালিব দু'জন এক মায়ের সন্তান ছিলেন।

দশ বছর ঃ দ্বিতীয় বারের মত সিনাচাক (বক্ষবিদীর্ণ হয়)।

বার বছর ঃ পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফর। খ্রিষ্টান পাদ্রী বুহাইরা কর্তৃক শিশু নবীর স্বীকৃতি।

পনের বছর ঃ ফুজ্জারের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেন।

সতের বছর ঃ হিলফুল ফুযুল শান্তি সংঘে যোগদান করেন।

তেইশ বছর ঃ খাদীজার (রা.) সাথে পরিচয় এবং তার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ।

চব্বিশ বছর ঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন।

www.nagorikpathagar.org

পঁচিশ বছর ঃ খাদীজা (রা.) কে বিয়ে।

ত্রিশ বছর ঃ আল-আমীন উপাধি লাভ। বড় মেয়ে যয়নবের (রা.) জন্ম।

পয়ত্রিশ বছর ঃ হাজারে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনে নেতৃত্ব দান।

সাইত্রিশ বছর ঃ চাচাত ভাই বালক আলীর (রা.) দায়িত্বভার গ্রহণ। হেরাগুহায় ধ্যান মগ্ন থাকা। বড় ছেলে কাশেমের জন্ম।

চল্লিশ বছর ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভ, কুরআন নাযিল শুরু। ১ ফেব্রুয়ারি ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।

একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ ও তেতাল্লিশ বছর ঃ নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। আপনজন, বন্ধু ও পরিচিতজনের মাঝে তাবলীগ করেন। খাদীজা (রা.), আলী (রা.), আবু বকর (রা.), যায়েদ (রা.), ওসমান (রা.), যুবায়ের (রা.), আবদুর রহমান (রা.), তালহা (রা.), সাদ (রা.), আবু উবাইদা (রা.), উম্মে রুকাইয়া (রা.), আয়মন (রা.), আরকাম (রা.), উসমান (রা.), কুদামা (রা.), আব্দুল্লাহ (রা.) উবাইদা (রা.), ফাতিমা (রা.), উম্মে ফজল (রা.), আসমা (রা.), আয়িশা (রা.), সাঈদ (রা.), যাব্বার (রা.), উমাইর (রা.), বিলাল (রা.), জাফর (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার নিকট আরকামের (রা.) ঘরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন। কুরাইশ নেতাদের অতিথিয়তা ভোজনান্তে ইসলামের দাওয়াত প্রচার।

চুয়াল্লিশ বছর ঃ বিশ্বনবী আত্মীয় স্বজনের মাঝে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাবলীগ করেন। নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেন। এটিই ইসলামের প্রথম হিজরত। যার নেতৃত্ব দেন ওসমান (রা.)। দলে নবী কন্যা রুকাইয়া (রা.) ছিলেন। মহিলা সাহাবী সুমাইয়া (রা.), যালিম, কাফির সর্দার আবু জাহেল কর্তৃক শাহাদাত বরণ।

পঁয়তাল্লিশ বছর ঃ নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা (রা.) ইসলাম কবুল করেন। ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের প্রকাশ্য মিছিল। কাবা প্রাঙ্গণে নামায আদায়।

ছেচল্লিশ বছর ঃ নবুওয়াতের সপ্তম বছরে বিশ্বনবী চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। সূরা নজম, মরিয়ম, ত্বহা, ওয়াকিয়া, শূরা অবতীর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

ছেচল্লিশ, সাত চল্লিশ ও আট চল্লিশ বছর ঃ নবুওয়াতের ৭-৯ তম বছর অর্থাৎ ৩ বছর শি'আবে আবী তালিবে বয়কট (অবরোধ) অবস্থায় থাকেন। খানা, পানিবিহীন অবস্থায় মুসলমানরা অসহনীয় কষ্টে দিন অতিবাহিত করেন। দাওয়াত ও তাবলীগ অব্যাহত থাকে। কা'বার ভেতর জন্মগ্রহণকারী একমাত্র মানব সন্তান হাকীম ইবনে হাশেমের (রা.) জন্ম।

উনপঞ্চাশ বছর ঃ নবুওয়াতের ১০তম বছরে রমযান মাসে বিশ্বনবীর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। তার তিন দিন পর বিবি খাদীজাও (রা.) ইন্তিকাল করেন। এ সময় মদীনা থেকে ৬ জনের একটি দল ইসলাম কবুল করেন। মদীনায় দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচার ও প্রসার হয়।

পঞ্চাশ বছর ঃ নবুওয়াতের ১১তম বছরে মহররম মাসে বিশ্বনবী তায়েফে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যান এবং নির্যাতিত হন। ইবনে উমাইরের এবং খাযরাজ বংশীয় ছয় জনের ব্যাপকভাবে মদীনায় ইসলাম প্রচার শুরু। এ ছয়জন প্রথমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত হন (প্রথম বাইয়াত)। এ হিজরীতে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। মক্কার বাইরে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম জামাত/সফর। জামাতের নেতৃত্ব দেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং সাথে ছিলেন যায়েদ বিন হারিছা (রা.)। হাজীদের কাছে ব্যাপকভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের প্রসার

একান্ন বছর ঃ নবুওয়াতের ১২তম বছরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ সংঘটিত হয় এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। তৃতীয়বারের মত বক্ষবিদীর্ণ করণ (সিনাচাক)। মদীনার ১২ জন আকাবা নামক স্থানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত হন (এটা ৩য় বাইয়াত)। মদীনার আওস গোত্রের নেতা সাদ মুসলমান হন।

বায়ান্ন বছর ঃ নবুওয়াতের ১৩তম বছরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরতের আদেশ দেন। কুরাইশদের ১২ জন যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার জন্য বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। এরই মধ্য থেকে তিনি ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার মদীনায় হিজরত করেন। হিজরী সনের গণনা এখান থেকেই শুরু হয়। সে অনুসারে ৬২২ ঈসায়ী সন থেকে প্রথম হিজরী সন শুরু হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

তেপ্পান্ন বছর (প্রথম হিজরী) ঃ

মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ বছরই জুমু'আর নামায ফরয হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে মসজিদে কুবা ও মসজিদে জুম্মা প্রতিষ্ঠিত করেন। আযানের প্রচলনসহ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম নাযিল হয়। তিনটি খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়। এ বছরেই আয়িশা (রা.) এর সাথে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়।

চুয়ান্ন বছর (দ্বিতীয় হিজরী)

কুরবানী ওয়াজিব হয়।

কিবলা পরিবর্তন হয়।

কা'বার দিকে নামায পড়ার হুকুম হয়। ইতোপূর্বে কিছুকাল কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস।

রোযা ফরয হয়।

যাকাত ফরয হয়।

ঈদের নামায চালু হয় ও সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়।

সর্বপ্রথম জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত (হজ্জ ঃ ৩৯-৪০) নাযিল হয়।

বদরসহ ৫টি যুদ্ধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পরিচালনা করেন।

৩টি খণ্ড যুদ্ধ বা অভিযান পরিচালিত হয়।

উবাইদা ইবনে হারিস এবং হামযার নেতৃত্বে ইতিহাসের প্রথম (দু'টির যেকোন একটি) মুসলিম বাহিনীর অভিযান পরিচালিত হয়।

ফাতিমা (রা.) এর সাথে আলী (রা.) এর বিয়ে হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ২য় মেয়ে রুকাইয়া ইন্তিকাল করেন।

সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

পঞ্চান্ন বছর (তৃতীয় হিজরী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হামযা (রা.) শহীদ হন।

উহুদসহ ৩টি যুদ্ধ পরিচালিত হয় (গাতফান, উহুদ, হাজারাউল আসাদ)।

হদের প্রথম নিষেধাজ্ঞার আয়াত নাযিল হয়।

www.nagorikpathagar.org

বিয়ের আইন ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়।

সুদ ত্যাগের প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়।

২টি খণ্ড যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালিত হয়।

হাফসা ও যয়নাব (রা.) এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিয়ে হয়।

কিসাসের হুকুম (শাস্তির বিধান) নাযিল হয়।

উত্তরাধিকারীর বিধান (ওয়ারিসের সম্পত্তি বণ্টন) নাযিল হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তৃতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুমের সাথে উসমানের (রা.) বিয়ে হয়।

ছাপ্পান্ন বছর (চতুর্থ হিজরী)

পর্দার হুকুম ও মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন।

এ সময় ২টি যুদ্ধ ও ৪টি খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়।

বীরে মাউনায় দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতের সকল সদস্য (৬৯ জন হাফিয) শহীদ হন।

বনু নাজীর ও যাতুর রিকা যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়।

সাতান্ন বছর (পঞ্চম হিজরী)

এ সময়ে খন্দকসহ ৫টি যুদ্ধ ও ১টি খণ্ড যুদ্ধ হয়। বনু কুরাইযার যুদ্ধে ইহুদীদের প্রাণদণ্ড হয়।

ওযু ও তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়।

যয়নাব বিনতে খুযাইমা ও জোয়াইরিয়া (রা.) কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত পান।

৫ দিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে নামায আদায় করেন।

আয়িশার (রা.) বিরুদ্ধে ইফকের (অপবাদ) ঘটনা সংঘটিত হয়।

সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়।

www.nagorikpathagar.org

আটান্ন বছর (ষষ্ঠ হিজরী)

৩টি যুদ্ধ ও ১১টি খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। বায়'আতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিল মহরের জন্য রূপার আংটি তৈরি করেন।

বিভিন্ন বাদশার নিকট পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌছান।

ব্যভিচারের শাস্তির হুকুম (রজম) নাযিল হয়।

মিথ্যা অপবাদের শাস্তির হুকুম নাযিল হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ায় বৃষ্টিপাত হয়।

বিশ্বনবী, মারিয়া কিবতিয়াকে (রা.) (খ্রীষ্টান বিধবা কন্যা) বিবাহ করেন।

উনষাট বছর (সপ্তম হিজরী)

খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৩টি যুদ্ধ ও ৫টি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম কবুল করেন।

মুতা বিবাহ রহিত ঘোষণা করা হয়।

চুরির শাস্তি বিধান নাযিল হয়।

বিশ্বনবী, উম্মে হাবিবা, মাইমুনা ও সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে (রা.) বিবাহ করেন। শেষজন ইহুদী বিধবা ছিলেন।

হারাম-হালাল খাদ্য চিহ্নিত করে আয়াত নাযিল হয়।

সুদ নিষিদ্ধ হয়।

আবু হুরাইরার (রা.) ইসলাম গ্রহণ।

বিয়ে ও তালাকের বিধান নাযিল হয়।

ষাট বছর (অষ্টম হিজরী)

মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ অবরোধ করা হয়।

কা'বাঘর তাওয়াফ করেন।

www.nagorikpathagar.org

কাবাঘর থেকে মূর্তি সরানো হয়।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস এবং উসমান ইবনে তালহার (রা.) ইসলাম গ্রহণ।

মসজিদে মিম্বার তৈরি হয়।

মুতা ও হুনাইনসহ ৪টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুতার অভিযানে যায়েদ, জাফর, আব্দুল্লাহর (রা.) শাহাদাতের পর খালিদের (রা.) হাতে বিজয় সূচিত হয়।

১০টি খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়।

হুনাইনের যুদ্ধে প্রথম মুসলমানদের পরাজয়ের পর বিজয় আসে। তায়েফ সহজেই বিজয় হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ে যয়নবের মৃত্যু হয়।

একষট্টি বছর (নবম হিজরী)

হজ্জ ফরয হয়।

তাবুক যুদ্ধ। কতিপয় মুসলমান ও মুনাফিকের যুদ্ধে অনুপস্থিত। রোমান বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন।

৩টি খণ্ড যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩য় মেয়ে উম্মে কুলসুমের মৃত্যু হয়।

আবু বকর (রা.) কে 'আমীরুল হজ্জ' করে মক্কায় পাঠান।

স্ত্রীদের অসঙ্গত দাবির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস তাদের কাছে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মুনাফিকদের তৈরি 'মসজিদ, যেরার'কে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

বাষট্টি বছর (দশম হিজরী)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু হয়।

১ লাখ ৩০ হাজার সাহাবীসহ হজ্জ পালন করেন। বিদায় হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.nagorikpathagar.org

আল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত (মায়েদা ঃ ৩) অবতীর্ণ হয়।

২টি খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তেষট্টি বছর (একাদশ হিজরী)

দাওয়াত ও তাবলীগে আলীকে (রা.) ইয়ামানে প্রেরণ। উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্বে বিশাল সৈন্য দলকে সিরিয়া প্রেরণ।

১টি খণ্ড যুদ্ধ হয়।

২৮ সফর বুধবার মাথাব্যথা ও জ্বর শুরু হয়।

১১ রবিউল আউয়াল সর্বশেষ নামাযের জামাতে যোগদান করেন।

১৪ দিন অসুস্থ থাকেন।

১২ রবিউল আউয়াল, ১৮ জুন ৬৩৪ খ্রীঃ রোজ সোমবার দুপুরের সময় ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এদিন সকালেও নিজ ঘরে দাওয়াত ও তাবলীগ করেন।

১৪ রবিউল আউয়াল আয়িশার (রা.) ঘরে তাঁর দাফন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই বিশ্বনবীর (সা.) কবর রচিত হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে-মেয়ের পরিচয় ঃ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ৩ জন ও কন্যা ৪ জন। ছেলেরা হলেন - ১. কাসেম, ২. আবদুল্লাহ, ও ৩. ইব্রাহীম। আর কন্যারা হলেন - ১. যয়নব, ২. রুকাইয়া, ৩. উম্মে কুলসুম ও ৪. ফাতিমা (রা.) [ইবরাহীম বাদে সকলেই খাদীজার (রা.) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।] ইব্রাহীম মারিয়া কিবতিয়ার (রা.) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেড় বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। বিশ্বনবীর (সা.) বংশ ধারা মেয়েদের, বিশেষভাবে ফাতিমার (রা.) মাধ্যমে চালু আছে। কেননা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পুত্র সন্তানই শিশুকালে মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের পরিচয়

১. খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রা.) : বিয়ের সময় বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ২৫ বছর। বিয়ের সন ৫৯৫ খ্রীঃ। মোহরানা ২০টি উট। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর।

www.nagorikpathagar.org

২. সওদা বিনতে যাময়া (রা.) : বয়স ৫০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৩ বছর। বিয়ের সন ১০তম নবুওয়াতী বছর। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে বয়স ৭০ বছর।

৩. আয়িশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) : বয়স ৬, কুমারী। রাসূলের ৫৪ বছর। বিয়ের সন নবুওয়াতের ১০তম বছর। ৯ বছর বয়সে তিনি রাসূল (সা.) এর ঘরে আসেন। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে আয়িশার (রা.) বয়স ছিল ৬৬ বছর। কোন কোন বর্ণনা মতে ৮২ বছর।

৪. হাফসা বিনতে ওমর (রা.) : বয়স ২০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৫ বছর। বিয়ের সন ৩ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যু ৮১ বছর বয়সে।

৫. যয়নব বিনতে খুজাইম (রা.) : বয়স ২৯, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৫ বছর। বিয়ের সন ৪ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে বয়স ৩০ বছর।

৬. উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া (রা.) : বয়স ৩৮, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৬ বছর। বিয়ের সন ৪ হিজরী। মোহরানা ১টি প্লেট, পেয়ালা ও যাঁতাকল। মৃত্যুকালে বয়স ৮২ বছর।

৭. যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) : বয়স ৩৭, তালাকপ্রাপ্তা। রাসূলের বয়স ৫৭ বছর। বিয়ের সন ৫ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে বয়স ৫৫ বছর।

৮. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) : বয়স ৩৯, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৭ বছর। বিয়ের সন ৫ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে বয়স ৬৫, (৩১ হিজরী)।

৯. রায়হানা বিনতে শামউন (রা.) (ইহুদী কন্যা) : বয়স ৪১, বিধবা। রাসূলের বয়স ৬০ বছর। বিয়ের সন ৮ হিজরী। মোহরানা-দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মোহরানা আদায়। মৃত্যুকালে বয়স ৪২ বছর, (১০ হিজরী)।

১০. সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার (রা.) (ইহুদী কন্যা) : বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৭ হিজরী। মোহরানা-দাসত্ব থেকে মুক্তির বিনিময়ে। মৃত্যুকালে বয়স ৮২ বছর, (৫০ হিজরী)।

১১. মারিয়া কিবতিয়া (রা.) (খ্রিষ্টান কন্যা) : বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৮ বছর। বিয়ের সন ৬ হিজরী। মোহরানা- মিসরের বাদশা নিজে মোহরানা

www.nagorikpathagar.org

আদায় করেন। উপঢৌকন হিসেবে মিসরের বাদশা কর্তৃক প্রেরিত। মৃত্যুকালে বয়স ৪৭ বছর, (১৩ হিজরী)।

১২. উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.) : বয়স ৪০, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৭ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে বয়স ৭৪ বছর, (৪০ হিজরী)।

১৩. মাইমুনা ইবনে হারিস (রা.) : বয়স ৫১, বিধবা। রাসূলের বয়স ৫৯ বছর। বিয়ের সন ৭ হিজরী। মোহরানা ৪০০ দিরহাম। মৃত্যুকালে বয়স ৮৭ বছর, (৪২ হিজরী)।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের গড়ন

মাথা : বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা ছিল আকারে সামান্য একটু বড়।

চুল : মাথার চুল ছিল কানের লতি বরাবর কিছুটা কোঁকড়ানো ও ঢেউ খেলানো। বাবরী চুল। তিঁনি মাথার মধ্যখানে সিঁথি করতেন। চুলে তেল ও আতর মাখতেন। চুল ঘন ও কালো ছিল। ইন্তিকালের পূর্বে ১৮/২০ টি চুলে পাক ধরেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রকমের চুলই রেখেছেন - বাবরী, কেটে ছোট করে ও মাথা মুণ্ডন করে।

কপাল : প্রশস্ত ও মসৃণ।

নাক : নাকের ডগার মধ্যভাগ উঁচু এবং ছিদ্র ছিল সংকীর্ণ।

দাঁত : সামনের দাঁত ছিল উজ্জ্বল ও সামান্য একটু ফাঁকা।

চোখ : ডাগর ডাগর। চোখের মণি খুব কালো। সাদা অংশে সামান্য লাল আভা। পাতা ছিল বড়। মনে হত চোখে সুরমা দিয়েছেন।

ভ্রু : প্রশস্ত ও জোড়া লাগানো।

চেহারা : নূরানী চেহারা! মুখায়ব গোলাকার। দুধে আলতা মেশানো রং। ফর্সা ও ঝকঝকে।

আকার : খুব লম্বাও নয়, খুব খাটোও নয়। মধ্যমের চেয়ে একটু বড়। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর মত সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যক্তি আর কাউকে দেখা যায়নি।

দাঁড়ি : মানানসই ঘন ও বড় রাখে জীবনের শেষের দিকে থুতনীর ছোট দাঁড়ি ও চিপে একটু পাক ধরেছিল। লম্বা চওড়ায় সুন্দর (সাইজ) করে দাড়ি রাখতেন।

www.nagorikpathagar.org

হাত : হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা। কব্জী হতে কনুই পর্যন্ত পশম ছিল। তালু মাংশে ভরা এবং প্রশস্ত।

বুক : বুক কিছুটা উঁচু ও প্রশস্ত। বীরের মত। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটা সরু রেখা ছিল। এছাড়াও শরীরে পশম ছিল।

পেট : সরু; কোন ভুড়ি ছিল না। সুন্দর সমান ছিল। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী।

ঘাম : ঘামলে মতির মত দেখাতো। ঘামের মধ্যে মিশক আম্বরের ন্যায় সুগন্ধ ছিল। পার্থিব যে কোন খুশবুর চেয়ে উত্তম।

পা : পায়ের গোছা সরু ছিল। পায়ের পাতার মধ্য ভাগে কিছু খালি ছিল। চলার সময় কিছুটা সামনে ঝুঁকে চলতেন।

কাঁধ/পিঠ : কাঁধ ছিল প্রশস্ত। দুই কাঁধের মাঝখানে (একটু নিচের পিঠে) মহরে নবুওয়াত ছিল। যা দেখতে কবুতরের ডিমের মত। রং ছিল গায়ের রংয়ের সাথে মিলানো।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক

পোশাক ব্যবহারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরতেন।

তিনি জামা জাতীয় পোশাককে বেশি পছন্দ করতেন।

পায়জামা পরতেন না, তবে মিনার বাজার থেকে একটা পায়জামা কিনেছিলেন।

সাদা কাপড় বেশি পছন্দ করতেন।

সবুজ ও জাফরানীসহ সব রঙ্গের কাপড় ব্যবহার করেছেন।

মোজা পরার অভ্যাস ছিল না। তবে আবিসিনার নাজ্জাশী বাদশার পাঠানো চামড়ার মোজা ব্যবহার করেছেন।

মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি ব্যবহার করতেন।

অধিকাংশ সময়ে কালো পাগড়ি ব্যবহার করতেন।

পাগড়ির নিচে টুপি পরতেন। তার তিনটি টুপি ছিল। ১. সাদা সুতার কাজ করা। ২. ইয়ামেনি চাদর দ্বারা বানানো। ৩. কান পর্যন্ত লম্বা টুপি।

ইয়ামেনের ডোরাযুক্ত চাদর তিনি খুব পছন্দ করতেন।

www.nagorikpathagar.org

শেরওয়ানি পরতেন।

জুতা ছিল দুই ফিতা লাগানো, বর্তমান সময়ের সেণ্ডেলের মত।

তিনটা জুব্বা ছিল। তার মধ্যে ১টি সবুজ রংয়ের রেশমি সুতার তৈরী। একটি জিহাদের ময়দানে ব্যবহার করতেন। জিহাদের ময়দানে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয। খেজুর পাতা ভর্তি করা (তৈরি) গদি ছিল। দড়ির তৈরি শোয়ার খাট ছিল। সিল দেয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য রুপার একটি আংটি ছিল। তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। পোশাকের ব্যাপারে সাদা-সিধা জীবনযাপন করতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদ্য

তিনি হালুয়া ও মধু খুবই পছন্দ করতেন।

কদুর তরকারি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

সামুদ্রিক মাছ খেয়েছেন।

উট, ভেড়া, মুরগি ও বকরির গোশত খেয়েছেন।

বন্য গাধাঁ ও খরগোশের গোশত খেয়েছেন। পরবর্তীতে গাধাঁ খাওয়া নিষেধ হয়েছে।

খাঁটি দুধ ও পানি মিশানো দুধ খেয়েছেন।

ছড়া থেকে আঙ্গুর খেতেন।

পানি মেশানো মধু ও খেজুর ভিজানো পানি খেতেন।

ছাতু, দুধ ও আটা দিয়ে তৈরি পিঠা, পনির, কাঁচা পাকা খেজুর খেতেন।

সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন।

গোশতের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে (ছরীদ) খেয়েছেন।

ভুনা গোশত, চর্বির ইহালা ও কলিজা খেয়েছেন। তবে তিনি গুর্দা ও কলিজা বেশি পছন্দ করতেন না।

যয়তুন ও মাখন দিয়ে শুকনো খেজুর খেতেন।

তিনি কখনো কখনো ঘি দিয়ে রুটি খেয়েছেন।

নরম খেজুরের সাথে খরমুজ খেয়েছেন। তিনি খরমুজ খাবার সময় দু'হাত ব্যবহার করতেন।

খাবার সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেতেন।

তিনি যবের রুটি খেয়েছেন।

সফরে মাটিতে বসে খেতেন।

হালাল ও পবিত্র খানা যা পেতেন, তা তৃপ্তির সাথে খেতেন।

বেশির ভাগ সময়ে তিনি ক্ষুধা সহ্য করতেন। রোযা রাখতেন। দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস না খেয়ে কাটাতেন।

পেট ভরে খেতেন না, খাদ্যের প্রাচুর্যের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। খুবই কম খেতেন। পেটের একভাগ খাদ্যে, একভাগ পানিতে এবং একভাগ খালি রাখতেন।

তিনি অত্যধিক গরম খাবার খেতেন না।

তিনি কাঁচা রসুন, পেয়াজ ও কুররাস (রসুনের মতো গন্ধযুক্ত এক প্রকার তরকারি) খেতেন না।

তিনি কোনো খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বলতেন না। রুচিপূর্ণ না হলে খেতেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার্য জিনিস পত্র

পিতার একখানা ভিটাবাড়ি।

উম্মে আয়মান নামে একজন দাসী।

৯ খানা তরবারি। এগুলোর বাট ছিল রৌপ্যখচিত।

৭টি বর্ম। জাতুল ফযুল বর্মটি অভাবের কারণে ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন।

৬টি বর্শা।

বর্শার ফলক রাখার জন্য 'কাফুর' নামে একটি থলে।

সুদাদ নামে একটি ধনুক।

৩টি ঢাল।

রূপায় বাঁধানো একটি কমরবন্দ।

পাঁচটি নেযা। বারদা নামের নেযাটি বড় ছিল। গেমরা একটু ছোট। এটা নামাযের সময় সামনে গেড়ে দেয়া হত।

২টি হেলমেট। ১টা লোহা তামা মেশানো টুপি। একটি লৌহ নির্মিত মুখোশ।

www.nagorikpathagar.org

১টি তাঁবু (কনু নামক তাঁবু)।

৩টি লাঠি।

১টি ডাণ্ডা। এটির নাম ছিল 'মউত'।

সকব নামে ধুসর রংয়ের ঘোড়াসহ মোট ৭টি ঘোড়া।

দুলদুল নামে একটি সাদা খচ্চর।

কাসওয়া নামে উটে চড়ে মদীনায় হিজরত করেন। মোট ৪৫ টি উট।

'একশ'টি বকরি। ৭টি পাহাড়িয়া ছাগল যা উম্মে আয়মান চরাতেন।

৩টি পেয়ালা। ১টি লোহার পাতযুক্ত মোটা কাঠের পেয়ালা।

রাতে পেশাবের জন্য চৌকির নিচে কাঠের পাত্র রাখতেন।

সাদির নামে একটি মশক।

ওযু করার জন্য একটি পাথরের পাত্র।

কাপড় ধোয়ার জন্য একটি পাত্র।

'সিককা' নামে একটি বড় পেয়ালা।

হাত ধোয়ার থালা। তেলের শিশি ও আয়না।

চিরুনি রাখার একটি থলে। চিরুনি ছিল সেগুন কাঠের।

একটি সুরমাদানি।

কাঁচি (বা কেঁচি) ও মিসওয়াক থলের মধ্যে রাখতেন।

চারটি আংটা লাগানো একটি বড় পাত্র।

পরিমাপের জন্য ছা' ও মুদ।

দড়ির তৈরি একটি খাট। খাটের পায়া ছিল সেগুন কাঠের।

চামড়ার তৈরি একটি গদী যার ভিতরে ছিল খেজুরের ছোবড়া।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসতবাড়ি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশবে দাদার বাড়িতে লালিত-পালিত হন। ২৫ বছর পর্যন্ত চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। বাবার কিছু ভিটামাটি ছিল। মদিনায় হিজরত করার পর সে বাড়ি আকিল (আবু তালিবের

www.nagorikpathagar.org

ছেলে। তখনো মুসলিম হয়নি) দখল করে নেয়। হিজরত করে আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এর বাড়িতে ছয় মাস অবস্থান করেন। নিজের জন্য মসজিদে (নববী) এর পাশে ছোট ছোট দু'টো ঘর তৈরি করেন। তখন স্ত্রী ছিল দু'জন- হযরত সওদা (রা.) ও হযরত আয়িশা (রা.)। দু'জনকে দুটো ঘর দেন। হারেছ ইবনে নোমান আনসারী (রা.) এর দেয়া জায়গার উপর ঘরগুলো তৈরি করেন। খেজুর গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা দ্বারা ঘরগুলো তৈরি। ছাদ ও দেয়ালে কাদামাটির আস্তর করা ছিল। ঘরগুলোর কোনো আঙ্গিনা বা বারান্দা ছিল না। ছাদের উচ্চতা ছিল ৭/৮ ফুটের মত অর্থাৎ মানুষের মাথা বরাবর উঁচু। ঘরের দরজায় থাকত চট অথবা কম্বলের পর্দা।

'মাশরাবা' নামে তাঁর একটি দোতলা ঘর ছিল। নবম হিজরীতে যখন তিনি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে আঘাত পান; তখন একমাস এ দোতলায় অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত বসবাসের জন্য ঘরের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল এগারোখানা। ঘরের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট। দরজা সাড়ে চার ফুট উঁচু ও পৌনে দুই ফুট চওড়া ছিল। এগারোটি ঘরের মধ্যে ৪টির কাঁচা ইটের দেয়াল ও বাকিগুলো খেজুর শাখায় তৈরি। হযরত আয়িশার (রা.) ঘর মসজিদের পূর্ব বরাবর ছিল। এ ঘরেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাওজা মুবারক। খলীফা উমর (রা.) শাসনকাল পর্যন্ত হুজরাগুলো অপরিবর্তিত ছিল। পরে ঘরগুলো ভেঙ্গে মসজিদের সাথে শামিল করা হয়েছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন কাজ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন রাতের তিন ভাগের একভাগ ইবাদত-বন্দেগী, একভাগ পরিবার-পরিজন ও গৃহকর্মের জন্য এবং আরেকভাগ সমাজের দুঃস্থ-নিঃস্বজনের সেবায় ব্যয় করতেন। বিশেষ জরুরি অবস্থা সৃষ্টি না হলে, এ অবস্থার ব্যতিক্রম হতো না। ফজরের নামায শেষ করে জায়নামাযে লোকজনের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে বসতেন। তাদের ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত ও উপদেশ দিতেন। প্রশ্নের জবাব দিতেন। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে পরামর্শ করতেন। মাঝে মাঝে সাহাবীদের স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করতেন। বিদেশি প্রতিনিধি ও বিভিন্ন গোত্রের লোকের সাথে সাক্ষাৎ দিতেন। বিচার সালিসি অভিযোগ শোনা ও মীমাংসা করতেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন। মালে গণীমত, ভাতা ও খারাজের মাল বণ্টন

করতেন। চার রাকাত অথবা আট রাকাত চাশতের নামায পড়ে ঘরে ফিরতেন (বুখারী, মুসনাদে আহমদ)।

ঘরে ফিরে বাড়ির কাজে লেগে যেতেন। উট বকরির খাবার দিতেন। দুধ দোহন করতেন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনতেন। নিজের পুরানো কাপড়, জুতা সেলাই করতেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতেন। যুহরের নামাযের আগে খাবার খেয়ে নিতেন। কিছু সময় বিশ্রাম করতেন (কায়লুলা করতেন)। যোহরের নামায শেষে পুনরায় দাওয়াতের কাজ করতেন। অথবা বাইরে কোথাও দাওয়াত ও তালিমের কাজে যেতেন। আসরের নামাযের পর ঘরে গিয়ে সকল স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বলতেন ও খোঁজ-খবর নিতেন। যার ঘরে পালা আসত সকল স্ত্রীগণ সেখানে জড়ো হতেন। এ সময় তিনি মহিলাদের সমস্যা নিয়ে আলাপ করতেন। দাওয়াত, তাবলীগ ও তালিমের কাজ করতেন। এভাবে ইশার আগ পর্যন্ত কাটাতেন (বুখারী)।

ইশার পর যে স্ত্রীর ঘরে পালা পড়ত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। ইশার পর কথাবার্তা বলা বা রাত জাগা পছন্দ করতেন না। নিদ্রা যাওয়ার আগে নিয়মিত কুরআন মাজীদের কোনো সূরা (সূরা বনী ইসরাঈল, যুমার, হাদীদ, হাশর, সফ, তাগাবুন, জুমু'আ) পাঠ করে শয়ন করতেন। শোয়ার সময় দোয়া পড়তেন। জেগেও দোয়া পাঠ করতেন। রাতের অর্ধপ্রহর পার হওয়ার সাথে সাথে জেগে উঠতেন। হাতের কাছে মিসওয়াক ও ওযুর পানি রাখতেন। ভালোভাবে মিসওয়াক ও ওযু করতেন। নিজ বিছানায় নামায আদায় করতেন (তাহাজ্জুদ)। কোনো কোনো সময় এশার নামাযের পর সামান্য বিশ্রাম করে ফজর পর্যন্ত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। ডান কাতে ডান হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করতেন। ঘুমে অতি সামান্য নাক ডাকা শব্দ অনুভূত হত। সাধারণত চামড়ার বিছানায় অথবা চাটাইয়ের উপর অথবা মেঝেতে শুয়ে আরাম করতেন। প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অর্থাৎ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত থাকতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য কাজকর্ম

১. নফল নামায। ২. নফল রোযা। ৩. কুরআন তিলাওয়াত। ৪. যিকির ও দোয়া। ৫. আহার (সকাল, দুপুর, রাত)। ৬. নাশতা। ৭. পায়খানা-পেশাব। ৮. ওযু, গোসল (তাহারাত অর্জন)। ৯. চুল, দাঁড়ি, মোছ, নখ, বগল ও গুপ্তাঙ্গ পরিষ্কার করা। ১০. চুল, দাঁড়ি, আঁচড়ানো। ১১. আতর, সুরমা লাগানো।

www.nagorikpathagar.org

. জিহাদে শরীক হওয়া। ১৭. বিচার শালিস
৯. স্ত্রীদের ফরমায়েশ পূরণ করা। ২০. শিশুে
২১. মি'রাজে গমন করা। ২২. ওহী নাযিল
। ২৪. যুদ্ধ অভিযানে লোক পাঠানো। ২
ট চিঠি দেয়া। ২৬. জীবিকা নির্বাহের
াসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। ২৮. বায়
তিবেশী ও দুঃস্থদের প্রতি নজর রাখা।
আদায় করা। ৩১. হজ্জ ও ওমরা পালন করা।
নামাযে ইমামতি করা। ৩৪. জুমার খুতবা
। ৩৬. বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাে
(আ.) সাথে সময় দেয়া। ৩৮. কাফির-মুশরিব
হলে সুফফাদের প্রতি নজর দেয়া। ৪০. মা
দর বাড়িতে যাওয়া।

অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা
াকশা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এর
সময়, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
হয়েছে। সফরে, হজ্জে, বিশেষ দাওয়াতী মিশ
ানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে এর ব্যতিক্রম
সবে জীবনে অসংখ্য ঘটনা ও অধ্যায় অতিক্র
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈনন্দিন কাজের
হুবহু কোন হাদীস গ্রন্থে লেখা নেই। তবে সি
কিতাবসমূহ, শামায়েলে তিরমিযী, সীরাত
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর
র্ণিত তালিকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী রাষ্ট্র

হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
াবে সম্পাদনের জন্য তার একটি সুসংগঠি

www.nagorikpathagar.org

১. নিরাপত্তা বিভাগ : নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ছিল না। কিছুসংখ্যক সাহাবী স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করতেন। বায়তুল মাল থেকে তাঁদের ব্যয়ভার বহন করা হত। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কায়েস ইবনে সা'দ (রা.)।

২. বিচার বিভাগ : এ বিভাগের প্রধান ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে। এছাড়া আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

৩. শিক্ষা বিভাগ : এ বিভাগ ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে। ইবনে আবুল আরকামের বাড়ি ছিল প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। তাছাড়া মসজিদে নববী ছিল মুসলমানদের সার্বিক শিক্ষাকেন্দ্র। মদীনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও মহিলাঙ্গনে আয়িশা (রা.) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৪. জনস্বাস্থ্য বিভাগ : নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হত। বিশিষ্ট চিকিৎসক হারিস ইবনে সালাহকে এ বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। চিকিৎসকগণ বায়তুল মাল থেকে ভাতা পেতেন।

৫. নগর প্রশাসন বিভাগ : ওমর (রা.) এর উপর এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। তাঁর কাজ ছিল নাগরিক হয়রানি, ধোঁকা ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় যেন না হয়, সে বিষয় নিশ্চিত করা। তিনি কঠোর প্রকৃতির ন্যায় বিচারক ছিলেন। শয়তান ইবলিস পর্যন্ত তাঁকে ভয় করত।

৬. বায়তুল মাল বিভাগ : বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ বিভাগের কাজ তদারকি করতেন। মুয়ানকি ইবনে আবী ফাতিমা (রা.) এ বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন।

৭. যাকাত ও সদাকাহ বিভাগ : যাকাত ও সদাকাহ বিভাগের অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতেন যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ও যুহাহির ইবনে সালাত (রা.)। যারা আঞ্চলিক যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তাদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক) মদিনা - উমর (রা.)।

খ) নাজরান - আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.)।

গ) বনু কিলাব - দাহহাক ইবনে সুফিয়ান (রা.)।

ঘ) বনু সুলাইম ও বনু মজাইনা - উব্বাত ইবনে বিশর (রা.)।

ঙ) বনু লাইস - আবু জাহাম ইবনে হুযায়ফা (রা.)।

চ) বনু কা'ব - বসুর ইবনে সুফিয়ান (রা.)।

ছ) বনু গেফার ও বনু আসলাম - বুয়াইদা ইবনে হুসাইন (রা.)।

জ) বনু জাবয়ান - আব্দুল্লাহ ইবনে লাইতাই (রা.)।

ঝ) বনু তাঈ ও বনু আসাদ - আদী ইবনে হাতেম আত-তাঈ (রা.)।

ঞ) বনু ফাজায়া - আমর ইবনুল আস (রা.)।

ট) এছাড়াও আরো কিছু আদায়কারী ছিলেন।

৮. পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ : আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা.), যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)।

৯. যোগাযোগ বিভাগ : মুগীরা ইবনে শো'বা ও হাসান ইবনে নুসীরা (রা.)।

১০. পরিসংখ্যান বিভাগ : বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার আদমশুমারি করেছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে প্রথম বার এবং পরে আরেকবার এ কাজ করেন। তাতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন।

১১. সিলমোহর বিভাগ : মুকার ইবনে আবী ফাতিমার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিল মোহরকৃত আংটি সংরক্ষিত থাকত।

১২. অভ্যর্থনা বিভাগ : আনাস ইবনে মালেক (রা.) ও বারাহ (রা.)।

১৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ : মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাদেশিক এলাকা ছিল। 'ওয়ালী' নামে খ্যাত এ সমস্ত এলাকায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

১৪. প্রতিরক্ষা বিভাগ : সে সময় বেতনভুক্ত কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক মুসলমানকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হত। রাসূলুল্লাহ সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। সেনাপতিগণ হলেন– ১. আবু বকর সিদ্দীক (রা.), ২. আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.), ৩. আলী ইবনে আবু তালিব (রা.), ৪. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), ৫. আবু ওবায়দা ইবনে যাররাহ (রা.), ৬. উবাদা ইবনে সামেত (রা.), ৭. হামযা ইবনে মুত্তালিব (রা.), ৮. মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.), ৯. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.), ১০. আমর ইবনুল আস (রা.), ১১. উসামা ইবনে যায়েদ (রা.), ১২. যায়েদ ইবনে হারিস, ১৩. ওমর

www.nagorikpathagar.org

ইবনে খাত্তাব (রা.), ১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.), ১৫. সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), ১৬. জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)।

১৫. রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ : এ বিভাগে কাজ করতেন- ১. হানযালা ইবনে আল রবী (রা.)। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত সচিব)। ২. শুরাহবিল ইবনে হাসান (রা.), সচিব। ৩. আনাস ইবনে মালেক (রা.), সার্বক্ষণিক সেবক।

১৬. দণ্ড (শাস্তি) বিভাগ : প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের শাস্তি কার্যকর করার কাজে দায়িত্ববান ছিলেন- ১. যুবায়ের (রা.)। ২. হযরত আলী (রা.)। ৩. মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.)। ৪. মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রা.)। ৫. আসেম ইবনে সাবিত (রা.)। ৬. দাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবি (রা.)।

১৭. ওহী লিখন বিভাগ : ওহী লিখনের মহান দায়িত্ব পালন করতেন- ১. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), ২. আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ৩. ওমর ফারুক (রা.), ৪. উসমান (রা.), ৫. আলী (রা.), ৬. উবাই ইবনে কা'ব (রা.), ৭. আবদুল্লাহ (রা.), ৮. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), ৯. খালিদ ইবনে সাঈদ (রা.), ১০. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.), ১১. খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.), ১২. মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.), ১৩. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)-সহ প্রায় চল্লিশ জন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল

১১ হিজরীর সফর মাসের শেষে বুধবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। ৩ রবিউল আউয়াল সাথীদের নিয়ে জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে শেষবারের মত জিয়ারত করেন। ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার রোগ আরো বেড়ে যায়। ১২ই রবিউল আউয়াল ভোরে আয়িশার ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখেন, মুসলমানেরা আবু বকরের নেতৃত্বে ফজরের নামায আদায় করছেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি খুশি হয়ে মৃদু হাসেন। ১১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল বা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ জুন, সোমবার দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আয়িশার ঘরে, তাঁর কোলে মাথা রেখে চির বিদায় নেন। ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাত্র ৭টি দিরহাম ছিল, যা গরীবদের মাঝে তখনই বিলি করে দেয়া হয়। আরেক বর্ণনায় এসেছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশার নামাযের মাঝামাঝি সময়ে ইন্তিকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন এবং সে অবস্থায় তাকে গোসল করানো হয়। আলী (রা.), আব্বাস (রা.), আব্বাসের দুই ছেলে ফজল ও কুছাম (রা.) এবং উসামা বিন যায়েদ (রা.) গোসল করান। রাসূল (সা.) এর মুক্ত করা গোলাম শুকরান (রা.) শরীরে পানি ঢালেন। ১৩ রবিউল আউয়াল, মঙ্গলবার রাতে জানাযা শেষ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানাযায় কেউ ইমামতি করেননি। লাইন ধরে দশ দশ জন লোক এসে দোয়া করে চলে যান। আলী, ফজল, কুছাম ও শুকরান (রা.) কবরে নেমে লাশ রাখেন। বিলাল (রা.) কবরে পানি ছিটিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোট জীবনকাল ৬৩ বছর ৪ মাস অথবা ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টার মত।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনে আলোচিত আয়াতসমূহ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনবার্তা ঃ সূরা আরাফ : ১৫৭; সূরা সফ : ৬।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মপরিচয় ঃ সূরা আলে ইমরান : ১৪৪; সূরা আনআম : ৫০,৬৬; সূরা আরাফ : ১৮৭,১৮৮; সূরা ইউনুস : ১০৮; সূরা হিজর : ৮৯; সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৪; সূরা হজ্জ : ৪৯; সূরা সাদ : ৭০; সূরা হা-মীম : ৬; সূরা আহকাফ : ৯; সূরা জীন : ২১-২২।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি, রাসূল হওয়ার সত্যতার সাক্ষী ও দায়িত্ব কর্তব্যের পরিসীমা ঃ সূরা দোহা : ৭; সুরা তাকবীর : ২২-২৫; সূরা রা'দ : ৩৮-৪৩; সূরা সাবা : ৪৬; সূরা ইয়াসিন : ৩-৪; সূরা শূরা : ৫২; সূরা যুখরুফ : ৪৩-৪৪; সূরা ফাতাহ : ৮, ২৯; সূরা নজম : ১, ১২, ৫৬; সূরা সফ : ৬; সূরা যুমার : ২; সূরা ক্বলাম : ২-৭।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পথপ্রদর্শক, সতর্ককারী রাসূল, বিশ্বনবী ও শেষনবী ঃ সূরা আলে ইমরান : ১৪৪; সূরা আ'রাফ : ১-২, ১৫৮; সূরা হূদ : ২; সূরা হাজ্জ : ৪৯; সূরা ফুরকান : ১; সূরা সাদ : ৭, ৬৫-৭০; সূরা আহকাফ : ১, ৯; সূরা কাফ : ১-২; সূরা আহযাব : ৪০, ৪৫, ৪৬; সূরা আম্বিয়া : ১০৭; সূরা নজম : ৫৬; সূরা সাবা : ২৮।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণক, কবি বা পাগল নয়, বল প্রয়োগ

www.nagorikpathagar.org

করে দ্বীন বুঝানো তার দায়িত্ব নয়, তিনি কারো কাছে পারিশ্রমিক চান না, তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলেননি ঃ সূরা ইউনুস : ২, ১৫; সূরা হিজর : ৬-১১; সূরা আম্বিয়া : ৫, ৪৮; সূরা ইয়াসিন : ৬৯; সূরা সফফাত : ৩৬; সূরা তূর : ২৯, ৩০; সূরা কলাম : ২-৬; সূরা হাক্কাহ : ৪০-৪১; সূরা আন'আম : ৬৬; সূরা ফুরকান : ৫৭; সূরা সাবা : ৪৭; সূরা সাদ : ৮৬; সূরা শূরা : ২৩; সূরা নাজম : ১-৬।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ বিদীর্ণ, আল্লাহর সাথে কথা বলা, মি'রাজ ও ফিরিশতা দর্শন ঃ সূরা ইনশিরাহ : ১-৮; সূরা নাজম : ৬-১৮; সূরা তাকবীর : ২৩; সূরা বনী ইসরাঈল : ১, ৬০।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবনধারা, স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ ও তাঁদের মর্যাদা ঃ সূরা আহযাব : ৬, ২৮-৩৪, ৩৭-৫২; সূরা তাহরীম : ১-৫।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে গবেষণা করা, অনুসরণ করা ও সম্মান প্রদর্শন করা ঃ সূরা আ'রাফ : ১৮৪; সূরা আলে ইমরান : ৩১-৩২; সূরা নিসা : ৫৯-৮০; সূরা মায়িদা : ৯২; সূরা আনফাল : ২০; সূরা আন'আম : ৫৪; সূরা আহযাব : ৬, ২১, ৩১,৩৬, ৫৩-৫৭; সূরা মুহাম্মদ : ৩৩; সূরা ফাতাহ : ৯, ১০; সূরা তাগাবুন : ১২; সূরা নূর : ৬২; সূরা সাবা : ৪৬; সূরা হুজুরাত : ১-৮; সূরা মুজাদালাহ : ১১-১৩।

অন্যান্য আয়াতসমূহ ঃ এছাড়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশাবলি, মুনাফিকদের আচরণ, কাফিরদের শত্রুতা, বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিচার-ফায়সালা, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এভাবে পুরো কুরআন তো মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্যই নাযিল হয়েছে। আর তিনি ছিলেন বিশ্ব মানবতার মহান নেতা। তাই তাঁকে ঘিরে কুরআনের অবতারণা। আয়িশা (রা.) বলেন, পুরো কুরআনই হল, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিফলন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো কুরআনের সকল আদেশ নির্দেশকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে তিনিই ছিলেন কুরআনিক সকল ঘটনার মূল/কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরেই নাযিল হয়েছে আল কুরআন।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবিস্তৃত সীরাত

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কার জীবন

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উচ্চবংশ কুরাইশ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামহের নাম আবদুল মুত্তালিব এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ'র জন্ম নিয়ে এক অভূতপূর্ব ঘটনা রয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামহ মানত করেছিলেন যে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে যদি তিনি দশটি পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে পান তাহলে ১টি পুত্র আল্লাহর নামে কুরবানী করবেন। আল্লাহ তার আশা পূরণ করেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ ছিল পিতার সর্বাধিক প্রিয়। আবদুল মুত্তালিব পুত্র কুরবানীর ব্যাপারে আল্লাহর নামে কোরায বা লটারী করলেন। লটারীতে বার বার আব্দুল্লাহর নাম উঠল। এভাবে দশবার লটারীতে একই ফল পেলেন। তখন তিনি প্রতিবারের জন্য ১০টি করে উট হিসাব করে ১০০টি উট; আব্দুল্লাহর বদলা হিসেবে কুরবানী করলেন। এভাবে বিশ্বনবীর পিতা আব্দুল্লাহ রক্ষা পান। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 'আমি দুই যবহের সন্তান অর্থাৎ তার বংশে পিতৃ পুরুষের মধ্যে দু'টি যবহের উপক্রম ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটি তাঁর পিতা আবদুল্লাহর ঘটনা এবং দ্বিতীয়টি তাঁর পিতামহের বংশের আদি পুরুষ হযরত ইসমাইল (আ.) এর কুরবানীর ঘটনা। যিনি যবেহ হচ্ছিলেন তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীমের (আ.) হাতে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনিও রক্ষা পেয়েছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন সুন্দর ও চরিত্রবান সুপুরুষ। তাঁর চেহারায় এক অভাবনীয় আলোকছটা সবসময় ঝলমল

www.nagorikpathagar.org

করত। তাঁর আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং মানুষকে আপন করে নেয়ার অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি তার বংশের প্রত্যেকটি লোকের কাছে অত্যধিক প্রিয় ছিলেন। কথিত রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর বংশ পরম্পরায় এসেছে। ফলে বংশের উপরস্থ প্রত্যেকেই সর্বদা এক অলৌকিক উজ্জ্বল্যের অধিকারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি পবিত্র বংশে জন্মেছি এবং আদম হতে আরম্ভ করে আমার পিতা মাতা পর্যন্ত অন্ধ যুগীয় কোন অত্যাচার-ব্যভিচার-কদাচার আমার বংশকে স্পর্শ করেনি। বিয়ের সময় আব্দুল্লাহর বয়স ছিল আনুমানিক সতের। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন তিনি ব্যবসা উপলক্ষ্যে শাম দেশে (পারস্য) যাতায়াত করেন। শামদেশ থেকে ফিরে আসার পথে তিনি একদিন মদীনায় ইয়াসরেবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অসুস্থতার খবর পেয়ে আবদুল মুত্তালিব তার বড় ছেলে হারিসকে পাঠালেন। কিন্তু হারিসের সেখানে পৌঁছার পূর্বেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ ইহজগত ত্যাগ করে কবরবাসী হয়ে গেলেন। হারিস এ শোকসংবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরলে বংশের আদরের দুলালের মৃত্যুতে পুরো বংশ ও নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসে (৫৭০ খ্রীঃ)।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মায়ের গর্ভে। অথচ পিতা দুনিয়ার বুক হতে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এভাবেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠমানব বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভেই এতীম হয়ে রইলেন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'র গর্ভে থাকা অবস্থায় মা আমিনার অনুভূতি ছিল বিস্ময়কর। তিনি বলেন, যে দিন আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গর্ভে ধারণ করি, সেদিন থেকে সন্তান প্রসবের দিন পর্যন্ত আমি সামান্যতম যন্ত্রণা অনুভব করিনি। এমনকি আমি তার কোন ওজনও অনুভব করিনি। কোন অবস্থায় আছি, তাও বুঝতে পারতাম না। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গর্ভ ধারণের পরে একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ফিরিশতারা আমার সামনে হাজির হয়ে বলল, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, তুমি গর্ভবতী, তোমার গর্ভে বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক আসছে। যা বললাম তা খুব ভালভাবে জেনে রাখ। আর সে মুহূর্তে আলোর একটি রশ্মি আমার দেহ হতে বের হয়ে তীব্রবেগে উত্তর দিকে চলে যায় এবং তা সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর আমার প্রসবের দিন যখন সমাগত হলো, তখন ঐ ফিরিশতারা আবার আমার নিকট এলো এবং এ বলে আমাকে সতর্ক করে দিল যে, আমি যেন বলি হে আল্লাহ! তুমি আমার

www.nagorikpathagar.org

সন্তানকে তার শত্রুর হাত হতে রক্ষা কর এবং আমি যেন আমার সন্তানের নাম রাখি 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ প্রশংসিত। যার কথা তৌরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কারণ তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সকলের প্রশংসিত হবেন।

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আওয়াল, রোজ সোমবার রাতের অন্ধকারের বুক চিরে পূর্বাকাশে দেখা দিল আশার আলো। দিকে দিকে অন্ধকার, অধর্ম, অত্যাচার, অনাচার ও পাপ-পংকিলতা-কলুষিত পৃথিবীর বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং দিশেহারা মানুষের একান্ত প্রতীক্ষিত নূরের রবি, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মপ্রকাশ করলেন পৃথিবীর বুকে। রুক্ষ আরবের মরু দিগন্তে মক্কা নগরীর এক জীর্ণ কুটিরের এক নিভৃত কক্ষে মা আমিনা সুখ স্বপ্নে দেখতে পেলেন-এক অপূর্ব আলোতে আকাশ বাতাস-জমীন আলোকিত। তার কুটিরে আজ কি অপরূপ দৃশ্য, কারা এ শুভ্রবাসন পুণ্যময়ী রমণীগণ? মা হাওয়া, হাজেরা, আসিয়া, রহিমা, মারইয়াম সবাই আজ আমিনার শিয়রে দণ্ডায়মান। বেহেশতী আলোর ছটায় সারা ঘর অসম্ভব রকমের উদ্ভাসিত এবং বেহেশতী সৌরভে বাতাস আজ সুরভিত। মা আমিনা বলেন, আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সদ্যজাত শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন হাতে ভর দিয়ে সিজদা করছে এবং এক হাতে মাটি আঁকড়ে ধরে শাহাদত আঙ্গুলটি ঊর্ধ্বদিকে তুলে রেখেছে। আর আকাশের দিকে মাথা তুলে কি যেন দেখছে। প্রকৃতির এ হাসি আনন্দ ও স্ফূর্তির ঢেউ অনেকেরই চোখ এড়াতে পারেনি। অনেকে উদগ্রীব হয়ে খুঁজে বেড়াতে থাকে কোথায় যেন কি ঘটে গেছে? মনে প্রশ্ন জাগে, আজ দুনিয়ার সবকিছু হাসছে কেন? কি সে মহাঘটনা।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবীকে প্রসব কালে একটি আলোর রেখা মা আমিনার দেহ থেকে বের হয়ে অতি দ্রুত সিরিয়া অতিক্রম করে বসরা শহরের রাজপ্রাসাদকে আলোকিত করে। একই সাথে ঘটে যায় বহু বিস্ময়কর ঘটনা। এসব ঘটনা বিশ্বের মানুষকে চমকে দেয়। প্রবল ভূমিকম্পে পারস্য সম্রাট খসরুর রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠে এবং চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। যে অগ্নিশিখা পারস্যে হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত ছিল তা নিভে যায়। কা'বাঘরে স্থাপিত ৩৬০টি মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে যায়। বিশ্বের সকল মূর্তিপূজকরা দারুণ লজ্জায় মাথা অবনত রাখতে বাধ্য হয়। মদীনার প্রসিদ্ধ কবি হাসান বিন সাবেত (পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) বলেন, আমার বয়স তখন সাত বছর।

www.nagorikpathagar.org

কথাবার্তা সবই বুঝি। হঠাৎ একদিন দেখি জনৈক ইহুদী মদীনার একটি লাল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অপর ইহুদীদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে। সকলে একত্রিত হলে, সে বলল, আজ রাতে অকাশের গায়ে নজমে আহমদ (আহমদের তারকা) উদিত হয়েছে। কাজেই প্রতিশ্রুত নবী আহমদ জন্ম গ্রহণ করেছেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তখন কাবা ঘরে তার বন্ধুদের সাথে আলাপ করছিলেন, আমিনা তাকেই সর্বপ্রথম সংবাদ পাঠালেন। আপনার নাতি হয়েছে দেখে যান। আবদুল মুত্তালিব সংবাদ শুনে বাড়ি আসেন। সদ্য ভূমিষ্ঠ নাতিকে দাদার কোলে তুলে দিয়ে, মা আমিনা সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। আবদুল মুত্তালিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে নাতিকে কোলে নিয়ে চুমু দিতে দিতে কা'বা ঘরে আসেন। আবদুল মুত্তালিব, নাতিকে পবিত্র কাবার চাদরে আবৃত করে, তার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলের জন্য বহুক্ষণ আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে দোয়া করেন। আবদুল মুত্তালিবের বন্ধুরা অবাক বিস্ময়ে তার এ প্রার্থনা দেখতে থাকে। কেউ কোন রা শব্দ করে না। সাত দিন পর, আরবের নিয়মানুযায়ী আবদুল মুত্তালিব খুব উৎসবমুখর পরিবেশে নাতির আকিকা পালন করেন। মক্কার বিশিষ্ট কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হয়। উৎসব শেষে কুরাইশ দলপতিরা শিশুকে দেখে খুশিতে কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করেন, শিশুর নাম কি রাখলেন? মুহাম্মদ। কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আবদুল মুত্তালিবের মুখ থেকে এ পবিত্র নাম বের হয়ে আসে। মুহাম্মদ! নাম শুনে অবাক হয়ে যায় কুরাইশ দলপতিরা। তারা পুনরায় প্রশ্ন তোলে, এমন অদ্ভুত নাম তো আমরা কখনো শুনিনি? দেবতার নামের সাথে নাম মিলিয়ে রাখলেন না কেন? সেকালের নিয়মানুসারে দেবদেবিদের নামের সাথে মিলিয়ে শিশুদের নাম রাখা হত। আবদুল মুত্তালিব আবেগাপ্লুত হয়ে জবাব দেন, আমার স্নেহের নাতিটি বিশ্ব বরেণ্য হবে। বিশ্ব জগতে তার মহিমা ও প্রশংসা হবে। এজন্যই ওর নাম রাখলাম 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ প্রশংসিত। আমন্ত্রিত দলপতিরা আবদুল মুত্তালিবের কথা বুঝতে না পারলেও আর কোন প্রশ্ন না করে শিশুকে দোয়া করে চলে যায়। মা আমিনাও গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন, তার প্রাণের দুলালের নাম যেন 'আহমদ' রাখা হয়েছে। এজন্য 'মুহাম্মদ' নামের সাথে তিনি 'আহমদ' নামও যুক্ত করে দেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই দু'নামে অভিহিত হলেন। মুহাম্মদ ও আহমদ। মুহাম্মদ অর্থ চরম প্রশংসিত আর আহমদ অর্থ চরম প্রশংসাকারী। বাস্তবেও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বারা

www.nagorikpathagar.org

চরমভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। আবার তিঁনি আল্লাহর চরম প্রশংসা করেছেন। আল্লাহর হাবীব যে চরম প্রশংসা ও সম্মান লাভ করেছেন, পৃথিবীর অন্য কারো ভাগ্যে তা ঘটেনি। ভবিষ্যতে ঘটবেও না। আবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, অন্য কারো দ্বারা তা করা সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। এজন্যই প্রিয় নবীর উভয় নামই অতিমাত্রায় সার্থক ও সফল হয়েছে। আল্লাহর হাবীব, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাত্র এক সপ্তাহ মা আমিনার বুকের দুধ পান করেন। পরে বিবি হালিমা সাদিয়ার নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত আরেক সপ্তাহ আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার বুকের দুধ পান করেন।

আবদুল্লাহর পুত্র সন্তান জন্ম লাভের পর, আনন্দ সংবাদ আবু লাহাবের কাছে দাসী সুমাইয়া পৌছালে, বিশ্বনবীর চাচা আবু লাহাব খুশিতে সংবাদদাত্রী দাসী সুয়াইবাকে সাথে সাথেই মুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে আবু লাহাব ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তার নামে সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন। আবু লাহাবের ব্যাপারে বুখারী শরীফে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি অবস্থা চাচা? উত্তরে আবু লাহাব বলল, আর বল না বাবা; ভীষণ আযাবে ভুগছি। তবে প্রতি সোমবার দিন শুধু শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলের ফাঁকে একটু পানি পাই পান করার জন্য। ঐদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সংবাদ নিয়ে আসায়, আঙ্গুলদ্বয়ের দ্বারা ইশারা করে সুয়াইবা দাসীকে বলেছিলাম, যা তুই মুক্ত। এ কাজটুকু করার বিনিময়ে পরকাল এ সামান্য রহমত এদিনে আমার ভাগ্যে জুটেছে (বুখারী)। সত্যিই বিস্ময়কর। স্রষ্টার কাছে এতটাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুকাল

কুরাইশ ও মক্কা নগরীর অন্যান্য সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারের শিশু সন্তানদেরকে গ্রাম্য বেদুইন ধাত্রীদের কাছে পঠানো ছিল তখনকার দিনের চিরাচরিত রীতি। গ্রামের মুক্ত আলো বাতাসে শিশুরা সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে উঠবে, শুদ্ধ ভাষা শিখবে। এ উদ্দেশ্যে নগরীর শিশুদেরকে গ্রাম্য ধাত্রীর কাছে পাঠানো হত। কেননা শহরের নানা জাতির নানা সম্প্রদায়ের মানুষ থাকায় শুদ্ধ আরবি ভাষায় অনেক বিকৃতি দেখা দিত। তাই গ্রাম্য পরিবেশে থাকলে অতি শৈশবে তারা খাঁটি ও অবিকৃত

আরবি ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে বলে শিশুদের বেদুইন ধাত্রীদের কাছে দেয়া হত। গ্রামের আর্থিক অভাবে দুর্বল, অথচ সম্ভ্রান্ত বংশের গৃহবধূরা এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা পয়সার আশায় বছরে একাধিকবার স্তন্যপায়ী সন্তানের সন্ধানে দূর দূরান্ত হতে উপস্থিত হত। প্রিয়নবীর জন্ম লাভের দু'সপ্তাহ পরে তায়েফের পার্শ্বস্থিত গ্রামের, বনী সাদ গোত্রের একটা ধাত্রী দল মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে আর্থিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল বিবি হালিমাও ছিলেন। হালিমা বিনতে যুইব বলেন, বছরটা ছিল ঘোর অন্ধকার। আমি এবং আমার স্বামী হারিস দু'জনেই মানষিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত ছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, মক্কায় গিয়ে একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু খুঁজে বের করব। আমরা আরো মনে করলাম, হয়তো এমন একটি শিশু পেয়ে যাব, যার কৃতজ্ঞ পিতা-মাতা আমাদের কঠিন অভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবেন। আমরা একটি কাফেলায় শরীক হলাম। যেখানে আমাদের গোত্রের অনেকেই ছিল। যারা একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। আমি যে গাধার পিঠে সওয়ার হয়েছিলাম সেটা ছিল শীর্ণকায় এবং ক্লান্তিতে এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার রাস্তায় পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল। আমার বাচ্চা সারারাত ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছিল। আমরা সে রাতে একদম ঘুমোতে পারিনি। আমার বাচ্চার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার মত এক ফোঁটা দুধও আমার বুকে ছিল না। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমি ভাবলাম, আমাদের এ কষ্টের অবস্থায় আমি কি কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু পাব? কাফেলার অনেক পরে, আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। ইতোমধ্যে অন্যান্য দুগ্ধবতী সব মহিলারা নবজাতকের লালন-পালনের দায়িত্ব পেয়ে গেছে। কেবল একটি শিশু ছাড়া এবং সে দুগ্ধ শিশুটি ছিল বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বিবি হালিমা বলেন, শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা বেঁচে ছিলেন না। তার পরিবার উচ্চ বংশীয় হলেও, ধনী ছিলেন না। সে জন্যে কোন ধাত্রী শিশুটিকে নিতে আগ্রহী ছিল না। আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম খালি হাতেই ফিরে যাব। কিন্তু আমি এ ভেবে চিন্তিত ছিলাম যে, খালি হাতে ফিরে গেলে এলাকায় আমার চেয়ে ভাগ্যবতীরা আমাকে বিদ্রূপ করবে। তাছাড়া সুন্দর শিশুটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল মক্কা নগরীর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সে শুকিয়ে ঝরে যাবে। আমার মনে শিশুটির প্রতি এক গভীর মমতা জেগে উঠল। আমি অনুভব করলাম, অলৌকিকভাবে আমার স্তন স্ফীত হয়ে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে! আমি আমার স্বামীকে বললাম, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি,

www.nagorikpathagar.org

আমার এ শিশুটিকে নিতে বড়ই ইচ্ছে করছে। যদিও এর থেকে আমাদের আর্থিকভাবে তেমন কিছু পাবার নেই। আমার স্বামী বললেন, আমার মনে হয় না যে, তুমি ভুল বলছ। হয়তো এ শিশুটির কারণে আমাদের সংসারে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হতে পারে। নিজেকে সংযত করতে না পেরে আমি সুদর্শন ও মায়াবী ঘুমন্ত শিশুটির দিকে দৌঁড়ে গেলাম। যখন আমি শিশুটির সুন্দর ছোট বুকে হাত রাখলাম, তখন সে চোখ খুলে হাসল। তার চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মিষ্টি আলো। আমি তার ভ্রুর মাঝে চুমু খেলাম। শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি আমাদের কাফেলায় তাঁবুর কাছে ফিরে এলাম। আমি আমার ডান স্তন তার মুখে তুলে দিলাম। অবাক হয়ে আমি দেখলাম, সে তার ক্ষুধা নিবারণের মতো যথেষ্ট দুধ পান করতে পারলো। আমি আবার আমার বাম স্তন তার মুখে তুলে দিলাম। কিন্তু সেটা সে মুখে নিল না (তার দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিল)। সে পরবর্তীতেও সব সময়ই এরকম করতো। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতাম।

বিবি হালিমা সাদিয়া বলেন, আরো একটা বড় ধরনের বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকাল থেকে যে উটের বাঁটে দুধ ছিল না, সে বাঁটগুলো দুধে ভর্তি হয়ে গেল। সেগুলো থেকে আমার স্বামী দুগ্ধ দোহন করল এবং আমরা তা পরম তৃপ্তিসহকারে পান করলাম। কয়েক মাস পর রাতের ছায়ায়, এ প্রথম আমাদের ভালো ঘুম হল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামী বললেন, 'হালিমা! তুমি এক অসাধারণ আশীর্বাদপ্রাপ্ত শিশুকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছ। শিশুটিকে নিয়ে আমি আমার গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। গাধাটি দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল এবং সবাইকে অবাক করে, কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা কাফেলাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললো। আমার সহযাত্রীরা বলতে লাগলো, হালিমা! একটু দাঁড়াও, যাতে আমরা এক সাথে বাড়ি ফিরতে পারি। এটা কি সে গাধা নয়, যেটার পিঠে চড়ে তুমি এসেছিলে? আমি তাদেরকে বললাম, হ্যা সেটাই তো। তখন তারা অবাক হল, আর বলাবলি করতে লাগলো, গাধাটির ওপর এমন কিছুর আছর হয়েছে, যার ব্যাপারে তারা কোন ধারণা করতে অক্ষম। অবশেষে বনী সাদ গোত্রে আমরা নিজ নিজ ঘরে পৌঁছলাম। আমাদের মত খরা-পীড়িত এলাকা পৃথিবীর আর কোথাও ছিল বলে আমার জানা ছিল না। আমাদের পশুর পাল দুর্ভিক্ষে কাঁবু হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমরা বাড়ি ফিরে দেখি, অন্যান্য ভালো মৌসুমের চেয়ে আমাদের ভেড়াগুলো রহস্যময়ভাবে সতেজ হয়ে উঠেছে।

www.nagorikpathagar.org

অথচ আমাদের আশেপাশের পশুগুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। সেজন্য মালিকরা তাদের রাখালদের দোষারোপ করতে লাগল। তারা রাখালদের গালি দিয়ে বলল, হালিমার ভেড়াগুলো যেখানে চরে সেখানে আমাদের ভেড়াগুলো চরাতে পারিস না? রাখালরা নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। এভাবে আমাদের বাড়িঘর কল্যাণ ও প্রাচুর্যে ভরে উঠতে লাগল। শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন দু'বছর হল, তখন আমি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। তার হাবভাব এমন ছিল যে, মাত্র নয় মাস বয়সে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সুন্দর স্বরে কথা বলতে পারত যে, তা হৃদয় স্পর্শ করে যেত। সে কখনও নোংরা থাকতো না এবং ফুঁপিয়ে বা চিৎকার করে কাঁদতো না। যদি কখনও রাতে সে অস্থির হয়ে উঠত এবং ঘুমাতে চাইতো না, তখন আমি তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে আসতাম। শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলই আকাশের তারকারাজির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকত এবং ভীষণ আনন্দিত হয়ে উঠত। আর যখন দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন সে চোখ বুজে ঘুমিয়ে যেত।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হালিমা প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ ছাড়ানোর পর, তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং মক্কা পৌঁছা মাত্র হালিমা, মা আমিনার পায়ে পড়ে কাকুতি মিনতি করে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে তার মিনতি এবং ছেলের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে, মা আমিনা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হালিমার সঙ্গে পুনরায় তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বিবি হালিমার একমাত্র পুত্রের নাম ছিল আবদুল্লাহ। তিন মেয়ে শায়মা, আতিয়া ও হুযাফা। বড় মেয়ে শায়মা, তার দুধ ভাই শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব আদর করত। তাকে কোঁলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এতে একটুও ক্লান্তি অনুভব করত না। মা হালিমা সদা সর্বদা কড়া নজর রাখতেন। কখন তারা কি করে? কোথায় যায়? কোনো ব্যাপারে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হয় কিনা? একবার শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে করে শায়মা বেশ দূরে এক মাঠে ছেলেদের খেলা দেখতে গিয়েছিল। এদিকে মা হালিমা শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশে পাশে না দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। দুপুর বেলার প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ছেলেকে নিয়ে শায়মা কোথায় গেল? তিনি সে চিন্তায়

www.nagorikpathagar.org

অস্থির। এমন সময়ে শায়মা তার দুধ ভাইকে নিয়ে ফিরে এল। হালিমা, শায়মাকে খুব বকাঝকা করলেন। রৌদ্রে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাগ করলেন। শায়মা বলল মা! ভাইয়ের মোটেই কষ্ট হয়নি। আমি যখন যেখানে গিয়েছি, সেখানেই এক খণ্ড মেঘ আমাদের এ কুরাইশ ভাইয়ের মাথার উপর ছায়া দান করেছে। আমি দাঁড়ালে মেঘটিও থেমে দাঁড়াত। ভাইয়ের শরীরে একটুও রোদ লাগেনি। বিবি হালিমা মেয়ের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর অসীম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এতো মহান স্রষ্টার সরাসরি কৃপায় পালিত মানব শিশু। নিশ্চয়ই এ শিশু বিশ্ব বরেণ্য কেউ হবে।

শিশুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার বছর বয়সে বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে কুরআনে এসেছে, আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি; আর আপনার যে বোঝা আপনার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছিল; তা আপনার থেকে সরিয়ে দিয়েছি (সূরা আলাম নাশরাহ-১)। একদিন শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুধ ভাইয়ের সাথে মেষ চরাতে চারণ ভূমিতে গেলেন। তখন এক কল্পনাতীত ঘটনা ঘটল। দিনের মধ্যভাগে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই, হঠাৎ দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরে আসে। সে তার পিতা মাতাকে চিৎকার করে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকে, তোমরা তাড়াতাড়ি এসো। আমার কুরাইশ ভাইকে সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক মাটিতে শুইয়ে বুক চিরে দু'ফালা করে ফেলেছে। ভয়ে পাগোলীনির মত হালিমা এবং বিস্ময়ে তার স্বামী দৌড়াতে দৌড়াতে ছেলেকে অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে। সেখানে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা পাহাড়ের উপর বসে থাকতে দেখে। তাকে সম্পূর্ণ শান্ত, অথচ তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। অতপর তাঁর পালক পিতা (হারিস) তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, প্রিয় বৎস, ব্যাপার কি? তোমার কি হয়েছে? তখন শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, আমি যখন মেষপালের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছিলাম। সে সময় শুভ্রমূর্তির মত দু'জন লোক দেখতে পেলাম। আমি প্রথমে ঐ দু'জনকে বিরাটকায় শুভ্রপাখি মনে করেছিলাম। কাছে আসায় ভুল ভাঙ্গল। তারা আমাকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর আমার বুক চিরে বুকের ভেতর থেকে কী একটা বস্তু ফেলে দিল। তারপর আবার আমার বুক যেমন ছিল তেমনই করে দিল (মুসলিম)।

www.nagorikpathagar.org

বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব এ ঘটনার পর, বিবি হালিমার মনে শত প্রশ্ন জাগতে লাগল। স্বামী হারিস চুপে চুপে বলল, হালিমা! আমার মনে হয় ছেলেকে ভূত প্রেতে আছর করেছে। এ সমস্ত ঘটনা জানা জানি হবার আগেই, চল আমরা তাকে ফেরত দিয়ে আসি। বিবি হালিমা ও তার স্বামী, মায়ের ছেলেকে মায়ের কাছে দিয়ে আসাই ভাল মনে করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হল। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মা আমিনার কাছে নিয়ে গেলেন। হালিমা, মা আমিনার নিকট ঘটনাটি খুলে বললেন। আমিনা বললেন, জেনে রাখুন শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই ওর ক্ষতি করার। কারণ এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। বিবি আমিনা তখন শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্ভে থাকাকালীন সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাগুলো হালিমাকে জানালেন। এরপর তিনি হালিমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাকে পুরস্কৃত করে নিজের শিশু সন্তান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীর মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। মার কাছে, মুক্ত বাতাসে, পরম স্নেহে, পিতৃহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় হতে লাগলেন।

বিশ্বনবী ছিলেন এতিম এবং এ ব্যাপারে কুরআনে এসেছে 'অতএব, আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং নবীর প্রার্থনাকারীকে ধমক দিবেন না' (সূরা আদ দোহা : ৯-১০)। আরবের রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মায়ের স্নেহের বাঁধন খুলে চলে যেতে হয়েছিল দুধ মাতা হালিমার ঘরে। শিশুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দু'বছর তার বুকের দুধ পান করেন। বড় হলেন। দুধ মা হালিমার আদর সোহাগ এবং দুধ ভাই আবদুল্লাহ ও বোন শায়মার স্নেহে লালিত পালিত হয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করেন। শিশুনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ছয় বছরে পা দিতেই মা আমিনার ক্রোড়ে এসে নবজীবন লাভ করেছিলেন। একদিন মা আমিনা তাঁকে নিয়ে মদীনায় বেড়াতে যেতে মনস্থ করেন। আমিনার বংশের অনেকেই আত্মীয়তা সূত্রে মদীনার সাথে জড়িত। আবার স্বামী আবদুল্লাহও সেখানে সমাহিত হয়েছেন। আত্মীয়দের সাথে দেখাশুনা করা তথা স্বামীর কবর যিয়ারত করার আকুলতা বুকে নিয়ে মা আমিনা পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে মদীনা যান। সেখানে গিয়ে মাতুল গোষ্ঠী বনী নাজারে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

এরপর বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও দাসী উম্মে আইমানকে

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হন। কিন্তু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা কি মানুষ বুঝতে পারে? না কখনই পারে না। আর পারে না বলেই মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে হঠাৎ মা আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আকস্মিকভাবে সেখানেই ইন্তিকাল করেন (৫৭৬ খ্রঃ)। শিশুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন স্নেহময়ী পিতা দুনিয়া ছেড়ে গেছেন। জন্মের ছয় বছর পর স্নেহময়ী জননীও হারিয়ে গেলেন চিরতরে। মায়ের আদর সোহাগ যখন তিল তিল করে ভোগ করার সময়, তখনই মা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। এতীম শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদূর বিদেশে মাকে কবর দিয়ে দাসী উম্মে আইমানের হাত ধরে দেশে ফিরেন সর্বশান্ত হয়ে।

ওদিকে আবদুল মুত্তালিব ছেলের বউ' এর মৃত্যু সংবাদ শুনে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। ছেলে আবদুল্লাহ মারা যাবার পর, পিতা আবদুল মুত্তালিব প্রচণ্ড আঘাতে পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সে শোকের পাথর ভাঙতে শুরু করেছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের মধ্যদিয়ে। হঠাৎ ছেলের বউ' এর ইন্তিকালে পুনরায় সবকিছু উলট পালট হয়ে যায়। মায়ের মৃত্যুর পর, দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর অবুঝ নাতির লালন পালনের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। মমতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার সঙ্গে তার দেখাশুনা করতে লাগলেন। এভাবেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাল্যজীবন দাদার আদর সোহাগ ও স্নেহ-মমতা এবং চাচা ও বংশের অন্যান্য মানুষের ভালবাসায় অতিবাহিত হতে লাগল। নাতির প্রতি আবদুল মুত্তালিবের স্নেহ কত গভীর ছিল, তা উপলব্ধি করার জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

পবিত্র কাবার তত্ত্বাবধায়ক আবদুল মুত্তালিবকে মক্কার লোকেরা এত বেশি সম্মান করতো যে, কা'বা ঘরে কার্পেট বিছানো অবস্থায় তিনিই প্রধান আসন গ্রহণ করতেন। একদিন উপস্থিত জনতা তাদের প্রিয়নেতা আবদুল মুত্তালিবের অপেক্ষায় বসে আছেন। এমন সময় বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথা হতে হঠাৎ এসে বিছানো কার্পেটের ঠিক মাঝখানে, দাদার বিছানার উপরে বসে পড়লেন। এ ঘটনার ফলে জনগণ ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়ে পড়লে, উপস্থিত চাচাদের একজন তাকে কোলে করে বিছানা থেকে উঠিয়ে নিলেন। ঠিক এসময় আবদুল মুত্তালিব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্যাপারটি দেখে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, আমার নাতি যেখানে বসে ছিল, তাকে ঠিক সে

www.nagorikpathagar.org

জায়গাতেই বসিয়ে দেয়া হোক। তিনি আরও বললেন, সেই তো আমার বৃদ্ধ কালের আনন্দ। তার এ বিশাল স্পর্ধা জেগে উঠেছে তাঁর নিয়তির পূর্ব লক্ষণ থেকে। কারণ সে নিশ্চয়ই একদিন উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হবে। যে পদমর্যাদা কোন আরবের কপালে এ যাবত জোটেনি। এ কথা বলে বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কোলে নিয়ে নিজের পাশে বসালেন। পরম স্নেহে তার মাথা ও পিঠে হাত বুলিয়ে সোহাগ করতে লাগলেন। সোহাগের অতিশয্যে বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যহারা হয়ে গেলেন। কিন্তু এ আদর-সোহাগ, এ অনাবিল সুখ-শান্তি, বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি দিন স্থায়ী হল না। যখন তার বয়স ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন (৫৭৮ খ্রীঃ), তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবীর এ অস্থায়ী আবাস ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে। দুনিয়ার বুকে তখন বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে নিঃস্ব। পুরোপুরি একা হয়ে গেলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিশোরকাল

বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক করে বাবা, মা, দাদা সব হারালেন। এ অনাথ, এতীম, সহায়হীন বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসঙ্গতাকে সাথী করে বেড়ে চললেন। চাচা আবু তালিব ছাড়া তার পাশে দাঁড়াবার মত আর কেউ ছিলেন না। দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর সময়, নাতিকে তুলে দিয়েছিলেন আবু তালিবের হাতে। পিতা আবদুল মুত্তালিবের অন্তিম আদেশ মাথা পেতে নিলেন, আবু তালিব। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ এতীম অসহায় অবস্থার কথা, তথা পার্থিব সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে আল্লাহর রহমতের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হওয়ার কথা, আল্লাহ অলৌকিকভাবে বর্ণনা করেছেন আল কুরআনে। 'হে নবী! আল্লাহ কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর আপনাকে (স্বীয় রহমতের ক্রোড়ে) আশ্রয় প্রদান করেছেন, আর আপনাকে কি পথহারা পাননি? অতঃপর (বিশ্ব জগতের হিদায়াতের জন্য) হেদায়াত প্রাপ্ত করেছেন। আর আপনাকে কি সহায় সম্বলহীন (পরমুখাপেক্ষী) অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি (নেতৃত্ব প্রদানকরতঃ) অভাবমুক্ত করেছেন।' (সূরা আদদোহা : ৬-৮)

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৈত্রিক সূত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একজন দাসী লাভ করেন। দারিদ্র্যতার মধ্যদিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। এরপর হযরত খাদীজার (রা.)

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসায় শরীক হয়ে, তথা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারিবারিক সচ্ছলতা ও সফলতা লাভ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, 'আর যদিও আপনি ইতোপূর্বে এসব বিষয়ে গাফিল বা অনবহিত ছিলেন' (সূরা ইউসুফ : ৩)। বাল্যকালেই মহান প্রতিপালক তাঁর প্রতিপালনের সমস্ত উপলক্ষ ও পার্থিব যাবতীয় উপকরণ হতে বঞ্চিত করে, স্রষ্টা কর্তৃক পূর্ণ প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন। তার চিত্র ও হাকিকত অতুলনীয় ভঙ্গীতে আল কুরআনে উঠে এসেছে। 'হে নবী! আমি কি আপনার বক্ষদেশ আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি? আমি আপনার উপর থেকে ভারি বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিল' (সূরা আলাম নাশরাহ : ১)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তার প্রিয় হাবিবের বক্ষকে জ্ঞান, বিজ্ঞতা, মাধুর্যতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ব বিখ্যাত কোন পণ্ডিত ও দার্শনিক তার গরিমার কাছে পৌঁছানোর কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না।

পিতৃহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের দু'সপ্তাহ পরেই আরবের প্রথানুসারে বেদুইন ধাত্রী বিবি হালিমা সাদিয়ার কুটিরে প্রতিপালিত হন। হালিমা ছিলেন বনি সাদ গোত্রের চরিত্রবান মহিলা। সে যুগে সা'দ বংশের মেয়েরা বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর আরবি ভাষায় কথাবার্তা বলার জন্য বিখ্যাত ছিল। অপরদিকে শহরের ভাষা নানা ধারায় সংমিশ্রণে বিকৃত হয়ে পড়েছিল। স্রষ্টার অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনের দায়িত্বভার, মার্জিত, রুচিসম্মত ও উন্নতমনা সা'দ গোত্রের দরদী নারী বিবি হালিমার উপর গিয়ে পড়ে। ফলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে কথাবর্তায় মিষ্টি ও কারুকার্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

শৈশবকাল শিক্ষার সময়। এ সময় শিশুর মনে যে আদর্শের রেখাপাত করে তাই স্থায়ী হয়ে থাকে। শৈশবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেরূপ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি। পিতা নয়, মাতা নয়, শিক্ষক নয়, সমাজ নয়, স্বয়ং মহান আল্লাহ তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের শিক্ষা এবং কৃত্রিম জ্ঞান সীমিত। তা নবী-রাসূলদের জন্য নয়। তাঁদের শিক্ষার পদ্ধতি ও উপাদান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি এসেছেন স্রষ্টার অলৌকিক শিক্ষায় বিশ্বকে আলোকিত করতে। পৃথিবীর নিয়মে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরক্ষর উম্মি ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাক উল্লেখ করেন, তিনি ছিলেন উম্মি। উম্মি অর্থ নিরক্ষর; অর্থাৎ কোন বক্তব্য কাগজে কলমে উদ্ধৃত

www.nagorikpathagar.org

করতে হলে যে অক্ষর জ্ঞান থাকা দরকার, তা থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। আল্লাহ বলেন, "আপনি এ কিতাবের (কুরআনের) পূর্বে কোন কিতাব পড়েননি। আর কোন কিতাব নিজ হাতে লিখতেও পারতেন না। (যদি এমন হতো) তবে এ সমস্ত মিথ্যাবাদী লোকেরা সন্দেহ করতে পারত (হয় তো আপনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ দেখে তা লিখেছেন অথবা মুখস্থ করে লোকদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছেন।" (সূরা আনকাবূত : ৪৮)।

আবু তালেব একাধারে সমাজের নেতা, কা'বা ঘরের খাদেম এবং সনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রথম জীবনে চাচা আবু তালিবের সাথেই সিরিয়া গমন করেন। আল্লাহ পাক কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরিয়া গমনকেও হাজারও ঘটনার মধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনায় পরিণত করেছেন। কিশোর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন নিখিল বিশ্বের পথপ্রদর্শক হতে হবে। বিশ্বনবীকে মর্যাদাবান আসনে বসে সারা জাহানের নেতৃত্ব দিতে হবে। এজন্যেই মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকর্তা আল্লাহ, তাঁকে নানা অসাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানবের সামনে তার বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র তুলে ধরেছেন। বাণিজ্যের জন্য বছরে একবার সিরিয়া গমন করা কুরাইশদের সাধারণ নিয়ম ছিল। যার ইঙ্গিত সূরা কুরাইশের মধ্যে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন বার বছর দু'মাস দশ দিন। তখন চাচা আবু তালিব অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কাফেলা প্রস্তুত। উটগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার কাপড় জড়িয়ে ধরলেন। আবু তালিব স্নেহের ভাতিজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বাবা? কি চাও? কিশোর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাচা! আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? আমার আব্বাও নেই, আম্মাও নেই। এমন মন উতাল করা কথায় চাচা আবু তালিব স্থির থাকতে পারলেন না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সঙ্গীদেরকে বললেন, ছেলেটি আমাকে ছাড়া থাকে না। তাকে না দেখলে আমিও শান্তি পাই না। এবার না হয় তাকে নিয়ে যাই। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে কাফেলার সাথে রওনা হলেন। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলের একজন যাত্রী। ভবিষ্যতের বিশ্বনবী আজ বণিক। তিনি যে একদিন বিশ্ব মানবের পথের দিশারী হবেন-এ বিদেশ যাত্রাও ছিল তারই পূর্বাভাস। এর পাশাপাশি

তিনি দেখবেন নানা স্থানের অধিবাসী, বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও তাদের রীতি-নীতি। কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচিত হবেন, ভিন্ন এলাকা, ভাষাভাষি ও নানা মানুষের সাথে।

এরপর কাফেলা এগিয়ে চলল। মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালছে। কিন্তু তপ্ত রবির উত্তাপ কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পর্শ করছে না। পায়ের নীচে গরম হয়ে উঠছে বালুকণা। কিন্তু তার উত্তাপ কাফেলাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে না। দিনের পর দিন কাফেলা চলছে। এভাবেই কাফেলা একসময় সবুজ শ্যামলে ঘেরা সিরিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। কাফেলা এগিয়ে চলল। উষর মরুভূমি পার হয়ে শাম বা সিরিয়া ছেড়ে আরও সামনে বসরার অন্তর্গত 'তায়মা' নামক স্থানে। 'তায়মা' খ্রিষ্টান প্রধান একটি ব্যবসা কেন্দ্র। বিশেষ করে বাৎসরিক একটা মেলার জন্য এ এলাকা বিখ্যাত ছিল। তখন মেলা চলছিল পূর্ণদ্যোমে। তাই কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে ব্যবসা করার জন্য তাঁবু স্থাপন করল মক্কার কাফেলা। নিকটেই ছিল একটি খ্রিষ্টান গির্জা। 'বুহাইরা' নামক জনৈক পাদ্রী, সে গির্জার ধর্মগুরু। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবের পারদর্শী সুপণ্ডিত ছিলেন।

কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হঠাৎ একদিন পাদ্রী বুহাইরার নজরে পড়ে গেলেন। কিশোর নবীর দীপ্তিময় উজ্জ্বল চেহারা দেখে তিনি থমকে গেলেন। গির্জাটি ছিল একটি পাহাড়ের উপর। খ্রিষ্টান পাদ্রী বুহাইরা সমতল ভূমির দিকে দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ সাদা এক খণ্ড আয়তাকার মেঘমালার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তা একটি বিশাল পাখির আকারে উত্তর দিকে আগত একটি কাফেলার উপর ছায়া দান করে আসছিল। পাদ্রী বুহাইরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন বাতাসে ভাসমান মেঘ খণ্ডটি মক্কার কাফেলার যাত্রীদের উপর ছায়া বিস্তার করে তাদের সঙ্গী হয়ে ভেসে চলছে। অতঃপর আরো লক্ষ্য করে দেখলেন। মৃদু বাতাসের দোলায় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-পল্লব যেন ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে মেঘ খণ্ডটি ঝুঁকে পড়ে কাফেলার এক বালকের উপর ছায়া বিস্তার করছে এবং সে ঘনছায়া প্রখর সূর্যকিরণ থেকে তাঁকে রক্ষা করছে। এসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে পাদ্রী বুহাইরা অনুমান করলেন যে, মক্কা থেকে আগত কাফেলার মধ্যে রয়েছেন হয়ত সে মানুষটি, যার জন্য তিনি এতকাল অপেক্ষা করে আছেন। যার আগমন বার্তা পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলোতে আগেই ঘোষিত হয়েছে। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার জানা

www.nagorikpathagar.org

যত নিদর্শন ছিল, বাহ্যিক আকার অবয়বে সবই এ বালকের সাথে মিলে যাচ্ছে। এভাবে তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এ কিশোরই হল প্রতিশ্রুত নবী।

সবকিছু ভালভাবে জানার জন্য, খ্রিষ্টান জ্ঞানী পাদ্রী বুহাইরা একজন দূত পাঠিয়ে কাফেলার বালক, বৃদ্ধ, যুবক, গোলাম সবাইকে দাওয়াত দিলেন। এদিকে তিনি ভাল খাবারের ব্যবস্থা করে মক্কার অতিথিদের আগমনের জন্য আগ্রহ ভরে গির্জার প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছিলেন। একটু পরেই দূত মক্কার কাফেলার অতিথিদের নিয়ে সেখানে আসল। বুহাইরা একজন একজন করে সকলকে দেখলেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিতজনকে দেখতে না পেয়ে বললেন, আমি সকলকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু মনে হয় সকলে আসেনি। কুরাইশ সর্দাররা উত্তর দিল, আসার মত কেউ বাদ পড়েনি। শুধু একটা ছোট বালককে আমরা জিনিসপত্র পাহারার জন্য রেখে এসেছি। বুহাইরা বিনীত কণ্ঠে বললেন, তাকেও নিয়ে আসুন। তখন কাফেলার একজনকে পাঠিয়ে কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আসা হল।

বুহাইরা, বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে দেখলেন। মেহমানদের খাদ্য গ্রহণের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি লাত ও উজ্জার কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি সঠিক জবাব দিবে? লাত ও উজ্জার দোহাই দিয়ে বুহাইরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, লাত ও উজ্জার কসম দিবেন না। আমি তাদেরকে ঘৃণা করি। ঠিক আছে, তবে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে? কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, বলুন, আমি যতদূর জানি ঠিক ঠিক উত্তর দিব। তখন বুহাইরা তার বর্তমান অবস্থা, কাজ-কর্ম, কখন ঘুম যান, স্বপ্নে কি দেখেন, ইত্যাদি অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন এবং দেখলেন যে, প্রত্যেকটি উত্তর হুবহু পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে। নানা কথার ফাঁকে কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠদেশে নবুওয়াতের মোহরও দেখে নিলেন পাদ্রী বুহাইরা। আরও ভালভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বুহাইরা পুনরায় আবু তালিবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বালক আপনার কি হয়? আবু তালিব ইচ্ছে করেই কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে বললেন, সে আমার ছেলে। বুহাইরা

www.nagorikpathagar.org

বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন আপনার ছেলে? না, তার পিতা অন্য কেউ হবেন। আবু তালিব এবার স্বীকার করলেন, আসলে কিশোর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ছেলে নয়। তবে আমার ভ্রাতুস্পুত্র। বুহাইরা আবু তালিবের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ভাই কোথায়? মুহূর্তে আবু তালিবের মুখ মলিন হয়ে গেল। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, তিনি মারা গেছেন এবং এ ছেলের মা তখন তিন মাসের গর্ভবতী ছিলেন।

এ কথা শুনেই বুহাইরা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরামর্শের সুরে বললেন, আমি শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনাকে বলছি, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। সব সময় তার উপর নজর রাখবেন। বিশেষ করে ইহুদীদের কাছ থেকে সাবধান থাকবেন। যদি তারা এ বালককে দেখে চিনতে পারে, যেমন আমি তার পিঠের নিদর্শন দেখে চিনেছি; তবে তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। এরপর আবু তালেব আর শাম দেশে না গিয়ে সেখানেই নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করেন এবং অন্যান্য পণ্য, উটে বোঝাই করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। অবাক ঘটনা হচ্ছে যে, এ ব্যবসায় আবু তালিবের আগের চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। পরে জানা যায় যে, একদল খ্রিষ্টান প্রতিশ্রুত নবীকে হত্যা করার সংকল্পে কাফেলার পর কাফেলা খুঁজে বুহাইরার কাছে এসে পৌঁছলে; বুহাইরা তাদেরকে কৌশলে নিরাশ করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই বাল্য বয়সেই বহু স্থানের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পাশাপাশি মহান প্রতিপালকের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যৌবনকাল

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় যৌবনে পা রাখলেন। অথচ যৌবনসুলভ কোন উচ্ছৃংখলতা, উচ্ছলতা, বেহিসাবী, চঞ্চলতা; তাঁকে কখনই প্রভাবিত করেনি। এমনকি কোন অন্যায়, অশ্লীলতা এবং অভদ্রতাজনিত কাজ তিনি কখনই করেননি। আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে প্রতি পদে পদে নৈতিক ও চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলতেন, আমি কোন দিন জাহেলিয়াতের কোন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিনি। অন্ধ যুগীয় কোন পাপ কর্ম করিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তখন খুব ছোট, যখন কা'বা ঘর মেরামত করা

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছিল। সে সময় ছোট ছোট বালকরাও ইট-পাথর এগিয়ে দিয়ে একাজে সাহায্য করছিল। কাজের সুবিধার্থে ছোট ছেলেরা সবাই কাপড় কাঁধে বেঁধে রেখে কাজ করছিল। কিন্তু আমি লজ্জাবশত কাপড় পরে কাজ করছিলাম। এতে কাজের কিছুটা ব্যাঘাত হচ্ছিল। তখন আমার চাচা, আমাকে ডেকে বললেন, আরে বেটা! কাপড় খুলে কাঁধে বেঁধে নাও। তখন অগত্যা তাই করলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম। পরক্ষণে হুঁশ হতেই আমার কাপড়! আমার কাপড়! বলে ডাকতে লাগলাম। চাচা আব্বাস (রা.) আমাকে কোলে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কি হয়েছে? আমি বললাম, আমি বিবস্ত্র হতেই শুনতে পাই, আকাশ হতে কে যেন ডেকে বলছে, কাপড় পরে নাও হে মুহাম্মদ! কাপড় পরে নাও। জীবনে এ প্রথম আসমানী ডাক শুনে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ফটিকের মত স্বচ্ছ চরিত্রের ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদা রাতের বেলা আমি মক্কার এক টিলার চূড়ায় এক কুরাইশ বালকের সাথে ছাগল চরাচ্ছিলাম। হঠাৎ ইচ্ছে হল আরবীয়দের "ছমর" গল্পের আসরে গিয়ে আজ রাতে একটু আনন্দ করি। সঙ্গীকে বললাম, আমার ছাগলটা দেখাশুনা করিস, আমি একটু 'ছমর' শুনে আসি। কিছুদূর আগানোর পর, এক বস্তির কাছাকাছি যেতেই, বাজনা ও ঢোল তবলার আওয়াজ কানে ভেসে এল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, কোন এক লোকের বিয়ে হচ্ছে। কৌতূহলবশত, যখন আমি সে পথে পা বাড়াতে ইচ্ছে করলাম, অমনি আমার ভীষণ ঘুম পেল। এমন ঘুম যে, একটুও চলতে পারলাম না। সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে সূর্য কিরণের উত্তাপে আমার ঘুম ভাঙ্গে। এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্বনবীকে অসুন্দর থেকে নিরাপদ রেখেছেন সেই শিশুকাল হতেই।

আরব জাতি যোদ্ধা হিসেবে দুর্ধর্ষ। সাম্প্রদায়িকতাই ছিল এসব যুদ্ধের মূল কারণ। একেবারে সাধারণ ঘটনা থেকে গোত্রে গোত্রে, বংশে বংশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতো। আর এ যুদ্ধ চলতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। অবশ্য নিষিদ্ধ চার মাস তারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে নিবৃত থাকত। তাদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। আর অবসর সময়ে তারা আমোদ প্রমোদে মেতে উঠত। বছরে কয়েকটি মেলা বসত। সেসব মেলায় বিভিন্ন গোত্রের কবিরা কবিতার আসর বসাতো। এছাড়া ঘোড় দৌড়, জুয়া খেলা,

মদ পান করা ইত্যাদি নোংরা কাজ, সেসব মেলাতে হরদম চলত। আর এ থেকে অনেক সময় বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ঝগড়া, মারামারি ও যুদ্ধবিগ্রহের বীজ অঙ্কুরিত হত। আরবের বিভিন্ন মেলার মধ্যে একটি মেলা ছিল সর্বপ্রধান। এ মেলা হতেই ফিজ্জার যুদ্ধের উৎপত্তি। হারবে ফিজ্জার অর্থ অন্যায় যুদ্ধ, অধর্মের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে সূত্রপাত হয়েছিল অথবা এর মাধ্যমে মক্কার পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এজন্যেই এর নামকরণ এমনটি করা হয়েছিল। এ যুদ্ধ বিভিন্ন কারণে চার বার অনুষ্ঠিত হয় এবং তা দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। প্রথম যুদ্ধের সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল দশ বছর আর শেষ যুদ্ধের সময় ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি চতুর্থ ফিজ্জারের সময় চাচা আবু তালিবের সাথে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন।

আবু তালিব ও তার আত্মীয় স্বজনের সকলকেই যুদ্ধে যোগদান করতে হয়েছিল। এ যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল কুরাইশ, কিনানা ও তাদের মিত্র গোত্রসমূহ; আর অপরপক্ষে ছিল হাওয়াযিন বংশের কায়স ও তাদের মিত্র গোত্রসমূহ। বনু হাশেম বাহিনীর পতাকাবাহী ছিল যাবের বিন আবদুল মুত্তালিব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তবে তিনি কেবল বড়দের সাথে থেকে শত্রুদের তীর হতে নিজেকে রক্ষা করে, স্বজনদের তীর সংগ্রহ করে দিতেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অকারণে বা সাধারণ কারণে মানুষ যে মানুষের রক্ত এমন করে ঝরাতে পারে, তা করুণার আঁধার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চোখে দেখার সুযোগ পেলেন। এ নির্মম দৃশ্য দেখে বিশ্ব ত্রাণকর্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মল ও পবিত্র অন্তরের মধ্যে দুর্গত ও অসহায়দের আর্তনাদের যে করুণ বেদনা জেগে উঠেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এ যুদ্ধে যুবায়েরের হাতে ছিল বনী হাশিমের জাতীয় পতাকা। তার অন্তরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের চাওয়ার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল। যুদ্ধ অবসানের পর যুবায়েরই সর্বপ্রথম এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, মানুষকে যেকোন ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে যেতে হবে। তখন কুরাইশ যুবকরা অতি আনন্দের সাথে, সে প্রস্তাবে সাড়া দিল। আর তাদের সাড়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপর নেই আনন্দিত হলেন। স্বগোত্রের কোন লোক অন্যায় করলেও, দলগতভাবে তাকে সমর্থন করা এবং তার মর্যাদা রক্ষার্থে সারা গোত্রের ধন-মাল-প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দেয়া ছিল আরবের চিরাচরিত প্রথা। এ

www.nagorikpathagar.org

কুৎসিৎ মনোবৃত্তির মূলোৎপাটন করে স্বগোত্র, পরগোত্র, স্বদেশী, পরদেশী নির্বিশেষে যে কেউ অন্যায় করলে তার দমন এবং অত্যাচারিতের সমর্থন করাই হল তাদের উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত ফিজ্জার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় (প্রিয়নবীসহ) তাঁর চাচা যুবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিব, আবদুল্লাহ বিন জুমআনের ঘরে একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় হাশিম, যুহরা প্রভৃতি গোত্রের বিশিষ্ট কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর একটি সেবা সংঘ গঠিত হয়। এ সেবা সংঘের সদস্যরা যে সকল কাজ করার জন্য শপথ ও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা হচ্ছে, (১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করব; (২) আমরা বিদেশী পর্যটকদেরকে রক্ষা করব; (৩) আমরা গরীব দুখীদেরকে সাহায্য করব; (৪) আমরা শক্তিশালীদেরকে, দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে দেব না; (৫) আমরা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব। আর এ পবিত্র প্রতিজ্ঞা বাণীর নাম হল 'হিলফুল ফুযুল'। দয়াল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনিও আবদুল্লাহ বিন জুমআনের ঘরে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে শপথ ও প্রতিজ্ঞায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর বলেন, একদা আবদুল্লাহ বিন জুমআনের গৃহে শপথ করে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তার বিনিময়ে আমাকে রক্তবর্ণ উট দান করলেও আমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে রাজী নই। আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি আহ্বান করে, হে ফুযুল প্রতিজ্ঞার সদস্যগণ! তবে আমি তার সে ডাকে সাড়া দেব। কারণ ইসলাম ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মযলুমের সাহায্য করার জন্যই এসেছে (আল হাদীস)। উপরোক্ত পাঁচটি আদর্শ যুগে যুগে, দেশে দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে বাঁধা দেয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপন করার মত আদর্শ কর্মই তারুণ্যের উৎকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ। যেমনটি হয়েছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিশোর জীবনে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবসায়িক জীবন

মক্কায় আবু তালিবের মত বেশিরভাগ মক্কাবাসী সিরিয়া ইয়ামেনের সাথে ব্যবসা করে জীবন ধারণ করতেন। এ ধরনের ব্যবসাতে কিছু কিছু মহিলাও জড়িত ছিল। যারা এ ব্যবসা কাফেলার সঙ্গে থাকত। তাদের উপর মহিলা ব্যবসায়ীরা

দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দায়িত্বভার অর্পণ করতো। তাদের বিক্রিত মালামালের মূল অর্থসহ লাভের একটা অংশ তারা পেত। খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ ছিলেন একজন ধনী, উচ্চ বংশীয় ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা। ব্যবসায় তার ছিল খুব প্রভাব প্রতিপত্তি। খুয়াইলিদ ছিলেন একজন ধনবান ও বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র মালিক। মেয়ে খাদীজাকে পর পর দু'বার বিয়ে দিয়েও সুখী করতে পারেননি বিত্তশালী খুয়াইলিদ। খাদীজার পরপর দু'স্বামীই মারা যায়। প্রথম স্বামীর ঔরসে এক ছেলে ও এক মেয়ে আর দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে এক মেয়ে জন্মলাভ করে। এদের বুকে নিয়েই খাদীজা বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফিজ্জার যুদ্ধের আগেই পিতা খুয়াইলিদ ইন্তিকাল করেন। ফলে পিতার ব্যবসাকে দু'হাতে আগলে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন।

বিত্তশালী খাদীজা ইতোমধ্যে লোক মুখে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা আর চারিত্রিক গুণাবলীর কথা জানতে পারলেন। তখন তিনি ভাবলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়? কেননা এমন একজন বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিনি খুঁজছেন। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে এনে তিনি প্রস্তাব দিলেন। সিরিয়াগামী তার এক বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্ব তিনি যদি গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি অন্যদের যা সম্মানী দেন, তাকে তার দিগুণ দিবেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু আবু তালিব বুহাইরার সাবধান বাণীর কথা ভেবে চিন্তিত হলেন। চাচা আবু তালিব কাফেলার সকলকে ডেকে যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখতে বললেন। বিশেষভাবে মাইসারা নামে বিবি খাদীজার একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাসকেই, আবু তালিব তার সাবধান বাণী জানালেন। আবু তালিবের সাবধান বাণী শুনে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মাইসারা তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে এবং তার প্রতি লক্ষ্য রেখে রওনা হলেন। সফরে কিছু অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত হয়ে যুবক নবীর প্রতি, মাইসারা গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। সিরিয়া যাওয়ার পথে প্রত্যেকটি ঘটনা থেকে মাইসারা কিছু অলৌকিক চিহ্নের পরিচয় পেলেন। সে চিহ্নগুলো অবশ্যই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিমানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। ঘটনাগুলো এক এক করে বর্ণিত হচ্ছে।

ঐ পথে মাইসারা ব্যবসার প্রয়োজনে আগেও বহুবার যাতায়াত করেছেন। সে

কারণে তার এ পথের অভিজ্ঞতা ভালই ছিল। এ পথ ধরে সে আগে যখন গমন করছিল তখন প্রচণ্ড গরমে তাঁর গায়ের চামড়া পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেবারের যাত্রায় প্রত্যেক দিন যখন সূর্য মাথার উপরে উঠে আসতো এবং তার অগ্নিরূপ কিরণ পথযাত্রীর উপর বর্ষিত হতো। তখন হালকা একখণ্ড মেঘমালা পাখির ডানার মত আকার ধারণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ছায়া দান করত। আর যখন সূর্যের তেজ ক্রমান্বয়ে কমে আসত, তখন ঐ মেঘমালা অদৃশ্য হয়ে যেত।

সে সফরে একদিন চলতে চলতে খাদীজার দু'টি উট দারুণভাবে অবসন্ন হয়ে দলের পেছনে পড়ে গেল। মাইসারা তাদের মারধর করেও অন্যান্য উটের সারিতে আনতে পারল না। এ দু'টি উটের দেহ থেকে তখন দর দর করে ঘাম ঝরছিল। মনে হল তারা শিগগিরই মাটিতে পড়ে যাবে। মাইসারা এ অবস্থায় উট দু'টোকে নিয়ে খুবই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। সে উট দু'টোকে ফেলে রেখেও যেতে চাইল না। আবার অন্যদিকে তার মনে পড়ল, আবু তালিবের সাবধানী বাণীর কথা। তাই সে দ্রুত পদে যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এগিয়ে গিয়ে উটের করুণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করল। মাইসারার কথা শুনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে না গিয়ে পীড়িত উট দুটোর কাছে ফিরে এলেন। সামনে ঝুঁকে পড়ে যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর হাত দু'টি মেলে দিয়ে (নুড়ি পাথরে) ক্ষত-বিক্ষত তাদের পাগুলো স্পর্শ করলেন। যে উট দুটি মার ধরের পরেও নড়াচড়া করতে পারেনি, তারা তখন ঐ পবিত্র হাতের স্পর্শ পেয়ে, ত্বরিত গতিতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। দ্রুতগতিতে ধাবমান হয়ে কাফেলার নেতাদের সন্নিকটে পৌঁছে গেল। যখন কাফেলা সিরিয়ার বসরা নগরীতে পৌঁছল, তখন তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দ্রব্য এনেছিলেন, সিরিয়া পৌঁছে তা তিঁনি অপ্রত্যাশিত উচ্চ মুনাফায় বিক্রি করলেন। সেসব জিনিসের ব্যাপারে তাঁকে অধিক দর কষাকষির ঝুঁকি পোহাতে হয়নি। তিনি তাঁর অকপটতা ও সততা দ্বারা প্রত্যেক ক্রেতার সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে তার দ্রব্যাদি ক্রয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ওসব অঞ্চলে প্রতিটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে গির্জা আছে এবং প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড একজন নবীকে স্মরণ করে। তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকৃতি, স্বয়ং কাছে পেয়ে মাথা নত করে অভিবাদন জানায়। ইতোপূর্বে মাইসারা কয়েকবার বাণিজ্য

www.nagorikpathagar.org

করতে আসার ফলে অনেক ধর্ম যাজকই তাকে চিনত। তাই তারা মাইসারাকে যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলেন।

তারা দৈবক্রমে জানতে পারলেন যে, মাইসারা তরুণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস। 'জরডিস' নামের নেসতোরিয়ান গোত্রের একজন ধর্ম যাজক মাইসারার কাছে ঠিক ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, যেভাবে আবু তালিবের কাছে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন ধর্মযাজক বুহাইরা। বেচাকেনার পালা শেষ করে কাফেলা বাড়ির দিকে যাত্রা করল। সেবারও মাইসারা দেখতে পেল, সে একই রহস্যময়ী মেঘমালা যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দিয়ে চলছে। এদিকে বিবি খাদীজা কাফেলার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুনছিলেন। সময় অসময় অস্থির মন নিয়ে সুদূর প্রান্তরের দিকে চেয়ে দেখতেন, তারা আসছে কিনা? একদিন স্বীয় অভ্যাসবশত নিজের চাকর-চাকরাণীদের নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে সিরিয়া যাওয়ার পথের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলেন, সে সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক কাফেলা। যার পুরোভাগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে বসে আছেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যেও তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করে আছে এক খণ্ড মেঘ। সে ছায়ায় তার নূরানী চেহারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এ অপূর্ব দৃশ্য দেখে খাদীজার অন্তর, এক অজানা আবেগে কেঁপে উঠল। হৃদয়ে বাজতে লাগল এক আনন্দ সুর। সুপুরুষ যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে তার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলা খাদীজার দরজায় এসে দাঁড়াল।

যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমদানীকৃত মালামাল খাদীজাকে বুঝিয়ে দিলেন। বিক্রয়কৃত মালের হিসাব কষে দেখা গেল, সেবারের ব্যবসায় প্রায় দিগুণ মুনাফা হয়েছে। উচ্চ বংশীয় রমণী খাদীজা তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বিগুণ সম্মানী দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। এরপর থেকে তিনি তার মনের মধ্যে একটি ধারণাই পোষণ করতে লাগলেন যে, কিভাবে তাঁর যাবতীয় ধন সম্পত্তির দেখা শোনার দায়িত্ব যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অর্পণ করা যায়। বিবি খাদীজার বার বার মনে হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃদু হাসি, বিস্ময়

www.nagorikpathagar.org

ভরা চোখের চাহনি আর সংযত শব্দ চয়নের ভেতর দিয়ে বলিষ্ঠ কথা বলা সত্যিই অপূর্ব। গোলাম মাইসারা, আর এক বিশ্বস্ত সঙ্গী খুজামা একদিন বিবি খাদীজার কাছে সদ্যসমাপ্ত সফরের ঘটনা বর্ণনা করল। বলল, খ্রিষ্টান যাজক নসতোরার কথা। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে ভবিষ্যৎ নবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বললেন সে ছায়াবতী বিস্ময়কর মেঘের কথা, যা পথ চলার সময় তাঁর মাথার উপর এসে ছায়া দান করত। পথিমধ্যে উট চলার দুর্ঘটনাসহ, আরো অনেক কথা। বিবি খাদীজা এক ধ্যানে তাদের কথা শোনলেন। তাঁর মন প্রাণ ভরে উঠল। এতদিন পর সত্যিই একজন মানুষ তিনি পেয়েছেন। ইতোমধ্যে এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, পূর্ণিমার চাঁদ মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে মন উতাল করা আলো ছড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে সে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ থেকে নেমে এসে তার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। চাঁদের স্পর্শে খাদীজার পবিত্র শরীরে অজানা আনন্দে কাঁপন ধরল। এরপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে তিনি বিহ্বল হয়ে বসে রইলেন। এ কিসের ইঙ্গিত? তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। স্বপ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে, পরদিন ভোর বেলাতেই তার চাচাতো ভাই বিশিষ্ট ধর্ম যাজক অন্ধ ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে তা'বীর জানতে গেলেন। অন্ধ ওয়ারাকা ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের যেমন পণ্ডিত, তেমনি স্বপ্নেরও ব্যাখ্যাকারক।

যাজক ওয়ারাকার কাছে গিয়ে বিবি খাদীজা তার স্বপ্নের বিবরণ শুনালেন। ওয়ারাকা গভীর মনযোগ দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে বললেন, শোন বোন! আমার মনে হচ্ছে, তুমি অতি ভাগ্যবতী নারী। তাওরাত ও ইঞ্জীল থেকে আমি যে তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে এ পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করেছেন। অচিরেই তুমি তাকে স্বামীরূপে বরণ করে নিবে। ওয়ারাকার কথা শুনে খাদীজার বুকে নতুন করে আনন্দমাখা, ভীরু কম্পন শুরু হল। মনে মনে ভাবলেন, এতদিন বিয়েতে অনীহা প্রকাশ করে এসেছি। কত সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরা এ ধরনের প্রস্তাব দিয়ে বিফল হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু কোনদিন এমন কিছু তো ভাবিনি। বিবি খাদীজা চিন্তায় পড়ে গেলেন। একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যাচ্ছে। যা উভয়ের বয়সের তারতম্য। সে সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবে মাত্র ২৫ বছরে পদার্পণ করেছেন। আর খাদীজার (রা.) বয়স ৪০ বছর পার হয় হয়। তবুও তিনি চিন্তা করছেন কিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কথাটা তোলা

www.nagorikpathagar.org

যায়। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে, এমন কথা তো কিছুতেই তার মুখে আসবে না। অনেক ভেবে চিন্তে কিছু স্থির করতে পারলেন না।

খাদীজার (রা.) নাফিসা নাম্মী এক বুদ্ধিমতী পরিচারিকা ছিল। সে যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কথায় পারদর্শিণী। খাদীজা (রা.) তার কাছেই মনের কথা প্রকাশ করলেন। বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এতদিন ভেবেছেন বিয়েশাদী আর না করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু এখন মন চাইছে এমন একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে যেতে, যার সেবা করে জীবনকে ধন্য করা যায়। কিন্তু তিনি কি সম্মতি দিবেন? নাফিসা চুপচাপ খাদীজার (রা.) কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। সে বুঝতে পারল, তার এ সম্পদশালী, অথচ চির দুখিনী মনিবের বুকে কি প্রচণ্ড ঝড় বইছে। তখন সে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করব। একদিন সুযোগ করে নাফিসা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নানা বিষয়ে আলাপের পর জিজ্ঞেস করল, আপনি এখনও বিয়ে করছেন না কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন আমার হাত একেবারে খালি। নাফিসার পুনরায় প্রশ্ন, আপনার সামান্য যা কিছু আছে, এটাকে যদি কোন ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত নারী যথেষ্ট মনে করেন, তখন আপনি কি করবেন? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করলেন, তুমি কার ইঙ্গিত দিচ্ছ? নাফিসার স্পষ্ট জবাব, বিবি খাদীজার। যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সঙ্গে তামাশা করছো কেন? আমার যে সামান্যতম কিছু আছে, তা দিয়ে কোন সাহসে আমি তার সান্নিধ্য কামনা করব? নাফিসা খুশী হয়ে বলল, তার দায়িত্ব আমার। আপনি সম্মতি দিলে আমি অগ্রসর হতে পারি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। তবুও আমার অভিভাবক চাচা আবু তালিব। তিনি সম্মতি দিলে আমি রাজী। নাফিসা বলল, আমি খাদীজার (রা.) দায়িত্ব নিলাম। আমার বিশ্বাস, তিনিও (আবু তালিব) আনন্দচিত্তে রাজী হবেন।

নাফিসা খুশি মনে চলে গেল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবকে ঘটনাটি পরিষ্কার করে জানালেন। আবু তালিব স্নেহের ভাতিজার মুখে খাদীজার সাথে বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। এমনকি এ পবিত্র বিয়ে নিজের দায়িত্বে সম্পাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিবি খাদীজা (রা.) পরিচারিকা নাফিসার মুখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মতির সংবাদ পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কিছুক্ষণ স্থির বসে রইলেন। এরপর তিনি নিজেই একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ বাড়িতে

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াত করে এনে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। বিয়ের ব্যাপারে একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করেনিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবসহ কয়েকজন পিতৃব্য অভিভাবক বিবি খাদীজার (রা.) চাচা আমর বিন আসাদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

দু'পক্ষের অভিভাবকদের যথারীতি প্রস্তাব ও আলোচনা ফলপ্রসূ হল। উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হল। নির্দিষ্ট দিনে চাচা আবু তালিব, হামযা, কুরাইশ প্রধানরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় পরিজনসহ বিবি খাদীজার গৃহে উপস্থিত হলেন। বিবি খাদীজার চাচা 'আমর' এবং চাচাতো ভাই 'ওয়ারাকা বিন নওফেল' তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বিয়ের কাজ শুরু করলেন। বিয়েতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব পাত্র পক্ষের এবং বিবি খাদীজার চাচা আমর বিন আসাদ মেয়ে পক্ষের অভিভাবকত্ব করেন। পাত্র পক্ষের তরফ থেকে প্রথমে বিয়ের খোৎবা পাঠ করেন আবু তালিব। হযরত খাদীজার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল বহু শাস্ত্রবিদ জ্ঞানী লোক ছিলেন। আবু তালিবের খোৎবার পর তিনি পাত্রী পক্ষের হয়ে খোৎবা পাঠ করেন। এমনিভাবেই বিশ্বের অন্যতম স্বামী-স্ত্রীর জুটি অর্থাৎ 'আল আমীন' (সত্যবাদী) ও 'আত তাহেরার' (পবিত্রা) শুভ বিবাহসম্পন্ন হয়েছিল (৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহিত জীবন

শুচিতা, সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধাচারের জন্য খাদীজাকে তাহেরা বলা হত। বিয়ের পর চাচা আবু তালিব প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নববধূ বিবি খাদীজা (রা.) কে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আনন্দে চাচা আবু তালিবের চোখ অশ্রুসিক্ত হল। তিনি দু'হাত তুলে এ জুটির ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হওয়ার জন্য দোয়া করলেন। পরের দিন উট যবাই করে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়ালেন। খাদীজা (রা.) তাঁর দাস-দাসীদের আমোদ আহলাদ করতে অনুমতি দিলেন। দাস-দাসীরা মনিবের মুখে এত বছর পর অনাবিল সুখের ছোঁয়া লক্ষ্য করে, নতুন করে উদ্ভাসিত হল। খাদীজা (রা.) খুশীতে ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর ক্রীত দাস-দাসীদের অনেককে মুক্ত করে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

দু'হাতে সব গরীব দুঃখীদের প্রচুর ধন সম্পদ দান করলেন। এরপর কা'বা ঘরের নিকট মক্কা নগরীর মূল কেন্দ্রে খাদীজার (রা.) বাড়িতে, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী একত্রে বসবাস করতে লাগলেন। এ বাড়িতেই হযরত ফাতিমা (রা.) সহ অন্যান্য নবী কন্যারা জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিবাহ পয়গাম্বর জীবনের আয়োজন মাত্র। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের বিশাল দায়িত্ব ও সার্থকতার জন্য খাদীজার (রা.) সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ এমনিভাবেই এ দু'মহান নর-নারীর মিলন সংঘটিত করে দিয়েছিলেন। বিবি খাদীজা (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রা রমণী খাদীজাকে (রা.) বিধবা অবস্থায় বিয়ে করেন। অথচ তাকে তিনি এতই ভালবাসতেন যে, বাকী জীবনে (খাদীজার মৃত্যুর পরও) সর্বাবস্থায় স্মরণে রেখেছেন। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের এ বরকতময় বিবাহের পর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপুল অর্থের মালিক হন। কিন্তু খাদীজার (রা.) ইচ্ছানুসারে ব্যবসার উন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া; অধিক পরিমাণে আল্লাহর প্রশংসা ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তথা আল্লাহর ইবাদতে তিনি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন, তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি এবং পরে আশ্রয় দেননি? আর তিনি কি আপনাকে পথহারা অবস্থায় পাননি এবং পথ দেখাননি ?

প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের পর প্রিয়তমা সহধর্মিণীকে নিয়ে, চাচা আবু তালিবের বাড়িতে ক'দিন অতিবাহিত করেন। এরপর তাদেরকে ফিরে যেতে হয় স্ত্রীর সংসারে। কেননা বিবি খাদীজার (রা.) যেমন ছিল বিশাল ব্যবসা ক্ষেত্র, তেমন ছিল বিরাট সংসার। কর্মচারী, চাকর নকর, দাস-দাসী মিলে, সে সংসার ছিল একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। এদের পরিচালনা ও দেখাশোনা করতেন খাদীজা (রা.) নিজে। খাদীজা (রা.) বিয়ের পর, প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দক্ষতার সাথে সবকিছু পরিচালনা করতে শুরু করেন। খাদীজা (রা.), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ডেকে এনে বিশেষ করে মাইসারা ও খোজাইমার কাছে তাঁর চরিত্র মাধুর্যের

www.nagorikpathagar.org

বিস্তারিত বর্ণনা শুনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নন। এর ভেতর যে আলো লুকিয়ে আছে, তা এতই উজ্জ্বল যে. এক সময় সমস্ত পৃথিবী সে আলোতে আলোকিত হয়ে উঠবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাংসারিক জীবন

দীর্ঘ পঁচিশ বছর বিবি খাদীজা (রা.) সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় স্বামীর জীবন সঙ্গিনী হয়েছিলেন। খাদীজা (রা.) পয়ষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীর আদর, সোহাগ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হননি। তিনি এত ভাগ্যবতী ছিলেন যে, মৃত্যুর সময় স্বামীর কোলে মাথা রেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোন স্ত্রীর এ সৌভাগ্য হয়নি। তিনিই সে ভাগ্যবতী নারী, যিনি বিশ্বনবীকে নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থাতেই দেখেছেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। মহিয়সী খাদীজা (রা.) এর গর্ভে এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔরসে দু'পুত্র ও চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ছেলের নাম ছিল 'কাশেম'। এজন্যে লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবুল কাশেম বলে সম্বোধন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ডাকাকে পছন্দ করতেন। দ্বিতীয় ছেলের নাম তৈয়ব ওরফে তাহির। এ দু'সন্তানই শিশুকালে ইন্তিকাল করেন (ইবনে হিশাম)। কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে আবুল কাশেম, তৈয়ব ও তাহির এ তিন সন্তানের কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের মৃত্যুতে অন্তরে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু তাতে তিঁনি ভেঙ্গে পড়েননি। মহান বিধাতার প্রতি সমর্পিত হয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বিশ্বনবীর কোন ছেলে সন্তানই বেঁচে থাকত না বিধায় মক্কার কাফিররা হিংসা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে আটকুরে বলে গাল দিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাক, এটা হয়তবা আলীমুল গাইব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চাননি। কেননা, এ সন্তানেরা অথবা তার পরবর্তী অধঃস্তন পুরুষেরা খিলাফত নিয়ে নানা মতবাদের জন্ম দিতে পারত। হয়তবা স্বাধীন নির্বাচনের ও গণতন্ত্রকে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আল্লাহ এমন করেছেন। অবশ্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন, এর পিছের রহস্যের কারণ। কেননা মানুষের জ্ঞানের সীমানা সসীম-সীমিত-অতিক্ষুদ্র। খাদীজা (রা.) এর গর্ভে যে চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের

নাম যথাক্রমে ঐয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা (রা.)। মেয়েদের মধ্যে ফাতেমাই (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত বা পৃথিবী হতে বিদায়ের পরেও জীবিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের সন্তান, হযরত আলীর (রা.) সাথে হযরত ফাতিমার (রা.) বিয়ে হয়। তাঁদের ঘরে দু'সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'জন দৌহিত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই আদরের ছিলেন। তাদের শহীদ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে পূর্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন।

'ওকাজ' মেলা থেকে বিবি খাদীজা (রা.) 'যায়েদ' নামে একটি বালককে কিনে আনেন। সে সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়েই দাস ব্যবসা প্রচলিত ছিল। হাঁটে গরু ছাগলের মত মানুষ বিক্রি হত। ক্রয় করা গোলামের প্রতি আচরণও হত নিষ্ঠুর। তারাও যে মানুষ, তারাও যে একই আল্লাহর বান্দা, তাদেরও যে অন্য আর দশজন মানুষের মত আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ, মায়া, মমতা অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সব কিছুই বিদ্যমান থাকতে পারে, মানুষ নামের মনিবেরা তা কখনই চিন্তা করত না। এ বিষয়টি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্মান্তিকভাবে পীড়া দিত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় কেঁদে উঠত। এ কতবড় যুলুম ও অন্যায়। খাদীজা (রা.) বালক যায়েদকে ক্রয় করে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'যায়েদ'! আজ থেকে তুমি মুক্ত। বাকি মানুষদের মতই স্বাধীন সত্তা। বিশ্ব মানবের যিনি মুক্তিদাতা, তিনি কি কখনও কোন মানুষকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে রাখতে পারেন? আল্লাহ বলেছেন, সব 'মানুষই ভাই ভাই।' কুরআনের এ অমোঘ বাণীকে তিনি বাস্তবে রূপ দিতে ধরায় এসেছেন। মানুষ হয়ে অন্য মানুষের প্রভু হওয়া গর্হিত কাজ, চরম পাপাচার। তাই প্রভু নয়, পিতা যেমন আপন সন্তানকে লালন করে, তেমনি করে যায়েদকে তিনি লালন করতে লাগলেন। যায়েদ বিন হারেসা (রা.) হয়ে গেলেন বিশ্বনবীর পালক পুত্র। যায়েদ (রা.) ছিলেন কালো বা নিগ্রো। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত সাহাবী (রা.) হয়ে মুতার যুদ্ধে সেনাপতির বেশে শাহাদৎ বরণ করেছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকা অবস্থায় বালক যায়েদের পিতা হারিস এবং চাচা কা'ব যায়েদের খোঁজে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামের কাছে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের সন্তানকে ফেরত চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যায়েদকে তো আমি মুক্ত করে দিয়েছি। সে ইচ্ছা করলে এখনই চলে যেতে পারে। কিন্তু যায়েদ জন্ম দাতা পিতার সাথে যেতে রাজি হলেন না। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'আপনি আমার বাবা, আমি বাকী জীবন শুধু আপনার খিদমতেই থাকতে চাই। আমাকে এর থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। যায়েদের পিতা হারিস সন্তানের এ আকুলতা লক্ষ্য করে তাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। প্রিয় সন্তানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রেখে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার ও চরিত্র কতটা পবিত্র ও আকর্ষণীয় হলে, একজন গোলাম তথা পালক পুত্র নিজের বাবা-মার কাছে ফিরে যাওয়াকে কষ্টকর মনে করে; তা সহজেই অনুমেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, যায়েদকে এভাবে রাখলে মানুষ তাকে ক্রীতদাসই ভাববে। তাই তিনি তখনই কা'বা শরীফের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে সমবেত কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সকলে সাক্ষী থাক, এ যায়েদ আমার পুত্র, সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার উত্তরাধিকারী। কি উদার আহবান। কি মহত্ত্বপূর্ণ ঘোষণা। এ ঐতিহাসিক ঘোষণাকারীই আমাদের বিশ্বনেতা, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাধারণ একটি ক্রীতদাসকে আপন সন্তানের মর্যাদা দেয়া পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পৃথিবীতে কোন মানুষই ছোট বা তুচ্ছ নয়। পরিবেশ, পরিস্থিতি মানুষকে ছোট বড় করে। সুযোগ সুবিধা পেলে ওরাও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করতে পারে। ইতিহাসে যায়েদ (রা.), এর যথার্থ ও যোগ্য প্রমাণ রেখেছেন। যায়েদ বহু যুদ্ধ অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। মদীনার আমীরের দায়িত্ব দক্ষভাবে পালন করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মানুষকে আপন করে নিয়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখরিত করতে যে প্রেরণা যুগিয়েছেন, তা অনুসরণ করলে আজও এ মাটির পৃথিবীই জান্নাতের অনাবিল সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুকরণ ও অনুসরণেই বিশ্ব মানবের মুক্তি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংসার শুরু করেছেন দশ বছর হয়ে গেছে। এরপর তাঁর বয়স পয়ত্রিশ পূর্ণ হতে চলল। বিয়ের পর স্ত্রীর ব্যবসা, তাঁরই তরে

তথা মানব সেবায় উৎসর্গ হয়েছে। মহান প্রতিপালকের বরকতে তা আরো বড়, আরও প্রাচুর্যময় হয়েছে। সংসারে সমৃদ্ধি এসেছে। সাথে এসেছে সন্তান-সন্ততি। দু'ছেলে চার মেয়ে। ছেলেরা বড় হওয়ার আগেই আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছে। মেয়েরা নরম তুলতুলে পায়ে এক সময় হাঁটতে শিখেছে। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকেন। সারাক্ষণ স্রষ্টার সান্নিধ্য খুঁজেন। এর মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে এসে সবার খোঁজ খবর নেন। কার কি প্রয়োজন, তা জেনে নিয়ে তা পূরণ করেন। প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেন। তাদের প্রয়োজন সাধ্যমত পূরণ করেন। সমাজ, জাতি, সংসার সবই পালন করেন। এর মাঝে প্রায়ই তিনি তিন-চারদিনের খাবার সাথে নিয়ে হেরা গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হন। হেরার চারপাশ জনমানবশূন্য বিস্তীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তর। বিশাল শান্ত নীলাকাশ। তীব্র প্রখর সূর্যের আলো। শীতল, মায়াবী চাঁদের কোমল জ্যোতি। রাতের আকাশে লক্ষ কোটি তারার অপূর্ব সমারোহ। উত্তাল বাতাসের হিল্লোল। এর মাঝে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকেন। তাঁর অদেখা অজানা প্রিয় ইলাহ বা রবের সঙ্গ লাভের প্রতীক্ষায় থাকেন।

তাঁর পিতামহ হযরত ইব্রাহীম (আ.) যেভাবে তাঁর প্রিয় ইলাহ বা রবের ইবাদতে মশগুল হতেন, ঠিক তেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধির আগ্রহে দিন অতিবাহিত করেন। অস্থিরতা বাড়তে থাকে। সংসারের বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। এক সময় অর্থ ছিল না- বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। উত্তপ্ত বালুরাশির বুক চিরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সুদূর সিরিয়া-মিশরে ছুটতে হয়েছে। অর্থ আহরণ করতে হয়েছে। পিতৃব্য আবু তালিবের সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই সাংসারিক জীবনে আদর্শ অভিভাবক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত হয়েছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবসা সম্পর্কে অভূতপূর্ব যোগ্যতার কথা শুনে নিজের বিশাল ব্যবসা অবলীলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনাঢ্য বিধবা খাদীজা (রা.)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে খাদীজার (রা.) ব্যবসাকে আরও সমৃদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। এভাবেই একজন বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গুণবতী ও পবিত্র নারী খাদীজাতুল কোবরা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা নিশ্চিত আশ্রয় এবং উপযুক্ত সহধর্মিণী পেয়ে সংসার ও সাংসারিক জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করেন। কিন্তু স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের আশায় হৃদয়ের অতৃপ্তি ধীরে ধীরে মহিরুহে রূপান্তরিত হতে থাকে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একসময় নিজের ঘরকে আর শান্তির নীড় বলে মনে হয় না। সন্তানদের স্নেহ-আদর, স্বজন-প্রতিবেশীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা, স্ত্রীর পত্নী সেবার মায়াবী বাঁধন ধীরে ধীরে ধূসর হতে থাকে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু সংসার ধর্ম পালন করার জন্য অথবা শুধু স্বজন, সমাজ, জাতি, দেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে এ নশ্বর পৃথিবীতে পাঠাননি। তিনি সারা বিশ্বের পথ প্রদর্শক। বিশ্বের সবার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তাঁর জন্য অনেক বড় দায়িত্ব প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাঁকে পিতা ইব্রাহীমের বংশধর- যাঁরা এত যুগ পরে যাযিরাতুল আরবে, এক আল্লাহর উপাসনা বাদ দিয়ে ৩৬০টি পাথরের মূর্তির পূজা করতো; হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি; আর জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটির গভীরে প্রথিত করে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করতো। তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে; এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই তাঁর আগমন। জাহান্নাম থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। অন্ধকার গহবর থেকে আলোতে টেনে বের করার কর্মযজ্ঞ। এক সময় যাঁকে স্রষ্টার নির্দেশে সকল মাখলুকের আর মাটির মানুষের সার্বিক দায়িত্ব নিতে হবে; তাঁকে সর্বাধিক বিবেচনায় আরো উন্নত হতে হবে। এজন্যই বয়স বাড়ার সাথে সাথে মহান প্রতিপালক তাঁর প্রিয় বন্ধুর অভিজ্ঞতার ঝুলিও ভারি করেছেন।

এভাবে বিশ্বনবী পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করে চল্লিশের পূর্বেই ভিতরে ভিতরে এক পূর্ণ দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে উঠেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম স্ত্রী খাদীজা (রা.), স্বামীর এ পরিবর্তন গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। খাদীজা (রা.) স্থির ও নিশ্চিত, তার পবিত্র স্বামী পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তার ভাই ওয়ারাকা তো তাঁকে নিশ্চিত করেছেন, এ ব্যক্তি তুচ্ছ কেউ নন। আগত ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ নবী। খাদীজার (রা.) অন্তরও এটা বিশ্বাস করেছে যে, নিশ্চয়ই তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ নবী। ফলে বিবি খাদীজা মাঝে মাঝে চঞ্চল হলেও

www.nagorikpathagar.org

বিচলিত হননি। স্বামীর পাশে পাশে মহিরুহের মত বন্ধু হয়ে, তাঁর সাধনাকে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করেছেন। খাদ্য, পানীয় ফুরিয়ে গেলে হেরা পর্বতের গুহা থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়ীর পথে আসতে দেরী করতেন, মহিয়সী খাদীজা (রা.) তখন খাবার নিয়ে দূর্গম মরুভূমির আগুনঝরা পথ অতিক্রম করে স্বামীর কাছে পৌঁছে যেতেন। ধ্যানমগ্ন স্বামীর ধ্যান ভাঙার অপেক্ষায় প্রহর গুনতেন। প্রিয় স্বামী ধ্যান ভাঙতেই, চোখ খুলে যখন প্রিয়তমা স্ত্রীকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে দেখতেন; তখন এক অনাবিল প্রশান্তিতে তাঁর হৃদয় মন ভরে যেত। খাদীজা (রা.), স্বামীকে কাছে বসিয়ে তৃপ্তির সাথে আহার করাতেন। এরপর বাড়তি খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্র স্বামীর প্রয়োজনে সেখানে রেখে আবার তপ্ত বালুকণা আর তীক্ষ্ণ পাথর কুচির বুক মাড়িয়ে বাড়ির পথ ধরতেন। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিকর পদযাত্রা তাঁর হৃদয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করত না। উপরন্তু স্বামীর সান্নিধ্যের সময়টুকুই তার কষ্টকে মুছে দিয়ে অনাবিল প্রশান্তিতে উদ্বেলিত করত। খাদীজা (রা.) সত্যই মহিয়সী নারী। এ পবিত্রা নারীকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ফিরিশতা জিব্রাইল (আ.) মারফত সালাম পাঠিয়েছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যৌবনের মূল অংশ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছরকাল, মাত্র একজন স্ত্রীর সাথে অতিবাহিত করেন। তাও আবার এমন একজন নারীর সাথে; যাকে বলা যায় প্রায় বৃদ্ধা। তার মৃত্যুর পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকজন বৃদ্ধা মহিলাকে বিয়ে করেন। উভয় জনই ছিলেন বৃদ্ধা এবং বিধবা। প্রথমজন হযরত খাদীজা (রা.) এবং দ্বিতীয়জন হযরত সাওদা (রা.)। এরপর জীবনের শেষ ৩-৫ বছরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামাজিক, আদর্শিক, সমতা, শান্তি, রাজনৈতিক, আত্মিক এবং বিশেষ কারণেই বাকী বিয়েগুলো করেন। প্রতিটি বিয়ের পিছনেই ছিল এক মহৎ এবং গৌরবোজ্জ্বল উদ্দেশ্য। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত হাফসা (রা.) কে বিয়ে করে যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করেছিলেন। একইভাবে হযরত ওসমান (রা.) এর হাতে পরপর দু'কন্যাকে বিয়ে দিয়ে এবং হযরত আলী (রা.) এর সাথে সবচেয়ে আদরের/স্নেহের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) কে বিয়ে দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজন বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ চারজন সাহাবী

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের বিজয়ে, প্রচার-প্রসারে, ত্যাগ-তিতিক্ষায় খলিফা হিসেবে অতুলনীয় মহত্ত্বের পরিচয় দেন। আরবের সামাজিক রীতিতে, তারা শ্বশুর সম্পর্কিত আত্মীয়তার বিশেষ গুরুত্ব দিত। আরব প্রথানুযায়ী, জামাতা সম্পর্ক, বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সম্পর্ক দৃঢ়করণে বিশেষ ভূমিকা পালন করত। জামাতার সাথে যুদ্ধ করা, তাদের রীতিতে লজ্জাজনক কাজ ছিল। এ নিয়মকে বা প্রথাকে কাজে লাগাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি বিভিন্ন গোত্রের শত্রুতা ও শক্তি খর্ব করতে তাদের মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন বনু মাখযুম গোত্রের মহিলা। আবু জাহল এবং খালীদ বিন ওয়ালিদ ছিলেন এ গোত্রের লোক। এ গোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর খালীদ বিন ওয়ালিদের মাঝে ইসলামের প্রতি তেমন শত্রুতা লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি ক'দিন পরই, তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে অপরাজেয় সেনানায়ক হিসেবে বীরদর্পে বিজয় ছিনিয়ে আনেন। ইতিহাস এর সাক্ষী। এমনকি ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিয়ে করার পর, আবু সুফিয়ান কিছুকাল শত্রুতা করলেও, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আসেননি এবং সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) উভয়ই বিধবা ছিলেন। অপরদিকে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) এবং হযরত সফিয়া (রা.) এর বিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সংঘটিত হওয়ার পর, যথাক্রমে বনু মুস্তালিক এবং বনু নযির গোত্র, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছিল। এমনকি এ দু'গোত্রের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক অনেক উন্নত ও নিবিড় হয়েছিল। এ উভয় উম্মুল মুমেনিন (রা.) বিধবা ছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মুল মুমেনিনদের (রা.) বিয়ের কারণেই, ইসলাম এবং দ্বীনি ইলম সর্বোপরি বিশ্ব মুসলিম সমাজ উপকৃত হয়েছে। আসলে ব্যাপারটি ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার খাস রহমত, কুদরত এবং রহস্যময় উদ্দেশ্য। দাম্পত্য জীবনে তথা পারিবারিক জীবনের রীতিনীতি শিক্ষাদানে উম্মুল মুমেনিনরা (রা.) বিশাল এবং ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষভাবে তাদের মাঝে যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন; তাঁরা ইসলামকে বিশেষভাবে উপকার করে গেছেন। এদের মাঝে মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

শিরধার্য হলেন উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়িশা (রা.)। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহস্রাধিক হাদীস, ঘটনা, বাণী বর্ণনা করে গেছেন। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস, মুফতি এবং ফিকাহবিদ ছিলেন। ইসলামের বড় বড় সাহাবী, খলিফারাও, যে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে হযরত আয়িশার (রা.) শরণাপন্ন হতেন এবং উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়িশা (রা.) সেসব জটিল সমস্যার ইসলাম ভিত্তিক সমাধান করে দিতেন। হযরত আয়িশা (রা.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত সন্নিধ্যে থাকার কারণে, তিনি কয়েক হাজার গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর (রা.) বর্ণনাকৃত হাদীসের মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ইসলামের পারিবারিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অনেক হাদীস, মাসলা-মাসায়েল রচিত হয়েছে উম্মুল মুমেনদের অবদানে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, তার পালক পুত্র হযরত যায়েদের (রা.) তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নবের (রা.) বিবাহ ছিল জাহেলী যুগের রীতিনীতির নস্যাৎ করার এক শ্রেষ্ঠ দলিল। এ বিয়ের মাধ্যমে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, পালক পুত্র কখনই আসল পুত্রের সমতুল্য হতে পারে না। জাহেলী যুগের পালক পুত্রের কুসংস্কার-তথা নিলর্জ কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজ ও ইসলামী ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করেছিল এ বিয়ে। জাহেলী যুগের এ কুসংস্কার নির্মূল করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত যয়নবের (রা.) বিয়ে দেন। এ ব্যাপারে আল কুরআনে নির্দেশ জারী হয়েছে। অতএব বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোন ঘটনা নিয়ে বক্রভাবে চিন্তা করা জঘন্যতম নির্বুদ্ধিতা ও মহাপাপ।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ময়দার নরম রুটি খেয়েছেন কিনা জানি না। তিনি কখনো ভূনা করা বকরী খেয়ে দেখেননি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাদের দুই দুই মাস কেটে যেত; তৃতীয় মাসের চাঁদ দেখা যেত; অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুলায় আগুন জ্বলতো না। দু'টো সামান্য খেজুর ও পানি খেয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীরা জীবন ধারণ করতেন; অথচ কেউ কোন আপত্তিকর আচরণ করতো না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীরা রাসূলকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা কেউ দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েননি।

www.nagorikpathagar.org

সাধারণত সতীনের মাঝে যে ধরনের (সচরাচর) খুনসুটি বা মনোমালিন্য হয়; তাও তাঁদের মাঝে লক্ষ্য করা যায়নি। বরং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক বন্ধন, মহত্ত্ব, মমত্ব, আদর্শিক সম্পর্ক সত্যিই কল্পনাতীত এবং অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ইসলামের ইতিহাসে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন বিশ্ব মানবতা, শান্তি, মানুষের মর্যাদা ও ভালোবাসার অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে বিশ্ব ইতিহাসে চিত্রিত হয়ে আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মাত্র সন্তান (ছেলে) ইব্রাহীম, মারিয়া (মরিয়ম) কিবতিয়ার গর্ভে এবং অন্যান্য সকল সন্তান খাদীজার (রা.) গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহর দু'টি ডাক নাম ছিল। তায়্যিব ও তাহির। অনেকেই ভুল করে তায়্যিব ও তাহিরকে, দু'জন বলে মনে করে থাকেন। কাসিম ২ বছর বয়সে ও আবদুল্লাহ শৈশবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই ওফাত প্রাপ্ত হন। ইব্রাহীম ৮ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ম হিজরীতে মাত্র ১৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। বিশ্বনবীর সকল পুত্র সন্তান শিশুকালে মৃত্যুবরণ করেন। সর্বশেষ পুত্র সন্তান ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করলে কাফিররা খুশী হয়। পুত্র সন্তানরা একে একে সবাই মৃত্যুবরণ করায় তারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বিশ্বনবীকে আটখুড়াঁ, নিঃবংশ, ইত্যাদি নামে ডাকত। এ ব্যাপারে সূরা আল কাউসার নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, বিশ্বনবীকে তিনি কাউসার দান করে সম্মানিত করেছেন।

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়নবের, খাদীজার (রা.) ছোট বোন হালার পুত্র, আবুল আস বিন রাবিবিনের সঙ্গে বিবাহ হয়। আবুল আস বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়ায় আবুল আস মুক্তি পেয়ে মক্কায় ফিরে যান এবং মুক্তির শর্তানুযায়ী ঐয়নবকে মদীনা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে আবুল আস ষষ্ঠ হিজরীতে মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে জয়নবের সঙ্গে মিলিত হন। ঐয়নব (রা.) অষ্টম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। উমামা নামের জয়নবের একটি মেয়ে ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমামাকে খুব আদর করতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একন্যা খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২য় ও ৩য় কন্যা যথাক্রমে রুকাইয়া ও কুলসুমের প্রথমে বিবাহ হয়-উৎবা ও উতাইবার সঙ্গে। তারা উভয়েই ছিল আবু লাহাবের পুত্র। যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ধর্ম প্রচার

শুরু করেন, তখন আবু লাহাব পুত্রদ্বয়কে বাধ্য করল মহানবীর কন্যাদ্বয়কে পরিত্যাগ করতে। ফলে এ দু'মেয়েরই পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমানের (রা.) সঙ্গে বিবাহ হয়। ওসমান (রা.) রুকাইয়ার (রা.) মৃত্যুর পর, কুলসুমকে (রা.) বিবাহ করেন। রুকাইয়া (রা.) দ্বিতীয় হিজরীর রমযানে বদরের যুদ্ধের দিন ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁকে নিজ হাতে দাফন করেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে ওসমানের (রা.) বিবাহ সম্পাদিত হয় ৩য় হিজরীতে। উম্মে কুলসুম ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ইসলামের প্রথম যুগে বিশ্বনবীর এ দু'কন্যা অমানুষিক নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তবুও তাঁরা পিতার আনীত দ্বীন ইসলামের উপর জীবন অতিবাহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৪র্থ কন্যা ফাতিমা (রা.) ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলীর (রা.) সঙ্গে ২য় হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ফাতিমার (রা.) আনুমানিক ১৬ বছর বয়সে বিবাহ হয়। ১১ হিজরীতে (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে) মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কেবল ফাতিমাই (রা.) জীবিত ছিলেন। অন্য সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দশাতেই ইন্তিকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র কন্যাদের সকলকেই জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়েছে। শুধু বিবি খাদীজা (রা.) জান্নাতুল মোয়াল্লাতে (মক্কার পাশে) শুয়ে আছেন। এসব পবিত্র মানুষগুলোর কবরসমূহ সাদামাঠা, চিহ্নবিহীন। কোন ধরনের জৌলুস, বাঁধানো, সাজানো বা জাঁকজমক নেই এসব কবরে। এমনকি সামান্য পাথর দিয়েও চিহ্ন করে রাখা হয়নি। এটাই ইসলামের আদর্শ। এর বিপরীত কোন কিছু ইসলাম সম্মত নয়। যারা কবরকে মাজার বানায়; তারা স্পষ্টতই ইসলামের বাইরে মনগড়া বিদআত বা কঠিন গোনাহে লিপ্ত। এসব থেকে আল্লাহ আমাদের হিফাযত/রক্ষা করুন। আমীন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামাজিক জীবন

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আরববাসীদের ঠিক সম্মুখে রয়েছে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি আরবদের মাঝেই, তাদের একজন হয়ে অতিবাহিত করেছেন। তাদের শহর মক্কাতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের চোখের সামনে তিনি শৈশব কাটিয়েছেন। সম্মানের

www.nagorikpathagar.org

সাথে উন্নত চরিত্র নিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। জীবনের প্রায় পুরো সময় তাদের সাথে থাকা-খাওয়া, চলা-ফেরা, মেলামেশা করেছেন। বিয়ে-শাদীও তাদের সাথে করেছেন। লেন-দেন করেছেন। সকল প্রকার সামাজিক কাজে যোগ দিয়েছেন তথা সম্পর্ক স্থাপন তাদের সাথেই করেছেন। মেয়েদের বিয়ে শাদীও তাদের কাছে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি দিকই তাদের নিকট প্রকাশ্য, উজ্জ্বল ও খোলা খাতার মত ছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি কোন শিক্ষালয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেননি। এতীম অনাথ হওয়ার কারণে সে সুযোগও পাননি। তবে কি করে তিনি আল কুরআন হতে এমন তথ্য, তত্ত্ব জ্ঞান, বিজ্ঞতা লাভ করে, সহসাই নবুওতের দাবী করলেন? এর সাথে সাথেই তার মুখ হতে জ্ঞানের ঝর্ণধারা প্রবাহিত হতে লাগল? কেউ গবেষণা করল না? আসলে এর পিছে কি মহারহস্য লুকিয়ে আছে? কেউ তা ভেবে দেখল না? মহান রবের সরাসরি সাহায্য ব্যতীত কেউ কি এমনটি করতে পারে? অবশ্যই না। ইতিহাসই এর সাক্ষী।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আরববাসীদের কাছে স্পষ্ট ছিল তা হলঃ মিথ্যাবাদ, ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতি, ঠকবাজী প্রভৃতি নৈতিক কদর্যতাপূর্ণ কাজ; তাঁর জীবনে কখনই দেখা যায়নি। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে, কোন মানুষ এমন দাবী করতে পারেনি যে, তাঁর চরিত্রে ওসব কিছুর বিন্দু মাত্র লক্ষণ ছিল। পক্ষান্তরে যে লোকই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, সে তাঁকে একজন সত্যবাদী, সত্যদর্শী, নিষ্কলুষ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছে। অতএব এ কিতাব (আল কুরআন) তাঁর বানিয়ে বলাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও বোকামি। অথচ প্রিয়নবী যখন পবিত্র কুরআনের বাণী আরববাসীদের শোনাতে লাগলেন, তখন তারা বলতে লাগল, এটা আল্লাহর বাণী নয় বরং এটা তোমার নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত বানান কথা। এটাকে আল্লাহর নামে পেশ করার উদ্দেশ্য হল, তার সে বাণীর মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। মানুষ অজ্ঞতাবশত এভাবেই ভুল করে থাকে। প্রত্যেক নবী রাসূলের ক্ষেত্রেই এমনটি হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর। নবুওয়াত লাভের মাত্র পাঁচ বছর বাকী। তখন কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের ও হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর পুনঃ স্থাপনের মত ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় কা'বা গৃহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়। কারণ এ পবিত্র ঘরটি নিম্নভূমিতে স্থাপিত হয়েছিল। ফলে বর্ষাকালে সারা শহরের পানি হারাম শরীফেই জমা হত। এ পানি যাতে করে কাবা গৃহের ক্ষতি সাধন করতে

www.nagorikpathagar.org

না পারে, সে জন্য বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বাঁধটি প্রায়ই ভেঙ্গে যেত। ফলে হারাম শরীফের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ে। কা'বা ঘরকে ভালভাবে মেরামত করা জরুরী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সব কিছুকে ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহর ঘর কিভাবে ভেঙ্গে ধূলিস্মাৎ করা যাবে? এটাতো ভয়ংকর পাপের কাজ। তখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মতামত দিল, না! পাপ হবে কেন? এতো কা'বা ঘরকেই পুনঃনির্মাণের জন্য এবং মজবুত করে তৈরি করার জন্য করা হচ্ছে।

এভাবেই কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণে সকলেই ঐক্যমতে পৌঁছে। এদিকে সে সময় জিদ্দা বন্দরের উপকূলে ঝড়ের আঘাতে একটি জাহাজ অকেজো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। এ সংবাদে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, ওলীদকে পাঠিয়ে খুব অল্পদামে জাহাজের পরিত্যক্ত কাঠগুলো কা'বার ছাদের জন্য কিনে আনার ব্যবস্থা করে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কা'বা গৃহের সংস্কার কাজে অংশগ্রহণ করে। এতে দেয়ালগুলো খুব দ্রুত নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু পবিত্র কালো পাথরটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কারণ এ পবিত্র পাথরটি দেয়ালে স্থাপন করার সম্মান ও গৌরব কোন গোত্রই হাতছাড়া করতে রাজী ছিল না। ফলে দাঙ্গা বাঁধার উপক্রম হল। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এ সংবাদে শহরের বাসিন্দারা আতংকিত হয়ে উঠল। আরব রীতিতে সংঘাত যদি শুরু হয়, তাহলে বংশানুক্রমে চলতে থাকে। কোন কোন গোত্র তাদের প্রথানুসারে রক্তপূর্ণ পাত্রে হাত ডুবিয়ে সংঘাতের জন্য প্রতিজ্ঞা করে বসল। এ পরিস্থিতিতে তাদের সম্মানী ব্যক্তিত্ব জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া (মতান্তরে ওলীদ) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, শোন তোমরা থাম! শুধু শুধু রক্তপাত কেন ঘটাবে? আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম হেরেম শরীফের মধ্যে প্রবেশ করবে, তাকেই তোমরা সকলে পঞ্চায়েত মেনে নিবে। তার কথামতেই স্থাপিত হবে পবিত্র পাথর। সকলেই প্রস্তাবে রাজি হল। এরপর সবাই যার যার অবস্থানে চলে গেল।

পর দিন খুব ভোরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সেখানে প্রবেশ করল, তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে দেখতে পেয়েই সমবেত লোকেরা বলে উঠল, এ ব্যক্তি আল আমিন; বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আমরা তাকেই মীমাংসাকারী মেনে নিতে রাজি আছি। তিনি তো মুহাম্মদ। সত্যবাদী, বিজ্ঞ, সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। গোত্র প্রধানরা তাঁকে ঘিরে, তাদের সমস্যার কথা বললেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি বড় চাদর এনে

www.nagorikpathagar.org

জমিনে বিছানো হোক। অতঃপর প্রত্যেক গোত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এসে চাদরের চারিদিকে ধরল। এরপর তিঁনি কালো পাথরটি নিজ হাতে নিয়ে সে বিছানো চাদরের মাঝখানে রাখলেন। অতঃপর দলপতিরা চাদরের কোণা ধরে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেল। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরটিকে নিজ হাতে তুলে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে বসিয়ে দিলেন। এভাবে নবুওয়াত লাভের পূর্বেই মহান আল্লাহ, সমগ্র কুরাইশদের দ্বারা তাঁকে একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরূপে স্বীকার করিয়ে নিলেন। সমাজে তাঁকে স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। এসবই মহান প্রতিপালকের নিখুঁত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পরে মক্কার জীবন

নবুওয়াতের ১ম বছর (৬১০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের প্রথম বছরটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের একচল্লিশতম বর্ষ। তিনি নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্ত হন ঠিক চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার দিনটিতে (বুখারী, মুসলিম)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে অথবা রমযান মাসে নবুওয়াত লাভ করেছেন। রবিউল আউয়াল থেকে স্বপ্ন যোগে নবুওয়াতের সূচনা হয়েছিল এবং এ অবস্থা ছয় মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর রমযান শরীফে লাইলাতুল কদরে প্রিয়নবী যখন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন তখন জিব্রাঈল (আ.) এর শুভাগমন হয় এবং কুরআন নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'রমযান সেই মহিমান্বিত মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।' অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, 'আমি কদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছি।' (১ ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রীঃ) বিশ্বনবী হেরা গুহায় গভীর ইবাদতে মগ্ন। অকস্মাৎ তাঁর কাছে ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন। ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) আত্মপ্রকাশ করেই বলেন, ইকরা, (পড়ুন)। উম্মি নবী বলেন, আমি পড়তে জানি না। এরপর জিব্রাঈল (আ.), প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিয়ে, একই প্রশ্ন করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উত্তর দেন। এরপর পুনরায় ফিরিশতা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় একই প্রশ্ন করেন। এভাবে তিনবার তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়। ৪র্থ বার জিব্রাঈল (আ.) আল কুরআনের সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করেন। ইকরা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খলাক্বা, খলাক্বল ইনসানা মিন আলাক্বা, ইক্বরা ওয়া

www.nagorikpathagar.org

রব্বুকাল আকরমুল্লাযী আল্লামা বিলক্বলাম; আল্লামাল ইনসানা মা-লাম ইয়ালাম। অর্থাৎ, পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক্ব ঃ ১-৫)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে আয়াতগুলোকে পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তা তাঁর অন্তরে বসে গেল। অতঃপর যখন তিনি হেরা পাহাড়ের গুহা হতে বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে, অন্তর (অহীর ভারে) কাঁপছিল। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও! নবী পত্নি খাদীজা (রা.) তখনই তাঁর গায়ের উপর চাদর জড়িয়ে দিলেন। এরপর যখন তিনি একটু শান্ত হলেন; তখন খাদীজাকে (রা.) সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। অতঃপর বললেন, আমার প্রাণের ভয় হচ্ছে। হযরত খাদীজা (রা.) একথা শুনে আরয করলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়তার হক পালন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন, অসহায়দের সহায়তা করেন, অভাবগ্রস্তদের জীবিকা নির্বাহের উপায় করে দেন, ইত্যাদি। আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে মর্যাদাবান ও সম্মানিত করবেন।

হৃদয়ের পবিত্রতা এবং জ্ঞানের গভীরতা আছে বলেই হযরত খাদীজা (রা.) আরব সমাজে 'তাহেরা' নামে পরিচিত ছিলেন। এমনকি সৃষ্টির সেরা মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হওয়ার এবং এভাবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবি খাদীজার এরূপ আলাপ আলোচনার পর তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার চাচাতো ভাই 'ওয়ারাকা বিন নওফেলে'র নিকট নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগের ঐ সকল লোকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যারা সত্যিকার খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইঞ্জীল কিতাব লিখতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সী অতিশয় দুর্বল ও অন্ধ ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) ওয়ারাকাকে বললেন ঃ ভাই! আপনি আপনার ভগ্নিপতির ঘটনাটি শ্রবণ করুন। ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করলেন, অবস্থা কি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংঘটিত পুরো ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করে শুনালেন। ওয়ারাকা শুনে বললেন, ইনি সেই ফিরিশতা (জিব্রাঈল)

www.nagorikpathagar.org

যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট অহী নিয়ে আসতেন। তিনি আরো বলেন ঃ কতইনা ভাল হত. যদি আমি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার কওম আপনাকে জন্মভূমি (মক্কা) হতে বের করে দিবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কওম কি আমাকে জন্মভূমি হতে গৃহহীন করবে? ওয়ারাকা বললেন, নিঃসন্দেহে এরূপ হবে এবং যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আল্লাহ আপনাকে পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন আর এ খেদমতের জন্য যিনিই আদিষ্ট হয়েছেন তাঁরই এ অবস্থা হয়েছে। অতএব, যদি সে সময়টুকু আমার জীবিত কালেই আসে, তবে আমি পূর্ণ শক্তি দিয়ে আপনার সাহায্য করব। কিন্তু ওয়ারাকা সে সময়টি আর পাননি। এর পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন (বুখারী)। নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকে গাছপালা এবং পাথর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাতো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নবুওয়াতের শুরুর লগ্নে আমি যে গাছ কিংবা পাথরের নিকট দিয়ে চলতাম তারা আমাকে এভাবে সালাম দিত, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' অপর এক হাদীসে আছে যে, মক্কায় এমন দু'টি পাথর আছে যেগুলো আমাকে নবুওয়াতের প্রথম দিকে সালাম জানাত। কোন কোন আলেম বলেন, এর অর্থ হাজরে আসওয়াদ, আবার কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল অপর একটি পাথর, যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাড়ির কাছে ছিল।

এরপর ২য় পর্যায়ে অহী নাযিল হয় সূরা মুদ্দাছছিরের প্রথম ৪ আয়াত নিয়ে। তাতে বলা হয়, হে কম্বল আবৃত (নবী) উঠো এবং মানুষকে ভয় প্রদর্শন কর, আর তোমার রবের বড়ত্ব/শ্রেষ্ঠত্ব/মহত্ত্ব প্রকাশ কর. তোমার পোশাকসমূহ পবিত্র কর। (সূরা মুদ্দাছছির ঃ ১-৪)। এ আয়াতগুলো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দিতেই নাযিল হয়েছে। কেননা, সূরা আলাক্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মানবতাবোধ তথা জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক ইলমের কথা বলা হয়েছে। যেখানে আমল নেই, সেখানে ইলমের উপকারিতা নিষ্ফল হয়ে যায়। আর উল্টো যেখানে আমল আছে কিন্তু ইলম নেই, সেখানে এ আমল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই হিদায়েত ও সিরাতুল মুস্তাকিমের জন্য ইলম, আমল উভয়টির প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াতগুলোতে পড়া, জ্ঞানার্জন করা বা ইলমের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত আয়াতগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে জোর তাগিদ এসেছে।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে অহী নাযিলের প্রথম স্তরে সূরা আলাক্বে হিতকর ইলমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় স্তরে সূরা মুদ্দাছছিরে হিতকর আমলের মৌলিক বিষয়গুলো তথা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা আলাক্বের আয়াতগুলোতে হেরা গুহায় নাযিলকৃত যে অহীর কথা বলা হয়েছে তা ছিল ইলম নামক গুণের প্রকাশক্ষেত্র। যা ছিল অহীর প্রথম স্তর। প্রাথমিক পর্যায়ে অহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ ও মনে খুব বেশি চাপ পড়ত। তখনও তিনি অহী গ্রহণে ভালভাবে অভ্যস্ত হননি। তাই প্রথম দিকে ঘন ঘন অহী নাযিল হত না। প্রতি বার অহী আসার পর কিছুদিন বন্ধ থাকত। এভাবে কয়েকবার বিরতি দিয়ে যখন তিনি অহী গ্রহণের অভ্যস্ত হন, তখন তা ঘন ঘন নাযিল হতে থাকে। দ্বিতীয় স্তরে হিতকর আমলের মৌলিক বিবরণ তথা দাওয়াত ও তাবলীগের প্রকাশ করে সূরা মুদ্দাছছিরের উপরোক্ত আয়াত ক'টি নাযিল হয়। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছের মানুষদের মাঝে ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। নিজের স্ত্রী, কন্যা, পালকপুত্র, বন্ধু আবুবকর, বালক আলী (রা.) কে দ্বীনের দাওয়াত দেন।

এরপর ছয়মাস পর তৃতীয় পর্যায়ে পুনরায় অহী নাযিল হয় সূরা দ্বোহার পাঁচ আয়াত নিয়ে। এখানে বলা হয়েছে, শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং রাতের যখন তা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (হে নবী) আপনার রব আপনাকে ত্যাগ করেননি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়ে উত্তম। আর শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা আদ্ব দ্বোহা ঃ ১-৫)। প্রথম অহী নাযিলের পর কিছু কালের জন্য অহী নাযিল হওয়ার ধারা বন্ধ ছিল। অহী প্রেরণ বন্ধ থাকার এ সময়সীমা অধিকাংশের মতে ছয় মাসের মত ছিল। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে চিন্তা ঢুকলো যে, না জানি আমার এমন কোন ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে, যার কারণে রব আমার উপর নারাজ হয়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন। তখন উল্লিখিত সূরা দ্বো-হা ও সূরা ইনশিরাহ নাযিল করে আল্লাহ তাঁর হাবীবকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। মূলতঃ এটা ছিল অহী নাযিলের তৃতীয় স্তর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে যে, আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অহী বন্ধ করা হয়নি। এখানে দিনের ও রাতের কসম খেয়ে আল্লাহ একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, দিনের আলোতে পরিশ্রম করার পর বিশ্রামের জন্য রাতের অন্ধকার যেমন দরকার; তেমনি অহী আসার কারণে আপনার উপর যে কঠিন

www.nagorikpathagar.org

দায়িত্ব এসে পড়ে, যার ফলে আপনি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যান। মাঝে মাঝে আপনার একটু বিশ্রামের দরকার। অহী, দিনের আলোর মতই আপনাকে কাজে ব্যস্ত রাখে। আর রাতের মত বিশ্রাম নেয়ার উদ্দেশ্যে অহী বন্ধ রাখা হয়। কাজেই অহী বন্ধ রাখাটাও একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। এরপর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে (পরিবার এবং অতি আপনজনের মাঝে) ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালতের বিষয়ে অহী নাযিল হতে থাকে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরে অহী নাযিলের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। পুরো ব্যাপারটিই ছিল রহস্যময়, বিস্ময়কর, মহাসত্য এবং অতিমানবীয়। সকল নবীদের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। তবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে অহী নাযিলের ঘটনা ঘটেছে অহরহ, ব্যাপকভাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে। সবকিছুই মহান প্রতিপালকের ইচ্ছা। তিনিই জানেন এর প্রকৃত অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাপকতা। তবে প্রথম পর্যায়ে যে সকল ভাগ্যবান এবং হিদায়াত প্রাপ্ত নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন; তাদের মর্যাদা বর্ণনা করার মত কোন ভাষা সৃষ্টি হয়নি। তদুপরি সেসব বুদ্ধিমান ও আলোকিত নর-নারীরা প্রথম পর্যায় থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেছেন। তাদের মর্যাদা এবং আমলে সলিহাত কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কেননা যার তাবলীগের কারণে অন্য কেউ মুসলমান হয়েছে, সে তার সমপরিমাণ আমলের বদলা নিজের আমলনামায় পেতে থাকবে। এ কারণেই আবু বকর (রা.) এর আমলনামার ওজন, সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীর আমলনামার চেয়েও অধিক। একজন সাহাবীর আমলনামার ওজন, আলেম, আবেদ, গাজী, শহীদ তথা যেকোন পীর বা অলীর চেয়েও ওজনদার। আল্লাহপাক সকল উম্মতে মুহাম্মদীকে দাওয়াত ও তাবলীগের মহত্ত্ব বুঝার তৌফিক দিন।

উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কৃতিত্বের অধিকারী তিনি। আল্লামা ছালাবী, আল্লামা ইবনে আব্দুল বারী, আল্লামা সুহাইলী প্রমুখ আলেমগণ এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছির লিখেছেন যে, উম্মতের সর্বসম্মত ঐক্যমতে নারী পুরুষের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে অনেক আগেই

www.nagorikpathagar.org

খাদীজার (রা.) বিয়ে হয়েছিল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ২৫ বছর ছিল এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনা মোতাবেক সেসময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চার কন্যা হযরত জয়নাব (রা.), ফাতেমা (রা.), রুকাইয়্যা (রা.) এবং উম্মে কুলসুম (রা.); মা খাদীজার (রা.) সংগে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণে প্রথম স্থান দখলকারী পুরুষ। পুরুষের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান, তাতে কারো কোন দ্বিমত নেই। বয়সে তিনি (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দু'বছরের ছোট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বহু আগেও মহানবীর (সা.) নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১২ বছর বয়সে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালিবের সংগে সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন (বুহাইরা নামক পাদ্রীর যুগে), তখন আবু বকর সিদ্দীকও (রা.) সে সফরে সংগী ছিলেন। পাদ্রী বুহাইরা, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। তখন থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভক্ত ছিলেন। তবে সেটাকে ইসলাম বলা যাবে না। ভক্তি বা বিশ্বাস বলা যাবে। কারণ সেটা ছিল নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা। অথচ নবুওয়াতের উপর বা নবীর স্বীকৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপনকে ইসলাম বলে। বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ভোরে নবুওয়াত লাভ করেন এবং সে দিন বিকালেই হযরত আবু বকর (রা.) এর গৃহে ইসলাম পৌঁছে যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপকভাবে অথচ গোপনে নিকটজন, পরিবার ও অন্তরঙ্গ আপনজন বা সঙ্গীদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। গোপনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। খুব দরদ দিয়ে দাওয়াতের প্রচার করতেন। দিনরাত দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আমার কাজ কি? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, আমার যে কাজ, তোমারও সে কাজের অনুসরণ করা অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ করা। আবু বকর (রা.) মক্কার সম্মানী লোক ছিলেন। তিনি দাওয়াতের সময় রাহবারীর দায়িত্ব পালন করতেন। আর প্রিয়নবী ছিলেন

www.nagorikpathagar.org

ক্ষুদ্র জামাতের মুতাকাল্লিম। প্রথম অবস্থায় এভাবেই দু'জনের জামাত মক্কার বাড়ি বাড়ি, ঘরে ঘরে, দাওয়াতের কাজ করত।

হযরত আলী (রা.), হযরত আবু বকরের (রা.) পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর এক বর্ণনা মতে হযরত আবু বকরের আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম বক্তব্য প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধও বটে। এর সমর্থনে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং হযরত আলী (রা.) এর পরদিন মঙ্গলবার ইসলাম গ্রহণ করেন। এদিকে খাইসামা প্রমুখ হযরত আলীর (রা.) উক্তি বর্ণনা করেছেন। আলী (রা.) বলেন, আবু বকর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে এগিয়ে গেছেন। তাছাড়া হযরত আলী (রা.) তখন নাবালক বাচ্চা ছিলেন। ৮ বা ১০ বছর ছিল তার বয়স। ১০ বছরের কথা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। কেননা সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনায় রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের ত্রিশ বছর পরে তার জন্ম হয়েছে। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ও পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। আলী ইবনে আবু তালিবের (রা.) পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর ইসলামের দিকে অগ্রবর্তী অনেক সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন যেমন হযরত ওসমান (রা.), যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.), হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) ইসলামী ভ্রাতৃত্বে প্রবেশ করেন। উপরোক্ত পাঁচজন মহান ব্যক্তিবর্গ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই তাঁদেরকে দরবারে নববীতে নিয়ে আসেন। আবু বকরের (রা.) দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াযিযন হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াযিযন হওয়ার গৌরবের অধিকারী। তাঁর মাতা হামামাহও মুসলমান হয়েছিলেন। সে হিসেবে তাকে বিলাল ইবনে হামামাহও বলা হয়। হযরত বিলাল (রা.) এক মুশরিকের গোলাম ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে নয় উকিয়া খাদ্যের বিনিময়ে খরিদ করে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁকে (রা.) মাওলায়ে আবু বকর বলা হত। এরপর আমির ইবনে ফুহাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিও ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর আযাদকৃত গোলাম।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের শুরুতেই হযরত আবু যর গিফারী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম জুনদুব ইবনে জানাদাহ। ইসলামে প্রবেশে তাঁর স্থান হচ্ছে চতুর্থ বা পঞ্চম। তাঁর পূর্বেই (কয়েকদিন আগে) তাঁর বড় ভাই উনাইস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর উভয় ভাই নিজ গোত্র বনী গিফারে ফিরে যান। সে গোত্রের লোকেরা হারামাইন শরীফাইনের মধ্যবর্তী স্থলে বসবাস করতেন। এরপর বিশ্বনবীর (সা.) সান্নিধ্যে মদীনায় আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। উমাইয়্যাহ ইবনে খালফ এর এক গোলাম আবু ফকীহা প্রথমদিকেই মুসলমান হন। হযরত বিলাল (রা.) সহ এ দু'জন একই দিনে মুসলমান হন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা.) ইসলামের প্রারম্ভে শান্তির ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াসির (রা.), পিতা ইয়াসির বিন আমির (রা.), মাতা সুমাইয়া বিনতে সালাম (রা.) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আম্মার এবং হযরত সোহাইব (রা.) একইদিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা এবং তাঁর ভাই কিছুদিন পরে মুসলমান হন। হযরত সোহাইব ইবনে সিনান রুমী (রা.) প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এক বর্ণনা মতে হযরত সোহাইব (রা.) ত্রিশ পয়ত্রিশ ব্যক্তির পরে এমন সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারে আরকামে অবস্থান করছিলেন। তবে এ উক্তিটি দুর্বল।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরত তামিমী (রা.) শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে ৬ষ্ঠ। হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর (রা.) আলকুরশী, যা কুরাইশ বংশের একটি শাখা বনী আব্দুদ দার এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আদয়ামা ইবনে রবিআ (রা.), আরকাম ইবনে আবু আরকাম (রা.) এ দু'জন ছিলেন কুরাইশের একটি শাখা, বনু মাখজুমের অন্তর্ভুক্ত। ওসমান ইবনে মাজউন (রা.) এবং তার দু'ভাই ক্বাদামা ইবনে মাজউন (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাজউন (রা.) প্রারম্ভেই ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে উল্লিখিত চারজনই আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের প্রথম বছরেই আবু ওবায়দা ইবনে আমির (রা.), ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাতারাহ আলকুরশী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কণ্ঠে আমীনুল উম্মত খেতাবে ভূষিত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাত ভাই আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ আলকুরশী আলমাখজামী (রা.) নবুওয়াতের প্রথম বছরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মায়ের

www.nagorikpathagar.org

নাম বাতারা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। ইসলাম গ্রহণের হিসেবে তার স্থান একাদশ। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর ভাই প্রথম বছরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনুল আছির উসদুল গাবা গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি দশজন পুরুষের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ওবায়দা ইবনে হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে মানাফ আলকুরশী আল মুত্তালিবী (রা.) নবুওয়াতের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.) নবুওয়াতের প্রথম বছরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবার অন্তর্ভুক্ত। খুনাইস ইবনে হুজাফা আসসাহমী (রা.) প্রথম বছরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন নবুওয়াতের পঞ্চম সনে হযরত জাফরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে। সায়ীদ ইবনে আবুল আস এর আযাদকৃত গোলাম মুয়াইনকীব ইবনে আবু ফাতেমা (রা.) প্রথম বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। এবছর ইবনে নাওফল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উজ্জা ইবনে কুসাই ইবনে কেলাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ওয়ারাকা তখনই ঈমান আনেন যখন মা খাদীজা (রা.) মহানবীকে ওহী নাযিলের পর তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার নিকট কিভাবে ওহী আসে? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওহী নাযিলের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং ওয়ারাকা তা সমর্থন করেন। শরহে মাওয়াহিবে জুরকানী লিখেছেন যে, ওয়ারাকা (রা.) সুনিশ্চিতভাবেই মুসলমান ছিলেন। প্রখ্যাত সাহাবী আরকাম ইবনে আরকাম আল কুরশী আল মাখজুমী (রা.) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। জুরকানী লিখেছেন তার ইসলাম গ্রহণ সাত বা দশ জনের পরেই ছিল।

এ বছর খালিদ ইবনে সায়দ ইবনুল আস ইবনে উমাইয়া আল কুরশী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে আছির উসদুল গাবায় এবং জুরকানী শরহে মাওয়াহিবে লিখেন ইসলাম গ্রহণের ধারাবাহিকতায় তার স্থান চতুর্থ অথবা পঞ্চম ছিল। ইসলাম গ্রহণ করায় তার পিতা তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। এমনকি তার খানা-পানি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজেই আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরতের সময় অপরাপর অন্যান্য হিজরতকারী সংগীদের সংগে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। খায়বার বিজয়ের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও খায়বারে

www.nagorikpathagar.org

অবস্থান করছিলেন; এমনি সময় তিনি সাথী সংগীদের নিয়ে নৌকা যোগে আবিসিনিয়া থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হন। পরবর্তীতে তিনি ওমরাতুল কাযা, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুক ইত্যাদি অভিযানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগী ছিলেন। তাঁর কন্যা উম্মে খালিদ বিনতে খালত ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস (রা.) এর জন্ম হয় আবিসিনিয়াতে। তার নাম ছিল উম্মা। তিনিই সেই কন্যা; যার বিবরণ বুখারীতে রয়েছে যে, তিনি যখন নিজ পিতার সংগে হাবশা (আবিসিনিয়া) থেকে ফিরে আসেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুসুম রং এর জামা পরিয়ে ছিলেন। এ মেয়ে ঐ রং এর কাপড় পরে আনন্দিত হয়ে উঠে। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ার ভাষায় ইরশাদ করেন, "উম্মে খালিদ পোশাকটি খুবই সুন্দর না? খুবই সুন্দর"। উতবা ইবনে গাজওয়ান মাজনী (রা.) এ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। হযরত মিক্বদাদ ইবনে আমর আল কান্দী (রা.) প্রথম বছরেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রথম দিকেই হযরত ওমর (রা.) এর বোন হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত খাদীজা (রা.) এবং তাঁর কন্যাদের পর তিনি হলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যিনি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ সাবালগ মহিলাদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় মহিলা, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ভাই হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষে বোনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত (রা.) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের (রা.) আম্মা ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধাত্রী হযরত উম্মে আয়মন (রা.) নবুওয়াতের প্রথম বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল বারাকাহ। তিনি হচ্ছেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদের (রা.) মাতা। হযরত আব্বাস (রা.) ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের (রা.) স্ত্রী উম্মুল ফযল (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল লুবাবা। কেউ কেউ বলেন, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর দীর্ঘদিন পরে নবুওয়াতের দ্বিতীয় কিংবা সপ্তম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে হযরত খাদীজার (রা.) পরে দ্বিতীয় মহিলা হলেন উম্মুল ফযল (রা.), যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এ গৌরবের অধিকারী হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাবই (রা.) ছিলেন। বরং উম্মে ফযলের (রা.) আগে ফাতেমা

www.nagorikpathagar.org

(রা.) ছাড়াও হযরতের আম্মারের (রা.) মাতা সুমাইয়া (রা.) এবং উম্মে আইমনও (রা.) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন সাত বৎসরের মেয়ে। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়িশার (রা.) চেয়ে দশ বছরের বড়। এর আগে আঠার জন পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) মাতা উম্মে আবদ বিনতে আবদ (রা.) প্রথম বছরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের শুরুতেই আসমানের সংবাদ অবগত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানদের উপর সর্বদিক থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বর্ষিত হতে থাকে। এর আগে তারা আসমানী বার্তা শুনে শুনে গণকের কাছে পৌছে দিত। আল্লামা কাজরুনী তাঁর সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন যে, শয়তানদের উপর তারকা নিক্ষেপের ঘটনা নবুওয়াতের বিশ দিন পর থেকে শুরু হয়।

সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত যা জিব্রাঈল (আ.) ওহীর সূচনায় হেরা গুহায় নিয়ে এসেছিলেন, অবতরণের পর জিব্রাঈল (আ.) হেরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন। একস্থানে পায়ের গুড়ালী দিয়ে আঘাত করেন। ফলে সেখান থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে থাকে। ওযু এবং নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে হযরত জিব্রাঈল (আ.) সেখানে ওযু করেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মনযোগসহকারে তা প্রত্যক্ষ করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মাত্র দু'বেলা নামাযের নির্দেশ প্রদান করা হয়। দু'রাকাত ফজর এবং দু'রাকাত আসরের নামায মি'রাজের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। নামাযের এ বিধানই চলে আসছিল। নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে মি'রাজের সময় পাঁচ বেলা নামাযের যথারীতি বিধান দেয়া হয়।

ওহী নাযিলের প্রথম দিনে জিব্রাঈল (আ.) মানুষের রূপ ধরে হাজির হয়েছিলেন। এতে হয়ত ধারণা করা যেত যে, সম্ভবতঃ তিনি কোন মানব অথবা জীন হতে পারেন। এ সংশয়টি দূর করার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন জিব্রাঈল (আ.) তাঁর আসল ফিরিশতার রূপ ধারণ করে হাজির হন। একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হেরা পর্বত এবং মক্কা শরীফের মধ্যবর্তী কোন একস্থানে উপস্থিত ছিলেন তখন জিব্রাঈল (আ.) তার প্রকৃত রূপ ধারণ করে হাজির হলেন। এ সময় তিনি মহাশূন্যে

www.nagorikpathagar.org

চেয়ারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর সমস্ত শরীর মোবারক থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ঘরে ফিরে আসেন এবং হযরত খাদীজা (রা.) কে বলেন, 'আমাকে কম্বলে জড়িয়ে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর।' আর এক বর্ণনায় আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে চাদরে জড়িয়ে দাও, চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও।' কাপড় জড়িয়ে তিনি শুয়ে পড়েন। এরপর ভীতি দূর হয়ে গেলে প্রশান্তি লাভ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হযরত খাদীজার জীবন উৎসর্গের সুফল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল যে, হেরা গুহায় খাদীজার প্রতি মহান আল্লাহর সালাম নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আগমন করেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বলেন, 'হে রাসূল! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে সালামের সাথে সাথে আমার সালামও খাদীজাকে পৌঁছে দিবেন।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ এবং ফিরিশতাকুলের সর্দার হযরত জিব্রাঈলের (আ.) সালাম খাদীজা (রা.) এর দরবারে পেশ করেন। খাদীজা (রা.) সালামের জবাব দেন। উক্ত জবাবের মাধ্যমে তার তীক্ষ্মবুদ্ধি এবং প্রাঞ্জল ভাষার সৌন্দর্য ফুটে উঠে। 'আল্লাহ নিজেই সালামের অধিকারী। শান্তি, নিরাপত্তা ও সালাম তাঁরই পক্ষে থেকে আসে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম। জিব্রাঈলের প্রতি সালাম এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপরেও সালাম, যে তা শুনবে। কিন্তু শয়তানের উপর না।

<u>নবুওয়াতের ২য় বছর (৬১১ খ্রীষ্টাব্দ)</u> ঃ নবুওয়াতের ২য় বছরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর জন্ম হয়। উহুদের যুদ্ধের বছর তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ। বয়স কম হওয়ার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেননি। নবুওয়াতের ২য় বছরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। আল ইসাবা গ্রন্থে হাফিয এ উক্তিকে খুবই সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। আল মাওয়াহেবে লাদুনিয়ার রচয়িতা একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে সীরাত গ্রন্থের অধিকাংশ লেখকদের মতে তিনি নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন মুহাম্মদ (সা.) সাফা পর্বতের গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আবু জেহেল সেখানে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজ করে এবং একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারে। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা ফেঁটে দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রতিবাদ না করে রক্তমাখা মুখ নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। এক ক্রীতদাসী ঘটনাটি রাসূলের চাচা হামযার কাছে বলে দেন। হামযা শিকার থেকে বাড়িতে ফিরেছিলেন মাত্র। তিনি সিংহের মত গর্জে উঠেন। কা'বার কাছে গিয়ে ধনুক দিয়ে আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করেন। আবু জেহেল বলে, আমি ধর্মের জন্য এ কাজ করেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় আঘাত করেছি। হামযা তখন চিৎকার করে কলেমা তৈয়বা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান এবং বলেন, তবে শুনে রাখ আমিও মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলাম। হযরত হামযার (রা.) মত বীর সাহসী কুরাইশ নেতার ইসলাম গ্রহণে মুসলমানরা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। নবুওয়াতের ২য়, মতান্তরে ৩য় সনে হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এর বিয়ে হযরত ওসমান (রা.) এর সংগে অনুষ্ঠিত হয়। তবে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া এবং সীরাতে শামীরায় এসেছে, যখন 'তাব্বাত ইয়াদা' সূরা নাযিল হয়, তার পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বংশের লোকদের ডেকেছিলেন। তাদের মধ্যে আবু লাহাবও ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে আবু লাহাব প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। আবু লাহাবের দু'ছেলে উতবা এবং উতাইবার সংগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'কন্যার বিয়ে সাব্যস্ত হয়েছিল। হযরত রুকাইয়্যার সংগে উতবার এবং হযরত উম্মে কুলসুমের সংগে উতাইবার বিয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তখন পর্যন্ত ঘর সংসার শুরু হয়নি। উক্ত ঘটনার পর আবু লাহাব তার দু'সন্তানকে নির্দেশ দেয়, তারা যেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে দেয়। তালাক ঘটে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে হযরত রুকাইয়্যার বিয়ে হযরত ওসমানের (সা.) সংগে অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর ওহীর মহান সংকলক (কাতিবে ওহী) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) এর জন্ম হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তাইয়্যিবায় যখন শুভাগমন করেন তখন তিনি ছিলেন এগার বছরের বালক। তার পিতা যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় বয়স কম থাকার কারণে মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেননি। তবে তিনি উহুদের যুদ্ধে এবং

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বর্ণিত হয়েছে আল কুরআনে। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামীদল এবং যারা নিষ্ঠাবান, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা তওবা-১০০)। নবুওয়াতের প্রথম দিকেই সূরা ফাতিহা পুরোটাই নাযিল হয়েছিল এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় এ সূরাটি পড়তেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খাদীজা (রা.) এর সাথে জামাতে রাতের অন্ধকারে নামাযে এ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন। বালক আলী (রা.) (বয়স ১০ কিংবা ১১ বছর) আড়াল থেকে এ দৃশ্য দেখতেন- আর ভাবতেন এরা কার ইবাদত করে? এরপর হযরত আলীও (রা.) তাদের সাথে জামাতে যোগ দিতে লাগলেন।

<u>নবুওয়াতের ৩য় বছর (৬১২ খ্রীষ্টাব্দ)</u> ঃ নবুওয়াতের ৩য় বছরে, মতান্তরে চতুর্থ বছরে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ আসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে বয়ান করুন। আপনি মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বছর মতান্তরে চতুর্থ বছর নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং এ ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'আপনি নিকট আত্মীয়-স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করুন।' উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর উঠে কুরাইশ গোত্রদের আহ্বান জানালেন। হে বনী ফেহের! হে বনী লোয়াই! হে বনী কাব! হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! সবাইকে ডেকে কলেমা তৈয়ব্যের পয়গাম শুনালেন। অতঃপর নিজ চাচা আব্বাসকে এবং কন্যা ফাতেমাকে ডেকে তাওহীদ ও কলেমার কথাই বলেন। এর জবাবে আবু লাহাব বলে, 'তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদের ডেকেছো?' এর জবাবে পবিত্র কুরআনে তাব্বাত ইয়াদা সূরা (সূরা লাহাব) নাযিল হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব যখন জানলেন যে তার সন্তান আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি পুত্রকে নিতে আসলেন। বালক পুত্র আলী (রা.) বলেন, আব্বা আমি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। এখন আর ফিরতে পারব না। আবু তালিব ছেলের কথায় দৃঢ়তার আভাস পেয়ে জবাব দেন, আমি জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে বিপথে পরিচালিত করবেন না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচাকে বলেন, চাচা আপনিও এ সত্যধর্ম গ্রহণ করুন। আবু তালিব কোমল কণ্ঠে বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি জানি তুমি মিথ্যাবাদী নও। তবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমাকে কুরাইশদের অত্যাচার হতে রক্ষা করব। কি বিচিত্র চরিত্র এ লোকটির? ইতিহাসে রয়েছে মৃত্যুর সময় আবু তালিব বলেছেন, লোকে বলবে আবু তালিব মৃত্যুর ভয়ে পিতার ধর্ম ছেড়েছে। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করছি না। আল্লাহ বলেন, হে নবী আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে সঠিক পথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে চান, তাকে সঠিক পথে আনেন। দাওয়াত ও তাবলীগ বান্দার কাজ। হিদায়াত আল্লাহর হাতে। দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বিতীয় ধাপে আল্লাহপাক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন, হে নবী, আপনার আত্মীয়-স্বজনদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন। নবুওয়াতের পথম তিনবছর গোপনেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চলেছে। নিকটাত্মীয়-স্বজন ও কাছের লোকেরা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে। খাদীজা, তার কন্যারা, আলী, আবু বকর, যায়েদ, ওসমান, ওমরের বোন ফাতিমা ও তার স্বামী (রা.) প্রমুখরা গোপনে মুসলমান হয়েছেন। এরপরই প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ আসে নবুওয়াতের ৪র্থ বছরে।

নবুওয়াতের ৪র্থ বছর (৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের ৪র্থ বছরে মতান্তরে নবুওয়াতের তৃতীয় বছর খাদীজা (রা.)-এর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের ইন্তিকাল হয় এবং মক্কায় তাকে দাফন করা হয়। ওয়ারাকা অন্ধ ও নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি মুসলমান ছিলেন। নবুওয়াতের ৪র্থ বছর হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। এ বছর থেকে মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে প্রকাশ্যে শত্রুতা ও বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রকার নির্যাতনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হতে থাকে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে আবু তালিবের ব্যাপক সমর্থন ছিল। মক্কার কাফিরদের একটি প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে, আপনার ভাতিজা আমাদের ধর্মকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আমাদের ধর্মের সমালোচনা করেন। তিনি লোকজনকে আমাদের দেবতাদের পূজা করতে নিষেধ করেন। আপনি তাকে এ ব্যাপারে বিরত থাকতে বলুন। তাকে বলে দিন, যেন তিনি আমাদের ধর্মের সমর্থনে কথা বলেন। তিনি

www.nagorikpathagar.org

যদি আপনার কথা না মানেন, তবে আপনি তাকে সহায়তা বন্ধ করে দিন। এ কথা শুনে আবু তালিব বলেন, 'আমি তাকে বাঁধা দিতে পারব না এবং তার সহায়তাও বন্ধ করব না।' এ ধরনের জবাব শুনে মক্কার কাফিরগণ পোড়া মুখ নিয়ে ফিরে যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি চাচা আবু তালিবের এমন একচ্ছত্র সমর্থন সত্যি বিস্ময়কর। অথচ তার ইসলাম গ্রহণ নসীব হয়নি। হিদায়াত পুরোপুরি আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান, যেভাবে চান, যখন চান- তাই হয়। হিদায়াতের জন্য আমাদের কান্নাকাটি করা চাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, তার ভাগ্যেই হিদায়াত নসীব হয়।

এ বছর থেকেই (মতান্তরে নবুওয়াতের ৩য় বছর) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মাঝে ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। মক্কার হাঁটে, মাঠে, ঘাটে, মহল্লায়, অলি, গলিতে, ঘরে-ঘরে দাওয়াত ও তাবলীগ করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা (রা.)। তাঁদের পুরো দিন রাতের কর্মই ছিল দ্বীনের প্রচার ও প্রসার। মক্কার কাফির, মুশরিকরা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) ব্যাপকভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উত্ত্যক্ত করত। হাসি-তামাশা করে অপমান করত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কেউ যেন শুনতে না পারে এজন্য শোরগোল, চিৎকার, চেঁচামেচি ও গান বাজনা করত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিচল থেকে দাওয়াত দিতেন। নবুওয়াতের ৫ম বছর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন, আপনি মক্কা ও আশপাশের লোকদের সতর্ক করুন। এরই প্রেক্ষিতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে মক্কায় সীমাবদ্ধ না রেখে মক্কার আশে পাশে ব্যাপক করে দেন। পরবর্তীতে তায়েফ, হুনাইন, ইয়াসরিব তথা মদীনা পর্যন্ত দাওয়াতের কাজকে বিস্তার করেন। এমনকি আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান বাদশার কাছেও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছান।

নবুওয়াতের ৫ম বছর (৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের ৫ম বছরে হযরত আলী (রা.)-এর বড় ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে এবং একত্রিশ জনের পরে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। মুসলমানগণ মক্কার কাফিরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার

www.nagorikpathagar.org

(আবিসিনিয়ার বা ইথিওপিয়ার) দিকে হিজরত করতে বাধ্য হন। প্রথম হিজরতের বা জামাতের মধ্যে বারজন পুরুষ এবং পাঁচজন মহিলা ছিলেন। সর্বপ্রথম হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) তার স্বীয় স্ত্রী, নবী কন্যা হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংগে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাই তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে হিজরতকারী। মুহাজিরীনে আউয়ালিন (প্রথম স্তরের মুহাজের) এর এ কাফেলায় ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), মুসআব ইবনে আওয়াম (রা.), আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ আল মাখজামী (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) প্রমুখ। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) মুসলমানদের প্রথম হিজরতকারী জামাতের আমীর ছিলেন।

এ বছর রমযানুল মুবারকে আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) প্রথম হিজরতের পরে এবং দ্বিতীয় হিজরতের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে সিজদার সূরাটি তিলাওয়াত করেন। কুরাইশদের বৈঠকে মুসলমান, কাফির, মানুষ এবং জীন সবাই উপস্থিত ছিলেন। তিলাওয়াত করে যখন সিজদার আয়াতে পৌছেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে এক সাথে মুসলমান, কাফির, মানব, দানব, জীন সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তবে কুরাইশের এক বৃদ্ধ, উমাইয়া ইবনে খালফ অহংকারবশতঃ সিজদা করেনি। সে বরং এক মুষ্টি কঙ্কর পাথর হাতে নিয়ে ললাটে লাগিয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।' বিস্ময়করভাবে একমাত্র উমাইয়া ইবনে খালফ ছাড়া যত মুশরিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সিজদা করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে ইসলামের নিয়ামতে ধন্য করেন। ফলে উমাইয়া ইবনে খালফের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হয়নি। বাকী সবাই পর্যায়ক্রমে মুসলমান হয়েছিলেন।

এ বছরের গোঁড়ার দিকে অথবা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের শুরুতে হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের ঘটনা ঘটে। এ জামাতে মুহাজিরদের কাফেলায় তিরাশিজন পুরুষ এবং এগারজন কুরাইশ মহিলা এবং সাতজন বিদেশী মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ এ সংখ্যা আরো অধিক বলেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হলেন ঃ জাফর ইবনে আবুতালিব (রা.), তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে ওমাইস (রা.), খুনাইস ইবনে হুজাদা আস সাহমী (রা.), মাসয়াব ইবনে ওমায়র (রা.), মোয়াইকিব ইবনে আবু ফাতিমা আদদুসী (রা.), মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল

কুন্দী (রা.), আবু ওবায়াদা ইবনুল জাতারাহ (রা.), খালিদ ইবনে হেজাম ইবনে খুওয়াইলীদ (রা.), (তিনি হেকম ইবনে হেজামের ভাই এবং হযরত খাদীজার ভাতিজা), উম্মুল মুমেনীন সওদা বিনতে জাময়া' (রা.) প্রমুখ। আল্লামা শামী তাঁর গ্রন্থে প্রথম হিজরত এবং দ্বিতীয় হিজরতের বিশদব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বছর হযরত বিলাল, খাব্বাব ও আম্মারের (রা.) উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয়। বিলাল (রা.)-কে মরুর তপ্ত বালুতে টানা হেঁচড়া করত তার মালিক। খাব্বাব (রা.) কে জ্বলন্ত উনুনের উপর উত্তপ্ত কয়লার মাঝে শুইয়ে রাখা হত। তার পিঠের মাংসের গলিত চর্বিতে আগুন নিভে যেত। এভাবেই গরীব ও গোলাম মুসলমানদের উপর তাদের মুশরিক ও কাফির মালিকরা নির্যাতন করত। আবু বকর (রা.) এদেরকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। এ বছর খালিদ ইবনে হেজাম ইবনে খুওয়াইলিদ (রা.) ইন্তিকাল করেন। হাবশা হিজরতের পথে তার ইন্তিকাল হয়। তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়। 'আর যে কেউ বের হবে হিজরতের উদ্দেশ্যে, নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও রাসূলের তরে, তবে তার ছাওয়াব নির্ধারিত হয়ে আছে আল্লাহর নিকট।' (সূরা নিসা-১০০)।

একদিন মক্কার মুশরিক আবু জাহল, শাইবাহ, ওতবাহ, ওলীদ ইবনে ওতবাহ, আম্মারা ইবনে ওলীদ, ওতবাহ ইবনে আবি মুয়িত, উমাইয়া ইবনে খালফসহ মুশরিকদের দল মসজিদুল হারামে বৈঠক করছিলেন। মহানবী (সা.) কা'বার ছায়ার নীচে নামায আদায় করছিলেন। মসজিদে হারামের কাছেই এক লোক উট যবাই করেছিল। ঐসব কাফিরগণ পরস্পর পরামর্শ করল। তাদের থেকে কোন এক ব্যক্তি ঐ উটের ভুঁড়ি তুলে নিয়ে সিজদারত অবস্থায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপর ফেলে দিবে। যেমন কথা তেমন কাজ। কাফিররা ঠিক সিজদারত অবস্থায় উটের পচা নাড়ি-ভুঁড়ি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উপর ফেলে দিল। হযরত ফাতেমা (রা.) তখন ছিলেন খুব ছোট। খবর শুনে দৌড়ে এসে হাজির হলেন ঘটনাস্থলে। মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে শিশু ফাতিমার ঐ কথাই বলেছিলেন, যে কথাটি ফিরাউনের বংশের জনৈক মুমিন ব্যক্তি বলেছিলেন। 'তোমরা কি একজন মানুষকে কেবল এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, সে বলেছে আমার রব আল্লাহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হতভাগাদের নাম ধরে ধরে বদ দোয়া করেন। সে দোয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয় বদরের যুদ্ধে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

www.nagorikpathagar.org

মাসউদ (রা.) বলেন, 'আমি ওদের দেখেছি বদরের যুদ্ধের দিন। তারা সবাই বদরের কূপে লাশ হয়ে পড়েছিল।'

এ বছর হযরত সুমাইয়া ইবনে খুব্বাত (রা.) ইন্তিকাল করেন। দ্বীনের জন্য প্রথম শহীদ হয়েছিলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছিরের আম্মা সুমাইয়া (রা.)। তিনি শীর্ষস্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁকে দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য স্তরে স্তরে শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর পদস্খলন ঘটেনি। একদিন অভিশপ্ত আবু জেহেল এসে, এ অবলা মহিলার লজ্জাস্থানে বর্ষার আঘাত হানে। তিনি তৎক্ষণাত শাহাদত বরণ করেন। ফলশ্রুতিতে এ সম্মানিত মহিলা ইসলামের প্রথম শহীদ হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন। মুসলমানদের উপর যে কত বড় অত্যাচার ও যুলুম করা হত, তা এ শাহাদতের ঘটনা হতেই অনুমেয়। তবুও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসীম ধৈর্যধারণ করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পোশাক ধরে টানা হেঁচড়া করা হয়েছে; তার পবিত্র মুখে বালি ও থুথু মারা হয়েছে; পাথরের আঘাতে কপাল থেকে রক্ত ঝরেছে; শত-সহস্রবার জঘন্যতম অপমান করা হয়েছে। তবুও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতে তাবলীগের পথ থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি। চরম ধৈর্য নিয়ে, যুলুম অত্যাচার সহ্য করে দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে অবিচল থেকেছেন।

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর (৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের ৫ম বা ৬ষ্ঠ বছর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘোষণা দেন, আমি আপনাকে সমস্ত বিশ্বের মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছি। এ নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন। সূরা ফুরকানের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব নাযিল করেছেন নিজের বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যেন তিনি সারা বিশ্ববাসীকে ভয় প্রদর্শন করেন (ফুরকান-১)। এ জন্যেই বিশ্বনবী বিদায় হজ্জে বলেছেন, উপস্থিত জনতার প্রত্যেকেই অনুপস্থিত জনতাকে আমার আনীত দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিবে। নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে কুরাইশ কাফিরদের নির্যাতনের কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকাম ইবনে আবুল আরকামের গৃহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি গোপনে নামায আদায় করতেন। এমন অবস্থায় একদিন বিস্ময়করভাবে হযরত ওমর (রা.)

ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ঘর থেকে বের হয়ে প্রকাশ্যে মসজিদুল হারামে গিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করেন। দার এ আরকাম হচ্ছে মক্কা আল মুকাররমার মসজিদুল হারামের পার্শ্বে সাফা পাহাড়ের সংলগ্ন একটি স্থান।

হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণ ছিল নবুওয়াতের দ্বিতীয় কিংবা পঞ্চম বছরের ঘটনা। হযরত ওমর (রা.) তখন ছিলেন ছাব্বিশ বছরের যুবক। তার আগে উনচল্লিশ জন নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ বছর হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আয়াত নাযিল হয়, 'হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর যারা ঈমানদার আপনার অনুসরণ করেছেন।' এ বছর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মোজেযা প্রকাশিত হয়। একটি গরুর বাচ্চা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়। ঘটনাটি হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের অন্যতম একটি কারণ হয়েছিল। অভিশপ্ত আবু জাহল কুরাইশদের এক সমাবেশে বক্তব্য দানকালে বলে বসে, 'হে কুরাইশবাসী! মুহাম্মদ (সা.) আমাদের ধর্মকে বাতিল বলে থাকেন। আমাদের দেবতাদেরকে কটাক্ষ করেন। যে ব্যক্তি তার মাথা কেটে নিয়ে আসবে, তাকে একশত উট এবং একশত উকিয়া রৌপ্য পুরস্কার দিব।' এক উকিয়া চল্লিশ দিরহাম। ঘোষণা শুনে হযরত ওমর (রা.) কোষ থেকে তরবারী উন্মুক্ত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবতাহ নামক স্থানে পৌঁছার পর দেখতে পেলেন কতিপয় কাফির একটি গরুর ছানাকে হাত পা বেঁধে যবাই করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর গরুর বাচ্চার ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে, হে যুরাইহের বংশ! এক ব্যক্তি অত্যন্ত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সজোরে ঘোষণা দিচ্ছেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দাওয়াত দিচ্ছেন।

এ ঘটনা দেখে হযরত ওমর (রা.) অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তার অন্তরে ইসলামের সত্যতা অনুপ্রবেশ করে। পথিমধ্যে ওমর তার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব এর ঘরে যান। তার স্বামী সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.) সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা উভয়েই সদ্য নাযিলকৃত সূরা 'তোহা' এর পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন। ওমর যখন এ আয়াতটি শুনলেন, 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে কথা বল; তবে তিনি চুপে চুপে বলা কথা এবং তার চেয়েও গোপনে বলা কথা জানতে পারেন। তিনি (আল্লাহ) এমন যে, তিনি ছাড়া

আর কোন মা'বুদ নেই। তার সুন্দর নামসমূহ রয়েছে।' (সূরা তোহা-৭)। এ আয়াত শুনে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। যেন তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে যাচ্ছিল। সংগে সংগে দরবারে রিসালাতে এসে হাজির হন। দ্বীন ইসলামের কাছে মস্তক অবনত করে দেন। ফলে মুসলমানদের মাঝে নারায়ে তকবীরের আওয়াজে আকাশ ভারী হয়ে উঠে।

হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনে খাত্তাবের মধ্যে যাকে তুমি পছন্দ কর তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।' দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং পরদিন হযরত ওমর (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে লুটিয়ে পড়েন। বিশ্বনবী বুধবারে দোয়া করেছেন আর বৃহস্পতিবারে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমান জনতার মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। ইসলামের মান মর্যাদা ব্যাপক হয়ে উঠে। ইসলাম গ্রহণ করেই সাহসী বীর হযরত ওমর (রা.) মক্কার বাজারে বেরিয়ে পড়েন। হাতে ছিল খোলা তরবারী। কালিমার শব্দে মক্কার মাটি থরথর করে কাঁপছিল। তিনি যালেম কাফিরদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন, তোমাদের যে কেউ আপন স্থান ত্যাগ করবে, আমার তরবারী তাকে এমন আঘাত হানবে যে, সে মাটির সংগে মিশে যাবে। ইসলাম গ্রহণের পর ওমর (রা.) প্রকাশ্যে কাবা ঘরে নামায পড়েন। এরপর হযরত ওমর (রা.)-এর সন্তান আব্দুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লামা আমির আল রিয়াজুল মুস্তাবাহ কিতাবে লিখেছেন, ইবনে ওমর তাঁর পিতার সংগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দারে আরকামে অবস্থান করছিলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর মাতা উম্মুল খায়র সালমা বিনতে ছখর মুসলমান হয়েছিলেন। এ বছর দারে আরকামে অবস্থানকালীন সময়ে আয়াস ইবনে বুকাইর ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে নাশিব আল কেনানী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তেমনিভাবে তার তিনজন সহোদর ভাই - আমির, আকিল এবং খালিদ ইবনে গাজওয়াহ (রা.) বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া তার তিনজন বৈপিত্রয় ভাই মুয়াওয়াজ, মায়াজ এবং আওফর (রা.) বদর যুদ্ধে কৃতিত্বের ও বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার মাতা হলেন প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী আফরা

www.nagorikpathagar.org

বিনতে ওবায়েদ ইবনে ছা'লাবা আল আনসারী। এ বছর মক্কায় কাফির ও মুনাফিকদের অত্যাচার এত বেড়ে গিয়েছিল যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দারে আকরামে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। এ সময় কাফিররা আবু বকর (রা.)-কে এমনভাবে প্রহার করেছিল যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবু বকর (রা.) এর যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তিনি নিজের কথা না ভেবে বারবার শুধু বলছিলেন, আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? তাকে রাসূলের ব্যাপারে নিশ্চিত করা হলে, তিনি শান্ত হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আবু বকরের (রা.) এটা ছিল অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। এজন্যেই মুমিনদের মাঝে আবু বকরের মর্যাদা এতবেশী।

নবুওয়াতের সপ্তম বছর (৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের সপ্তম বর্ষের পহেলা মহররম মতান্তরে অষ্টম বছর কুরাইশরা একটি অন্যায় লিখিত আদেশের মাধ্যমে বনু হাশিমের সংগে সামাজিক বয়কট করে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মহানবীর সংগে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফকে শুয়াবে আবি তালিবে (দু'পাহাড়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে) বন্দী করে রাখে। কুরাইশরা যখন দেখতে পেল যে ক্রমশঃ তাদের ধর্ম সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। পাশাপাশি হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম নতুন করে অত্যন্ত কার্যকরী উপায় ও নিজের গতি পেয়ে গেছে। এদিকে সাধারণ মুসলমানগণ আবিসিনিয়া হিজরত করে নাজ্জাশীর নিকট আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। নাজ্জাশী তাদের অতিমাত্রায় সহযোগিতা ও সদ্ব্যবহার করছেন। অপরদিকে আবু তালিব এবং তার ভ্রাতৃপ্রতীম বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আছে। এমনি অবস্থায় কুরাইশ দল পরামর্শক্রমে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সংগে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে এবং তাদেরকে শহরের বাইরে কোন গিরি সংকটে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। সে গিরি-গুহার নাম ছিল শুয়াবে আবি তালিব। এ সময় আল্লাহপাক বিশ্বনবীকে জানান, নিশ্চয় তোমাদের ভীতি, ধন, সম্পদ ও শস্যহানী দ্বারা পরীক্ষা করে দেখব। আপনি সেসব ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা বিপদে পতিত হলে বলে আমরা আল্লাহর জন্য। তার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করব। (বাকারা ঃ ১৫৫-১৫৬)। এরপর মুসলমানরা অসীম ধৈর্যধারণ করে। দাওয়াত ও তাবলীগের সফলতা আসবে ধৈর্যের মাধ্যমে। এ কথাটি পুনরায় বাস্তব বলে প্রমাণ হয়। এ

www.nagorikpathagar.org

সময় মুসলমানরা গাছের পাতা, শুকনো চামড়া, এসব অখাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করেছিল। কিন্তু মুশরিকদের অন্তর সামান্যতম নরম হয়নি।

কুরাইশের এ চুক্তি মৌখিক ছিল না। বরং তা ছিল লিপিবদ্ধ দলিল আকারে। এ চুক্তিটি কা'বা শরীফের দেয়ালে লটকিয়ে রাখা হয়েছিল। এ চুক্তির অমানুষিক ও ভয়ংকর দফাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী হাশিম ও বনী আবদে মনাফসহ শহর থেকে বিতাড়িত করতে হবে।

২. কুরাইশের কোন সদস্য তাদের সংগে কোন ধরনের আত্মীয়তা করতে পারবে না।

৩. তাদের নিকট কোন ধরনের খাদ্য পানীয় সরবরাহ করতে দেয়া হবে না।

৪. কোন ব্যক্তি তাদের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করতে পারবে না। তাদের কোন জিনিসও কেউ ক্রয় করতে পারবে না।

৫. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরাইশের হাতে হস্তান্তর করা না হবে; ততক্ষণ কোন সন্ধি বা আপোষ করা হবে না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে শুয়াবে আবি তালিবে বন্দী অবস্থায় তিন বছর থাকেন। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে ঐ চুক্তিনামাটি উইপোকা কেটে ফেলে এবং একমাত্র আল্লাহর নাম ছাড়া একটি শব্দও অবশিষ্ট ছিল না। মহানবী (সা.) ওহী মারফত এটা জেনে স্বীয় চাচা আবু তালিবকে এ বিষয়টি অবহিত করেন। আবু তালিব সেটা কুরাইশদেরকে অবগত করেন। কুরাইশরা তা বিশ্বাস করতে রাজী হল না। আবু তালিব বলেন, চুক্তিনামা খুলে দেখ। সুতরাং সেটা খোলা হল এবং দেখা গেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মত চুক্তিনামাটি একেবারে পরিষ্কার; তাতে কোন লিখা নেই। এতে কুরাইশরা খুবই লজ্জিত হল। কাফিররা চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলে। তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। এমনিভাবে তিন বছর পর অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বছরে মহানবী (সা.), তাঁর স্বজন, সাহাবী (রা.) এবং ভক্ত প্রেমিকগণ নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

<u>নবুওয়াতের ৮ম বছর (৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ)</u> ঃ কুরাইশ কর্তৃক বিশ্বনবী ও তার অনুসারীদের এ বয়কট ছিল হৃদয় বিদারক ও ভয়াবহ। বয়কটের তিন বছর শিশু-কিশোর-মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা খাদ্য ও পানির অভাবে রাতে চিৎকার করে

www.nagorikpathagar.org

কাঁদতো। পিপাসা এবং ক্ষুধার তাড়নায় বেহুশ হয়ে যেত। গাছের ছাল, পাতা, পশুর চামড়া খেয়ে দিন অতিবাহিত করত। তাদের করুণ অবস্থায় আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। দ্বীনের জন্য এত যুলুম অত্যাচার, সকল ইতিহাসকে হার মানিয়ে যায়। অথচ কাফির মুশরিকরা এসব দেখে হাসি, তামাশা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। তাদের কর্ম পশুত্বকেও হার মানিয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা এর মাঝেও দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন। তা'লীম, গাশত, দাওয়াত, ইবাদত চলতে থাকে যথারীতি। সময়টা ছিল ইসলামের জন্য সংকটাপন্ন ও দুর্বিসহ।

মক্কার কাফিরদের নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, পারস্যের কাফিরগণ অর্থাৎ নওশের এর সন্তান বা রোমানদের উপর বিজয়ী হয়ে গেছে। সংবাদ শুনে মক্কার কাফিররা খুবই আনন্দিত হয়ে উঠে। তারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, রোমনরাও তোমাদের মত আহলে কিতাব। অপর পারস্যবাসী আমাদের মত কিতাব ছাড়া। আমাদের ভাইয়েরা সে দেশে যেভাবে রোমান ভাইদের উপর বিজয়ী হয়েছে, তেমনিভাবে আমরাও তোমাদের উপর বিজয়ী হব। এতে মুসলমানগণ মর্মাহত ও ব্যথিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়। এ সূরার মর্মকথা হল, আগামী দশ বছরের মধ্যে রোমানরা পুনরায় পারস্যের উপর আক্রমণ করবে এবং তারা পারস্যের উপর বিজয়ী হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মক্কার কাফিরদের ঐ আয়াতটি পড়ে শুনান। তখন কাফিরগণ সেটা বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। উবাই ইবনে খালফ, হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) উপর এ শর্ত আরোপ করে যে, তোমাদের দাবী অনুযায়ী যদি নয় বছরের মধ্যে রোম পারস্যের উপর বিজয়ী হতে পারে, তবে আমি তোমাকে একশত উট পুরস্কার দিব। অন্যথায় তোমার নিকট থেকে একশত উট আদায় করে ছাড়ব। উভয়পক্ষ থেকে এ চুক্তির জামিন নির্ধারিত হয়। অতঃপর মুসলমানগণ যেদিন বদর যুদ্ধে জয়লাভ করেন; ঠিক সেদিন সংবাদ এসে পৌঁছে যে, রোম পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এ কথা শুনে মুসলমানদের অন্তরে আনন্দের জোয়ার দেখা দেয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, 'আর সেদিন খুশি হবে মুসলমানগণ।' হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উবাই ইবনে খালফের জামিনের নিকট থেকে একশত উট আদায় করে নেন।

নবুওয়াতের ৮ম বছর আওস এবং খাজরায কাবিলার মধ্যে 'বুয়াস' নামক যুদ্ধ

সংঘটিত হয়। একই বছর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোজেযা ঘটে। মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দাবী জানায় যে, 'আপনি এমন কোন ঘটনা দেখান; যা আকাশের মধ্যে ঘটবে।' তাই মহানবী (সা.) পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার অবিস্মরণীয় অলৌকিক ঘটনা দেখান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত আংগুল দ্বারা চাঁদের প্রতি ইংগিত করেন এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এক টুকরা হেরা পর্বতের ডান দিকে এবং অপর টুকরা বাম দিকে পৃথিবীর নিকটে ঝুঁকে পড়ে। হেরা পর্বত উভয়ের মধ্যখানে সুস্পষ্টভাবে চমকে উঠে। তা দর্শনে কাফিরগণ বলে উঠে, এটা (এক শক্ত) প্রকাশ্য যাদু। তারা তা অবিশ্বাস করে এবং ইসলাম গ্রহণ না করে নিজেদের মনের খায়েশ অনুসারে চলতে থাকে। (সূরা ক্বমার)। বর্ণিত আছে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ভারতবর্ষের এক হিন্দু রাজা দর্শন করেছিলেন এবং তিনি রাজ্য ছেড়ে দেশান্তরি হয়ে মক্কায় গিয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। অথচ যাদের জন্য এ মোজেযা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের ভাগ্যে হিদায়াত নসীব হয়নি। অথচ হিদায়াত নসীব হয়েছিল দূর দেশের এক মুশরিক রাজার। হিদায়াত আল্লাহর কাছে।

নবুওয়াতের নবম বছর (৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের নবম বছরে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ জোরদার হয়। মুসলমানদের উপর অত্যাচারও বহুগুণে বেড়ে যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার আশেপাশে বেশী বেশী দাওয়াতের কাজ করেন। বিশ্বনবীর সাহাবীরাও শত বাঁধা ও অত্যাচারের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন। দরিদ্র দাস-দাসীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। তবে ধনী, বংশীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে থেকে যান। তাদের অহংকার এবং লোকে কি বলবে, এ মনোভাবের কারণে হিদায়াত নসীব হয়নি। অনেক মুশরিক ও কাফির স্পষ্টই অনুধাবন করেছিল যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য রাসূল এবং ইসলাম সর্বশেষ ও খাঁটি ধর্ম। কিন্তু নিজেদের মিথ্যা অহংকারে তারা হিদায়াত থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়।

নবুওয়াতের দশম বছর (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের দশম বছরে কুরাইশদের নির্যাতনমূলক চুক্তিনামা বাতিল হয়। বনু হাশিম শোয়াবে আবু তালিবের (রা.) বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসেন। তখনও আবু তালিব জীবিত ছিলেন। এ বছর ৭ই রমযান অথবা ১৫ই শাওয়াল, মতান্তরে প্রথম

যিলক্বদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। আল্লামা শামী লিখেছেন, আবু তালিব হিজরতের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ শোয়াবের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে আসার বিশ দিন পরে মৃত্যুবরণ করেন। তখন আবু তালিবের বয়স ছিল আশি বছরের উর্ধ্বে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চাচা আবু তালিবের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে প্রস্তুত হন, তখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয় অর্থাৎ 'নবীর জন্য এবং অন্যান্য মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তারা যদিও আত্মীয় হন না কেন; এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবার পর যে তারা জাহান্নামী।' (সূরা তাওবা-১১৩)। তাছাড়া বুখারী শরীফে আছে, এ আয়াতটিও আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ 'আপনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারবেন না। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত করেন এবং যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে তাদের কথাও তিনি জানেন।' (সূরা আল কসাস-৫৬)

এ বছরই মুসলিম জননী হযরত খাদীজা (রা.) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন। হজুন নামক স্থানে জান্নাতুল মোয়াল্লার শেষ প্রান্তে তাকে দাফন করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকে কবরে রাখেন। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামাযের জানাযা পড়েননি; কারণ তখনও জানাযার নামাযের বিধান আসেনি। তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল নবুওয়াতের দশম বর্ষের ১০ই রমযান। আবু তালিব এবং হযরত খাদীজার (রা.) ইন্তিকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীরভাবে শোকাহত হয়ে পড়েন। বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের দিকে চলে যান। হযরত খাদীজার (রা.) ইন্তিকালের পরে শাওয়াল মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা বিনতে জাময়া (রা.) কে শাদী করেন। হযরত খাদীজার (রা.) ইন্তিকালের পর তিনিই প্রথম স্ত্রী। হিজরতের সময় তিনিই কেবল স্ত্রী হিসেবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে বসবাস করছিলেন। হযরত আয়িশার (রা.) সংগে যদিও বিয়ে হয়েছিল; কিন্তু রুখসতী তখনও হয়নি। নবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসে হযরত আয়িশা (রা.) এর সংগে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে সম্পাদন হয়। তখন আয়িশার (রা.) বয়স ছিল ছয় বছর। বিয়ের তিন বছর পরে শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে তার রুখসতী হয় (হিজরতের পরে)।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম জননী হযরত আয়িশা (রা.) নয় বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে অতিবাহিত করেন। বিশ্বনবীর ইন্তিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল আঠার বছর। নবুওয়াতের চতুর্থ বছর তার জন্ম হয়। এ বিয়ে আল্লাহপাকের ইশারা। কেননা, আয়িশা (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর দীর্ঘ সময় জীবিত থেকে উম্মতের খেদমত করে গেছেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফতী ও আলেম ছিলেন। বড় বড় সাহাবী ও খলীফারা তাঁর কাছ থেকে ইলম ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

নবুওয়াতের দশম বছরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে বনু শক্বীক কাবিলার বস্তী ছিল। সেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৬ দিন অবস্থান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তাদের আহ্বান জানান এবং তাদেরকে কুরাইশ কাফিরদের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার কথা বলেন। তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে। অবশেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩শে যিলক্বদ মক্কায় ফিরে আসেন। তার সাথে ছিলেন যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। এটাই ইসলামের প্রথম দাওয়াত ও তাবলীগের জামাত। যে জামাতের আমীর ছিলেন স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামাতের একমাত্র সাথী যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। জামাত ২৬ দিন মক্কা থেকে ১০০ মাইল দূরে তায়েফে অবস্থান করেন। জামাতের রাহাবার ছিলেন যায়েদ (রা.) এবং মুতাকাল্লিম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জামাত ভয়াবহ নির্যাতনের স্বীকার হয় এবং কোন লোক দ্বীন গ্রহণ করেনি। উল্টো তায়েফের বালক-বালিকাদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছয় মাইল পর্যন্ত পাথর মারতে মারতে তাড়া করে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা শরীর রক্তে জর্জরিত হয়। অত্যাচারে পথিমধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে দাওয়াতরত ছিলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তায়েফের তিনজন সর্দার এসে উপস্থিত হন। আবদে ইয়ালীল, হাবিব এবং মাসউদ। তারা ছিলেন ওমর ইবনে ওবায়েদের সন্তান। কথা প্রসংগে তারা যে কথা বলেছিলেন মহান আল্লাহ পবিত্র

www.nagorikpathagar.org

কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন। এ কুরআন কেন দুই বস্তির বড় ও নামীদামী লোকের উপর নাযিল হল না? অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছিল যে, মক্কার ওলীদ ইবনে মুগিরাহ মাখজুমী এবং তায়েফের ওরতারাহ ইবনে মাসউদ ছাকাফী এ দুজনের কোন একজন নেতৃস্থানীয় লোককে আল্লাহ কেন নবুওয়াত দান করলেন না? কত বড় বেয়াদবি! এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহলে কি তারা নিজেরা আপনার রবের রহমত বিতরণ করে? তায়েফবাসীর নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহারে জর্জরিত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত মনে যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে জিব্রাইল (আ.) এবং পাহাড় পর্বতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতারা (আ.) এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির হন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অনুমতি দেন তবে মক্কার দুই দিকের পাহাড় তুলে এনে ওদের এমনভাবে পিষে ফেলব, যাতে একজনও জীবিত না থাকে। রহমতের সাগর, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, না। আমি আশা করি তারা যদি আমাকে বিশ্বাস নাও করে; তবুও তাদের বংশের মধ্যে এমন লোক জন্ম নিবে, যারা আল্লাহর তাওহীদে ঈমান আনবে এবং শিরক করবে না, মূর্তিপূজা করবে না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া পরবর্তীতে সফল হয়েছে। বর্তমানে আরবের মাঝে তায়েফের মুসলমানরাই বেশী নরম ও সরল অন্তরের।

এ বছর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নখলা নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন; তখন জী নদের সাত সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। নখলা হচ্ছে মক্কা মুকাররামা থেকে একদিনের রাস্তা। তায়েফ এবং মক্কার মধ্যবর্তী স্থান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামাযের ইমামতি করার সময় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন; তখন জীনেরা গভীর মনযোগসহকারে ধ্যানমগ্ন হয়ে শুনতে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতে সূরা আর রহমান এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা জীন অথবা সূরা ইক্বরা পাঠ করছিলেন। নামায শেষে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তারা নিজেদের কওমের কাছে ফিরে যান। পবিত্র কুরআনে সূরা আহ্কাফে এসেছে, আর একদল জীনকে আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছি; তারা কুরআন পড়া শ্রবণ করত (আহ্ফাক -২৯) এবং সূরা জী নে তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান কিতাবে এসেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে ছয়বার জীন হাজির হয়েছিল। কেউ কেউ মক্কায় এবং কেউ কেউ মদীনায়। আল্লামা শামী (রহ.) তার সীরাত গ্রন্থে লিখেছেন, জীন জাতির প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রথমবার সাত জন বা নয় জন। দ্বিতীয়বার ষাট জন। তৃতীয়বার তিনশত এবং সর্বশেষবার ষাট হাজার। আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহিবে লিখেছেন, জীনের প্রথম দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রিসালতের কিছুদিন পরে হাজির হয়েছিল, যখন তাদের উপর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বর্ষিত হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তায়েফ থেকে ফেরার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া করেছিলেন তা তায়েফের দোয়া নামে খ্যাত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত নামায আদায়ের পর এভাবে দোয়া করেছিলেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আমার দুর্বলতার এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার অভিযোগ পেশ করছি। আমি জনগণের মধ্যে আমার অবমাননার দুরবস্থার ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে পরম করুণাময়! আপনি দুর্বলদের রব, আপনি আমাকে কার হাওলা করে দেন ? সে দুশমনের প্রতি; যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না, কোন নিকটস্থ বন্ধুর প্রতি; যার হাতে আমার ফায়সালা হবে। আপনি যদি আমার প্রতি নারাজ না হন, তবে আমি অন্য কারো ভ্রূক্ষেপ করি না। এতদসত্ত্বেও আপনার পক্ষ থেকে প্রদত্ত দয়াই আমার নিকট অধিকতর কাম্য। আমি চাই আপনার সে নূরের সাহায্যে আসমান ও জমিন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠুক। যা দ্বারা গোটা অন্ধকার বিদূরিত হয় আর যার বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ সম্পন্ন হয়। যা দ্বারা আমার উপর আপনার গজব বর্ষিত হতে পারে; তা থেকে পানাহ চাই। আপনাকে রাজী করার চেষ্টা করব ততক্ষণ, যতক্ষণ আপনি রাজী হয়ে যান। আপনার সাহায্য ব্যতীত কোন সাহায্য কিংবা সামর্থ্য কারোরই নেই।

নবুওয়াতের ১১তম বছর (৬২০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের ১১তম বছরে আকাবার প্রথম বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা। মদীনা শরীফ থেকে আগত হাজীগণ হজ্বের মৌসুমে জুরায়ে ওকবার কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ছয় বা আটজন। আবু উসামা আসওয়াদ ইবনে জাতারাহ আল কাজরাজী (রা.) হলেন আনসারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী। মুয়াজ, মুয়াওয়িজ এবং আওফ (রা.); তারা ছিলেন হযরত হারিস ইবনে রাফায়ার (রা.) সন্তান। এ তিনজনকে বনী আফরাও বলা হয়। তাদের মাতার নাম হচ্ছে আফরা (রা.)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বাইয়াত গ্রহণের ভাষা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ "আমি তোমাদের বাইয়াত করছি এ শর্তে যে তোমরা আল্লাহর সংগে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। জেনে শুনে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না। কোন কাজে আমার নির্দেশ অমান্য করবে না। অতএব তোমরা যদি আমার এ শর্তসমূহ পালন কর, তবে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি তোমরা এর মধ্যে কোন খেয়ানত কর, তবে তোমাদের ব্যাপার আল্লাহর হাওলা করে দিলাম। তিনি চাইলে তোমাদের শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন।" প্রথম বাইয়াত থেকেই মদীনায় ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এভাবেই মদীনায় দাওয়াত ও তাবলীগের হাতেখড়ি হয়।

নবুওয়াতের ১২তম বছর (৬২১ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবুওয়াতের ১২তম বছর হল হিজরতের এক বছর আগের বছর। ইমাম নববী এবং ইবনে সাদ প্রমুখ ইসলামী গবেষকরা এ মত গ্রহণ করেছেন। ২৭ রজব শনিবার কিংবা সোমবার মতান্তরে রমযানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজের অবিস্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। মি'রাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের চূড়ান্ত শীর্ষস্থানে পৌঁছে ছিলেন। তিনি আল্লাহর বিশাল ও মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন। যার বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

মি'রাজ রজনীতে হযরত জিব্রাঈল (আ.), মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ বিদারণ করেন। হৃদয় বা অন্তর মোবারক বের করে জমজমের পানি ভর্তি সোনার থালায় ধৌত করেন। অতঃপর পবিত্র হৃদয়ে হিকমত, ঈমান এবং নবুওয়াতের নূর ভর্তি করে স্বস্থানে রেখে দেন। ওলামাগণ বলেন বক্ষ বিদারণের ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে চারবার ঘটেছে। প্রথম ৪ বছর বয়সে, দ্বিতীয় দফা দশ বছর বয়সে, তৃতীয় দফা হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের সময় এবং চতুর্থ বার শবে মি'রাজের সময়। মি'রাজ সফরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী যানবাহনে

www.nagorikpathagar.org

আরোহণ করেন। এর নাম বুরাক। মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বুরাকে ভ্রমণ করেছেন। বুরাক, বরক ধাতু থেকে নির্গত। বরক আরবী শব্দ এবং এর অর্থ বিদ্যুৎ। বুরাকের গতি আলোর মতোই দ্রুত ছিল। আইনস্টাইনের সময়ের আপেক্ষিকবাদ সূত্র মতে আলোর গতিতে চলমান বস্তুর জন্য সময় স্থির হয়ে যায়। বায়তুল মুকাদ্দাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত নামায আদায় করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে সকল নবীগণ সেদিন নামায আদায় করে ধন্য হয়েছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবীগণের ইমাম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে যখন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে আসেন তখন জান্নাত থেকে একটি সিঁড়ি লাগানো হয়। (আলোর গতি সম্পন্ন চলন্ত লিফট)। যে সিঁড়ি দিয়ে তিনি প্রথম আসমানে গিয়ে পৌছেন। অতঃপর ঐ সিঁড়িটি প্রথম আসমানে উপস্থাপন করা হয় যা দিয়ে তিনি দ্বিতীয় আসমানে পৌছেন। এমনিভাবে স্তরে স্তরে সপ্তম আসমানেরও উপরে চলে যান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুরো ঘটনাই ছিল আলোর গতিতে।

সে রাতেই আসমানসমূহে গুরুত্বপূর্ণ নবীগণের সংগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাৎ করেন। ঐসব নবীগণ, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে এবং সম্বর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আসমানে পৌছে গিয়েছিলেন। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.), তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আ.), পঞ্চম আসামানে হযরত হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সংগে সাক্ষাৎ হয়। মি'রাজের এ সফরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মা'মুর পরিদর্শন করেন। বায়তুল মা'মুর হল ফিরিশতাদের কিবলা। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা এর তোয়াফ করেন। অথচ কিয়ামত পর্যন্ত কোন ফিরিশতা দ্বিতীয় বার তোয়াফ করার সুযোগ পাবেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ সফরে জান্নাত এবং তার বিশাল নিয়ামত রাজি আর জাহান্নাম এবং তার ভয়াবহ শাস্তি পরিদর্শন করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দুধ, মধু এবং মদ ভর্তি পাত্র হাজির করা হয়। তিনি দুধ নির্বাচন করেন এবং পান করেন। এতে জিব্রাঈল (আ.) আরজ করেন, 'আপনি ফিতরাতকে গ্রহণ করেছেন। এটা আপনার এবং আপনার উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

www.nagorikpathagar.org

এ রাতে মহান আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং উম্মতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মূসা (আ.) এর পরামর্শে নামাযের এ সংখ্যা হ্রাস করার দরখাস্ত নিয়ে আল্লাহর দরবারে নয়বার গমন করেন। প্রতিবার পাঁচ ওয়াক্ত করে নামায হ্রাস করা হয়। এভাবে প্রতিদিন মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এসে পৌছায়। মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায যখন বাকী রইল; তখন আল্লাহ বলেন, উম্মতে মুহাম্মদী 'আদায় করবে পাঁচবেলা নামায পাঁচ ওয়াক্ত এবং ছাওয়াব পাবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। আমার জ্ঞানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল এবং এর বিনিময়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের ছাওয়াব দিব। আমার সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না।'

মি'রাজ রজনীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন এবং আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে নিজ সান্নিধ্য দিয়ে ধন্য করেন। আল্লাহ নিজ শান মোতাবেক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে কথা বলেন। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'অতঃপর নিকটবর্তী হলেন এবং অতি নিকটবর্তী হলেন। উভয়ের মধ্যে দু'কামানের দূরত্ব ছিল অথবা তার চেয়েও নিকটবর্তী হলেন।' এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না? ওলামাগণ বলেছেন, হ্যাঁ স্বচক্ষেই দেখেছেন। মি'রাজের রাতে আল্লাহর দরবারে সালাম পেশ করার জন্য নিম্নের বাক্যাবলী দান করা হয়েছিল, যা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর মাঝে কথোপকথন। শেষ বাক্যটি সমবেত ফিরিশতারা বলেছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য, তা কথা দিয়ে হোক অথবা শারীরিক কিংবা আত্মিক।' এর জবাবে আল্লাহ বলেন, 'সালাম আপনার প্রতি হে নবী এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বা প্রাচুর্য।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বার বলেন, 'সালাম বর্ষিত হোক, আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাগণের প্রতি।' এতদশ্রবণে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এবং ফিরিশতাগণ বলেন, 'আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

মি'রাজ পরবর্তী ভোরবেলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা প্রকাশিত হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে আকাশ ভ্রমণ ও

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাবর্তন করেছেন। এসবই খুব অবিশ্বাস্য বলে মনে হল কুরাইশবাসীর কাছে। তাই তারা পুরো ঘটনাটি অস্বীকার করল। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিবরণ স্মরণ করে বর্ণনা করতে বলল। অন্ধকার রাতে কিছুক্ষণের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করে তার বিশদ বিবরণ স্মরণ রাখার তেমন প্রয়োজনীয়তাই বা কি ছিল? সর্বশক্তিমান আল্লাহ যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর বাহুতে করে পুরো বায়তুল মোকাদ্দাস তুলে নিয়ে আসেন মক্কায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আকিলের বাড়ীর পার্শ্বে। বিশ্বনবী তা দেখে দেখে প্রতিটি বিষয়ের বিবরণ পেশ করতে থাকেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে বায়তুল মোকাদ্দাসের সঠিক বিবরণ শুনে মক্কাবাসী বিস্ময়ে ভিমরী খেয়ে যায়। কেননা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে কখনই ঐ মসজিদে ভ্রমণ করেননি বা দেখেননি। প্রিন্সেস বিলকিসের সিংহাসন তুলে নিয়ে আসা যেমন হযরত সুলাইমান (আ.) এর মু'জেযা ছিল, বায়তুল মুকাদ্দাস উঠিয়ে নিয়ে আসাও ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা।

এ বছরই মি'রাজ রজনীর পরবর্তী ভোর বেলা যখন কুরাইশ কাফিরগণ মি'রাজকে অস্বীকার করল, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য বলল, বলুন দেখি আমাদের মক্কার একটি বণিক দল এখান থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করেছে; তাদের খবর কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'ঐ দলটি অমুক জায়গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। দলের মধ্যে এতজন লোক আছে, এতটি উট রয়েছে।' কুরাইশবাসী আবার প্রশ্ন করল, 'তবে তারা মক্কায় কবে এসে পৌছবে?' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'অমুক মাসের অমুক তারিখ, বুধবার। কাফেলার সম্মুখে ধূসর বর্ণের একটি উট থাকবে। তার পিঠে থাকবে দু'টি চাটাই।' অবশেষে বিশ্বনবী যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই ঘটেছিল। তথাপি হতভাগাদের ঈমান নসীব হয় নি।

এ বছর হাবশায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবি তালিবের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন হাবশার (আবিসিনিয়াতে) মুসলমানদের মধ্যে প্রথম সন্তান। উসদুল গাবা কিতাবে আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল দশ বছর। তিনি আপন পিতা জা'ফর (রা.) এর সংগে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। অত্যধিক

বদান্যতার জন্য তার উপাধি ছিল বাহরুল জাউদ অর্থাৎ দানের সাগর। বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামে তার চেয়ে বড় দাতা আর কেউ ছিলেন না অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে, তিনিই ছিলেন বড় দাতা। অথচ তিনি ছিলেন অল্পবয়স্ক সাহাবী।

এ বছর রজব মাসে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে হজ্ব মৌসুমে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে মদীনাতে হযরত জাবির (রা.) ছাড়াও বারজন আনসার সাহাবী হজ্বের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আকাবার নিকটবর্তী স্থানে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তারা ১২ জনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে ওমায়র আল কুরশী আল আবদরী (রা.) কে কুরআনে করীম, নামায এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য মদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাবলীগ ও তা'লীমের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বলে উঠে। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর হযরত মুসয়াব ইবনে ওমায়র (রা.) মদীনায় তিহাত্তর জনকে নিয়ে আকাবার তৃতীয় বাইয়াতে রাত্রিবেলা হাজির হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের হিজরতের আগে দ্বিতীয় বার মদীনায় প্রেরণ করেন। তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তা'লীম ও তাদরীসের (শিক্ষাদানের) ফলে মদীনায় ইসলাম চমকে উঠে।

এ বছর মদীনায় মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম বিন খালিদ আলা মাদানী আল আনসারী (রা.) হযরত মুসয়াবের (রা.) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনু হারিসার বংশভুক্ত ছিলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা শুভাগমনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। একই বছর আবুল বিশর উব্বাদ ইবনে বিশর (রা.) হযরত মুসয়াব বিন ওমায়েরের (রা.) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বদর, উহুদ এবং অন্যান্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হচ্ছেন সে দু'জন সাহাবীদের একজন যাদের কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। একবার, তারা দু'জনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে এশার নামায আদায় করে দীর্ঘক্ষণ পরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করেন। রাত্রী ছিল ঘোর অন্ধকার। উভয়ের হাতে ছিল লাঠি। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বের হয়ে যান,

www.nagorikpathagar.org

তখন একজনের লাঠি আলোকিত হয়ে উঠে এবং সে আলোর সাহায্যে তারা পথ চলতে থাকেন। অতঃপর যখন দু'জনের রাস্তা ভিন্ন হয়ে পড়ে, তখন উভয়ের লাঠি আলোকিত হয়ে উঠে। এ অবস্থায় তারা বাড়ি পর্যন্ত পৌছে যান। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা এবং ঐ সাহাবাদের কারামত। দ্বিতীয় সাহাবীর নাম ছিল উসাইদ ইবনে হোজাইর (রা.)। এ বছর আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনুল আসাদ আল মাখজুমী (রা.) মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন। তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি এর আগে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন। মুশরিকদের অত্যধিক যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে এবং মদীনাতে ইসলামের প্রসারের খবর পেয়ে, মদীনা শরীফে হিজরত করেন।

নবুওয়াতের ১৩তম বছর (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ এ বছর যিলহজ মাসে আকাবার তৃতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। নবুওয়াতের ১২তম বর্ষে (আকাবার বাইয়াতকালে) মদীনার আনসারগণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আগামী বছর একই স্থানে এসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাক্ষাৎ করবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্বের মৌসুমে মিনা চলে যান। অতঃপর আনসার সাহাবাদের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা আইয়ামে তাশরীফের মধ্যবর্তী রাতে একই স্থানে এসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাক্ষাৎ করে বাইয়াত ও ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। এছাড়াও মদীনায় আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। এ বছর মতান্তরে পরের বছর হযরত সায়ীদ ইবনুল আস (রা.) এর জন্ম হয়। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি সে ভাগ্যবান দলের অন্যতম সদস্য, যারা হযরত ওসমান (রা.) এর নির্দেশে কুরআন মাজীদ সংকলন করেছিলেন। তাঁর পিতা আস ইবনে সায়ীদ বদরের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা.) হাতে নিহত হন।

ওলামাগণ লিখেছেন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আনসারদের নিকট থেকে তিনবার বাইয়াত অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রথমবার নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে রজব মাসে, তখন ছয়জন বা আটজন মুসলমান হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার দ্বাদশ বর্ষের রজব মাসে, তখন বারজন মুসলমান হয়েছিলেন। তৃতীয়বার ত্রয়োদশ বর্ষের যিলহজ্ব মাসে, তখন ৭৩ জন পুরুষ এবং

দু'জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এসকল আকাবা এবং হজ্ব রজব মাসে এ কারণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, কাফিররা কোন মাসকে আগে নিয়ে আসা কিংবা পিছিয়ে দেয়ার জাহেলি নিয়ম পালনে অভ্যস্ত ছিল। নবুওয়াত প্রাপ্তির যখন তের বছর পূর্ণ হয় তখন চৌদ্দতম বছর মক্কাতেই শুরু হয় এবং এটাই ছিল হিজরতের প্রথম বছর। কেননা নবুওয়াতের চৌদ্দতম বছরে তৃতীয় আকাবার তিন মাস পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা তৈয়বায় হিজরত করেন। এরপর থেকেই হিজরী সাল গণনা শুরু হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত পরবর্তী মদীনার সার্বিক পরিস্থিতি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনার জীবন তিনটি বৈশিষ্ট্যময় পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ে ছিল ফেতনা, সংকট, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও প্রতিবন্ধকতা। বাইরে থেকে শত্রুরা মদীনার অস্তিত্ব মিটিয়ে ফেলতে আক্রমণ অভিযান চালিয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ের শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূর্তিপূজারী নেতৃত্বের সাথে সন্ধি হয়েছিল। হিজরী অষ্টম সনের রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ের শেষ হয়েছিল। এ পর্যায়ে বিশ্বের রাজা বাদশাহদের দ্বীন ইসলামে দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে মানুষরা দলে দলে দ্বীন ইসলামের প্রবেশ করেছে, বিভিন্ন গোত্রগোষ্ঠীর প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করেছে। এ পর্যায়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ একাদশ হিজরী সনের এগারোই রবিউল আউয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন মদীনার তথা ইসলামের নতুন সমাজের রূপায়ণ ও বিনির্মাণের ইমাম, নেতা এবং পথপ্রদর্শক। মদীনায় এমন তিনটি জাতি গোষ্ঠীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহ অবস্থান ছিল; যাদের একটির অবস্থা অন্যটির থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ এমন কিছু সমস্যা ছিল, যেগুলো অন্য জাতি-গোষ্ঠীর সমস্যার থেকে ভিন্ন। একদিকে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নির্বাচিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দল/গোষ্ঠী। অন্যদিকে ছিল মদীনার প্রাচীন এবং আদি গোত্রসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট মুশরিক। এরা তখন পর্যন্ত ঈমান আনেনি। তৃতীয় দল হচ্ছে ইহূদী সম্প্রদায়। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামকে বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাদের জন্যে মদীনার অবস্থা ছিল মক্কার সম্পূর্ণ বিপরীত। মক্কায় যদিও তারা ছিলেন একই কালিমার অনুসারী এবং উদ্দেশ্যও ছিল অভিন্ন, কিন্তু তারা বিভিন্ন পরিবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তারা শঙ্কিত, দুর্বল ও অবমাননার সম্মুখীন ছিলেন। তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। যেসব উপাদানের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে একটি সমাজ কায়েম হয়, মক্কায় মুসলমানদের হাতে সেসবের কিছুই ছিল না। এ কারণেই মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে শুধু ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এমন সব আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে, যার উপর প্রতিটি মানুষই পৃথকভাবে আমল করতে পারে। এছাড়া পুণ্য কর্ম, কল্যাণ, মঙ্গল এবং সচ্চরিত্রের প্রতি উৎসাহিত আর হীন নীচ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ করা হয়েছে।

পাশাপাশি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাজিরদের মদীনায় যাওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই সামাজিক ক্ষমতার কলকাঠি ছিল মুসলমানদের হাতে। মুসলমানদের উপর অন্য কারো আধিপত্য ছিল না। তাই এটা ছিল সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধি সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার, হালাল-হারাম মেনে ইবাদত করার এবং স্বভাব চরিত্রের বিকাশ, জীবন জিজ্ঞাসা পুরোপুরি স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন করার সুবর্ণ সুযোগ। সময়টি যথার্থ ছিল মুসলমানদের একটি নতুন ইসলামী সমাজ গঠনের। যে সমাজ জীবনের সকল পর্যায়ে জাহেলী সমাজ থেকে ভিন্ন এবং বিশ্ব মানবের মাঝে বিদ্যমান অন্য যে কোনো সমাজ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সমাজটি ইসলামী দাওয়াতের প্রতিনিধি করবে। এমন সমাজের জন্যেই বিগত দশ বছর যাবত মুসলমানরা নানা ধরনের দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন ও নিষ্পেষণ সহ্য করেছেন। এ ধরনের কোনো সমাজ হুটহাট করে গঠন করা সম্ভব নয়। বরং এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ও সঠিক পরিকল্পনার। যাতে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে বিধি বিধান জারি করা যায়। আইন প্রণয়ন, অনুশীলন, প্রশিক্ষণ এবং যথার্থ বাস্তবায়ন করা যায়। বিধি বিধান জারি ও একত্রীকরণের বিষয়টির দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহর জারী করা বিধিবিধানের এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশের বিষয়টি সম্পাদনের জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

দেন, অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিলঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। (সূরা জুমুআ-২) সাহাবায়ে কেরাম সব সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মনোযোগী থাকতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ প্রদান করতেন, তা পালন করে তারা সন্তুষ্টি অনুভব করতেন। আল্লাহ্ বলেন, যখন তাঁর (আল্লাহর) আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয়, তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে (সূরা আনফাল-১২১)।

মদীনায় দু'ধরনের মুসলমান ছিল। এরা ছিল প্রথম দল।। কিছু মুসলমানের নিজস্ব জমি, বাড়ি-ঘর ছিল। যারা অর্থ-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করত। এদের বলা হত আনসার। এদের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে অত্যন্ত কঠোর ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা চলত। পাশাপাশি অপর দলটির নাম হল মুহাজির। এরা ছিল প্রায় সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এরা কষ্ট করে কোনো উপায়ে নিজেদের দেহ ও ভাগ্য নিয়ে মদীনায় এসেছিল। এদের থাকার কোনো ঠিকানা ছিল না। ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কোনো কাজও ছিল না। এদের তেমন কোন সম্পদ ছিল না, যার উপর অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। উপরন্তু আশ্রয়হীন মুহাজিরের সংখ্যাও কম ছিল না। বরং দিন দিন এদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। কেননা ঘোষণা করা হয়েছিল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যারা ঈমান রাখে, তারা যেন হিজরত করে মদীনায় চলে আসে। মদীনায় তেমন কোনো সম্পদ এবং আয়-উপার্জনের উল্লেখযোগ্য কোনো উপায়-উপকরণও ছিল না। ফলে মদীনায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এহেন সঙ্কটময় সময়ে ইসলামের শত্রুরা মদীনাকে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় বয়কট করে রাখে। এতে আমদানীর পরিমাণ কমে যায় এবং পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠে।

২য় দলটি হল মদীনার মুশরিক অধিবাসীরা। মুসলমানদের উপর তাদের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। তাদের কিছু লোক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে ছিল। তারা নিজেদের পৈতৃক দ্বীন পরিবর্তনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনুভব করছিল। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে তেমন কোনো প্রকার শত্রুতা বিদ্যমান ছিল না। এ দলটি অতি দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য মুশরিকদের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল, যারা নিজেদের মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করত। কিন্তু মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার এবং মুকাবিলা করার

www.nagorikpathagar.org

তাদের সাহস ছিল না। বরং পরিস্থিতির কারণে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রকাশে বাধ্য ছিল। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই। বুয়াস যুদ্ধের পর আওস ও খাযরাজ গোত্র তাকে নিজেদের নেতা বানাতে একমত হয়েছিল।

এ দুটি গোত্র পূর্বে অন্য কারো নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেনি। অথচ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জন্যে তারা মুকুট তৈরী করছিল। যাতে এ মুকুট তার মাথায় পড়িয়ে তাকে বাদশাহ ঘোষণা করা যায়। এভাবে সে মদীনার বাদশাহ হয়েই যাচ্ছিল। এমন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় উপস্থিত হওয়ার কারণে জনগণের দৃষ্টি তার দিক থেকে ফিরে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এ কারণে আবদুল্লাহ বিন উবাই মনে করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তার বাদশাহী মুকুট কেড়ে নিয়েছেন। ফলে সে মনের গভীরে তাঁর প্রতি প্রচণ্ড শত্রুতা পোষণ করত। তা সত্ত্বেও বদর যুদ্ধের পর সে দেখল, পরিস্থিতি তার অনুকূলে নয়। আবার এ অবস্থায় শিরকের উপর অটল থাকলে, সে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে। এ কারণে সে দৃশ্যত ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করল, বাস্তবে পর্দার অন্তরালে সে কাফেরই ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার কোনো সুযোগই সে হাতছাড়া করত না। তার সাথী ছিল সে সকল নেতৃস্থানীয় লোক, যারা তার বাদশাহীর অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সেসব সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তারা মদীনার কিছুসংখ্যক সরলপ্রাণ যুবক মুসলমানকে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত।

তৃতীয় দলটি ছিল মদীনার ইহুদীরা। এরা আশুরী এবং রোমানদের অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হেজাযে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল হিব্রু। হেজাযে আশ্রয় নেয়ার পর তাদের চালচলন, ভাষা, সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছু আরব রঙে রঞ্জিত হয়েছিল। এমনকি তাদের গোত্রসমূহ এবং গোত্র সদস্যদের নামকরণও আরবী হয়ে গিয়েছিল। আরবদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও তাদের বংশীয় অহমিকা যথারীতি বহাল ছিল। আরবদের তারা মনে করত খুবই নিকৃষ্ট। তাদের উম্মী বলে গালি দিত। উম্মী বলতে তারা বোঝাতে চাইত আরবরা নির্বোধ, মূর্খ, জংলী, নীচু এবং অচ্ছ্যুৎ। তাদের আকীদা এমনই ছিল যে, তারা ভাবত আরবদের ধন-সম্পদ

তাদের জন্যে পুরোপুরি বৈধ। যেভাবে ইচ্ছা তারা তা ভোগ করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা বলে, নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই (সূরা আলে ইমরান-৭৫)।

এসব ইহুদীদের মধ্যে তাদের দ্বীনের প্রচার প্রসারের কোনো প্রকার তৎপরতা লক্ষ্য করা যেত না। তারা দ্বীন বলতে বুঝত শুভাশুভ নির্ধারণ, যাদু, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি। এসব কিছুর বদৌলতে তারা নিজেদের আলিম, পণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিক নেতা মনে করত। ইহুদীরা ধন-সম্পদ উপার্জনে ছিল দক্ষ। খাদ্যশস্য, খেজুর, মদ এবং পোশাকের ব্যবসা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা খাদ্যশস্য, পোশাক ও মদ আমদানি এবং খেজুর রফতানী করত। ব্যবসায় আরবদের কাছ থেকে তারা দ্বিগুণ, তিন গুণ মুনাফা করত। শুধু তাই নয়, তারা সুদও খেত। তারা আববের শেখ ও সর্দারদের সুদে বিরাট অংকের টাকা ধার দিত। আরব শেখ ও সর্দাররা এ সুদী ঋণের অর্থ খ্যাতি লাভ এবং তাদের প্রশংসাকারী কবিদের জন্যে নিরর্থক ব্যয় করত। ইহুদীরা সুদের উপর অর্থ ধার নেয়ার বিনিময়ে যমীন, শস্য ক্ষেত, বাগ বাগিচা ইত্যাদি বন্ধক রাখত। এতে কয়েক বছরেই ইহুদীরা সেসবের মালিক হয়ে যেত।

ইহুদীরা গুজব, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ এবং ফাসাদ বিশৃংখলার আগুন জ্বালাতে ছিল সিদ্ধহস্ত। তারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে শত্রুতার বীজ বপন করত। এক গোত্রকে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে চরমভাবে উত্তেজিত করে তুলত, সূক্ষ্মভাবে পরস্পরকে লেলিয়ে দিয়ে ইহুদীরা চুপচাপ একপাশে বসে থাকত, আর আরবদের ধ্বংসের দৃশ্য দেখত। মারামারির সময়ও তারা মোটা সুদে অর্থ ধার দিত, যাতে মূলধনের অভাবে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে না যায়। এতে ইহুদীরা দু'ভাবে লাভবান হত। একদিকে তারা নিজেদের ঐক্য সংহতি নিরাপদ রাখত, অন্যদিকে সুদের ব্যবসার বাজারও জমজমাট রাখত। এমনকি সুদের উপর সুদ বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হিসাব করে তারা মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করত। মদীনায় প্রধান তিনটি ইহুদী গোত্র ছিল। বনু কায়নুকা- ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র এবং এরা মদীনার ভেতরেই বসবাস করত। বনু নযির ও বনু কোরায়যা- এ দুটি গোত্র ছিল আওস গোত্রের মিত্র। তারা মদীনার শহরতলী এলাকায় বসবাস করত।

এ তিনটি ইহুদী গোত্র দীর্ঘকাল যাবত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন. জ্বালিয়ে রেখেছিল। বুয়াস যুদ্ধে তারা নিজ নিজ মিত্র গোত্রের সাথে যুদ্ধে শরীক হত। ইহুদীরা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে, এটাই ছিল

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিক। কেননা, আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বংশোদ্ভূত ছিলেন না, যাতে তাদের বংশীয় অহমিকাবোধে চোট লাগে। অপরদিকে ইসলামের দাওয়াত ছিল এক কল্যাণকর দাওয়াত। যা বিচ্ছিন্ন হৃদয়সমূহকে জোড়া লাগাত। হিংসা বিদ্বেষের আগুন নেভাত। ইসলাম তার অনুসারীদের আমানতদারী, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং হালাল মাল ভোগ ও ব্যবহারে অভ্যস্ত বানাত অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা গোত্রসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সৃষ্টি করত। তাদের এ ভয় কাজ করত যে, ইসলাম এলে ইহুদীদের কবল থেকে আরবরা মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে তাদের বাণিজ্যিক তৎপরতা হ্রাস পাবে। তাদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি সুদভিত্তিক সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এমনকি এ ধরনের আশঙ্কাও করত যে, মুসলমানরা একদিন তাদের হারানো অর্থ, বাগান ও জমি ফিরে চাইবে, যেগুলো ইহুদীরা সুদের বিনিময়ে দখল করেছিল। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার সময় থেকেই ইহুদীরা, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি প্রবল শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.) থেকে একটি চমৎকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ছিলাম আমার পিতা ও চাচার কাছে তাদের সন্তানদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। তারা তাদের অন্য সন্তানদের চেয়ে আমাকে বেশি ভালোবাসতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর কোবা পল্লীতে বনু আমর ইবনে আওফের মহল্লায় অবতরণ করেন। এ খবর পাওয়ার পর আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতার এবং চাচা আবু ইয়াসের খুব সকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হন এবং সূর্যাস্তের সময় ফিরে আসেন। তারা আলোচনায় বলেন, যতদিন বেঁচে থাকি মুহাম্মদের (বিশ্বনবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) শত্রুতা করব।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম উঁচুস্তরের একজন ইহুদী আলেম ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বনী নাজ্জারে আগমনের খবর পাওয়ার পরই আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) তার কাছে হাযির হন এবং এমন কিছু প্রশ্ন করেন, যেসব প্রশ্নের উত্তর একজন নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, ইহুদীরা অন্যের নামে অপবাদ দিতে সিদ্ধহস্ত। যদি তাদের কারো কাছে আপনি আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেন,

তাহলে তারা যা বলবে, আমার ইসলাম গ্রহণের খবর শোনার পর তার বিপরীত বলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে কয়েকজন ইহুদীকে ডেকে পাঠালে তারা আসে। তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) ঘরের ভেতর লুকিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগত ইহুদীদের জিজ্ঞেস করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যেকার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর পুত্র। আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং সবচেয়ে ভালো মানুষের সন্তান। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির সন্তান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, আচ্ছা বলো তো, যদি শোনো আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মুসলমান হয়েছে? ইহুদীরা দু'বার অথবা তিন বার বলল, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ থেকে হিফাযত করুন। এরপরই হযরত আবদুল্লাহ বেরিয়ে এসে বলেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। একথা শোনার সাথে সাথে ইহুদীরা বলল, এ হচ্ছে আমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির সন্তান। সে সময় থেকেই ইহুদীরা তার সম্পর্কে আরো নানান রকম খারাপ কথা বলতে শুরু করে। (বুখারী)।

মদীনার বাইরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল কুরাইশরা। তারা মক্কায় মুসলমানদের দশ বছর সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিল। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও অত্যাচারে তারা মুসলমানদের জর্জরিত করেছিল। মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করার পর কুরাইশের লোকেরা তাদের মক্কার বাড়িঘর, জায়গা জমি, ধন-সম্পদ সব অধিকার করে নিয়েছিল। মুসলমান এবং তাদের পরিবার পরিজনকে যাকেই নাগালে পেয়েছে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে তাঁর দাওয়াতী কর্মসূচী সমূলে উৎপাটিত করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করেছে। এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। মুসলমানরা কোনো প্রকারে কষ্টে শিষ্টে পাঁচশ কিলোমিটার দূরবর্তী মদীনায় গিয়ে পৌছার পরও কাফিররা তাদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যায়। যেহেতু তারা মক্কার হেরেমের অধিবাসী এবং বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী ছিল, এ কারণে তারা আরবদের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং পার্থিব কর্তৃত্বের আসীনে সমাসীন ছিল। তারা সে প্রভাব বিস্তার করে আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের উত্তেজিত করে। এমনকি মদীনার সাথে প্রায় পুরোপুরি বয়কট করে। ফলে

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় জিনিসপত্রের আমদানী কমে যায়। ওদিকে মদীনায় আশ্রয় নেয়া মুহাজিরদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল। প্রকৃতপক্ষে মক্কার কাফের এবং মুসলমানদের এ নতুন আবাসস্থলের মাঝে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

যেভাবে মুসলমানদের বাড়িঘর ও ধন-সম্পদ মক্কার উদ্ধত বিদ্রোহীরা জবরদখল করে নিয়েছিল; সেভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছিল; মুসলমানদের জীবনযাত্রায় যেভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল; সঙ্গতভাবে মুসলমানদেরও সেরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার ছিল। যে যেমন তাকে তেমন প্রতিদান দাও- এ নীতির ভিত্তিতে মক্কার উদ্ধত বিদ্রোহীদের সাথে তাদের অনুরূপ আচরণ মুসলমানদের জন্যে যথার্থ ছিল, যেন তারা মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার কোনো সুযোগ না পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর এসব সমস্যার সম্মুখীন হন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নেতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। যারা অনুগ্রহ, স্নেহ মমতা ও করুণা পাওয়ার উপযুক্ত ছিল; তিনি তাদের অনুগ্রহ করেন, আর যারা কঠোর আচরণ পাওয়ার যোগ্য ছিল তাদের সাথে সে রকম আচরণ করেন। তবে এটা ঠিক, দয়া ও অনুগ্রহের পরিমাণ কঠোরতার চাইতে বেশি ছিল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ইসলাম এবং মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে।

মসজিদে নববী নির্মাণ ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম পদক্ষেপেই মদীনায় মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্যে তিনি সে জায়গাকেই নির্ধারণ করেছিলেন, যেখানে তাঁর উট গিয়ে বসেছিল। সে জমির মালিক ছিল দুই এতিম বালক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে নায্য মূল্যে সে জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণে কাজ শুরু করেন। নির্মাণ কাজে তিনি নিজেও ইট পাথর বহন করেছিলেন। সে জমিতে মুশরিকদের কয়েকটি পুরাতন কবর ছিল। খেজুর এবং অন্যান্য কয়েকটি গাছও ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে ফেলেন এবং দেয়ালগুলো সমতল করে দেন। খেজুর এবং অন্যান্য গাছ কেটে কিবলার দিকে লাগিয়ে দেন। সে সময় কিবলা ছিল বায়তুল মাকাদ্দাস। মসজিদের দরজার দু'টি পালা পাথর দিয়ে বানানো হয়। দেয়ালসমূহ কাঁচা ইট এবং কাদা দিয়ে গাঁথা হয়। ছাদের উপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হয়। খেজুর গাছের কাণ্ডের খাম্বা বানানো হয় এবং মেঝেতে বালু আর ছোট ছোট

কংকর বিছিয়ে দেয়া হয়। তিনটি দরজা লাগানো হয়। কিবলার দিকের দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত একশ হাত লম্বা ছিল। প্রস্থ লম্বার সমান অথবা এর চাইতে কিছু কম ছিল। মেঝে বা বুনিয়াদ ছিল প্রায় তিন হাত গভীর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের পাশে কয়েকটি ঘরও তৈরী করেন। এসব ঘরের দেয়াল কাঁচা ইট, ছাদ খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে বানান হয়। এসব ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীদের বাসগৃহ। এগুলো তৈরী হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা.) ঘর থেকে এখানে এসে ওঠে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ নির্মাণ শুধু নামায আদায়ের জন্যেই ছিল না; বরং এটি ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা ও হিদায়াতের পাঠ গ্রহণ করতেন (বুখারী)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সমাজ গঠন করেছিলেন, যেখানে দীর্ঘকালের জাহেলী দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঘৃণা-বিদ্বেষে জর্জরিত বিভিন্ন গোত্রের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করত। এ মসজিদ ছিল এমন একটি কেন্দ্র, যে কেন্দ্র থেকে নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত এবং বিভিন্ন অভিযান প্রেরিত হত। এছাড়া এ মসজিদের মর্যাদা ছিল একটি সংসদের মত, যেখানে মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) এবং মজলিসে এন্তেযামিয়া (ব্যবস্থাপনা পরিষদ) এর অধিবেশন বসত। সাথে সাথে এ মসজিদই ছিল এক বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব মুহাজিরের আবাসস্থল। যাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না; তারা এ মসজিদে বসবাস করত।

হিজরতের প্রথম থেকেই আযানের প্রচলন হয়। এ আযান ছিল উর্ধ্বজগতের সংগীত। যে সঙ্গীতের সুর দিনে পাঁচ বার দিক দিগন্তে গুঞ্জরিত হত এবং বিশ্বজগৎ কেঁপে ওঠত। এ প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাব্বিহী (রা.)-এর স্বপ্নের ঘটনা প্রসিদ্ধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে যেমন পারস্পরিক জোর ও মিল মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, একইভাবে তিনি মানব ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন, যাতে মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মূল কথা ছিল, তারা একে অন্যের দুঃখে দুখী এবং সুখে সুখী হবেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল, জাহেলী যুগের অহমিকার পরিবর্তন ঘটানো। যা কিছু অহমিকা ও মর্যাদাবোধ হবে তা যেন ইসলামের জন্যেই হয়।

www.nagorikpathagar.org

বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য যেন মিটে যায়। উঁচু নীচুর মানদণ্ড যেন মানবতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই হয়।

বিশ্বনবীর মহান প্রশিক্ষণ ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে শুধু অন্তসারশূন্য শব্দের আবরণে আচ্ছাদিত করেননি; বরং এমন এক অঙ্গীকার সাব্যস্ত করেছিলেন, যা রক্ত এবং সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এটা শুধু মুখে মুখে উচ্চারিত নিষ্ফল সালাম ও মুবারকবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সাথে আত্মত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং প্রেরণার সংমিশ্রিত ছিল। এ কারণে এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মদীনার নতুন সমাজকে দুর্লভ ও সমুজ্জ্বল কৃতিত্বে পরিপূর্ণ করেছিল। বুখারী শরীফে এর একটি উদাহরণ রয়েছে, মুহাজিররা মদীনায় আগমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে রবীর (রা.) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে রবী (রা.) হযরত আবদুর রহমানকে (রা.) বলেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী, আপনি আমার ধন-সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, আপনি ওদের দেখুন, যাকে আপনার বেশি পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আপনি তাকে বিবাহ করুন। হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আপনার পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আপনাদের এখানে বাজার কোথায়? তাকে বনু কায়নুকার বাজারের কথা বলা হল। তিনি বাজার থেকে ফিরে আসার পর তাঁর কাছে কিছু পনির এবং ঘি ছিল। এরপর প্রতিদিন তিনি নিয়মিত বাজারে যাওয়া আসা করতেন। একদিন তাঁর গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখা গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি বিবাহ করেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়াতে রয়েছে, আনসাররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন, আপনি আমাদের এবং মুহাজির ভাইদের মধ্যে আমাদের মালিকানাধীন খেজুর বাগানগুলো বণ্টন করে দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না। তখন আনসাররা বলেন, তাহলে মুহাজির ভাইয়েরা আমাদের বাগানে কাজ করুক আমরা উৎপাদিত ফল থেকে তাদের অংশ দেব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঠিক আছে। আমি তোমাদের কথা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি (বুখারী)। এ থেকে বুঝা যায়, আনসাররা কিভাবে মুহাজিরদের আপন করে নিয়েছিলেন। এতে মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের ভালোবাসা, সরল-সহজ আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মুহাজিররা আনসারদের এ দয়া ও মমত্ববোধের যথেষ্ট কদর করতেন। তারা আনসারদের দয়া ও অনুগ্রহ থেকে অবৈধ কোনো সুবিধা ভোগ করেননি। বরং নিজেদের ভেংগে পড়া অর্থনীতির কোমর সোজা করতে যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যেকার এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এক অভিনব কর্মকৌশল, অনন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের উল্লিখিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের মত আরেকটি অঙ্গীকার করান। যার মাধ্যমে জাহেলী যুগের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গোত্রীয় বিরোধের বুনিয়াদ ধসিয়ে দেয়া যায় এবং যেখানে জাহেলী যুগের রসম-রেওয়াজের জন্যে কোনো অবকাশই রাখা হয়নি। বর্ণিত অঙ্গীকারের দফাসমূহ ছিল সর্বকালীন সময়ের জন্য যথার্থ। এ অঙ্গীকার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরাইশ, ইয়াসরেবী (আনসার), তাদের অধীনস্থ এবং তাদের সাথে যুক্ত হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুমিন মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে-

১। এরা সবাই অন্য সকল মানুষ থেকে একটি ভিন্ন উম্মত।

২। কুরাইশ মুহাজিররা তাদের পূর্বতন অবস্থা অনুযায়ী পরস্পরে রক্তপণ আদায় করবে। মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত পন্থায় সুবিচারমূলকভাবে কয়েদীদের ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দেবে। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বতন রীতি অনুযায়ী পরস্পরে রক্তপণ আদায় করবে। তাদের সকল দল প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবং ঈমানদাররা নিজ কয়েদীদের ফিদিয়া আদায় করবে।

৩। ঈমানদাররা নিজেদের নিঃসম্বল কাউকে ফিদিয়া বা রক্তপণের ব্যাপারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দান ও উপঢৌকন থেকে বঞ্চিত করবে না।

৪। যারা তাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলমান তাদের বিরোধিতা করবে। অথবা ঈমানদারদের মধ্যে যারা যুলুম-অত্যাচার, পাপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুমিন মুসলমান তাদের বিরোধিতা করবে।

৫। মুমিনরা সম্মিলিতভাবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে থাকবে। অন্যায়কারী তাদের যে কারো সন্তান হোক, এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না।

৬। কোনো মুমিন আরেক মুমিনকে কোনো কাফিরের হত্যার বদলে হত্যা করবে না।

৭। কোনো মুমিন অন্য মুমিনের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য সহায়তা করবে না।

৮। আল্লাহর যিম্মা (অংগীকার) হবে এক। একজন সাধারণ মানুষের দেয়া অঙ্গীকারও সকল মুসলমানের উপর প্রযোজ্য হবে।

৯। যে সকল ইহুদী আমাদের অনুগত হবে, তাদের সাহায্য করা হবে। তারা অন্যান্য মুসলমানের মতোই ব্যবহার পাবে। তাদের উপর কোনো প্রকার যুলুম-অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

১০। মুসলমানদের সন্ধি সমঝোতা হবে অভিন্ন। কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে অন্যের সাথে আপস করবে না। বরং সকলেই সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে চুক্তি বা অংগীকারে আবদ্ধ হবে।

১১। আল্লাহর পথে জিহাদে প্রবাহিত রক্তের ক্ষেত্রে সকল মুসলমানই অভিন্ন বিবেচিত হবে।

১২। কোনো মুসলমানই কুরাইশ মুশরিকদের কাউকে জান মালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দিতে পারবে না। আর তার নিরাপত্তার জন্যে কোনো মুমিনের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

১৩। কেউ যদি কোনো মুমিনকে হত্যা করে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এর পরিবর্তে তার কাছ থেকে কিসাস আদায় করা হবে অর্থাৎ হত্যার অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাকেও হত্যা করা হবে। তবে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কিসাস নেয়া যাবে না।

১৪। এক্ষেত্রে সকল মুমিন, যালিমের বা হত্যাকারীর বিরোধিতা করবে। অন্যদের তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু হালাল হবে না।

১৫। কোন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী বা বেদয়াতীকে সাহায্য করা এবং তাকে আশ্রয় দেয়া মুমিনের জন্যে বৈধ হবে না। যদি কেউ তাকে আশ্রয় দেয় বা সাহায্য করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর গযব ও লা'নত বর্ষিত হবে। তার ফরয নফল কোনো ইবাদাতই কবুল হবে না।

www.nagorikpathagar.org

১৬। তোমাদের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী মীমাংসা করবে। (ইবনে হিশাম)

এভাবেই দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নতুন সমাজের ভিত শক্তিশালী করে তোলেন। তবে সমাজের বাহ্যিক দিক প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিম্ব ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বদৌলতে সে সমাজ থেকে সাহাবায়ে কেরামের মতো সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, আত্মশুদ্ধি, উন্নত স্বভাব চরিত্র গঠনে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতেন। তাদের ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সম্মান মর্যাদা এবং ইবাদত বন্দেগীর নিয়ম কানুন শেখাতেন। একজন সাহাবী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ইসলাম উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ইসলামের কোন আমল উত্তম? বিশ্বনবী বলেছিলেন, তুমি অন্যদের খাবার দাও এবং চেনা অচেনা সবাইকে সালাম করো (বুখারী)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর আমি তাঁর কাছে হাযির হই। তাঁর পবিত্র চেহারা দেখেই আমি ভালোভাবে বুঝে ফেলি, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদী মানুষের নয়। এরপর তিনি প্রথম কথা এটাই বলেছিলেন, হে লোকসকল, সালামের প্রসার ঘটাতে থাক, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন নামায পড়, জান্নাতে নিরাপদে প্রবেশ করবে (তিরমিযী; ইবনে মাজা)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার দুর্বৃত্তপনা এবং ধ্বংসকারিতা থেকে নিরাপদ নয় (বুখারী)। সে ব্যক্তিই মুসলমান, যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে (বুখারী)। তোমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্যে পছন্দ করা জিনিস নিজের ভাইয়ের জন্যে পছন্দ না করবে (বুখারী)। সকল মুমিন একজন মানুষের মত। যদি তার চোখে ব্যথা হয়, তবে সারা দেহে সে কষ্ট অনুভূত হয়। যদি মাথায় ব্যথা হয়, তবে সারা দেহে সে ব্যথার কষ্ট অনুভূত হয় (মুসলিম)।

বিশ্বনবী ঘোষণা করেন, মুমিন, মুমিনের জন্যে ইমারতস্বরূপ। যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তি যোগায় (বুখারী, মুসলিম)। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ

www.nagorikpathagar.org

পোষণ করো না, শক্রতা করো না, একে অন্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না। প্রত্যেকে আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাক। কোনো মুসলমানের জন্যে নিজের ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করে থাকা বৈধ নয় (বুখারী)। মুসলমান মুসলমানের ভাই। একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের উপর যুলুম না করে এবং তাকে শত্রুর হাতে তুলে না দেয়। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দুঃখসমূহকে দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন (বুখারী, মুসলিম)। তোমরা যমীনের অধিবাসীদের উপর দয়া কর, আকাশের মালিক তোমাদের উপর দয়া করবেন (তিরমিযী, আবু দাউদ)। সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায়, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে (মিশকাত)। মুসলমানকে গালাগাল দেয়া ফাসেকের কাজ। মুসলমানের সাথে মারামারি কাটাকাটি করা কুফরী (বুখারী)। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকা এবং এ কাজ ঈমানের শাখাসমূহের একটি বলে গণ্য হবে (বুখারী, মুসলিম)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাকা ও দান খয়রাতের উপদেশ দিতেন। তিনি সদাকা ও দান খয়রাতের এমন উত্তম ফযীলত বর্ণনা করতেন, যাতে আপনা থেকেই সেদিকে মন আকৃষ্ট হত। 'তিনি বলতেন, সদাকা গুনাহসমূহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভিয়ে দেয় (তিরমিযী; ইবনে মাজা)। যে মুসলমান কোনো নগ্ন মুসলমানকে পোশাক পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। যে মুসলমান কোন পিপাসিত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে ছিপি আঁটা শরাবান তহুরা পান করাবেন (তিরমিযী; আবু দাউদ)। খেজুরের এক টুকরো দান করে হলেও আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি সেটুকুর সামর্থ্যও না থাকে, তবে ভালো কথার মাধ্যমে নিজেকে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর (বুখারী)।

একই সাথে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকার জন্যে উপদেশ দিতেন। তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং অল্পে তুষ্টির ফযীলত শোনাতেন। ভিক্ষাবৃত্তিকে ভিক্ষুকের চেহারায় আঁচড় এবং খুজলি পাঁচড়ার যখম

বলে আখ্যায়িত করতেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)। তবে এ থেকে তাদেরকে ব্যতিক্রম বলেছেন, যারা একান্ত নিরুপায় হয়েই ভিক্ষা করে। তিনি কোন প্রকার ইবাদতের কি ফযীলত এবং আল্লাহর কাছে সেসব ইবাদতের কি রকম সওয়াব রয়েছে তাও বলতেন। আকাশ থেকে তাঁর কাছে যে ওহী আসত, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের সে ওহীর সাথে যুক্ত করে রাখতেন, মুসলমানদের তা পড়ে শোনাতেন এবং তাঁর কাছ থেকে শোনার পর মুসলমানরা তাঁকে পড়ে শোনাত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে যেন বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, চিন্তা, গবেষণা, দাওয়াত ও তাবলীগের নবীসুলভ দায়িত্বানুভূতি ও 'সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের অন্তর্নিহিত শক্তি সমুন্নত করেছেন। তাদের আল্লাহর দেয়া সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে উন্নত করেছেন। তাদের উন্নত আচার আচরণ ও কর্মকাণ্ডের মালিক বানিয়েছেন, যেন মানব ইতিহাসে আম্বিয়ায়ে কেরামের পর তারা মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে উচ্চতর নমুনা হতে পারেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মৃত ব্যক্তির (সাহাবাদের) আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। সাহাবারা ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী, উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, পুণ্যপ্রাণ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বাধিক নিঃসংকোচ। আল্লাহ এ সকল মানুষকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধু ও সাথী এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। কাজেই তাদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানা, তাদের পদাংক অনুসরণ করা জরুরী। যতোটা সম্ভব তাদের চরিত্র মাধুর্য এবং জীবনচরিত আত্মস্থ করা উচিত। কেননা তারা হিদায়াতের সহজ, সোজা ও সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (মিশকাত)।

বিশ্বনবীর মদীনায় শান্তির মহাদ্যোগ ঃ

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা, সম্মান, মর্যাদা, উত্তম স্বভাব চরিত্র ও সুন্দর আমলের বৈশিষ্ট্যের উন্নত মহামানব ছিলেন। যাতে মন আপনা আপনি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়, জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা জাগে। ফলে তাঁর পবিত্র মুখনিসৃত কথা পালন করতে সাহাবারা ছুটে যেতেন। হিদায়াত ও পথনির্দেশের যেসব কথা তিনি বলতেন, সেকথা

www.nagorikpathagar.org

যথাযথভাবে পালন করতে সাহাবাদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। এ ধরনের প্রচেষ্টার কল্যাণেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এমন একটি সমাজ গঠনে সক্ষম হন, যা ইতিহাসের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যময় এবং মর্যাদাপূর্ণ সমাজ ছিল। তিনি সে সমাজের সমস্যাসমূহের এমন চিত্তকর্ষক সমাধান বের করেন, মানবতা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কালের চাকায় পিষ্ট হয়ে এবং ঘোর অন্ধকারে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এরপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সে নতুন সমাজের উপাদানসমূহে এমন উন্নত শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে, যা পুরো ইতিহাসের ধারাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। যা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। হিজরতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস, রাজনীতি, একতা, শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে অমুসলিমদের সাথে নিজের সম্পর্ক সুবিন্যস্তকরণের উদ্যোগ নেন। তিনি চাচ্ছিলেন, সকল মানুষ সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য ও বরকতে পূর্ণ হোক। সাথে সাথে মদীনা এবং আশপাশের এলাকায় শৃংখলা এবং সুব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হোক। তিনি উদারতা ও মানসিক প্রশস্ততার এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করলেন, যা গোঁড়ামি, বাড়াবাড়ি এবং চরম পন্থায় ভরা তখনকার বিশ্বে কোনো সমাজ চিন্তাও করে নি।

মদীনার সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছিল ইহুদীরা। তারা পর্দার আড়ালে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করত। অথচ তারা বিরোধিতা ও ঝগড়াঝাটির প্রকাশ ঘটাত না। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হন। সে চুক্তিতে তাদের দ্বীন, ধর্ম পালন এবং জান মাল রক্ষার নিরংকুশ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির দফাসমূহ ছিল শান্তিপূর্ণ ও সহ-অবস্থানের মাইলফলকস্বরূপ।

১। বনু আওফের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে এ উম্মত হিসেবে বিবেচিত হবে। ইহুদী ও মুসলমান নিজ নিজ দ্বীনের উপর আমল করবে। স্বয়ং তাদের গোলাম এবং সংশ্লিষ্টদেরও এ অধিকার থাকবে। বনু আওফ ছাড়া অন্য ইহুদীরাও এ রকমের অধিকার ভোগ করবে।

২। ইহূদী এবং মুসলমানরা নিজ নিজ ব্যয়ের জন্যে দায়ী হবে। তাদের নির্বাসিত করা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা অথবা ঝগড়ার রাজনীতির পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

৩। যে কোনো শক্তি এ চুক্তির আওতাভুক্ত কোনো দলের সাথে যুদ্ধ করলে সবাই সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ আক্রান্ত দলকে সাহায্য সহযোগিতা করবে।

৪। এ চুক্তি অংশীদারদের পরস্পরের সম্পর্ক, কল্যাণ কামনা, কল্যাণ চিন্তা ও পরস্পরের উপকার সাধনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে; অন্যায়ের উপর নয়।

৫। কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের কারণে অপরাধী বিবেচিত হবে না।

৬। মযলুমকে সাহায্য করা হবে।

৭। যতোদিন যাবত যুদ্ধ চলতে থাকবে, ততোদিন ইহুদীরাও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

৮। এ চুক্তি অংশীদারদের সকলের জন্যে মদীনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে।

৯। এ চুক্তি অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে কোনো নতুন সমস্যা দেখা দিলে বা ঝগড়া-বিবাদ হলে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাসূল তা সমাধান করবেন এবং ইহুদীদের তার মীমাংসা করবেন।

১০। কুরাইশ এবং তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় প্রদান করা হবে না।

১১। ইয়াসরেবের (মদীনার) উপর কেউ হামলা করলে সে হামলা মুকাবিলায় সবাই পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। সকল পক্ষ নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

১২। এ চুক্তি কোনো অত্যাচারী বা অপরাধীর জন্যে আড়াল হবে না (ইবনে হিশাম)।

এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মদীনা এবং তার আশেপাশের এলাকা একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সে রাষ্ট্রের রাজধানী মনোনীত হয় মদীনা। রাসূল ছিলেন সে রাষ্ট্রের মহানায়ক। এর মূল কর্তৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। এভাবেই বাস্তবে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হয়। শান্তি ও নিরাপত্তার বৃত্ত আরো সম্প্রসারিত করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী সময়ে অন্যান্য গোত্রের সাথেও এ রকম চুক্তি করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও পরিণতি

মুসলমানরা হিজরত শুরু করলে কাফিররা তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। মুসলমানরা কাফিরদের কবল থেকে বেরিয়ে গেছে এবং মদীনায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, এটা দেখে কাফিরদের ক্রোধ আরো বেড়ে

www.nagorikpathagar.org

গিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনও খোলাখুলি মুশরিক ছিল। মদীনায় সে ছিল আনসারদের নেতা। সে সময় মদীনায় আবদুল্লাহর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কেননা, আনসাররা তার নেতৃত্বের উপর একমত হয়েছিল। এমনকি সে সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মদীনায় না যেতেন, তবে মদীনাবাসী তাকে তাদের রাজা বা নেতা হিসেবে গ্রহণ করত। মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের হুমকিপূর্ণ চিঠিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সহযোগীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিল, আপনারা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, হয়ত আপনারা তার সাথে লড়াই করুন অথবা তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন। যদি না করেন তবে আমরা সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাদের যোদ্ধা পুরুষদের সবাইকে হত্যা করব এবং আপনাদের মহিলাদের সম্মান বিনষ্ট করব (আবু দাউদ)। এ চিঠি পাওয়ার পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মক্কার মুশরিকদের নির্দেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হন। তার মনে আগে থেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল। কেননা তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তার কাছ থেকে মদীনার রাজমুকুট কেড়ে নিয়েছেন। মক্কার মুশরিকদের চিঠি পাওয়ার পর পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মূর্তিপূজার সহযোগীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হন। এ খবর পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে বলেন, কুরাইশদের হুমকিতে তোমরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছ মনে হচ্ছে। শোনো, তোমরা নিজেরা নিজেদের যতো ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছ, মক্কার কুরাইশরা তার চেয়ে তোমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কি নিজেদের সন্তান এবং ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করতে চাও? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ কথা শোনার পর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত আবদুল্লাহর সহযোগীরা ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায় (আবু দাউদ)।

সমর্থক সহযোগীরা ছত্র ভঙ্গ হওয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনকার মত যুদ্ধ থেকে বিরত হয়। পর্দার অন্তরালে কুরাইশদের সাথে তার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এ দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে অনিষ্ট, ফাসাদ, বিশৃংখলা, সংঘাত সৃষ্টির কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না। উপরন্তু মুসলমানদের বিরোধিতায় শক্তি অর্জনের জন্যে ইহূদীদের সাথেও ঘোর যোগাযোগ রক্ষা করত। যেন প্রয়োজনের সময় ইহুদীরা তাকে সাহায্য করে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার কৌশলে অশান্তি ও বিশৃংখলার আগুন নির্বাপিত করতেন (বুখারী)। একবার হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) ওমরা পালনের

www.nagorikpathagar.org

জন্যে মক্কায় গিয়ে উমাইয়া ইবনে খালফের মেহমান হন। তিনি উমাইয়াকে বলেন, আমি একটু নিরিবিলি সময়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করতে চাই। উমাইয়া ভর দুপুরে হযরত সা'দকে নিয়ে বের হলে আবু জাহলের সাথে দেখা হয়। সে উমাইয়াকে বলল, আবু সাফওয়ান, তোমার সঙ্গে আসা এ লোকটির পরিচয় কি? উমাইয়া জবাব দেয়, ইনি হচ্ছেন সা'দ ইবনে মা'য়ায। আবু জাহেল হযরত সা'দকে সম্বোধন করে বলল, তুমি দেখছি বড়ো নিবিষ্ট মনে তাওয়াফ করছ। অথচ তোমরা বেদ্বীনদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছ। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার ইচ্ছাও রাখ। খোদার কসম, তুমি যদি আবু সাফওয়ানের মেহমান না হতে, তবে তোমাকে নিরাপদে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হত না। একথা শুনে হযরত সা'দ (রা.) উচ্চৈঃস্বরে বলেন, শোন, তুমি যদি আমাকে তাওয়াফ থেকে বিরত রাখ, তবে আমি তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা মদীনার কাছ দিয়ে যেতে দেব না, সেটা কিন্তু তোমার জন্যে আমার চেয়ে গুরুতর ব্যাপার হবে (বুখারী)। এদিকে কুরাইশরা মুসলমানদের খবর পাঠালেন, তোমরা মনে করো না, মক্কা থেকে গিয়ে নিরাপদে থাকবে; আমরা ইয়াসরেব পৌছে তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়ব। (রাহমাতুললিল আলামীন)।

এটা শুধু হুমকি ছিল না; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্তিশালী সূত্রে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এবং অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হন। ফলে তিনি কখনও কখনও সারারাত জেগে কাটাতেন। আবার কখনও কখনও সাহাবায়ে কেরামের প্রহরাধীনে রাত যাপন করতেন। পাহারার ব্যবস্থা বিশেষ কয়েকটি রাতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না; বরং এটা অব্যাহত স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাত্রিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করা হত। অতপর পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানুষদের থেকে হিফাযত রাখবেন।' এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামরা বা ঘর থেকে মাথা বের করে বলেন, হে লোকেরা তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিরাপদ করে দিয়েছেন (তিরমিযী)। নিরাপত্তাহীনতার এ শঙ্কা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য ছিল। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীরা মদীনায় আসার পর আনসাররা তাদের আশ্রয় প্রদান করেন। মদীনার আনসাররা অস্ত্র ছাড়া রাত যাপন করতেন না এবং অস্ত্র ছাড়া ভোর করতেন না।

www.nagorikpathagar.org

এসব শংকাজনক পরিস্থিতি মদীনার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যে ছিল বিশেষ হুমকি ও বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। যা থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছিল, কুরাইশরা হঠকারিতা, দুষ্কৃতি থেকে বিরত হবার নয়। তখন আল্লাহ মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেন। তবে এ যুদ্ধকে ফরয বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। এ সময় আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করেন, যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা যাচ্ছে, কেননা তারা মযলুম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এ আয়াতের সাথে আরো কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। সে সকল আয়াতে বলা হয়েছে, যুদ্ধ করার এ অনুমতি নিছক যুদ্ধের জন্যে নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল বা মিথ্যার মূল উৎপাটন এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রতিষ্ঠা। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন 'আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে (সূরা হজ্জ)। এ অনুমতি হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছিল, তবে নাযিলের সঠিক সময় নির্ধারণ করা কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ সীমানা বিস্তৃত করার জন্যে দু'টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। (১) যেসব গোত্র মক্কা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য পথের আশেপাশে অথবা সে পথ থেকে মদীনার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করা। (২) সে পথে টহলদানকারী কাফেলা প্রেরণ করা।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামরিক অভিযান শুরুর আগে জুহায়না গোত্রের সাথেও ইহুদীদের অনুরূপ একটি বন্ধুত্ব, সহায়তা দান এবং অনাক্রমণ চুক্তি করেন। এ গোত্র মদীনা থেকে ৪৫ কিঃ মিঃ দূরে বাস করত। এছাড়া বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কয়েকটি সহগোত্রীতার চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছারিয়্যা ও গাযওয়া (যুদ্ধ ও অভিযান) সম্পর্কিত। যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের পর বর্ণিত পরিকল্পনাদ্বয় বাস্তবায়নের জন্যে কার্যত মুসলমানদের সেনা অভিযান শুরু হয়। সেনা দল নৈশ টহল দিতে থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশেপাশের রাস্তায় সাধারণভাবে এবং মক্কার আশেপাশের রাস্তায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, একই সাথে সেসব রাস্তার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা এবং ইয়াসরেবের মুশরিক, ইহুদী ও আশেপাশের বেদুঈনদের মনে করিয়ে দেয়া যে, মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা অতীতের দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা কাটিয়ে ওঠেছে। উপরন্তু এর মাধ্যমে কুরাইশদের অযথা

www.nagorikpathagar.org

ক্রোধ এবং আচরণের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখানো যে, নির্বুদ্ধিতার ফলে তারা ধসে যেতে চলেছে। এতে তাদের হুঁশ আসবে এবং তাদের অর্থনীতি ও জীবনোপকরণ হুমকির সম্মুখীন দেখে সন্ধি-সমঝোতার প্রতি ঝুঁকবে। আর মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে, তাদের নিঃশেষ করার যে সংকল্প পোষণ করছে; আল্লাহর পথে যে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাচ্ছে; মক্কায় দুর্বল মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন করছে; সেসব থেকে বিরত হবে। ফলে জাযিরাতুল আরবে আল্লাহর দাওয়াত পৌছানোর কাজ মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রশস্ত হবে।

হিজরত পরবর্তী মদীনা হতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচালিত মূল যুদ্ধসমূহ

বদর যুদ্ধ (২য় হিজরী, ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ)

বদর যুদ্ধের আগে আটটি যুদ্ধ (গাযওয়া এবং সারিয়া) সংঘটিত হয়। রমযান প্রথম হিজরী, মার্চ ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-কে সারিয়ায়ে সিফুল বাহার অভিযানের সেনানায়ক মনোনীত করেন। ত্রিশ জন মুহাজিরকে তার নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে আগত কুরাইশ কাফেলার খোঁজ নিতে প্রেরণ করেন। এ কাফেলায় ছিল তিনশ মুশরিক। যাদের মাঝে আবু জাহেলও ছিল। মুসলমান সেনাদল ঈসের (ঈস লোহিত সাগর এলাকায় ইয়াম্বু ও মারওয়ার মাঝখানে অবস্থিত এক জায়গার নাম) আশপাশের এলাকায় সমুদ্র উপকূলে কুরাইশ কাফেলার মুখোমুখি হয়। উভয়পক্ষ যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জুহায়না গোত্রের সরদার মাজদী বিন আমর, যিনি উভয় পক্ষের মিত্র ছিলেন; তিনি উভয় পক্ষের মাঝে দৌড় ঝাঁপ করে যুদ্ধ হতে দেননি। হযরত হামযার (রা.) নেতৃত্বাধীন সেনাদলের ঝাণ্ডাই ইসলামের প্রথম ঝাণ্ডা, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে হস্তান্তর করেছিলেন। এর রং ছিল সাদা এবং বাহক ছিলেন হযরত আবু মারসাদ কান্নায বিন হোসাইন গানাবী (রা.)।

শাওয়াল প্রথম হিজরী, এপ্রিল ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওবায়দা বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিবকে সারিয়ায়ে রাবেগ অভিযানে ষাট জন ঘোড়সওয়ারসহ প্রেরণ করেন। রাবেগ প্রান্তরে এ বাহিনী আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হয়। আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল দু'শ। উভয়পক্ষ পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, কিন্তু ঘটনা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি। এ সারিয়ায় মক্কার

www.nagorikpathagar.org

লোকদের মধ্যে থেকে দু'ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হয়। তাদের একজন হযরত মিকদাদ ইবনে আমর আল বাহরানী, অন্যজন ওতবা ইবনে গাওয়ান আল মাযেনী (রা.)। এ দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা মুশরিকদের কাফেলার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। হযরত ওবায়দার (রা.) বাহিনীর অভিযানের সাদা পতাকা ছিল, হযরত মেসতাহ্ বিন আসাসা বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফের (রা.) হাতে।

যিলক্বদ প্রথম হিজরী, মে ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে সারিয়ায়ে খাররার (খাররার জোহ্ফার নিকটবর্তী এক জায়গার নাম) বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে বিশ জন সৈন্য দিয়ে এক কুরাইশ কাফেলার সন্ধানে প্রেরণ করেন। এ কাফেলাকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন খাররার নামক জায়গার পরে অগ্রসর না হন। এ কাফেলা পদব্রজে রওয়ানা হয়েছিল। তারা রাত্রিকালে সফর করতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। পঞ্চম দিন সকালে এ কাফেলা খাররার পৌঁছে খবর পেল, কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা একদিন আগেই খাররার ত্যাগ করেছে। কোন যুদ্ধ হয়নি। এ অভিযানের পতাকা ছিল সাদা এবং হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা.) তা বহন করেছিলেন।

সফর দ্বিতীয় হিজরী, আগস্ট ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান অভিযানে সত্তর জন মুহাজিরসহ নিজেই অংশগ্রহণ করেন। সে সময় তিনি মদীনায় হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-কে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ করা। তিনি ওয়াদ্দান পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু যামরা গোত্রের সর্দার আমর ইবনে মাখশী আয যামরীর সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির বক্তব্য ছিল চমৎকার। 'বনু যামরার জন্যে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখা। তারা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপদ থাকবে। তাদের উপর কেউ হামলা করলে হামলাকারীর বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অবশ্য তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে এ অঙ্গীকার পালন করা হবে না। সমুদ্র যতোদিন তার সৈকত সিক্ত করবে, ততোদিন এ চুক্তির কার্যকারিতা অটুট থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের সাহায্যের জন্যে ডাকবেন, তখন তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

রবিউল আউয়াল দ্বিতীয় হিজরী, সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে গাযওয়ায়ে বুয়াত অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'শ সাহাবীসহ অংশগ্রহণ করেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা। এ কাফেলায় উমাইয়া ইবনে খালফসহ কুরাইশদের একশ মুশরিক এবং আড়াই হাজার উট ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাযওয়া এলাকায় অবস্থিত বুয়াত পর্যন্ত পৌছেন। কিন্তু কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ অভিযানের সময় হযরত সাদ বিন মায়ায (রা.)-কে মদীনায় আমীর নিযুক্ত করা হয়। এ অভিযানের পতাকার রং ছিল সাদা, যা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বহন করেছিলেন।

রবিউল আউয়াল দ্বিতীয় হিজরী, সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোরয ইবনে জাবের অল্প কিছু মুশরিক সৈন্য নিয়ে মদীনার চারণভূমিতে হামলা করে এবং কয়েকটি গবাদিপশু লুট করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেহরী গাযওয়ায়ে সাফওয়ান অভিযানে সত্তর জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে লুটেরাদের ধাওয়া করে বদরের পাশে অবস্থিত সাফওয়ান পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু কোরয এবং তার সঙ্গীরা নিরাপদে পালিয়ে যায়। কোনো প্রকার সংঘাত ছাড়াই মুসলিম বাহিনী ফিরে আসে। এ যুদ্ধকে কেউ কেউ প্রথম বদর যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। এ বাহিনীর পতাকার রং ছিল সাদা এবং হযরত আলী (রা.) তা বহন করেছিলেন। এ অভিযানের সময় হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল।

জমাদিউল আউয়াল বা জমাদিউস সানি, দ্বিতীয় হিজরী; নভেম্বর বা ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে গাযওয়া যিল ওশায়রা অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেড়শ অথবা দু'শ মুহাজির ছিলেন। এ অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্যে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। সওয়ারীর জন্যে উটের সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ। তাই সবাই পালাক্রমে উটে সওয়ার হয়েছিলেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এক কুরাইশ কাফেলা। কাফেলা সিরিয়ায় যাচ্ছিল এবং জানা গিয়েছিল, তারা মক্কা থেকে যাত্রা করেছে। ঐ কাফেলাকে ধাওয়া করতে যিল ওশায়রা অভিযান পরিচালিত হয়। এ কাফেলায় কুরাইশদের প্রচুর মালামাল ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাফেলার খোঁজে যুল ওশায়রা নামক জায়গা পর্যন্ত পৌছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগেই কাফেলা চলে গিয়েছিল। ঐ কাফেলাটি মক্কায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ ঘটনার জের হিসেবেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মত দিয়েছেন। এ অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম বনু মোদলেজ ও তাদের মিত্র বনু যামরার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদান করেন। এ অভিযানকালে মদীনার নেতৃত্বের দায়িত্ব হযরত আবু সালামা বিন আবদুল আসাদ মাখযুমী পালন করেন। এ অভিযানের পতাকার রং ছিল সাদা, যা হযরত হামযা (রা.) বহন করেন।

রজব দ্বিতীয় হিজরী, জানুয়ারী ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে গারিয়ায়ে নাখলা অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)-এর নেতৃত্বে বারো জন মুহাজিরের একটি দল প্রেরণ করেন। প্রতি দুজনের জন্যে একটি উট ছিল। তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। রওনার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতির হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, দুদিন সফর শেষে যেন তা পাঠ করা হয়। নির্ধারিত সময় পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) চিঠিখানি খুলে পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিল, আমার এ চিঠি পাঠ করার পর তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলায় অবতরণ করবে এবং সেখানে কুরাইশদের একটি কাফেলার অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকবে এবং আমাদের জন্যে এ কাফেলার খোঁজ নেবে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) পত্র পাঠ করে বলেন, শুনলাম এবং মানলাম। সঙ্গীদের চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, আমি কারো উপর জোর-জবরদস্তি করছি না, শাহাদাত যার প্রিয় সে ওঠো; আর শত্রু যার অপছন্দ সে ফিরে যাও। বাকী রইল আমার ব্যাপার। আমি যদি একা থেকে যাই তবুও সামনে অগ্রসর হব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)-এর বক্তব্য শোনার পর তার সব সংগী উঠে নাখলা অভিমুখে রওনা হন। পথে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রা.)-এর উট উধাও হয়ে যায়। এ উটের পিঠেই তারা পালাক্রমে সফর করছিলেন। উট হারিয়ে যাওয়ায় তারা পিছনে পড়ে যান। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) নাখলায় পৌঁছেন। সে পথ দিয়ে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করছিল। কাফেলায় কিশমিশ, চামড়া এবং অন্যান্য ব্যবসার পণ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কাফেলায় আবদুল্লাহ ইবনে মুগীরার দুই পুত্র ওসমান ও নওফাল, আমর ইবনে হাদরামী, হাকিম ইবনে কায়সান এবং মুগীরার মুক্ত করা এক দাসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান বাহিনী নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। সেদিন ছিল রজব মাসের শেষ দিন। রজব হচ্ছে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস। যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে হারাম মাসের অমর্যাদা করা হবে। অন্যদিকে যদি হামলা না করে রাত ভর অপেক্ষা করা হয়, তবে কুরাইশদের এ কাফেলা হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করবে। অতএব হামলার সিদ্ধান্ত হয়। মুসলিম বাহিনীর একজন কুরাইশ

www.nagorikpathagar.org

কাফেলার আমর ইবনে হাদরামীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন। এতে সে ধরাশায়ী হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। অন্যরা ওসমান এবং হাকিম বিন কায়সানকে গ্রেফতার করেন। নওফাল পালিয়ে যায়। তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর সাহাবীরা উভয় বন্দী এবং তাদের কাফেলার জিনিসপত্র নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। সাহাবীরা প্রাপ্ত গনীমত থেকে এক পঞ্চমাংশও বের করে নিয়েছিলেন। এটা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ; প্রথম শত্রু নিহত এবং প্রথম কাফির বন্দী। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনীর কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমি তো তোমাদের হারাম (যুদ্ধ নিষিদ্ধ) মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি, তবে কুরাইশ কাফেলা থেকে আটককৃত মালামাল এবং বন্দীদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করেননি।

এ ঘটনায় অমুসলিমরা প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ পেয়ে যায়। মুসলমানরা আল্লাহর হারাম করা মাসকেও হালাল করে নিয়েছে। এ নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা হয়। অবশেষে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার রহস্য ফাঁস করে দিয়ে বলেন, 'মুশরিকরা যা কিছু করেছে, তা মুসলমানদের আচরণ থেকে অনেকগুণ বেশি অপরাধ। এরশাদ হচ্ছে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা; আল্লাহর কাছে তদপেক্ষা বড় অন্যায়। আর ফেতনা হত্যা অপেক্ষা অনেক গুরুত্বর (সূরা বাকারা, ২১৭)। এ ওহীর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুসলমানদের চরিত্র সম্পর্কে মুশরিকরা যে শোরগোল সৃষ্টি করেছিল; তার কোনো অবকাশ নেই। কেননা মুশরিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং মুসলমানদের উপর যুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা পূর্বেই উপেক্ষা করেছে। যখন হিজরতকারী মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূলকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তখন মক্কার মর্যাদা নিয়ে এত উচ্চবাচ্য কেন? প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা প্রোপাগাণ্ডার যে ঝড় সৃষ্টি করে রেখেছে, তা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা এবং খোলাখুলি বেহায়াপনার শামিল। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় বন্দীকে মুক্তি দিয়ে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তপণ দেন।

উপরে বর্ণিত এ আটটি হচ্ছে বদর যুদ্ধের আগে সংঘটিত গাযওয়া এবং সারিয়া। বর্ণিত অভিযানে কোন লুটতরাজ, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটেনি। তবে

www.nagorikpathagar.org

মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রথম হামলার ঘটনা ঘটে। কোরয ইবনে জাবের ফেহরীর নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়েছিল। তাই হামলা, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা মুশরিকদের পক্ষ থেকেই হয়েছে। এর আগেও তারা নানা প্রকারে মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় যুলুম অত্যাচার করেছে। এটা সত্য যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)-এর নেতৃত্বে অভিযানের পর মুশরিকদের ভয় ও শংকা বাস্তব হয়ে দেখা দেয় এবং সেটা তাদের সামনে স্পষ্ট ভয়ের প্রতিকৃতি হয়ে উঠে আসে। তারা বুঝতে পেরেছিল, মদীনার নেতৃত্ব অত্যন্ত জাগ্রত মস্তিষ্কসম্পন্ন। তারা মদীনায় বসে কুরাইশদের প্রতিটি বাণিজ্যিক তৎপরতার উপর নযর রাখছে। মুসলমানরা ইচ্ছা করলেই তিনশ মাইলের পথ অতিক্রম করে তাদের এলাকায় এসে তাদের হত্যাও করে যেতে পারে। তাদের বন্দী করতে এবং তাদের সম্পদ লুটতরাজ করতে পারে। অভিযানের পরও তারা নিরাপদে মদীনায় ফিরে যেতে সক্ষম। মক্কার মুশরিকরা বুঝতে পেরেছিল, তাদের সিরিয়ার বাণিজ্য স্বতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন। অথচ সবকিছু জেনে বুঝেও তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা থেকে বিরত হয়নি। জোহায়না এবং বনু যামরার মত সন্ধি সমঝোতার পথ অবলম্বনের পরিবর্তে তারা রোষ, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষে ফুঁসে উঠে সংঘর্ষের দিকে আগে বাড়ায়। এ ক্রোধই তাদের বদর প্রান্তরে সমবেত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন সারিয়ার ঘটনার পরে দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে আল্লাহ মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করে কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন। "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" "যেখানে তাদের পাবে, হত্যা করবে এবং যে জায়গা থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সে জায়গা থেকে তাদের বহিষ্কার কর। হত্যা ফেতনা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের কাছে তোমারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে। যদি তারা বিরত হয় তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতোক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তারা বিরত হয়, তবে যালিমদের ছাড়া অন্য কাউকে আক্রমণ করা চলবে না।"

একই সময়ে যুদ্ধের পদ্ধতির বিষয়ে বেশকিছু আয়াত নাযিল হয়েছে। "অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে মোকাবেলা করবে, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। পরিশেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদের

www.nagorikpathagar.org

কষে বাঁধবে, অতপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ।" "তোমরা জিহাদ চালাবে যতোক্ষণ না শত্রু তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে, এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে।" "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন, তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছেন। হে মুমিনরা, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।" (সূরা মুহাম্মদ : ৪-৭)।

আল্লাহ সেসব লোকের নিন্দাবাদ করেছেন, যাদের মন যুদ্ধের আদেশ শুনে কাঁপতে শুরু করেছিল। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোনো নির্দেশ থাকে, তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম তাদের (সূরা মুহাম্মদ-২০)। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ ফরয হওয়া, এ বিষয়ে তাগিদ দেয়া এবং তার প্রস্তুতির নির্দেশ ছিল পরিস্থিতির যথার্থ দাবী। সমকালীন অবস্থায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী একজন সেনানায়কের জন্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করাই ছিল স্বাভাবিক। প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সব কিছু সম্পর্কে অবগত সর্বশক্তিমান আল্লাহ সঠিক সময়ে জিহাদের আদেশ দিয়েছিলেন। সে সময়ের পরিস্থিতি হক ও বাতিলের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘাতকে দাবী করছিল। যাতে করে সত্যমিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.)-এর অভিযান ছিল, মুশরিকদের দাম্ভিকতা ও অহংকারের উপর এক কঠিন আঘাত।

যুদ্ধের বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোর বাচনভংগি থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাতে মুসলমানদের জয় লাভ হবে। বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন, মুশরিকরা তোমাদের যে জায়গা থেকে বের কের দিয়েছে, তোমরাও তাদের সে জায়গা থেকে বের করে দাও। এরপর কয়েদীদের বাঁধার এবং বিরোধীদের নির্মূল করে যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত পরিণতি দান করার জন্যে পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা একটি বিজয়ী সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কিত। আয়াতে ইঙ্গিতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করবে। একথা ইশারায় বলার কারণ হচ্ছে, আল্লাহর পথে জিহাদে যারা অতিমাত্রায় আগ্রহী, তারা যেন তা বাস্তবে প্রমাণ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে (৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে) আল্লাহ মুসলমানদের এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবা ঘরকে কিবলা মনোনীত করে এবং নামাযের মধ্যে যেন কাবার দিকে মুখ পরিবর্তন করে। ফলে ইহুদী ও মুশরেক, যারা শুধু অনৈক্য বিশৃংখলা ছড়ানোর জন্যেই মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করেছে, তারা মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে নিজিদের আসল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারীদের কবল থেকে মুক্ত হয়। কিবলা পরিবর্তনের মাঝে এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও নিহিত রয়েছিল যে, এখন থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। মুসলমানরা এ পরিবর্তিত কেবলার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আগে তা শেষ হবে না। কেননা, কোনো জাতির কেবলা তাদের শত্রুর কবলে থাকাটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

এ সকল নির্দেশ এবং ইশারার পর মুসলমানদের চেতনা উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তাদের জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রেরণা এবং শত্রুদের সাথে সিদ্ধান্তকর যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বহুগুন বেড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে রওনাকালে তাঁর সঙ্গে তিনশ'র কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এ সংখ্যা আনুমানিক ৩১৩। তাদের মধ্যে আনুমানিক ৮৩ জন ছিলেন মুহাজির, বাকি সকলেই আনসার। আনসারদের মধ্যে ৬১ জন আওস আর ৭০ জন খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী, যুদ্ধের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা বা তেমন কোনো প্রস্তুতি নেয়নি। সমগ্র সেনাদলে ঘোড়া ছিল মাত্র ২টি। একটি হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)-এর, অন্যটি হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দীর (রা.)। ৭০টি উট ছিল। প্রতিটি উটে দুই বা তিন জন পালাক্রমে আরোহণ করতেন। একটি উটে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ (রা.) পালাক্রমে আরোহণ করেছিলেন।

মদীনার ব্যবস্থাপনা এবং নামাযে ইমামতির দায়িত্ব প্রথমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক জায়গায় পৌঁছে হযরত আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মোনযের (রা.)-কে মদীনার ব্যবস্থাপক বানিয়ে ফেরত পাঠান। মুহাজির এবং আনসারদের পৃথকভাবে সেনাবিন্যাস করা হয়েছিল। মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং আনসারদের পতাকা হযরত মুসয়াব ইবনে ওমায়রা আবদারী (রা.) বহন করেছিলেন। হযরত যোবায়র ইবনে আওয়াম

(রা.)-কে ডান দিকের, আর মেকদাদ ইবনে আমরকে (রা.) বাম দিকের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সমগ্র বাহিনীতে এ দু'জনই ছিলেন ঘোড়সওয়ার। হযরত কায়স ইবনে আবী সাসায়া (রা.)-কেও অন্যতম অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। প্রধান সিপাহসালার দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সামান্য ও অসম্পূর্ণ সেনাদল সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে মক্কাভিমুখী প্রধান সড়ক ধরে 'বিরে রাওহা'য় (রাওহা কূপ) উপনীত হন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে মক্কার রাস্তাকে বাম দিকে রেখে ডান দিকের পথে অগ্রসর হয়ে প্রথমে নাযিয়া নামক জায়গায় পৌঁছেন। অতঃপর নাযিয়া অতিক্রম করে রাহকান প্রান্তর পার হন। পরে সাফরার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ ধরে সাফরা প্রান্তরে উপনীত হন। সাফরায় উপনীত হওয়ার পর স্থানীয় জোহায়না গোত্রের দু'সাহাবীকে কুরাইশ কাফেলার খবর সংগ্রহে বদর প্রান্তরে প্রেরণ করেন।

কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার রক্ষক ছিলেন আবু সুফিয়ান। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি জানতেন, মক্কার রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে তিনি প্রতিটি কাফেলার কাছে পথের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। অতি শিগগিরই আবু সুফিয়ান খবর পেয়ে যান, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ কাফেলার উপর হামলার আহ্বান জানিয়েছেন। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আবু সুফিয়ান যমযম ইবনে আমর গেফারীকে মোটা অর্থের বিনিময়ে মক্কায় পাঠান, যেন সে মক্কায় পৌঁছে বাণিজ্য কাফেলার হেফাযতের জন্যে কুরাইশদের মাঝে সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে। যমযম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মক্কায় পৌঁছে আরবদের রীতি অনুযায়ী উটের নাক চিরে, লাগাম উল্টিয়ে, নিজের পোশাক ছিঁড়ে মক্কার প্রান্তরে, উটের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, কুরাইশরা শোনো, কাফেলা, কাফেলা। তোমাদের সেসব ব্যবসায় পণ্য পাবে বলে আমার বিশ্বাস নেই। অতএব সাহায্য-সাহায্য-সাহায্য।

যমযম গেফারীর ঘোষণা শুনে মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে আসে। তারা বলল, মুহাম্মদ এবং তার সাথীরা মনে করেছে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা ইবনে হাদরামীর কাফেলার মতো। না, মোটেই তা নয়। আমাদের ব্যাপারটা যে অন্যরকম, আল্লাহর কসম, তা সে টের পাবে। অতএব সমগ্র মক্কায় দু'ধরনের লোক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তাদের কেউ কেউ নিজেই যুদ্ধের জন্যে বের হল; কেউ বা নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রেরণ করল। এভাবে সবাই বেরিয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবু লাহাব ব্যতীত অন্য কেউ পিছনে থাকেনি। সে নিজের পরিবর্তে তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহীতা এক লোককে প্রেরণ করে। আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে কুরাইশরা সেনাদলে ভর্তি করে। কুরাইশ গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু আদী ব্যতীত অন্য কোনো গোত্রই পিছনে থাকেনি। তাদের কেউ এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

প্রথম দিকে মুশরিকদের মক্কী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৩০০। তাদের কাছে একশ ঘোড়া এবং ছয়শ বর্ম ছিল। উটের সংখ্যা ছিল অনেক। মুশরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিল আবু জাহেল ইবনে হেশাম। কুরাইশদের নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ বাহিনীর খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব নেয়। একদিন নয়টি, অন্যদিন দশটি উট যবাই করা হত। মক্কার সেনাদল রওনা হওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতেই কুরাইশদের মনে পড়ল, বনু বকর গোত্রের সাথে তাদের শত্রুতা ও যুদ্ধ চলছে। ওরা পিছন থেকে হামলা না করে বসে? কুরাইশদের মনে এমন একটা শংকা জাগে। ফলে কুরাইশদের সামরিক অভিযান স্থগিত হওয়ার উপক্রম হয়। ঠিক সে সময় অভিশপ্ত ইবলীস বনু কেনানা গোত্রের সর্দার সোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জোশেম মোদলেজীর চেহারা ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে কুরাইশ নেতাদের বলল, আমি তোমাদের বন্ধু। বনু কেনানা তোমাদের পিছনে আপত্তিকর কোনো কাজ করবে না, আমি তোমাদের এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

আল্লাহ বলেন, লোকেরা নিজেদের শান দেখিয়ে আল্লাহর পথ থেকে বিরত করতে করতে গর্বভরে মদীনাভিমুখে রওনা হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওরা বের হল, নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র, আল্লাহর প্রতি বিরক্তি এবং তাঁর প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসন্তুষ্টি নিয়ে, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়, ক্রোধে অধীর হয়ে। তারা দাঁত কিড়মিড় করে বলছিল, মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীদের মক্কার বাণিজ্য কাফেলার প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সাহস হল কি করে? খুবই দ্রুতগতিতে তারা উত্তর দিকে বদর প্রান্তর অভিমুখে এগিয়ে চলে। তারা ওসফান এবং কোদায়দ প্রান্তর অতিক্রম করে জোহফায় উপনীত হয়। সেখানে আবু সুফিয়ানের প্রেরিত নতুন এক পয়গাম তাদের হস্তগত হয়। তাতে বলা হয়, তোমরা নিজেদের কাফেলা এবং সম্পদ রক্ষার জন্যে বেরিয়েছিলে, আল্লাহ যেহেতু সব কিছু হেফাযত করেছেন, কাজেই এখন তোমরা ফিরে যাও।

হঠাৎ করে পরিস্থিতির এমন ভয়ানক পরিবর্তনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ পর্যায়ের এক সেনা মজলিসে শূরার (সামরিক পরামর্শ পরিষদ) বৈঠক আহ্বান করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সেনা অধিনায়ক

www.nagorikpathagar.org

এবং সাধারণ সৈন্যদের মতামত নেয়া হয়। এ সময় কিছুসংখ্যক মুসলমান রক্তাক্ত সংঘর্ষের কথা শুনে কেঁপে ওঠেন এবং তাদের মন ধু ধু করতে শুরু করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ থেকে বের করেছিলেন, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করতে থাকে, মনে হচ্ছিলো যেন তারা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে (সূরা আনফাল : ৫-৬)।

সেনা অধিনায়কদের মতামত চাওয়া হলে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) চমৎকার মনোভাব প্রকাশ করেন। তাদের কথায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিবেদিত চিত্তের পরিচয় ফুটে ওঠে। এরপর হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা.) ওঠে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন, আপনি তার উপর চলতে থাকুন। আমরা আপনার সঙ্গে রয়েছি। আল্লাহর শপথ, বনু ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে যা বলেছিল, আমরা আপনাকে ওরকম বলব না। উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল, 'হে 'মূসা, তারা (শত্রুরা) যতোদিন সেখানে থাকবে, ততোদিন আমরা সেখানে প্রবেশই করব না। সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব (সূরা মায়েদা, ২৪)। বরং আমরা বলব, 'আপনি এবং আপনার পরওয়ারদেগার লড়াই করুন, আমরাও আপনার সাথে লড়ব। সে মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের বারকে গেমাদ পর্যন্তও নিয়ে যান, তবুও আমরা সারা পথ লড়াই করতে করতে আপনার সাথে সেখানে পৌঁছব। হযরত মিকদাদ (রা.)-এর কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করেন এবং তার জন্যে দোয়া করেন।

হযরত আবু বকর, ওমর এবং মিকদাদ বিন আমর (রা.) ছিলেন মুহাজির দলভুক্ত। সেনাবাহিনীতে যাদের কংখ্যা ছিল কম। তাদের মতামত নেয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের মতামত নেয়া প্রয়োজন মনে করেন। কারণ সংখ্যায় তারাই ছিলেন বেশি। যুদ্ধের আসল ভার তাদের উপরই বেশি পড়বে। অথচ বায়াতে আকাবার অনুসারে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে তারা বাধ্য ছিলেন না। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত মিকদাদ (রা.)-এর মতামত শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ

দাও। তাঁর এ কথার লক্ষ্য ছিল আনসাররা। আনসারদের অধিনায়ক এবং যুদ্ধ পতাকাবাহী হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) তা বুঝে ফেলেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কথার ইংগিত আমাদের প্রতি। আপনি আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) বলেন, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই সত্য। আমরা আপনার কথা শোনার এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। কাজেই আপনি যা ভাল মনে করেন সেদিকে অগ্রসর হোন। সে আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, তবে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একজন লোকও পিছনে পড়ে থাকবে না। আগামীকাল আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করলেও, আমাদের মোটেও আপত্তি নেই, কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। আমরা বীর পুরুষ এবং রণনিপুণ। এমনও হতে পারে, আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদের এমন যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখাবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে। আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন, আল্লাহ বরকত দিন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি সম্ভবত ভাবছেন, আনসাররা শুধু নিজেদের এলাকায় আপনাকে সাহায্য করা তাদের ফরয দায়িত্ব বলে মনে করে। এ কারণেই আমি আনসারদের পক্ষ থেকে নিবেদন করছি, আপনি যেখানে চান চলুন, যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক স্থাপন করুন। আর যার সাথে ইচ্ছা ছিন্ন করুন। আমাদের অর্থ-সম্পদের যতোটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন। যতোটুকু গ্রহণ করবেন, সেটা আপনার ফায়সালা। আমরা তা চূড়ান্ত বলে মেনে নেব। আল্লাহর শপথ, আপনি যদি সামনে অগ্রসর হয়ে বারকে গেমাদ পর্যন্ত যান, তবুও আমরা আপনার সঙ্গে যাব। যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.)-এর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশী হন। তিনি বলেন, চল এবং আনন্দের সাথে চল। আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে দুটি দলের মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি যেন জাতির বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি। এরপর জাফরান থেকে সামনে অগ্রসর হন। আসাফের নামক কয়েকটি পাহাড়ী মোড় অতিক্রম করে তিনি দিয়াত নামক জনবসতিতে অবতরণ করেন এবং হানান নামক পাহাড় সদৃশ বালির স্তূপ ডান দিকে রেখে পরে বদর প্রান্তরের কাছাকাছি এসে অবতরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর উপস্থিত মক্কার ক্রীতদাসদের বলেন, আচ্ছা, তোমরা এবার আমাকে কুরাইশদের সম্পর্কে কিছু বল। তারা বলল, প্রান্তরের শেষ সীমায় যে টিলা দেখা যাচ্ছে, কুরাইশরা তার পিছনে রয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চান তাদের সংখ্যা কতো? তারা বলল, আমরা জানি না। তাদের জবাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, দৈনিক তারা কয়টি উট যবাই করে? তারা বলল, একদিন নয়টি এবং অপরদিন দশটি। একথা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের মধ্যে কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কারা রয়েছে? তারা বলল, রবি-য়ার দুই ছেলে ওতবা এবং শায়বা, আবুল বাখতারী ইবনে হিশাম, হাকিম ইবনে হেযাম, নওফাল ইবনে খুওয়াইলেদ, হারেস ইবনে আমর, তুয়ায়মা ইবনে আদী, নযর ইবনে হারেস, যামআ ইবনে আসওয়াদ, আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ। এছাড়াও ক্রীতদাসদ্বয় আরো কয়েকজনের নাম বলল। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন, মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলো তোমাদের কাছে এনে ফেলেছে।

সে রাতেই আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যে বৃষ্টি মুশরিকদের উপর মুষলধারে বর্ষিত হয় এবং তাদের অগ্রাভিযানে প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে, কিন্তু এ বৃষ্টি মুসলমানদের জন্যে রহমতের ফোয়ারা হয়ে বর্ষিত হয়। শয়তানের নোংরামি, কলুষতা দূরীভূত করে ভূমি সমান করে দেয়। পায়ের নীচের বালুকা শক্ত হয়ে পা রাখার যোগ্য হয়। দাঁড়ানো সুবিধাজনক এবং মন মযবুত হয়।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সৈন্যদের তৎপর করে তোলেন, যেন তারা মুশরিকদের আগেই বদরের জলাশয়ের কাছে পৌঁছে যায় এবং তার উপর মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। এ সময় হযরত হোবাব ইবনে মোনযের (রা.) একজন বিচক্ষণ সেনানায়কের মতো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চান, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এখানে আল্লাহর আদেশে সমবেত হয়েছেন, যে কারণে আমাদের সামনে বা পিছনে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই? নাকি রণকৌশল হিসেবে এ জায়গা পছন্দ করেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শুধুমাত্র রণকৌশলগত কারণে আমি এ জায়গা পছন্দ করেছি। একথা শোনার পর হোবাব ইবনে মোনযের বলেন, এ জায়গায় অবস্থান আমি সমীচীন মনে করি না। আপনি আরো সামনে এগিয়ে কুরাইশদের অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপের কাছে তাঁবু ফেলুন। বাকী কূপগুলো আমরা ভরাট করে দেব এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত কূপের

www.nagorikpathagar.org

পাশে হাউয বানিয়ে তাতে পানি ভরে রাখব। যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করব, কিন্তু কুরাইশরা পানি পাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যথার্থ পরামর্শই দিয়েছ। এরপর তিনি সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে চলেন। রাতের মাঝামাঝি সময়ে শত্রুদের একবারে কাছাকাছি কূপের পাড়ে পৌছে তাঁবু ফেলেন। এরপর সাহাবীরা হাউয বানান এবং বাকি সব কূপ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবিন্যাস করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হন (তিরমিযী)। সেখানে তিনি হাতের ইশারায় দেখিয়ে বলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ এ জায়গা হবে অমুকের বধ্যভূমি এবং এ জায়গা হবে অমুকের বধ্যভূমি (মিশকাত)। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে একটি গাছের শেকড়ের কাছে রাত্রি যাপন করেন। সাহাবারাও নিরুদ্বেগে প্রশান্তি র রাত কাটান। তাদের অন্তর ছিল আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তাদের মনে প্রত্যাশা ছিল, সকালে নিজ চোখে মহান প্রতিপালকের সুসংবাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন, তা দ্বারা তোমাদের তিনি পবিত্র করবেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণ করবেন। তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির রাখবেন (সূরা আনফাল-১১)। এটি ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযানের রাত।

মুশরিক বাহিনী যখন ময়দানে আবির্ভূত হয় এবং উভয় বাহিনী পরস্পরকে দেখতে থাকে, এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ, কুরাইশরা পরিপূর্ণ অহংকারের সাথে তোমার বিরোধিতায় এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছে। হে আল্লাহ, আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের বড় বেশি প্রয়োজন। হে আল্লাহ তুমি আজ ওদের ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতবাকে তার লাল উটের উপর দেখে বলেন, 'কওমের কারো কাছে যদি কল্যাণ থাকে তবে এ লাল উটের আরোহীর কাছেই রয়েছে। অন্যরা যদি তার কথা মেনে নিত, তবে সঠিক পথ পেত।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন, তাঁর সর্বশেষ নির্দেশের আগে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ সম্পর্কে বিশেষ দিকনির্দেশ দেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা যখন দলবদ্ধভাবে তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। তীরের অপচয় যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে (বুখারী)। ওরা তোমাদের ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত

তরবারি চালনা করবে না (আবু দাউদ)। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান কেন্দ্রে চলে যান। হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা বিধানে নিযুক্ত হন।

অন্যদিকে মুশরিকদের জন্য আবু জাহেল আল্লাহর কাছে ফয়সালার জন্যে দোয়া করে। সে বলে, হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে দল আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক ছিন্ন করেছে এবং ভুল কাজ করেছে, আজ তুমি তাদের ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে দল তোমার কাছে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, আজ তুমি তাদের সাহায্য কর। পরবর্তীতে আবু জাহেলের এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের কাছে এসে গেছে, যদি তোমরা বিরত হও তবে সেটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় তা কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না এবং আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সঙ্গে রয়েছেন (সূরা আনফাল, ১৯)।

এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন ছিল আসওয়াদ ইবনে আবদুল আছাদ মাখযুমী। সে ছিল নিতান্ত হঠকারী ও অসচ্চরিত্রের। ময়দানে বেরুবার সময় বলছিল, আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি, ওদের হাউযের পানি পান করেই ছাড়বো। যদি তা না পারি, তবে সে হাউয ধ্বংস বা তার জন্যে জীবন দিয়ে দেব। আসওয়াদ মুশরিক সেনাদল থেকে বেরিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে থেকে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে গেলেন। কূপের কাছেই উভয়ের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। হযরত হামযা (রা.) তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে আঘাত করেন, যাতে আসওয়াদের পা হাঁটুর নীচে থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। তার কর্তিত পা থেকে তার সাথীদের দিকে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোতে থাকে। আসওয়াদ হামাগুড়ি দিয়ে কূপের দিকে অগ্রসর হয়ে পানি পান করে তার কসম পূর্ণ করতে চাচ্ছিল। এ সময় হযরত হামযা (রা.) আসওয়াদের উপর পুনরায় আঘাত করেন। এ আঘাতের ফলে সে জলাশয়ের ভেতর পড়ে মারা যায়।

আসওয়াদ ইবনে আবুল আছাদের হত্যাকা ছিল বদর যুদ্ধের প্রথম ঘটনা। এ হত্যার পর সবদিকে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। কুরাইশ বাহিনীর মধ্য থেকে তিন বিশিষ্ট যোদ্ধা বেরিয়ে আসে, যারা একই গোত্রের লোক। তারা হল, রবিয়ার দুই পুত্র ওতবা ও শায়বা এবং ওতবার পুত্র ওলীদ। তারা কাতার থেকে

বেরিয়ে এসেই প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্ব বা মল্ল যুদ্ধের আহ্বান জানায়। তাদের মোকাবেলার জন্যে তিন আনসার যুবক অগ্রসর হন। তারা হলেন, আওফ, মোয়াওয়েয এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। প্রথমোক্ত দুজন ছিলেন হারেসের পুত্র। তাদের মায়ের নাম ছিল আফরা। কুরাইশরা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? তারা বলল, আমরা মদীনার আনসার। কুরাইশরা বলল, তোমরা ভদ্র অভিজাত প্রতিপক্ষ। কিন্তু তোমাদের সাথে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা চাই আমাদের চাচাতো ভাইদের। এরপর তাদের ঘোষক চিৎকার করে বলল, হে মুহাম্মদ, আমাদের গোত্রের সমকক্ষ পাঠাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওবায়দা ইবনে হারেস, হামযা এবং আলী এগিয়ে যাও। তারা এগিয়ে যাওয়ার পর তিন কুরাইশ যুবক না চেনার ভান করে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা নিজেদের পরিচয় দেন। কুরাইশ যুবকত্রয় বলল, হ্যাঁ, তোমরা অভিজাত প্রতিপক্ষ। এরপর মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত ওবায়দা ইবনে হারেস (রা.) ওতবা ইবনে ররিয়ার সাথে, হযরত হামযা (রা.) শায়বার সাথে এবং হযরত আলী (রা.) ওলীদ ইবনে ওতবার সাথে মোকাবেলা করেন (ইবনে হিশাম)। হযরত ওবায়দা (রা.) এবং তার প্রতিপক্ষ থেকে এক এক আঘাত বিনিময় হয় এবং উভয়ে কঠিন আহত হন। হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবন নাশ করে এসেই ওতবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে ফেলেন। এরপর তারা হযরত ওবায়দাকে উঠিয়ে আনেন। হযরত ওবায়দার (রা.) পা কেটে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মুখে আর কথা ফুটেনি। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে মুসলমানরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে সাফরা প্রান্তর অতিক্রম করার সময় হযরত ওবায়দা (রা.) ইন্তিকাল করেন। হযরত আলী (রা.) কসম খেয়ে বলতেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে- 'তারা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে (সূরা হজ্জ, ১৯)।

এ মল্ল বা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরিণামে মুশরিকদের দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। তারা একত্রে তিন জন ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা সেনাপতিকে হারায়। ফলে ক্রোধে দিশাহারা হয়ে তারা সবাই এক সাথে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের মহান প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের জন্যে দোয়া শেষে দৃঢ়তার সাথে নিজ নিজ জায়গায় স্থির থেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে মুশরিকদের জোরদার হামলা প্রতিরোধ করতে থাকে। এ সময় তাদের মুখে ছিল' আহাদ, আহাদ' শব্দ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের কাতার সোজা

www.nagorikpathagar.org

করার পর নিজের অবস্থান কেন্দ্রে ফিরে এসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্যের ওয়াদা পূরণের জন্যে আবেদন জানাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, যদি আজ মুসলমানদের এ দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় তোমার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ তুমি কি এটা চাও, আজকের পরে কখনই তোমার ইবাদত করা না হোক?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে কাতর কণ্ঠে এ মোনাজাত করছিলেন। তাঁর কাতরোক্তির এক পর্যায়ে উভয় স্কন্ধ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর ঠিক করে দিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এবার থামুন। আপনি তো আপনার প্রতিপালকের কাছে অতিশয় কাতরতার সাথে মোনাজাত করেছেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের প্রতি ওহী পাঠান, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। সুতরাং তোমরা মুমিনদের অবিচল রাখ। অচিরেই আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; যারা কুফরী করে (সূরা আনফাল)। অপরদিকে মহান আল্লাহ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মর্মে ওহী পাঠান, আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে (সূরা আনফাল : ৯)।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) আসেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু বকর খুশী হও, তোমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌছেছে। ঐ যে জিবরাঈল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার আগে আগে আসছেন এবং ধুলোবালি উড়ছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাপরা ঘরের দরজা দিয়ে বাইরে আসেন। এ সময় তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি উদ্দীপনাময় ভঙ্গিতে সামনে অগ্রসর হতে হতে বলছিলেন, কাফের দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (সূরা কমার : ৪৫)। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের দিকে মুখ করে বলেন, ওদের চেহারা বিগড়ে যাক। একথা বলেই তিনি তাদের প্রতি ধুলো নিক্ষেপ করেন। এ নিক্ষিপ্ত ধূলিকণা প্রত্যেক কাফিরের চোখ, মুখ, নাক ও গলায় প্রবেশ করে। তাদের একজনও এ ধূলিকণা থেকে বাদ যায়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তখন

www.nagorikpathagar.org

তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছিলেন (সূরা আনফাল : ১৭)।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবী হামলার নির্দেশ এবং যুদ্ধের তাগিদ দিয়ে বলেন, তোমরা এগিয়ে যাও। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদে'র প্রাণ, তাদের সঙ্গে তোমাদের যে কেউ দৃঢ়তার সাথে পুণ্যের কাজ মনে করে অগ্রগামী হয়ে পিছনে সরে না এসে যুদ্ধ করবে এবং মারা যাবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'জান্নাতের প্রতি ওঠ যার দিগন্ত ও বিস্তৃতি আকাশ এবং পৃথিবীর সমপরিমাণ।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা শুনে ওমায়র ইবনে হাম্মাম বলেন, চমৎকার, চমৎকার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অন্য কোনো কারণে নয়, আমি আশা করছি, আমিও সে জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে জান্নাতীদের মধ্যে তুমিও রয়েছ। এরপর ওমায়র ইবনে হাম্মাম কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, এ খেজুরগুলো খেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। জীবন এত দীর্ঘায়িত করব কেন। এ কথা বলে তিনি নিজের কাছে থাকা খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান (মুসলিম, মিশকাত)।

অনুরূপ প্রখ্যাত মহিলা সাহাবা আফরার পুত্র আওফ বিন হারেস জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ আমাদের কোন কাজে সবচেয়ে বেশী খুশী হন? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে মুচকি হাসেন। তিনি বলেন, বান্দা খালি শরীরে (প্রতিরক্ষা বর্ম না পরে) নিজের হাত শত্রুর মাঝে সেঁধিয়ে দিলে। একথা শুনে আওফ নিজের শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলেন এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জবাবী হামলার নির্দেশ দেন। তখন শত্রুদের হামলার তীব্রতা কমে আসে। ফলে শত্রুদের উৎসাহ-উদ্দীপনাতেও ভাটা পড়ে। কৌশলপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ়করণে সহায়ক প্রমাণিত হয়। জবাবী হামলার সময় তারা কাফিরদের কাতার এলোমেলো করে তাদের শিরচ্ছেদ করতে করতে এগিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বর্ম পরিধান করে রণক্ষেত্রে এসেছেন দেখে সাহাবাদের উদ্দীপনা

www.nagorikpathagar.org

আরো বেড়ে যায়। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'শীঘ্রই ওরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দীপনায় সাহাবীরা বিপুল বিক্রমে লড়াই করেন। এসময়ে ফিরিশতারাও মুসলমানদের সাহায্য করেন।

হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, সেদিন মানুষের মাথা কর্তিত হতে থাকে। অথচ জানা যাচ্ছিল না, কে তাকে মেরেছে। মানুষের হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, অথচ কে কেটেছে তা জানা যায়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একজন মুসলমান এক মুশরিককে ধাওয়া করছিলেন। হঠাৎ সে মুশরিকের উপর চাবুকের আঘাতের শব্দ শোনা গেল। আর এক ঘোড়সওয়ার বলছিল, সামনে আগাও। এক মুশরিক মুসলমানকে দেখে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। তার নাকে মুখে আঘাতের চিহ্ন, চেহারা ফাটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, অথচ আঘাতকারীকে দেখা যাচ্ছিল না। সে মুসলমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য (মুসলিম)।

আবু দাউদ মাযেনী (রা.) বলেন, আমি এক মুশরিককে মারার জন্যে দৌড়াচ্ছিলাম। আমার তলোয়ার পৌঁছার আগেই তার কর্তিত মস্তক মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারলাম, তাকে আমি ব্যতীত অন্য কেউ হত্যা করেছে। এক আনসার হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমাকে তো এ লোকটি কয়েদ করে নিয়ে আসেনি। আমাকে মু িত মস্তকের এক সুদর্শন লোক কয়েদ করে নিয়ে এসেছে। সে লোক একটি চিত্রল ঘোড়ার পিঠে আসীন ছিল। সে লোকটিকে তো এখন দেখা যাচ্ছে না। ঐ আনসার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাকে আমি গ্রেফতার করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চুপ কর। আল্লাহ তা'আলা একজন সম্মানিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছেন।

সেদিন অভিশপ্ত ইবলীস সোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জোশোম মোদলেজীর আকৃতি ধারণ করে এসেছিল। মুশরিকদের কাছ থেকে সে তখন পৃথক হয়নি। কিন্তু কাফিরদের বিরুদ্ধে ফিরিশতাদের ব্যবস্থা গ্রহণ দেখে সে ছুটে পালাতে লাগল। হারেস ইবনে হিশাম তাকে ধরে ফেলে। সে ভেবেছিল, মানবাকৃতি ধারণকারী ইবলীস প্রকৃতই সোরাকা ইবনে মালেক। কিন্তু ইবলীস হারেসের বুকে প্রচ ঘুষি মারে। সে মাটিতে পড়ে গেলে ইত্যবসরে ইবলীস পালিয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

মুশরিকরা বলতে থাকে, সোরাকা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বলোনি, আমাদের সাহায্য করবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না? সোরাকারূপী ইবলীস জবাব দেয়, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আল্লাহকে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। আজ তোমাদের ভয়াবহ পরিণতি নিশ্চিত। এরপর ইবলীস সমুদ্রে গিয়ে আত্মগোপন করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুশরিকবাহিনীতে ব্যর্থতা ও হতাশাজনিত চাঞ্চল্যের লক্ষণ ফুটে ওঠে। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়তে থাকে। অতপর মুশরিক বাহিনী বিশৃংখলভাবে পশ্চাদপসারণ করতে থাকে। তাদের মাঝে ভীতি ছেয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের কাউকে হত্যা, কাউকে আঘাত করছিলেন, কাউকে পাকড়াও করে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন। আর তাদের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। শেষ পর্যন্ত কাফিররা সুস্পষ্ট পরাজয় বরণ করে।

আবু জাহেল কুরাইশদের ছত্র ভঙ্গ হতে দেখে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সে আস্ফালন অহংকার করে তার নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের বলতে থাকে, সোরাকার পলায়নে তোমরা সাহস হারিও না। আগে থেকেই মুহাম্মদের সাথে সোরাকার যোগসাজশ ছিল। ওতবা, শায়বা, ওলীদ নিহত হয়েছে দেখে তোমরা ভীত আতংকিত হয়ো না। কেননা, তারা তাড়াহুড়ো করেছে। লাত এবং ওযযার শপথ, ততোক্ষণ আমরা ফিরে যাবো না, যতোক্ষণ না ওদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলব। আবু জাহেল তার এ অহংকারের মজা শিগগিরই টের পেয়ে যায়। কেননা অল্পক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের জবাবী হামলার মুখে তাদের কাতারগুলো ছত্র ভঙ্গ হতে থাকে। তখনও আবু জাহেল তার আশেপাশে মুশরিকদের এক দল নিয়ে স্থির অবিচল ছিল। তারা আবু জাহেলের চারদিকে তলোয়ার এবং বর্শার প্রতিরোধ ব্যূহ কায়েম করে রেখেছিল। মুসলিম মুজাহিদদের প্রচণ্ড হামলায় সে প্রতিরক্ষা ব্যূহও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানরা দেখেন, আবু জাহেল একটি ঘোড়ার পিঠে বসে চক্কর দিচ্ছে। এদিকে তার মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ মোড় নিয়ে দেখি, ডানে বাঁয়ে দু'জন আনসার কিশোর। তাদের একজন চুপিসারে আমাকে বলল, চাচা, আমাকে আবু জাহেল নামক দুর্বৃত্তকে একটু দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, ভাতিজা, তুমি তার কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি, আবু জাহেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি আবু জাহেলকে দেখতে পাই তবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে আলাদা হব না, যতোক্ষণ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত আমাদের যার মৃত্যু আগে লেখা হয়েছে, তার মৃত্যু না হয়। হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, এ কিশোরের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে অবাক হই। ইতোমধ্যে তাদের অন্যজনও আমাকে ইশারায় তার প্রতি নিবিষ্ট করে একই কথা বলে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি আবু জাহেলকে লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখে আনসার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ওই দেখ তোমাদের শিকার, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহেলকে হত্যা করবে? ক্ষিপ্রগতির দু'কিশোরের আক্রমণে আবু জাহেল ধরাশায়ী হয়। এরপর আব্দুর রহমান দু'কিশোরকে প্রশ্ন করেন, কে তাকে হত্যা করেছে? দু'জনই বলল, আমি। তিনি বলেন, তোমরা কি নিজ নিজ তালোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না, মুছিনি। তিনি উভয়ের তালোয়ার দেখে বলেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহলের জিনিসপত্র মা'য়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহকে প্রদান করেন। এ দু'কিশোরের নাম ছিল মা'য়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ এবং মোয়াওয়েয ইবনে আফরা (রা.) (বুখারী)।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মা'য়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ (রা.) বলেছেন, আবু জাহেল মুশরিকদের তীর তলোয়ারের দুর্ভেদ্য পাহারার ভেতর ছিল। কাফিররা বলছিল, আবুল হাকামের কাছে কেউ যেন পৌঁছতে না পারে। মা'য়ায ইবনে আমর (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি আবু জাহেলকে চিনে নিয়ে তার কাছাকাছি থাকতে লাগলাম। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমি তার উপর এমন আঘাত করলাম, যাতে তার পা হাঁটুর নীচে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়া খেজুরের মতো উড়ে যায়। এদিকে আবু জাহেলকে আমি যখন আঘাত করি; ওদিকে তার পুত্র ইকরামা আমার কাঁধ বরাবর তরবারি দিয়ে আঘাত করে। ফলে আমার হাত বাহুর চামড়ার সাথে লটকে যায়। এতে লড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছিল। আমি কর্তিত হাত পিছনে রেখে অপর হাতে তরবারি চালাচ্ছিলাম। এতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। আমি তখন হাতের কর্তিত অংশ কেঁটে ফেলে এক হাতে যুদ্ধ করি। এরপর মোয়াওয়েয ইবনে আফরা আবু জাহলের কাছে পৌছেন। তিনি ছিলেন আহত। তিনি আবু জাহালের উপর এমন আঘাত করেন, যাতে সে ওখানেই ঢলে পড়ে। তখন শুধু তার নিঃশ্বাস আসা যাওয়া করছিল। এরপর হযরত মোয়াওয়েয ইবনে আফরা (রা.) লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু জাহেলের পরিণাম দেখে আসার কে আছ? তখন সাহাবীরা আবু জাহলের সন্ধান করতে

www.nagorikpathagar.org

লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জাহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন, তার শুধু নিঃশ্বাস চলাচল করছিল। তিনি ঘাড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্যে দাড়ি ধরে বলেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোকে অপমান অসম্মান করলেন? আবু জাহেল বলল, কিভাবে আমাকে অসম্মান করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষ কি আছে? তার চেয়ে বড় আর কে? আহা, আমাকে যদি রাখালরা বা কৃষকরা ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করত! এরপর সে বলতে লাগল, বল তো আজ কারা জয়ী হয়েছে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জাহেলের ঘাড়ে পা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এ অবস্থায় সে বলল, ওরে বকরীর রাখাল, তুই অনেক উঁচু জায়গায় পৌঁছে গেছিস। উল্লেখ্য, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মক্কায় বকরী চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জাহেলের মাথা কেটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জাহেলের মাথা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ সত্যিই, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ সুমহান। সকল প্রশংসা তারই জন্যে নিবেদিত। তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন। নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল দলকে পরাজিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, চল। আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা তাকে আবু জাহলের লাশের কাছে নিয়ে গেলে বিশ্বনবী বলেন, ও হচ্ছে এ উম্মতের ফিরাউন।

এ কঠিন যুদ্ধে পিতা-পুত্রের মুখোমুখি এবং ভাই ভাইয়ের মুখোমুখি হয়েছে। মূলনীতির বিভেদের কারণে তলোয়ারসমূহ কোষমুক্ত হয়েছে এবং মযলুম অত্যাচারিতরা যালেম অত্যাচারীদের সাথে সংঘর্ষে ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করেছে। এরকম বেশকিছু সত্য ঘটনা এখানে বর্ণিত হচ্ছে। হক ও বাতিলের পার্থক্য এভাবেই রচিত হয়। হকের সামনে কোন সম্পর্কই বাতিলকে রক্ষা করতে পারে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন, আমি জানি, বনু হাশেমসহ অন্যান্য ক'টি গোত্রের কিছু লোককে জোর করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই হাশেম গোত্রের কোনো লোক

www.nagorikpathagar.org

এবং আবুল বাখতারী ইবনে হিশাম এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব যদি কারো সামনে পড়ে, তবে তাদের কাউকে যেন হত্যা না করা হয়। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে তো জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। একথা শুনে ওতবার পুত্র হযরত আবু হোযায়ফা (রা.) বলেন, আমরা নিজেদের পিতা, পুত্র, ভাই এবং গোত্রের অন্যান্য লোকদের হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? আল্লাহর শপথ, যদি আব্বাসের সাথে আমি মুখোমুখি হই, তবে আমি তাকে তলোয়ারে লাগাম পরিধান করাব। এ খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এ লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেব। কেননা, আল্লাহর কসম, সে মুনাফিক হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে হযরত হোযায়ফা (রা.) বলতেন, সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম, সে কারণে কখনই আমি স্বস্তি পাইনি। আমার মনে সব সময় ভয় লেগেই থাকত। শুধু আমার শাহাদাতই সেদিনের বেফাস মন্তব্যের কাফফারা হতে পারে। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত হোযায়ফা (রা.) শহীদ হন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে হত্যা করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তার পুত্র, (তখনও মুশরিক) আবদুর রহমানকে ডেকে বলেন, ওরে খবিস, আমার মান সম্মান কোথায়? আবু বকর, তার পুত্রকে হত্যা করতে উদ্ধত হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারণ করেন। মুসলমানরা যে সময় মুশরিকদের গ্রেফতার শুরু করেন, সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে তৈরী ছাপরায় অবস্থান করছিলেন। আর হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) তলোয়ার উঠিয়ে দরজায় পাহারা দিচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন, হযরত সা'দ (রা) এর চেহারা বিমর্ষ। তিনি বলেন, সা'দ, মুসলমানদের কাজ মনে হয় তোমার পছন্দ নয়। তিনি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। মুশরিকদের সাথে এটি আমাদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সুযোগ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি, মুশরিকদের ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে হত্যা করাই সমীচীন। তাদের খুব ভালোভাবে নির্মূল করা দরকার।

এ যুদ্ধে হযরত ওক্কাশা ইবনে মেহসান আসাদীর (রা.) তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। ওক্কাশা (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি তাকে এক টুকরো কাঠ দিয়ে বলেন, ওক্কাশা, এটি দিয়ে লড়াই কর। ওক্কাশা সে কাঠের টুকরাকে হাতে নিয়ে হেলাতেই তা একটি ধারাল চকচকে তলোয়ারে পরিণত হয়। এরপর তিনি সে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে লাগলেন। আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের বিজয়ী করেন। সে তলোয়ারের নাম রাখা হয় 'আওন' অর্থাৎ সাহায্য। সেটি হযরত ওক্কাশার কাছেই ছিল। পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি এ তলোয়ার ব্যবহার করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতের সময় ধর্মান্তরিত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেসময়ও এ তলোয়ার তার কাছে ছিল।

যুদ্ধ শেষে হযরত মোসয়াব ইবনে ওমায়র আবদারী (রা.) তার ভাই আবু ওযায়য ইবনে ওমায়র আবদারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু ওযায়য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সে সময় এক আনসার সাহাবী আবু ওযায়যেরকে বাঁধছিলেন। হযরত মোসয়াব সে সাহাবীকে বললেন, এ লোকটিকে মযবুত করে বেধেঁ নাও। তার মা বড় ধনী। তিনি সম্ভবত তোমাকে ভাল মুক্তিপণ দিবেন। এতে আবু ওযায়য তার ভাই মোসয়াবকে বললেন, আমার ব্যাপারে কি তোমার এটাই অসিয়ত? হযরত মোসয়াব (রা.) বললেন, হ্যাঁ তুমি নও; বরং এ আনসারই হচ্ছেন আমার সত্যিকারের ভাই।

মুশরিকদের লাশ যখন কূপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন ওতবা ইবনে রবিয়ার লাশ কূপের দিকে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতবার পুত্র আবু হোযায়ফার মুখের দিকে তাকান। লক্ষ্য করলেন, তিনি বিমর্ষ গম্ভীর। তাকে কেমন যেন চিন্তিত বিমর্ষ দেখাচ্ছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হোযায়ফা, সম্ভবত পিতার ব্যাপারে তোমার মনে কিছু একটা অনুভূতি জেগেছে? তিনি বলেন, জ্বি না, আল্লাহর রাসূল। আমার মনে আমার পিতা এবং তার হত্যাকা সম্পর্কে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য অস্থিরতা নেই। তবে আমি জানতাম, আমার পিতার মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে। এ কারণে আশা করেছিলাম, তার বুদ্ধি-বিবেক এবং দূরদর্শিতার কারণে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবেন। কিন্তু এখন তার পরিণাম এবং কুফরীর উপর জীবন শেষ হতে দেখে খুব কষ্ট লাগছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত হোযায়ফা (রা.)-এর জন্যে দোয়া করেন।

বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের বিজয় এবং কাফিরদের লজ্জাকর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। এ যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন মুহাজির আর ৮ জন আনসার। যুদ্ধে মুশরিকদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। তাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। নিহতরা ছিল মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গোত্রের সর্দার। যুদ্ধ শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমরা নিজের নবীর জন্যে কত

www.nagorikpathagar.org

খারাপ বংশ, গোত্র ছিলে? তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। অথচ অন্যেরা আমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন সহায়হীন অবস্থায় ফেলে দিয়ে ছিলে, যখন অন্যেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।' এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতদের মৃতদেহ টেনে নিয়ে বদরের একটি কূপে ফেলার নির্দেশ দেন।

হযরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে বদরের দিন কুরাইশদের ২৪ জন নেতৃস্থানীয় সর্দারের লাশ বদরের একটি নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি কোনো কওমের উপর জয়ী হলে তিন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাতেন। বদরের মাঠেও তিন দিন কাটানোর পর তাঁর নির্দেশে তাঁর সওয়ারীর পিঠে আসন পাতা হয়। এরপর তিনি পদব্রজে চলেন, সাহাবীরা তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনি বদরের কূপের তীরে এসে থামেন। কূপে নিক্ষিপ্তদের বাবার নাম ধরে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, 'হে অমুকের পত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করতে, তবে সেটা কি তোমাদের জন্যে ভালো হতো না? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন আমরা তার সত্যতা পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের কৃত ওয়াদার সত্যতা পেয়েছো? হযরত ওমর (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন সব দেহের সাথে কি কথা বলছেন, যাদের রূহই নেই। তিনি বলেন, সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। আমি যা কিছু বলছি, তা তোমরা ওদের চেয়ে বেশি শুনতে পাও না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা ওদের চেয়ে বেশি শ্রবণকারী নও, কিন্তু ওরা জবাব দিতে পারে না (বুখারী ও মুসলিম)।

পরাজয়ের পর মুশরিকরা বিশৃংখল অবস্থায় ভীতবিহ্বল হয়ে ময়দান ছেড়ে মক্কার পথে পালাতে থাকে। লজ্জায় তারা এমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যে, বুঝতে পারছিল না, কিভাবে মক্কায় প্রবেশ করবে? ইবনে ইসহাক বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কুরাইশদের পরাজয়ের খবর নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে, তার নাম ছিল হায়ছুমান ইবনে আবদুল্লাহ খোযাঈ। লোকজন তাকে পিছনের খবর জিজ্ঞেস করলে সে বলল, ওতবা ইবনে রবিয়া, শায়বা ইবনে রবিয়া, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং অমুক অমুক সর্দার নিহত হয়েছে। নিহতদের তালিকায় নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের নাম শুনে কা'বার হাতীমে উপবিষ্ট সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলল, খোদার কসম, এ লোকটির যদি হুঁশ থাকে, তবে

ওকে আমার কথা জিজ্ঞেস কর?। উপস্থিত লোকেরা হায়ছুমানকে বলল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কি সংবাদ? তিনি বলেন, ওই দেখো সে কা'বার হাতীমে বসে আছে। খোদার কসম, তার বাপ এবং তার ভাইকে নিহত হতে আমি নিজে দেখেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবু রাফে বর্ণনা করেন, সে সময় আমি হযরত আব্বাসের ক্রীতদাস ছিলাম, আমাদের পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমিও মুসলমান হয়েছিলাম। অবশ্য হযরত আব্বাস (রা.) তার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। মুসলমানদের জয়ের খবর শুনে তার উপর অপমান অপদস্থতা বিমর্ষতা ছেয়ে পড়ে। মুসলমানদের জয়ের সংবাদে আমরা শক্তি ও সম্মান অনুভব করি। আমি ছিলাম দুর্বল লোক। আমি তীর তৈরী করতাম। যমযমের হুজরায় বসে তীরের ফলা সরু করতাম। সে সময় আমি হুজরায় বসে এক মনে তীর তৈরী করছিলাম। উম্মুল ফযল আমার কাছে বসেছিলেন। যুদ্ধ জয়ের খবর পেয়ে আমরা বেশ আনন্দিত ছিলাম। এ সময় আবু লাহাব পা টেনে টেনে অনেকটা খোঁড়াদের ভঙ্গিতে এসে হুজরায় কাছে বসে। তার পিঠ ছিল আমার পিঠের দিকে। সে বসাই ছিল। হঠাৎ হৈচৈ পড়ে, আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিব এসে গেছে। আবু লাহাব তাকে বলল, আমার কাছে এসো। আমার জীবনের শপথ, তোমার কাছে কি কোনো খবর আছে? আবু সুফিয়ান আবু লাহাবের সামনে বসে পড়ে। বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে রইল। আবু লাহাব বলল, বল ভাতিজা, লোকদের কি খবর? আবু সুফিয়ান বলল, কিছুই না। লোকদের সাথে আমাদের মুকাবিলা হল, আমরা নিজেদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। তারা যেভাবে ইচ্ছা আমাদের হত্যা আর বন্দী করছিল। খোদার কসম, এসব সত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের দোষ দেই না। প্রকৃতপক্ষে এমন সব লোকদের সাথে আমাদের মুকাবিলা হয়েছিল, যারা আকাশ যমীনের মাঝামাঝি চিতল ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। খোদার কসম, তারা কিছু ছাড়ছিল না এবং কোনো জিনিস তাদের মুকাবিলায় টিকতে পারছিল না। এ ধরনের বিস্ময়কর প্রতিপক্ষ কেউ কখনো দেখেনি।

আবু রাফে (রা.) বলেন, আমি নিজ হাতে তাঁবুর কিনারা তুলে ধরে বললাম, খোদার কসম, তারা ছিলেন ফেরেশতা। একথা শুনে আবু লাহাব আমার মুখে সজোরে চড় দেয়। আমি তার সাথে লেগে গেলাম। সে আমাকে তুলে আছড়ে ফেলে। এরপর আমার উপর হাঁটু পেতে আমাকে প্রহার করতে থাকে। আমি

www.nagorikpathagar.org

ছিলাম দুর্বল, কিন্তু ইতোমধ্যে উম্মুল ফযল উঠে তাঁবুর একটা খাম্বা দিয়ে আবু লাহাবকে এমনভাবে প্রহার করতে লাগলেন, যাতে সে মারাত্মক আঘাত পায়। উম্মুল ফযল তাকে প্রহার করতে করতে বলছিলেন, ওর কোন মালিক নেই, এজন্যে ওকে দুর্বল মনে করেছো? আবু লাহাব অপমানিত হয়ে উঠে চলে যায়। এ ঘটনার মাত্র সাত দিন পর আবু লাহাব প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। প্লেগের গুটিকে আরবে খুব অপয়া মনে করা হত। মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত আবু লাহাবের লাশ পড়ে থাকে। তার সন্তানরাও কাছে যায়নি। কেউ তার দাফনের ব্যবস্থা করেনি। তার সন্তানরা তিন দিন পর ভাবল, এভাবে লাশ ফেলে রাখলে মানুষ তাদের নিন্দা সমালোচনা করবে। তাই তারা একটি গর্ত খুঁড়ে সে গর্তে কাঠের গুড়ির মাধ্যমে ধাক্কা দিয়ে তার লাশ ফেলে দিল। এরপর দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে গর্ত ভরে দিল। এভাবে পৃথিবীতেই অপমানিত হয়ে আবু লাহাব পরপারে চলে গেল।

মক্কায় বদর যুদ্ধের পরাজয়ের খবরে কুরাইশদের মানস প্রকৃতিতে অত্যন্ত ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া পড়ে। মৃতদের স্মরণে তারা শোক প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেনি। তারা ভেবেছিল, এতে করে মুসলমানরা তাদের তিরস্কারের সুযোগ পেয়ে যাবে। এদিকে যুদ্ধের সময় মদীনার ইহূদী এবং মুনাফিকরা মিথ্যা প্রোপাগা া চালিয়ে মদীনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। এমনকি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিহত হওয়ার খবর পর্যন্ত প্রচার করেছিল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাসওয়া নামক উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে দেখে এক মুনাফিক বলেই ফেলেছিল, সত্যি সত্যি মুহাম্মদ নিহত হয়েছে? এই দেখো তার উটনী। আমরা এ উটনী চিনি। এই দেখো যায়েদ ইবনে হারেসা, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। সে এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। উভয় দূত পৌছার পর মুসলমানরা তাদের ঘিরে ধরে বিস্তারিত বিবরণ শুনতে থাকে। সব শোনার পর বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুসলমানরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। যে সকল নেতৃস্থানীয় মুসলমান, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর প্রান্তরে যাননি, তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বদরের পথে বেরিয়ে পড়েন।

হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, হযরত ওসমান (রা.)-এর সহধর্মিণী নবী নন্দিনী হযরত রোকাইয়া (রা.)-কে দাফন করে যখন আমরা কবরের উপরের

মাটি সমান করে দিচ্ছিলাম, সে সময় আমাদের কাছে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর এসে পৌঁছে। হযরত রোকাইয়া (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তাঁর দেখাশোনার জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রা.)-এর সঙ্গে আমাকেও মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন বদর প্রান্তরে কাটানোর পর চতুর্থ দিন মদীনার পথে যাত্রা করেন। সঙ্গে মুশরিক বন্দী এবং গনীমতের মালও ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'বকে এ সবের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সাফরা প্রান্তর অতিক্রমের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ী পথ এবং নাযিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটি টিলায় অবস্থান করেন। এরপর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকি সব মুসলমানার মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন। সাফরা প্রান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নযর ইবনে হারেসকে হত্যার নির্দেশ দেন। কুরাইশ অপরাধীদের অন্যতম এ লোকটি মুশরিকদের পতাকা বহন করেছিল। ইসলামের শত্রুতায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্টদানে সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মহানবীর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) নযর ইবনে হারেসকে হত্যা করেন।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকুয যাবিয়ায় পৌঁছে সেখানে ওকবা ইবনে আবু মোযায়তকে হত্যার নির্দেশ দেন। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভয়াবহ কষ্ট দিত। এ লোকটিই নামায আদায়রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল এবং গলায় চাদর জড়িয়ে বিশ্বনবীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সময়মত উপস্থিত না হলে এ দুর্বৃত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গলা টিপে হত্যাই করে ফেলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুর্বৃত্তকে হত্যার নির্দেশ দিলে সে বলল, ওহে মুহাম্মদ, আমাদের জন্যে কি আছে? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আগুন (আবু দাউদ)। এরপর হযরত আসেম ইবনে ছাবেত আনসারী (রা.) অথবা হযরত আলী (রা.) ওকবা ইবনে আবু মোযায়তের শিরচ্ছেদ করেন। যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'দুর্বৃত্তকে হত্যা করা ছিল জরুরী। কেননা তারা শুধু যুদ্ধবন্দীই ছিল না; বরং তারা ছিল ভয়ানক যুদ্ধাপরাধী।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক জায়গায় পৌঁছলে, সেসব মুসলিম নেতৃত্বের সাথে সাক্ষাৎ হয়, যারা দূতদের মুখে মুসলমানদের বিজয় সংবাদ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিনন্দন এবং অভ্যর্থনা

www.nagorikpathagar.org

জানাতে মদীনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা মোবারকবাদ জানালে হযরত সালাম ইবনে সালামা (রা.) বলেন আপনারা আমাদের কিসের মোবারকবাদ জানাচ্ছেন। আল্লাহর কসম, আমাদের তো মুকাবিলা হয়েছে মাথা নুয়ে পড়া বৃদ্ধদের সাথে, যারা ছিল উটের মত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বলেন, ভাতিজা, এসব লোকই তো ছিল কওমের নেতা।

এরপর ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রা.) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল, সকল প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি আপনাকে কামিয়াবী দান করেছেন এবং আপনার চক্ষু শীতল করেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি জানতাম না শত্রুদের সাথে আপনার মুকাবিলা হবে। আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি একটি কাফেলার সন্ধানে বেরিয়েছেন। যদি জানতাম, শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হবে। তবে কিছুতেই পিছনে থাকতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি সত্য বলেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রবেশ করেন। মুসলমানদের জয় লাভে শহর এবং আশেপাশের সকল শত্রু প্রভাবিত হয়, মদীনায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীরাও লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার একদিন পর যুদ্ধবন্দীরা এসে পৌঁছে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দেন। এ উপদেশের ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা খেজুর খেয়ে থাকতেন, কিন্তু কয়েদীদের রুটি খেতে দিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মদীনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য ও গুরুত্ব ছিল অধিক।

মদীনায় পৌঁছার পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওরা তো আমাদের চাচাতো ভাই এবং আমাদের বংশ গোত্রেরই লোক। আমার মতে আপনি ওদের কাছ থেকে ফিদিয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে ছেড়ে দিন। এতে করে যা কিছু নেয়া হবে, সেসব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি হিসেবে কাজে আসবে। এমন হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াত করবেন এবং তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি হযরত আবু বকরের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি মনে করি, আপনি আমার আত্মীয় অমুককে আমার হাতে তুলে দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করব। একইভাবে আকীল ইবনে আবু তালেবকে হযরত আলীর

www.nagorikpathagar.org

হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরচ্ছেদ করবে। একইভাবে হামযার ভাই অমুককে হামযার হাতে তুলে দিন, হামযা তার শিরচ্ছেদ করবেন। এতে আল্লাহ তা'আলা বুঝতে পারবেন, মুশরিকদের জন্যে আমাদের মনে কোনই সমবেদনা নেই। আর এ সকল যুদ্ধবন্দী হচ্ছে মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

হযরত ওমর (রা.) বলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরের পরামর্শ পছন্দ করেন। যদিও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মূসা (আ.) এবং নূহ (আ.) তার কওমের প্রতি যে আচরণ করেছেন- যেমনটি ওমর (রা.) বলেছে; তা যুক্তিযুক্ত হলেও আমি গ্রহন করছি না। বরং ইব্রাহীম (আ.) এবং ঈসা (আ.) তার কওমকে যেভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন- যেমনটি আবু বকর (রা.) বলেছে; তা আমি গ্রহণ করছি। ফলে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমি পরদিন খুব সকালে গিয়ে দেখি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, বলুন আপনারা কেন কাঁদছেন। যদি কান্নার কারণ ঘটে থাকে তবে আমিও কাঁদব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিদিয়া গ্রহণ করায় তোমার সঙ্গীদের উপর যা পেশ করা হয়েছে, সে কারণে কাঁদছি। কথা বলে তিনি নিকটবর্তী একটি গাছের প্রতি ইশারা করে বলেন, আমার কাছে আযাব এ গাছের চেয়ে নিকটতর করে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন, দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্যে সঙ্গত নয়। তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ তা'আলা চান পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো, সে জন্যে তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো (সূরা আনফাল, ৭৬-৭৮)। এভাবে ওমরের (রা.) চাওয়া এবং ফয়সালার উপর আল্লাহর সমর্থন দেয়া হয়েছিল বর্ণিত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে।

এ আয়াতে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে ফিদিয়া নেয়ার কারণে সাহাবাদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। ধমক এ কারণেও দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফেরদের ভালোভাবে নিশ্চিহ্ন না করেই বন্দী করেছে। ধমক এ কারণেও দেয়া হয়েছে যে, তারা এমন সব কাফেরদের থেকে ফিদিয়া নিয়েছে, যারা শুধু যুদ্ধবন্দীই ছিল না; বরং এমন গুরুতর অপরাধী ছিল যে, যে কোন আইনেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করে ছাড়া হতো না। এ ধরনের অপরাধীদের ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলার শাস্তি সাধারণত মৃত্যুদ অথবা যাবজ্জীবন কারাদ । পরোক্ষভাবে হযরত ওমরের (রা.)

ফয়সালাই উত্তম ছিল এবং আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর। তিনি ক্ষমার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এজন্যেই বিশ্বনবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়, রহমাতাল্লিল আলামীন। মহাবিশ্বের রহমতস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত অনুযায়ী যেহেতু বিষয়টার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাই মুশরিকদের কাছ থেকে ফিদিয়া নেয়া হয়েছে। ফিদিয়ার পরিমাণ ছিল এক হাজার হতে চার হাজার দেরহাম পর্যন্ত। মক্কাবাসীরা লেখাপড়া জানত। পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা পড়ালেখার সাথে পরিচিত ছিল না। এ কারণে এরূপ সিদ্ধান্তও রাখা হয়েছিল যে, যাদের মুক্তিপণ প্রদানের সামর্থ্য নেই, তারা মদীনায় দশটি করে শিশুকে লেখাপড়া শিখাবে। শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করলে শিক্ষক কয়েদীদের জন্যে সেটাই হবে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন বন্দীর উপর অনুগ্রহ করে তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করেননি, তাদের এমনিতেই মুক্তি দেয়া হয়। তারা হচ্ছেন মুত্তালিব ইবনে হানতাব, সাইফী ইবনে আবু রেফায়া এবং আবু আযমা জুমাহী। শেষোক্ত ব্যক্তিকে ওহুদের যুদ্ধে পুনরায় বন্দী এবং পরে হত্যা করা হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জামাতা আবুল আসকেও এ শর্তে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি নবী নন্দিনী হযরত যয়নব (রা.)-এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। মুক্তিপণের মধ্যে একখানা হারও ছিল। এ হার ছিল প্রকৃতপক্ষে হযরত খাদীজার (রা.)। হযরত যয়নব (রা.)-কে আবুল আসের ঘরে পাঠানোর সময় তিনি কন্যাকে উপহার দিয়েছিলেন। এ হারখানা দেখামাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। তিনি আবুল আসকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের অনুমতি চান। সাহাবায়ে কেরাম এ প্রস্তাব সশ্রদ্ধভাবে অনুমোদন করেন। অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল আসকে এ শর্তে ছেড়ে দেন, তিনি হযরত যয়নব (রা.)-কে মুক্তি দিবেন। মুক্তি পেয়ে যয়নব (রা.) হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা এবং অন্য একজন আনসার সাহাবীকে মক্কায় পাঠান। তাদের বলে দেন, তোমরা মক্কায় বাতনে ইয়াজেজে থাকবে। যয়নব (রা.) তোমাদের কাছ দিয়ে যখন অতিক্রম করবে, তখন তোমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। এ দু'জন সাহাবী মক্কায়

www.nagorikpathagar.org

গিয়ে হযরত যয়নব (রা.)-কে মদীনায় নিয়ে আসেন। তার হিজরতের ঘটনা সত্যই মর্মস্পর্শী।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সোহায়ল ইবনে আমরও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বক্তা। হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সোহায়ল ইবনে আমরের সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে দিন, এতে তার কথা মুখে জড়িয়ে যাবে। সে কখনো বক্তা হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা এ কাজ 'মোছলা' (অংগহানি)-এর আওতায় পড়ে। কিয়ামতের দিন এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে পাকড়াও এর ভয় রয়েছে। হযরত সা'দ ইবনে নো'মান (রা.) ওমরা পালনের জন্যে গেলে আবু সুফিয়ান তাকে গ্রেফতার করে। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমরও বদরের যুদ্ধবন্দী ছিল। আমরকে আবু সুফিয়ানের হাতে ন্যস্ত করা হলে তিনি হযরত সা'দকে মুক্তি দেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রোযা এবং সদকাতুল ফিতিরকে ফরয করা হয়। যাকাতের পরিমাণ অর্থাৎ নেসাবও এ সময় নির্ধারণ করা হয়। মুহাজিরদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিলেন খুবই গরীব। তাদের রুটি রুজির সমস্যা ছিল প্রকট। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে বিভিন্ন স্থানে ছুটোছুটি করা তাদের জন্যে ছিল কষ্টকর। সদকায়ে ফিতির এবং যাকাত সম্পর্কিত বিধান তাদের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মুসলমানরা প্রথমবারের মত ঈদ উদযাপন করেন। বদরের যুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয়ের পর এ ঈদ উদযাপিত হয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিজয় ও সম্মানের মুকুট রাখার পর আল্লাহ মুসলমানদের এ ঈদ উদযাপনের সুযোগ দেন। এ ঈদ মুসলমানদের জন্যে অসামান্য সম্মান ও সৌভাগ্য বয়ে এনেছিল। ঈদের নামায আদায়ের দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর ছিল। বদরের বিজয় তথা মুসলমানদের পা দৃঢ় হয়েছে। নামাযে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর হামদ, তাকবীর, তাসবীহ ও তাওহীদের ঘোষণা করতে করতে মুসলমানরা ময়দানে বেরিয়ে এসেছিল। সে সময় মুসলমানদের মন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এবং সাহায্যের কারণে পরিপূর্ণ ছিল। তারা আরো বেশি পরিমাণে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাদের মাথা ছিল অবনত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক। পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল পরিগণিত হতে তোমরা আশঙ্কা করতে। লোকেরা তোমাদের আকস্মিকভাবে ধরে

নিয়ে যাবে। অতপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন। স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও (সূরা আনফাল-২৬)।

ওহুদের যুদ্ধ (৩য় হিজরী, ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ)

বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলমান এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র ও মর্যাদা নির্ধারণী সংঘর্ষ। এতে মুসলমানরা 'ফাতহে মুবিন' অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। সমগ্র আরব জাহান এ বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে। এ যুদ্ধের ফলাফলে মানসিক কষ্টে তারাই বেশি জর্জরিত ছিল, যারা এ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরা ছিল মুশরিক। এছাড়া অন্য একটি দল ছিল, যারা মুসলমানদের বিজয় এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জনকে তাদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্যে আশঙ্কার বিষয় বলে মনে করত, তারা হল ইহুদী। মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে জয় লাভ করায় এ দু'দল অর্থাৎ মুশরিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে। (সূরা মায়েদা-৮২)

মদীনার কিছু লোক এ উভয় দলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। তারা যখন লক্ষ্য করল, নিজেদের সম্মান বজায় রাখার অন্য কোনো পথ খোলা নেই, তখন প্রকাশ্যে তারা ইসলামে প্রবেশ করে। অথচ অন্তরে এবং বাস্তবে তারা ছিল মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার বন্ধু-বান্ধব। তারাও মুসলমানদের প্রতি ইহুদী ও মুশরিকদের চেয়ে কম ক্রোধান্বিত ছিল না। বরং এ তিন দলই, মুসলমানদের উপর চরমভাবে ক্ষেপে ছিল। এরা ছাড়া চতুর্থ একটি দলও ছিল। তারা হল, আরব বেদুঈন। যারা মদীনার আশেপাশে বসবাস করত। ইসলাম বা কুফর কোনো কিছুর প্রতিই তাদের মনের কোনো টান ছিল না। তারা ছিল লুটেরা, ডাকাত। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যে তারাও মনে কষ্ট পেয়েছিল। তারা আশঙ্কা করছিল, মদীনায় একটি শক্তিশালী সরকার কায়েম হলে, তাদের লুটতরাজের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের মনেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জেগে ওঠে ছিল এবং তারা মুসলমানদের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

এভাবে মদীনায় মুসলমানরা চতুর্মুখী সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তবে মুসলমানদের ব্যাপারে এ চারটি দলের প্রত্যেকেরই কর্মপদ্ধতি ছিল পৃথক। প্রত্যেকে নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করছিল। তারা ভাবছিল, এতেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। মদীনায় একদল লোক, মুখে প্রকাশ্যে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের কথা বললেও আড়ালে অন্তরালে তারা ষড়যন্ত্র, কুটিলতা এবং পারস্পরিক ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টির পথ অবলম্বন করে। এদিকে মক্কাবাসীরা বদরের কোমরভাঙ্গা মারের প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি দিতে থাকে। তারা খোলাখুলি প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকির পাশাপাশি যুদ্ধ প্রস্তুতিও শুরু করে। এক বছর পরে মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ অভিযান ওহুদের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধ মুসলমানদের খ্যাতি ও গৌরবের উপর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং উদ্ভূত শঙ্কার মোকাবেলায় মুসলমানরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেগুলো থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতাসুলভ যোগ্যতার পরিচয় ফুটে উঠে। এছাড়া একথাও বোঝা যায় যে, মদীনার নেতৃত্ব চারদিকের বিপদ সম্পর্কে কতোটুকু জাগ্রত ও সতর্ক ছিল। এমনকি শত্রুদের মোকাবেলায় তারা কতটা সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে রেখেছিল। বদরের পর মুসলমানদের যেসব অভিযান, শত্রুতা ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল, তা আলোচনা করা যাক।

১. বনু সোলায়মের সাথে যুদ্ধ ঃ বদরের যুদ্ধের পর মদীনার তথ্য বিভাগ সর্বপ্রথম খবর পায়, গাতফান গোত্রের শাখা বনু সোলায়মের লোকেরা মদীনায় হামলা করতে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এ খবর পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'শ সওয়ার মুজাহিদসহ আকস্মিকভাবে তাদের এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কুদর নামাক জায়গায় গিয়ে পৌঁছান। বনু সোলায়ম গোত্র এ ধরনের আকস্মিক হামলার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করে। যাওয়ার সময় পাঁচশ উট রেখে যায়। মুসলমানরা সেসব উট অধিকার করে নেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে উটের চার পঞ্চমাংশ মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দেন। প্রত্যেকে দু'টি করে উট পায়। এ অভিযানে ইয়াসার নামে একজন ক্রীতদাসও মুসলমানদের হাতে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। এরপর তিনি বনু সোলায়মের এলাকায় তিন দিন অবস্থানের পর মদীনায় ফিরে আসেন। দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার মাত্র ৭ দিন পর এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানের সময় সেবা ইবনে আরফাতা, মতান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

২. রাসূল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুশরিকরা রোষ ও ক্রোধে ছিল দিশেহারা এবং পুরো মক্কা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হাঁড়ির মত টগবগ করে ফুটছিল। অবশেষে মক্কার দুই বীর যুবক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সকল বিরোধ অনৈক্যের উৎস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই শেষ করে দিবে (নাউযু বিল্লাহ)। বদর যুদ্ধের কয়েকদিন পরের কথা। ওমায়র ইবনে ওয়াহাব জুমাহী ছিল কুরাইশ শয়তানদের একজন। এ দুর্বৃত্ত মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে নানাভাবে কষ্ট দিত। তার পুত্র ওয়াহাব ইবনে ওমায়র বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। সে একদিন কা'বার হাতীমে বসে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে বদর যুদ্ধে নিহতদের লাশ একটি নোংরা কূয়ায় নিক্ষেপ করার দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। সাফওয়ান বলল, খোদার কসম, বদরের নিহতদের পরে বেঁচে থাকায় কোনো স্বাদ নেই। জবাবে ওমায়র বলল, খোদার কসম, তুমি সত্য কথাই বলেছ। দেখ, আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হতাম এবং আমার পরিবার পরিজনের চিন্তা না থাকত, তাহলে আমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলতাম। কিন্তু আমার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই, পরিবার পরিজনও আমার অবর্তমানে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। যেহেতু আমার সন্তান ওদের হাতে বন্দী, তাই আমার মদীনায় যাওয়ার একটা অজুহাতও রয়েছে। সাফওয়ান সব কথা শুনে ভাবল, চমৎকার সুযোগ। সে ওমায়রকে বলল, শোন, তোমার ঋণ পরিশোদের দায়িত্ব আমার। তোমার পক্ষ থেকে আমি তা পরিশোধ করব। আর আজীবন তোমার পরিবারকে আমি নিজের পরিবারের মতো দেখব। আমার কাছে কোনো জিনিস রয়েছে অথচ তারা পাবে না, এমন কখনো হবে না।

ওমায়র বলল, ঠিক আছে। তবে আমাদের একথা যেন গোপন থাকে। সাফওয়ান বলল, হ্যাঁ, গোপনই থাকবে। এরপর ওমায়ের তার তরবারি ধারালো করে তাতে বিষ মিশায়। সে মদীনার দিকে রওনা হয়ে এক সময় সেখানে পৌঁছায়। মসজিদে নববীর সামনে সে তার উট বসাচ্ছিল। এ সময় তার উপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) দৃষ্টি পড়ে। তিনি মুসলমানদের এক সমাবেশে বদর যুদ্ধে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ওমায়রকে দেখামাত্র তিনি বলেন, এ নরাধম কুত্তা, আল্লাহর দুশমন ওমায়র। নিশ্চয়ই কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর দুশমন ওমায়র তরবারি ঝুলিয়ে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে আস। ওমায়র এলে, হযরত ওমর (রা.) তার তলোয়ার ওমায়েরের গলার কাছে চেপে ধরেন। কয়েকজন আনসারকে বলেন, তোমরা ভিতরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সেখানে বসে থাক। তাঁর বিরুদ্ধে এ খবিসের শংকাজনক তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকবে। কেননা একে বিশ্বাস করা যায় না। এরপর হযরত ওমর (রা.), ওমায়রকে মসজিদের ভিতরে নিয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, হযরত ওমর (রা.) ওমায়েরের তরবারি তার ঘাড়েই লেপ্টে ধরে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওমর ওকে ছেড়ে দাও। আর ওমায়েরকে বলেন, তুমি কাছে এসো। ওমায়র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আপনাদের সকাল শুভ হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন এক সম্বোধন শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমাদের সম্বোধন থেকে উত্তম। তা হচ্ছে আস্‌সালামু আলাইকুম, যা জান্নাতীদের সম্বোধন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ওমায়র, তুমি কেন এসেছ? সে বলল, আপনাদের কাছে যে বন্দী রয়েছে তার ব্যাপারেই এসেছি। আপনারা আমার বন্দীর ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে তোমার ঘাড়ে তরবারি কেন? সে বলল, আল্লাহ এ তরবারির নিপাত করুন। এটি কি আর আমাদের কোনো কাজে আসবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সত্যি করে বল, কেন এসেছ? সে বলল, বললাম তো, যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আলোচনার জন্যে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না তা নয়। তুমি এবং সাফওয়ান কা'বার হাতীমে বসে নিহত কুরাইশদের লাশ কূয়ায় ফেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছ। এরপর তুমি বলেছিলে, আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হতাম এবং আমার পরিবার পরিজন না থাকত, তবে আমি এখান থেকে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। একথা শোনার পর সাফওয়ান এ শর্তে তোমার ঋণ এবং পরিবার পরিজনের দায়িত্ব নিয়েছে যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে। আল্লাহ তা'আলা আমার এবং তোমাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আছেন।

ওমায়র বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের কাছে আকাশের যে খবর নিয়ে আসতেন এবং আপনার উপর যে ওহী নাযিল হত, সেসব আমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু এটা তো এমন ব্যাপার, যাতে আমি এবং সাফওয়ান ছাড়া সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। কাজেই আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, এ খবর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আপনাকে বলেননি। সে আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা যিনি আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং এ জায়গা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। একথা

www.nagorikpathagar.org

বলে ওমায়র কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের ভাইকে দ্বীন শেখাও, কুরআন পড়াও এবং তার বন্দীকে মুক্ত করে দাও। এদিকে সাফওয়ান মক্কায় বলে বেড়াচ্ছিল, সুখবর শোন, কয়েকদিনের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে, যা আমাদের বদরের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিবে। সাফওয়ান মদীনা থেকে আসা লোকের কাছে ওমায়েরের খবর জানতে চাচ্ছিল। অবশেষে একজনের কাছে খবর পেল, ওমায়র মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে সাফওয়ান কসম খেয়ে বলল, ওমায়রের সাথে কখনো কথা বলব না এবং তার কোনো উপকারও করব না। এদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ওমায়র (রা.) মক্কায় এসে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তার আহ্বানে বহু লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। (ইবনে হিশাম)

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, ইহুদীরা মুসলমানদের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ঝগড়া বিবাদের উস্কানি দিত। উদাহরণস্বরূপ মদীনায় শাশ ইবনে কায়স নামে এক ইহুদী ছিল। লোকটি এত বৃদ্ধ ছিল যে, দেখে মনে হতো, তার এক পা কবরে চলে গেছে। মুসলমানদের প্রতি তার শত্রুতা ও ঘৃণা ছিল সীমাহীন। একবার সে সাহ-াবায়ে কেরামের এক মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে মজলিসে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকজন বসে কথাবার্তা বলছিল। উভয়ের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের মত পারস্পরিক শত্রুতা ছিল না। ইসলামের স্নেহ, কোমলতা, ঐক্য, জাহেলিয়াত যুগের পারস্পরিক শত্রুতার জায়গা দখল করেছিল এবং তাদের দীর্ঘ কালের বিরোধ বিবাদের সমাপ্তি ঘটেছিল। এ অবস্থা দেখে বৃদ্ধ ইহুদীর মনে খুবই কষ্ট হয়। সে বলতে থাকে, বাহরে বাহ, এখানে তো দেখছি বনু কায়লা পরিবারের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়েছে। এ অভিজাতদের একত্রিত হওয়ার পর আমরা তো অপাংক্তেয় হয়ে গেছি। আমাদের তো আর এখানে বসবাসের সুযোগ নেই। বৃদ্ধ ইহুদী তার সঙ্গে থাকা যুবকটিকে বলল, ওদের কাছে গিয়ে বুয়াস যুদ্ধ এবং তারও আগের কিছু ঘটনা আলোচনা কর। এ প্রসংগে উভয়পক্ষে যেসব পরস্পর বিদ্বেষী কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিল, সেসব কবিতার কিছু কিছু ওদের শোনাও; যেন ওরা ঝগড়ায় জড়িয়ে যায়। ইহুদী যুবকটি তা-ই করে। ফলে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। উপস্থিত লোকেরা ঝগড়া শুরু করে এবং একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে থাকে। উভয় গোত্রের একজন করে প্রতিনিধি হাঁটু গেড়ে বসে। একজন বলল, যদি চাও, তবে আমরা সে যুদ্ধ এখন তাজা করে দিতে

www.nagorikpathagar.org

পারি। একথা শুনে উভয়পক্ষ ক্ষেপে ওঠে। উভয় দলই বলল, আমরাও প্রস্তুত। হাররায় উভয় পক্ষের মুকাবিলা হবে। অস্ত্রের ঝনঝনানী ও যুদ্ধের আওয়ায ওঠে। উভয় পক্ষের লোকজন অস্ত্র নিয়ে হাররা অভিমুখে রওনা হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হতে যাবে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পৌঁছে। তিনি দ্রুত মুহাজির সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বলেন, হে-মুসলমানরা, হায় আল্লাহ! আমার জীবদ্দশায় তোমরা জাহেলিয়াতে ফিরে যাচ্ছ? ইসলাম গ্রহণের পরও তোমাদের একি কাজ? ইসলামের মাধ্যমে তোমরা জাহেলিয়াতের রসম-রেওয়াজ থেকে মুক্ত হয়েছ। কুফরী থেকে মুক্তি লাভ করেছ। তোমাদের অন্তর পরস্পরের জন্যে সম্প্রীতিতে পূর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশপূর্ণ কথা শুনে আনসার সাহাবীরা বুঝতে পারল, তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়েছে, দুশমনের প্ররোচনার শিকার হয়েছে। এসব ভেবে তারা কাঁদতে শুরু করে। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে। এরপর আল্লাহর রাসূলের অনুগত হয়ে তারা এমনভাবে ঘরে ফিরে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দুশমন ইহুদী শাশ ইবনে কায়সের ষড়যন্ত্রের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন। (ইবনে হিশাম)।

মুসলমানরদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টার এটি একটি মাত্র উদাহরণ। ইসলামী দাওয়াতের পথে ইহুদীদের বাধা সৃষ্টির উদাহরণ এ ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে ইহুদীরা নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করত। তারা মিথ্যা প্রোপাগা া চালাত। সকালে মুসলমান হয়ে বিকেলে পুনরায় কাফের হয়ে যেত। তারা এটা এজন্যেই করত, যাতে দুর্বল চিত্তের মানুষদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করা যায়। কারো সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলে সে যদি মুসলমান হত, তাহলে ইহুদীরা তার জীবিকার পথ সংকীর্ণ করে দিত। আর টাকা পাওনা থাকলে সকাল-বিকাল তাগাদা দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলত। আবার কোনো মুসলমান পাওনাদার হলে তার পাওনা আদায় করত না; বরং অন্যায়ভাবে তা আত্মসাৎ করত। এরপরও যদি সে মুসলমান টাকা চাইতো, তখন কুচক্রী ইহুদী বলত, তোমার পাওনা তো আমার উপর ততোদিন পরিশোধের দায়িত্ব ছিল, যতোদিন তুমি পূর্বপুরুষের দ্বীনে বিশ্বাসী ছিলে। এখন তুমি তোমার দ্বীন পরিবর্তন করেছ, কাজেই এখন তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্ক থাকার কোন পথ নেই। (তাফসীরে সূরা আলে ইমরান)

ইহুদীরা যখন দেখল, বদর প্রান্তরে আল্লাহ মুসলমানদের সরাসরি সাহায্য করেছেন

এবং তাদের মর্যাদা ও প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষের উত্তপ্ত হাঁড়ি টগবগ করে ফুটে উঠল। তারা প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে এবং মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে হিংসুটে এবং দুর্বৃত্ত ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ। মদীনার তিনটি ইহুদী গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট ও শয়তান প্রকৃতির ছিল বনু কায়নুকা। তারা মদীনার ভিতরে থাকত এবং তাদের মহল্লা তাদের নামেই পরিচিত ছিল। তারা পেশায় ছিল কর্মকার, স্বর্ণকার এবং থালাবাটি নির্মাতা। এ কারণে তাদের কাছে সব সময় প্রচুর সমরাস্ত্র বিদ্যমান থাকত। তাদের যুদ্ধ করার মত বলিষ্ঠ লোকের সংখ্যা ছিল সাত'শ। তারা ছিল মদীনায় সবচেয়ে শক্তিধর ও বীর ইহুদী গোত্র। তারাই সর্বপ্রথম মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে।

আল্লাহ যখন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সফলতা দান করেন, তখন ইহুদীদের শত্রুতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তারা দুর্বৃত্তপনা, ঘৃণ্য কার্যকলাপ এবং উস্কানিমূলক কর্মতৎপরতা অবলম্বন করে। মুসলমানরা বাজারে গেলে তারা তাদের সাথে উপহাসমূলক আচরণ করত। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কষ্ট দিত। তাদের ঔদ্ধত্য এতই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুসলিম মহিলাদেরও উত্ত্যক্ত করত। ক্রমে অবস্থা নাজুক হয়ে ওঠে। ইহুদীদের ঔদ্ধত্য হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ সময় একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের সমবেত করে ওয়ায নসীহত করে হিদায়াতের সরল সোজা পথের প্রতি আহ্বান জানান। তাদের নিপীড়নমূলক কাজের মন্দ পরিণাম সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন। কিন্তু এতে তাদের হীন ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ আরো বেড়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন কুরাইশদের পরাজিত করেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসে বনু কায়নুকার বাজারে ইহুদীদের এক সমাবেশ আহ্বান করেন। এ সমাবেশে তিনি বলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়, কুরাইশদের উপর যে রকম আঘাত পড়েছে, সে রকম আঘাত তোমাদের উপর আসার আগেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা বলল, হে মুহাম্মদ, তুমি আমাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করছ। কুরাইশ গোত্রের আনাড়ি অনভিজ্ঞ লোকদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয়েছে। এতেই তোমরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে আছ। আমাদের সাথে যদি তোমাদের যুদ্ধ হয় তবে বুঝতে পারবে, পুরুষ কাকে বলে। আমরা হচ্ছি সাহসী বীর বাহাদুর। আমাদের মত লোকের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয়নি। তাই আমাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করে বসে আছ। তাদের উক্তির জবাবে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন,

www.nagorikpathagar.org

'যারা কুফরী করে; তাদের বল, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে। আর সেটা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল। দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল আর অন্য দল ছিল কাফের। ওরা তাদের চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ১২-১৩)

বনু কায়নুকা যে জবাব দিয়েছিল, তার অর্থ সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ সম্বরণ এবং ধৈর্যধারণ করেন। মুসলমানরাও ধৈর্যধারণ করে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার পর তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। কয়েকদিন পরেই মদীনায় তারা হাংগামাপূর্ণ সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে। ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খনন করে নেয়। নিজেদের জীবনের সকল পথ বন্ধ করে ফেলে।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, একবার এক আরব মহিলা বনু কায়নুকার বাজারে দুধ বিক্রি করতে যায়। দুধ বিক্রির পর সে মহিলা কোন এক প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের দোকানে বসে। ইহুদী তার চেহারা অনাবৃত করতে বলে, কিন্তু মহিলা রাযি হননি। এতে স্বর্ণকার চুপিসারে সে মহিলার কাপড়ের একাংশ তার পিঠের সাথে গিট বেঁধে দেয়। মহিলা কিছুই বুঝতে পারেনি। মহিলা উঠে দাঁড়ালে, সাথে সাথে তার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়ে। এতে ইহুদীরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। মহিলা এভাবে অপমানিত হয়ে চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করেন। তার কান্না শুনে একজন মুসলমান কারণ জানতে চান। সব শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে তিনি সে ইহুদীর উপর হামলা করে তাকে মেরে ফেলেন। ইহুদীরা যখন দেখল, তাদের একজন লোককে মেরে ফেলা হয়েছে এবং মেরেছে তাদের শত্রু মুসলমান, তখন তারা সম্মিলিত হামলা চালিয়ে সে মুসলমানকেও মেরে ফেলে। নিহত মুসলমানের পরিবারবর্গ চিৎকার কান্নাকাটি করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কাছে অভিযোগ করেন। ফলে মুসলমান এবং বনু কায়নুকা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। (ইবনে হিশাম)

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযেরকে অর্পণ করেন এবং হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের হাতে মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

পতাকা তুলে দিয়ে আল্লাহর বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বনু কায়নুকার বসতি অভিমুখে রওনা হন। ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে মুহূর্তে দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়। তিনি কঠোরভাবে তাদের অবরোধ করে রাখেন। সেদিন ছিল জুমার দিন, দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ। এরপর পনের দিন, অর্থাৎ যিলক্বদ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখা হয়। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব বসিয়ে দেন। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, তিনি কোনো কওমকে পরাজিত করতে চাইলে তাদের মনে প্রতিপক্ষের প্রভাব বসিয়ে দেন। বনু কায়নুকা গোত্র আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করে। তাদের জান-মাল, মহিলা ও শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের দেয়া ফয়সালাই চূড়ান্ত হয়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে ইহূদীদের সবাইকে বেঁধে ফেলা হয়।

মাত্র একমাস আগে ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণকারী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ সময় ইহুদীপ্রীতির নযীর স্থাপন করে। সে কপট বিনয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ইহুদীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে বলে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মিত্রদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। উল্লেখ্য, বনু কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। মুনাফিক নেতা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কিন্তু সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার বুকের দিকের ফাড়া অংশে হাত ঢুকিয়ে দেয়। তিনি এতে বিরক্ত হয়ে বলেন, আমাকে ছাড়। তিনি এত ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর চেহারায় ক্রোধের ঝলক ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, তোমার জন্যে আমার আফসোস হচ্ছে, তুমি আমাকে ছাড়। কিন্তু এ মুনাফিক তার অনুরোধ অব্যাহত রাখে। সে বলল, আমার মিত্রদের ব্যাপারে অনুগ্রহ না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ব না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কথা রাখেন। তার খাতিরে ইহুদীদের জীবন ভিক্ষা দেন। তবে নির্দেশ দেন, তাদের মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তারা মদীনার আশেপাশে কোথাও থাকতে পারবে না। ইহুদীরা তখন যতোটা জিনিস সঙ্গে নেয়া সম্ভব ততোটা নিয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। এখানে বহু ইহুদীদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এর মধ্যে তিনটি কামান, দু'টি বর্ম, তিনটি তলোয়ার এবং তিনটি বর্শা নিজের জন্যে রাখেন। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে নেন। একদিকে সাফওয়ান

www.nagorikpathagar.org

ইবনে উমাইয়া, ইহুদী এবং মুনাফিকরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে আবু সুফিয়ানও তার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান এ মর্মে কসম করেছিল যে, মুহাম্মদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত সে ফরয গোসল করবে না। এ কসম পূরণের জন্যে আবু সুফিয়ান দু'শ সওয়ারী নিয়ে রওনা হয় এবং কানাত প্রান্তরে অবস্থিত নাইব পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু স্থাপন করে। মদীনা থেকে এ জায়গার দূরত্ব বার মাইল। কিন্তু আবু সুফিয়ান মদীনায় সরাসরি হামলার সাহস পায়নি। সে এমন একটা কাজ করে বসে, যাকে ডাকাতি বা রাহাজানি বলা যায়।

রাতের অন্ধকারে আবু সুফিয়ান মদীনার উপকণ্ঠে এসে হুয়াই ইবনে আখতারের ঘরে গিয়ে তাকে দরজা খোলার অনুরোধ জানায়। হুয়াই পরিণাম আশঙ্কায় দরজা খুলতে অস্বীকার করে। তখন আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বনু নযীরের অন্য এক সর্দার সালাম ইবনে মিশকামের কাছে গমন করে। এ লোকটি বনু নযীর গোত্রের কোষাধ্যক্ষ ছিল। আবু সুফিয়ান ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চায়। সালাম ইবনে মিশকাম, আবু সুফিয়ানকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে এবং আতিথেয়তাও করে। খাবার খাওয়ায়, মদ পরিবেশন করে এবং মদীনার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ অবহিত করে। এরপর আবু সুফিয়ান এখান থেকে বেরিয়ে দ্রুত তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে এবং একদল লোক পাঠিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে আরিয নামক জায়গায় হামলা করায়। এ দুর্বৃত্তরা সেখানে কয়েকটি খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং কয়েকটি গাছে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর একজন আনসার এবং তার এক মিত্রকে ফসলের ক্ষেতে পেয়ে হত্যা করে ঊর্ধ্বশ্বাসে মক্কাভিমুখে পালিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের দ্রুত ধাওয়া করেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা এর চেয়ে দ্রুত মক্কার পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়। তারা বোঝা হালকা করার জন্যে ছাতু, খাদ্রসামগ্রী এবং সাজসরঞ্জাম পথে ফেলে রেখে যায়। এসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা আবু সুফিয়ানকে কারকারাতুল কুদর পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরে আসেন। ফেরার পথে মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের লোকদের ফেলে যাওয়া ছাতুসহ বিভিন্ন জিনিস তুলে নেন। এ অভিযানের নামকরণ করা হয় গাযওয়াতুস সাবিক বা সাবিক অভিযান। আরবী ভাষায় সাবিক মানে ছাতু। বদর যুদ্ধের মাত্র দুই মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর যিলহজ্জ মাসে এ ঘটনা ঘটে। এ অভিযানের সময় মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনযের এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। (ইবনে হিশাম)

www.nagorikpathagar.org

বদর যুদ্ধের পর এ অভিযান ছিল সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তৃতীয় হিজরীর মহররম মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এরপর, মদীনার তথ্য বিভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানায়, বনু সালাবা এবং মোহারেব গোত্রের এক বিরাট দল মদীনায় হামলা করতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পর পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। সওয়ারী ও পদাতিক মিলিয়ে সাড়ে চারশ মুজাহিদ রওনা হন। এ অভিযানে গমনকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। পথে মুহাজিররা বনু সালাবা গোত্রের জাব্বার নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আল্লাহর রসূলের সামনে হাযির করেন। লোকটিকে তিনি ইসলামে দাওয়াত দেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হযরত বেলাল (রা.)-এর সংগে দেন। সে পথপ্রদর্শকরূপে মুসলমানদের শত্রু এলাকা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এদিকে শত্রুরা মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে আশেপাশের পাহ-াড়ী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন এবং মুজাহিদদের নিয়ে শত্রুদের অবস্থানস্থল পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। সে জায়গায় ছিল একটা কূপ, যা 'যি-আমর' নামে পরিচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদুঈনদের উপর প্রভাব বিস্তার এবং মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়ার জন্যে তৃতীয় হিজরীর পুরো সফর মাস সেখানে অতিবাহিত করে পরে মদীনায় ফিরে আসেন। (ইবনে হিশাম)

ইহুদীদের মধ্যে কাব ইবনে আশরাফ এক লোক মুসলমানদের প্রচ ঘৃণা করত। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় সে ছিল অত্যন্ত কঠোর। সে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের দাওয়াত দিয়ে বেড়াত। তার মায়ের গোত্র ছিল বনু নযির। এ লোকটি ছিল ধনী এবং প্রভাবশালী। আরবে তার দৈহিক সৌন্দর্যের সুনাম এবং বিখ্যাত কবি হিসেবেও পরিচিতি ছিল। এ লোকটির দুর্গ ছিল মদীনার দক্ষিণাংশে বনু নযির গোত্রের বসতি এলাকার পিছনে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং কুরাইশ নেতাদের হত্যাকা র খবর শোনার সাথে সাথে সে বলে ছিল, আসলেই কি এরকম ঘটেছে? তারা ছিল আরবদের মধ্যে অভিজাত লোকদের বাদশাহ। মুহাম্মদ যদি তাদের মেরেই থাকে, তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এর উপরিভাগ থেকে উত্তম। সুতরাং বেঁচে থাকার চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই ভাল।

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের বিজয়ের খবর পাওয়ার পর আল্লাহর শত্রু কাব ইবনে আশরাফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের কুৎসা রটনা এবং ইসলামের শত্রুদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়। এতেও তৃপ্ত হতে না পেরে সে মক্কায় কুরাইশদের কাছে গমন করে এবং মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা সাহমীর মেহমান হয়। এরপর সে মুশরিকদের মনে উত্তেজনার আগুন প্রজ্বলিত করে। তাদের প্রতিশোধের আগুন তীব্র করে এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধের প্ররোচিত করার জন্যে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে নিহত কুরাইশ সরদারদের জন্যে বিলাপ মাতম শুরু করে। কাব মক্কায় অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে আমাদের না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদের দ্বীন অধিক পছন্দীয়? উভয় দলের মধ্যে কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত? কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং উত্তম। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। তুমি কি তাদের দেখোনি, যাদের কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা 'জেব্‌ত' এবং 'তাগুতে'র ওর ঈমান রাখে, তারা কাফেরদের সম্পর্কে বলে, তাদের পথই মুমিনদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। (সূরা নিসা-৫১)।

কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় এসব জঘন্য কাজ করার পর মদীনায় ফিরে আসে। মদীনায় এসে সে সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের সম্পর্কে ঘৃণ্য কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। এছাড়া যা মুখে আসছিল তাই বলছিল। অবিরামভাগে সে মুসলমানদের কষ্ট দিতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেন, কা'ব ইবনে আশরাফের সাথে বোঝাপড়ার মতো কে আছো? এ লোকটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর রসূলের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, ওব্বাদ ইবনে বিশর, আবু নায়েলা ওরফে সালকান ইবনে সালামা, হারেস ইবনে আওস, আবু আব্বাস ইবনে জারার (রা.) উঠে দাঁড়ান। আবু নায়েলা ওরফে সালকান ইবনে সালামা (রা.) ছিলেন কা'ব ইবনে আশরাফের দুধভাই। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এ দলের নেতা মনোনীত হন।

এর নির্দিষ্ট দিনে কা'ব ইবনে আশরাফের উপর হামলার সময় হযরত হারেস ইবনে আওস (রা.)-এর দেহে একজন সঙ্গীর তরবারির সামান্য আঘাত লাগে। এতে তিনি আহত হন। তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। ফেরার পথে হাররায়ে আরিয নামক জায়গায় পৌছার পর তারা দেখেন, হারেস (রা.) সঙ্গে নেই। তাই সবাই সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর হারেস এসে পৌঁছান।

www.nagorikpathagar.org

হারেসকে তুলে নিয়ে তারা বাকিয়ে গার্কাদে পৌঁছে জোরেশোরে তাকবীর ধ্বনি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত কিলোমিটার দূর হতে সে তাকবীর ধ্বনি শুনতে পান। এতে তিনি বুঝতে পারেন, অভিযান সফল হয়েছে। তিনিও আল্লাহ আকবর ধ্বনি দেন। এ দলের লোকেরা উপস্থিত হলে তিনি বলেন, এ চেহারাগুলো কামিয়াব হোক। তারা বলেন, আপনার চেহারাও, হে আল্লাহর রাসূল। একথা বলার পর পরই অভিযানে অংশ গ্রহণকারীরা কা'ব ইবনে আশরাফের কর্তিত মস্তক আল্লাহর রাসূলের সামনে রেখে দেন। কা'বের হত্যায় তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং হারেসের ক্ষতস্থানে থুথু লাগিয়ে দেন। এতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর সে ক্ষতস্থানে আর কখনো ব্যথা হয়নি। (ইবনে হিশাম)

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে ইহুদী হঠকারীদের মনে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারে, যারা শান্তি ভঙ্গের জন্যে দায়ী হবে, সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করবে, সদুপদেশ দানে কাজ না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের দ্বিধা করবেন না। এ কারণে তারা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার খবর শুনে টুশব্দ করেনি। বরং তারা একেবারে দম বন্ধ করে পড়ে থাকে। অংগীকার রক্ষা করছে বলে প্রকাশ্যে দেখাতে থাকে। এরপরের গুরুত্বপূর্ণ এক সামরিক অভিযানে তিনশ মুজাহিদ অংশ গ্রহণ করেন। এ বাহিনী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বাহরান এলাকা অভিমুখে রওনা হন। এটি হেজাযের অভ্যন্তরে ফারা অঞ্চলের এক জায়গা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মুজাহিদরা রবিউস সানী এবং জমাদিউল আউয়াল মাস সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় ফিরে আসেন। কোনো লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। (ইবনে হিশাম)

ওহুদ যুদ্ধের ঠিক আগে সংঘটিত হয় মুসলমানদের শেষ সফল অভিযান। তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানি মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়। বদর যুদ্ধের পর থেকে কুরাইশরা মানসিক কষ্টে ও অস্থিরতায় কাতর ছিল। এর মাঝে গ্রীষ্মকাল এসে পড়ে। এ সময়ই সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলা পাঠানোর কথা। বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার চিন্তা তাদের পেয়ে বসে। সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার নেতা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কথায় কুরাইশদের এ দুঃচিন্তার বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সে কুরাইশদের বলে, মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা আমাদের বাণিজ্যপথ কঠিন বিপজ্জনক করে তুলেছে। বুঝতে পারছি না, তাদের সাথে কিভাবে মুকাবিলা

www.nagorikpathagar.org

করব। তারা সমুদ্র উপকূল থেকে সরছে না, এদিকে উপকূলবাসীরাও তাদের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছে। সাধারণ লোকেরাও তাদের পক্ষে চলে গেছে। বুঝতে পারছি না, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করব। অথচ আমরা যদি ঘরে বসে থাকি, তবে তো আমাদের পুঁজিই শেষ হয়ে যাবে। কেননা মক্কায় আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা দু'মৌসুমের ব্যবসার উপর নির্ভশীল। গ্রীষ্মকালে সিরিয়া আর শীতকালে আবিসিনিয়ার সাথে।

ফলে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে ইরাকগামী পথ ধরে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ সফর পরিকল্পনার বিস্তারিত খবর মদীনায় পৌঁছে যায়। সালিত ইবনে নোমান, যিনি মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি নঈম ইবনে মাসউদের সাথে এক মদের আড্ডায় মিলিত হন। নঈম তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য যে, তখনো পর্যন্ত মদপান নিষিদ্ধ হয়নি। মদের আড্ডায় নঈম, সালিতের কাছে নেশার ঘোরে কুরাইশদের বাণিজ্য যাত্রার সব কথা প্রকাশ করে দেয়। সালিত সাথে সাথে বিদ্যুদ্বেগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে কুরাইশ কাফেলার এ সফরের সব কথা প্রকাশ করে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর পেয়ে অবিলম্বেই কুরাইশ কাফেলার উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং একশ সওয়ারের একটি বাহিনী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা কালবী (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ (রা.) তার বাহিনীসহ দ্রুত পথ অতিক্রম করেন। ওদিকে কুরাইশ কাফেলা একবারে অজ্ঞাত অবস্থায় কারদা নামক কূপের পাড়ে গিয়ে তাঁবু ফেলার জন্যে অবতরণ করছিল। এ অবস্থায় হযরত যায়েদ (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে হঠাৎ হামলা চালিয়ে পুরো কাফেলাই দখল করে নেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং কাফেলার অন্য তত্ত্বাবধায়কদের পলায়ন ছাড়া উপায় ছিল না। মুসলিম বাহিনী কুরাইশ কাফেলার পথপ্রদর্শক ফোরাত ইবনে হাইয়ানকে মতান্তরে আরো দু'জন লোককে গ্রেফতার করে। কাফেলার বিভিন্ন মালামাল গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। যেগুলোর মূল্য ছিল আনুমানিক এক লাখ দেরহাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে, বাকি সব মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেন। ফোরাত ইবনে হাইয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনে হিশাম)

বদর যুদ্ধের পর এটি ছিল কুরাইশদের জন্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা। এর ফলে তাদের মানসিক যন্ত্রণা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে। হয়ত নিজেদের দম্ভ অহংকার ছেড়ে মুসলমানদের সাথে আপস

www.nagorikpathagar.org

মীমাংসা করা। অন্যথায় তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের হারান শক্তি সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনা এবং মুসলমানদের শক্তি এমনভাবে ভেংগে দেয়া যেন ভবিষ্যতে তারা পুনরায় মাথা তুলতে না পারে। মক্কার কুরাইশরা দ্বিতীয় পথই গ্রহণ করে। এ ঘটনার পর তাদের প্রতিশোধস্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। তারা মুসলমানদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার এবং তাদের দেশে প্রবেশ করে তাদের উপর হামলা করার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। অতীতের ঘটনাবলীর পাশাপাশি বাণিজ্য আক্রান্ত হওয়ার ক্ষোভও ওহুদ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

বদর যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের পরাজয় ও অবমাননা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিহত হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অস্থির ছিল। এমনকি তারা নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ, কান্নাকাটি এবং বিলাপ নিষেধ করে দিয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ ও পরিশোধের তাড়াহুড়া করা থেকে বিরত ছিল, যেন মুসলমানরা তাদের দুঃখ দুশ্চিন্তা আন্দাজ করতে না পারে। তাদের শোকের গভীরতা এবং মানসযন্ত্রণা তারা মুসলমানদের জানতে দেয়নি। বদর যুদ্ধের পর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ করে নিজেদের মনের জ্বালা জুড়ানোর এবং ক্রোধ প্রশমনের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরপরই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে এ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়া ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী।

আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিল এবং সে মালামালসহ ঐ কাফেলা নিরাপদে বাঁচিয়ে নিতে সফল হয়েছিল। উক্ত কাফেলার সমুদয় মালামাল সে পরবর্তী যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখে। সে মালামালের মালিকদের বলে, শোনো কুরাইশ বংশের লোকেরা, মুহাম্মদ তোমাদের কঠিন আঘাত হেনেছে, তোমাদের নেতাদের হত্যা করেছে। সুতরাং তার সাথে যুদ্ধ করতে তোমরা তোমাদের এ মালামাল দিয়ে সহায়তা কর। হয়তো আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হব। কুরাইশদের একথায় সাড়া দিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলায় যা কিছু সম্পদ ছিল তা সবই যুদ্ধের জন্যে দান করতে রাযি হয়। সে মালামালের পরিমাণ ছিল এক হাজার উট এবং পঞ্চাশ হাজার দীনার। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে উটগুলো বিক্রি করে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, 'আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত করার জন্যে কাফিররা

www.nagorikpathagar.org

তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা তো ধন-সম্পদ ব্যয় করবেই; অতপর সেটা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে এবং তাদের পরাভূত করা হবে। (সূরা আনফাল-৩৬)

সবশেষে যায়েদ বিন হারেসা কালবীর (রা.) অভিযানে কুরাইশদের যে গুরুতর কোমর ভাংগা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তথা যে পরিমাণ দুঃখ পেতে হয়, তা আগুনে তেলের কাজ করে। এরপর থেকেই মুসলমানদের সাথে একটি ভয়ংকর যুদ্ধ লড়ার জন্যে কুরাইশদের প্রস্তুতিতে জেদী ভাব সঞ্চারিত হয়। বছর পূর্ণ হতেই কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। নিজেদের লোক ছাড়াও সহযোগী এবং মিত্রদের মিলে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার। কুরাইশ নেতারা কিছুসংখ্যক সুন্দরী মহিলাকেও যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী পনের জন মহিলাকেও নেয়া হয়। মহিলাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দেখান হয়, তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার প্রেরণায় যুদ্ধে বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা বেশি কাজ করবে। যুদ্ধের জন্যে তিন হাজার উট এবং দু'শ ঘোড়া প্রস্তুত করা হয়। ঘোড়াগুলোকে অধিকতর সক্রিয় রাখতে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পুরো পথ সেগুলোর উপর কাউকে আরোহণ করতে বিরত রাখা হয়। এছাড়া নিরাপত্তামূলক অস্ত্রের মধ্যে তিন হাজার বর্মও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আবু সুফিয়ানকে পুরো বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। খালিদ ইবনে ওলীদকে সাহায্যকারী ঘোড়সওয়ার বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। ইকরামা ইবনে আবু জাহেলকে তার সহকারী নিযুক্ত করা হয়। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধ পতাকা বনী আবদুদ দার গোত্রের হাতে দেয়া হয়। হযরত আব্বাস (রা.) কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতি গভীর নযর রাখছিলেন। অতএব মক্কী বাহিনী মদীনার দিকে রওয়ানা করতেই তিনি সমুদয় বিবরণ সম্বলিত একখানা পত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে দূত মারফত মদীনায় পাঠান। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আব্বাস (রা.)-এর চিঠি পড়ে শোনান। তিনি হযরত উবাই (রা.) কে চিঠির বক্তব্য গোপন রাখার নির্দেশ দিয়ে আনসার ও মুহাজির নেতাদের সাথে জরুরী পরামর্শ করেন।

কুরাইশ বাহিনীর মদীনাভিমুখে রওনার খবর পেতেই যে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্যে মুসলমানরা সর্বক্ষণ অস্ত্র সঙ্গে রাখতে শুরু করেন। এমনকি নামাযের সময়ও অস্ত্র কাছে রাখা হত। কয়েকজন আনসারকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তা রক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.), ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রা.) এবং

সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)। তারা সশস্ত্র অবস্থায় সারা রাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে পাহারায় থাকতেন। মদীনার বিভিন্ন প্রবেশপথেও বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দল নিয়োগ করা হয়। যে কোনো ধরনের আকস্মিক হামলা মোকাবেলায় তাদের প্রস্তুত রাখা হয়। শত্রুদের গতিবিধির উপর নযর রাখতে মদীনার বাইরের রাস্তায়ও ছোট ছোট কয়েকটি টহল দল নিযুক্ত করা হয়।

এদিকে কুরাইশ বাহিনী পরিচিত পথে মদীনা অভিমুখে এগিয়ে চলে। আবওয়া নামক জায়গায় পৌঁছার পর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে ওতবা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা বিবি আমেনার কবর খুঁড়ে ফেলার প্রস্তাব করে। কিন্তু এমন একটি ঘৃণ্য কাজের দরজা উন্মুক্ত করতে কুরাইশ নেতারা রাযি হয়নি। কুরাইশ বাহিনী আবওয়া থেকে যথারীতি তাদের সফর অব্যাহত রাখে। তারা মদীনার কাছে পৌঁছে প্রথমে আকিক প্রান্তর অতিক্রম করে। এরপর কিছুটা ডানে গিয়ে ওহুদ পর্বতের নিকটবর্তী আইনাইন নামক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে। আইনাইন মদীনার উত্তরে কানাত প্রান্তরের কাছে একটি উর্বর ভূমি। এটা তৃতীয় হিজরীর ৬ শাওয়াল শুক্রবার দিনের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামায পড়ান এবং নামায শেষে ওয়াজ নসীহত করেন, জিহাদে উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, ধৈর্য এবং দৃঢ়পদ থাকার মাধ্যমেই জয় লাভ করা যেতে পারে। সাথে সাথে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা শত্রুর মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত থাকে। একথা শোনার পর মুসলমানদের মাঝে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসরের নামায আদায় করেন তখন লোকজন সমবেত হয়। মদীনার উপরিভাগের বাসিন্দারাও আসে। নামাযের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রা.) সঙ্গে ছিলেন। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেন এবং পোশাক পরিধান করান। তিনি উপরে নিচে দু'টি বর্ম পরিধান করেন। এরপর তলোয়ারসহ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকলের সামনে হাযির হন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদের তিন ভাগে ভাগ করেন–

(১) মুহাজির বাহিনী। এ বাহিনীর পতাকা হযরত মোসয়াব ইবনে ওমায়র আবদারী (রা.)-কে প্রদান করেন।

(২) আনসারদের আওস গোত্রের বাহিনী। এ বাহিনীর পতাকা হযরত ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রা.)-কে দেন।

(৩) খাযরাজ গোত্রের বাহিনী। হযরত হুবাব ইবনে মোনযের (রা.)-কে এ বাহিনীর পতাকা প্রদান করেন।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে এক হাজার। তাদের মধ্যে একশ জন বর্ম পরিহিত এবং পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ চলাকালে মদীনায় অবস্থানরতদের নামাযে ইমামতির দায়িত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর উপর দিয়ে মুসলিম সৈন্যদের রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে রওনা হয়। হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বর্ম পরিহিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এগিয়ে যান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়খান নামক জায়গায় পৌঁছে মুসলিম সৈন্যদের পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং যুদ্ধের অনুপযোগীদের ফেরত পাঠান। যাদের ফেরত পাঠান হয়; তারা হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত ওসামা ইবনে যায়দ (রা.), হযরত ওসায়দ ইবনে যহির (রা.), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রা.), হযরত ওসামা ইবনে আওস (রা.), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা আনসারী (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে হেব্বা (রা.)। এ তালিকায় হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর নামও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি ওহুদ যুদ্ধে যোগ দান করেন।

কম বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও হযরত রাফে ইবনে খাদীজা (রা.) এবং হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-কে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। এর কারণ ছিল, হযরত রাফে ইবনে খাদীজা (রা.) তীরন্দাজ হিসেবে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাকে অনুমতি দেয়ার পর হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন, আমি তো রাফের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কুস্তিতে তাকে আমি আছড়ে দিতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা জানান হলে তিনি উভয়কে কুস্তি লড়ার আদেশ দেন। সে কুস্তিতে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) সত্যিই হযরত রাফেকে আছড়ে ফেলেন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সামুরা (রা.)-কেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য এসব তরুণ সাহাবীদের ঈমানী শক্তি ও মনোবলের এমন ইতিহাস সত্যিই বিরল।

শায়খানে সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করে রাত যাপনের সিদ্ধান্ত দেন। পঞ্চাশ জন সাহাবীকে নির্বাচন করা হয়, যারা মুসলমানদের তাঁবুর চারদিকে অবিরত টহল দেন। এ দলের নেতা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আনসারী (রা.)। তিনিই ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর সাফওয়ান ইবনে

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং শত্রু বাহিনী একেবারে কাছাকাছি অবস্থানে থেকে এক অপরকে দেখছিলেন। ওহুদে পৌঁছার পূর্বেই মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করে এবং তিনশ লোক সাথে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে যায়। এ সময় সে বলছিল, আমরা বুঝতে পাচ্ছি না খামাখাই কেন জীবন দিতে যাব? সে এ বিতর্ক প্রকাশ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের কথা মেনেছেন, তার কথা মানেননি।

এ মুনাফিক তার দলবল নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার যে কারণ প্রকাশ করছে, নিশ্চিত বলা চলে, কারণ আসলে তা নয়। সে বলছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা মানেননি, তাই সে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এ অবস্থায় তার মুসলিম বাহিনীর সাথে এত দূর পর্যন্ত আসার প্রশ্নই আসে না। বরং সেনাদল রওনা হওয়ার আগেই তার আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এ নাজুক মুহূর্তে এসে সে ইসলামী বাহিনীতে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও দুর্বলতা ছড়াতে চাচ্ছিল। যখন সে শত্রুবাহিনীর প্রতিটি তৎপরতা দেখছিল। তার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, দলবলসহ তার মুসলিম বাহিনী ত্যাগ করার ফলে সাধারণ সৈন্যরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগ ত্যাগ করবে। আর যারা থাকবে তাদের সাহস হিম্মত ভেংগে পড়বে। অন্যদিকে এ দৃশ্য দেখে শত্রুর সাহস অটুট থাকবে। সুতরাং মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ের এরূপ কর্মকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর একনিষ্ঠ আন্তরিক সংগী সাথীদের নির্মূল নিশ্চিহ্ন করার এক কার্যকর প্রচেষ্টা ছিল। এ মুনাফিকের আশা ছিল, এরপর সে এবং তার সাথী অনুসারীদের নেতৃত্ব কর্তৃত্বের জন্যে ময়দান পরিষ্কার নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে। এ মুনাফিকের কিছু দুরভিসন্ধি সফল হওয়ার কাছাকাছি ছিল। কেননা সে এবং তার সঙ্গীদের পিছুটান দেখে আওস গোত্রের শাখা বনু হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সালামার লোকেরাও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। তারাও ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন এবং তারা ফিরে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণের পরও অবিচল হয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'টি দল ভীরুতার পরিচয় দেয়ার ইচ্ছা করেছিল এবং আল্লাহ তাদের বন্ধু। মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারাম (রা.) এ নাজুক পরিস্থিতিতে মুনাফিকদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে চেষ্টা করেন। তিনি

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশী মুনাফিকদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তাদের পিছনে কিছু দূর গিয়ে বলেন, এখন ফিরে চল, আল্লাহর পথে লড়াই কর। কিন্তু তারা জবাব দেয়, যদি আমরা জানতাম, তোমরা যুদ্ধ করবে তাহলে আমরা ফিরে আসতাম না। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারাম (রা.) বলেন, ওহে আল্লাহর শত্রুরা, তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল হবে। স্মরণ রেখো, আল্লাহ তাঁর নবীকে তোমাদের মুখাপেক্ষী রাখবেন না। এ মুনাফিকদের সম্পর্কেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন, 'এবং মুনাফিকদের আনবার জন্যে তাদের বলা হয়েছিল,' এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলল, যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিত তোমাদের অনুসরণ করতাম না। সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল। যা তারা মুখে বলে তা, তাদের অন্তরে নেই। যা তারা গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তা বিশেষভাবে অবহিত। (সূরা আলে ইমরান, ১৬৭)

মুনাফিকদের ফিরে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট সাতশ মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রান্তরের শেষ সীমায় অবস্থিত ওহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছে সেখানেই শিবির স্থাপন করেন। সামনে ছিল মদীনা আর পিছনে ওহুদের উঁচু পাহাড়। শত্রু বাহিনী তখন মুসলমান এবং মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করছিল। এখানে পৌঁছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদের বিন্যস্ত ও সংগঠিত করেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সৈন্যদের কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করেন। তীরন্দাজদের একটি ছোট বাহিনী নির্বাচন করেন। তাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাবের ইবনে নোমান আনসারী বদরী (রা.)-কে এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে কানাত উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুসলিম বাহিনীর শিবির থেকে প্রায় দেড়শ মিটার দূরে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ের গিরিপথে নিযুক্ত করেন। এ গিরিপথ বর্তমানে বাজালে রুমাত নামে পরিচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরিপথে মোতায়েনকৃত তীরন্দাজদের নেতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা ঘোড়সওয়ার শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদের আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে। লক্ষ্য রাখবে তারা যেন পিছনের দিক থেকে আমাদের উপর হামলা করতে না পারে। আমরা জয় লাভ করি অথবা পরাজিত হই, উভয় অবস্থায়ই তোমরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে। তোমাদের দিক থেকে যেন আমাদের উপর হামলা হতে না পারে। এরপর সকল তীরন্দাজকে লক্ষ্য করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আমাদের পেছনের দিক হিফাযত করবে। যদি দেখ

আমরা মারা পড়ছি, তবুও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসো না। যদি দেখ আমরা গনীমতের মাল আহরণ করছি, তবুও তোমরা আমাদের সাথে অংশ নেবে না (ইবনে হিশাম)। এমনি কঠোর সামরিক নির্দেশসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজ সৈন্যদের নিযুক্ত করে একমাত্র গিরিপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ শত্রুরা সেদিক থেকে মুসলমানদের একেবারে পিছনে উপনীত হয়ে তাদের ঘেরাও করে নিতে সক্ষম হত।

হযরত মোনযের ইবনে আমর (রা.)-কে ডান দিকের এবং হযরত যোবায়র ইবনে আওয়াম (রা.) কে বাম দিকের বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.)-কে হযরত যোবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.)-এর সহকারী নিযুক্ত করেন। হযরত যোবায়র (রা.)-কে এক বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি যেন খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বাধীন ঘোড়সওয়ারদের গতিরোধ করে রাখেন (খালিদ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি)। এ বিন্যাস ছাড়াও সম্মুখভাগে এমন বিশিষ্ট ও বাছাই করা বীর বাহাদুর মুসলমানদের মোতায়েন করা হয়, যাদের বীরত্ব সাহসিকতা এবং জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করার খ্যাতি এত বেশি ছিল যে, তাদের এক একজনকে এক হাজার শত্রুর মোকাবেলায় যথেষ্ট মনে করা হত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাবিন্যাসের এ পরিকল্পনা ছিল সূক্ষ্ম যুদ্ধ কৌশল ও সামরিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। এতে তাঁর সামরিক নেতৃত্ব এবং সমর কৌশলে নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে আরো প্রমাণিত হয়, সুযোগ্য ও দূরদর্শী কোনো সেনানায়কই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমর পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন না। কেননা, শত্রু সৈন্যদের উপস্থিতিতে যুদ্ধের ময়দানে এসেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের অবস্থানের জন্যে উৎকৃষ্ট স্থান নির্বাচন করেছিলেন। পাহাড়ের সম্মুখভাগে অবস্থান গ্রহণ করে তিনি শত্রুদের হামলা থেকে পিছন দিক এবং ডান দিক নিরাপদ করেন। বাম দিক থেকে শত্রুরা এসে যে জায়গায় পৌঁছে হামলা করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, সে জায়গায় তিনি সুদক্ষ তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করেন। পিছনে উঁচু জায়গা বাছাই করে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন, খোদা না করুন, পরাজিত হলেও যেন পলায়ন করতে না হয় এবং শত্রুদের ধাওয়ার মুখে পড়ে নাজেহালও হতে না হয়। বরং শিবিরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এমতাবস্থায় শত্রুরা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্যে হামলা চালালে তাদের শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। পক্ষান্তরে শত্রুদের এমন জায়গায় থাকতে বাধ্য করেছিলেন, যাতে তারা জয়ী হলেও তেমন সুফল লাভ করতে না

পারে। আর মুসলমানরা জয় লাভ করলে, তারা মুসলমানদের ধাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারে। পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট বীরদের একটি দলকে সম্মুখভাগে রেখে সৈন্য সংখ্যার কমতি পূরণ করেছিলেন। তিনি তৃতীয় হিজরী সালের ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে সেনাবিন্যাসের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন।

যথাযথভাবে সেনাবিন্যাসের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, আমি আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না। তিনি সেদিন উপরে নীচে দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। সাহাবীদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময় বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিবে। সাহ-াবাদের মধ্যে উদ্দীপনা ও জিহাদী জোশ, জযবা সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি একটি ধারাল তলোয়ার খাপমুক্ত করে বলেন, এর হক আদায় করতে পারবে এমন কে আছ? একথা শুনে কয়েকজন সাহাবী তলোয়ার নেয়ার জন্যে ছুটে যান। তাদের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত যোবায়র ইবনে আওয়াম এবং ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। হযরত আবু দোজানা সেমাক ইবনে খারশা (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল এর হক কী? তিঁনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ তরবারি দিয়ে শত্রুর চেহারায় এমনভাবে আঘাত করবে যেন সে চেহারা বাঁকা হয়ে যায়। হযরত আবু দোজানা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এ তলোয়ার গ্রহণ করে এর হক আদায় করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তলোয়ার হযরত আবু দোজানা (রা.)-এর হাতে তুলে দেন।

হযরত আবু দোজানা (রা.) ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। লড়াইয়ের সময় তিনি বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতেন। তার কাছে একটি লাল পট্টি ছিল। সেটি মাথায় বেঁধে নিলে লোকে বুঝত, এবার তিনি আমৃত্যু লড়াই করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া তলোয়ার গ্রহণ করে তিনি মাথায় লাল পট্টি বেঁধে মুসলমান ও কাফের সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে বুক টান করে হাঁটতে লাগলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ ধরনের চলাচল আল্লাহ রব্বুল আলামীন পছন্দ করেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। মুশরিকরা কাতারবন্দী করার মূলনীতিতেই সৈন্য সমাবেশ করে। তাদের প্রধান সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। সে সৈন্যদের মাঝামাঝি জায়গায় নিজের কেন্দ্র তৈরী করে। ডান দিকে ছিলেন খালিদ ইবনে ওলীদ, বাঁ দিকে ইকরামা ইবনে আবু জাহেল। পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আর তীরন্দাজ

www.nagorikpathagar.org

সৈন্যদের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইবনে রাবিয়াকে নিযুক্ত করা হয়। মুশরিক বহিনীর যুদ্ধ পতাকা বহন করছিল বনু আবদুদ দারের একটি ছোট দল।

যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে কুরাইশরা মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন এবং পারস্পরিক কলহ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আবু সুফিয়ান আনসারদের কাছে পয়গাম পাঠায়, আপনারা যদি আমাদের এবং আমাদের চাচাতো ভাই (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝখান থেকে সরে যান, তবে আমরা আপনাদের উপর হামলা করব না। কিন্তু আনসাররা আবু সুফিয়ানকে কঠোর ভাষায় জবাব পাঠিয়ে কিছু রূঢ় কথাও শুনিয়ে দেন। এ যুদ্ধে কুরাইশ মহিলারাও অংশগ্রহণ করে। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে ওতবা। এসব মহিলা যুদ্ধরত সৈন্যদের মাঝে ঘুরে ঘুরে দফ বাজিয়ে বাজিয়ে তাদের উদ্দীপ্ত করে তুলছিল। যুদ্ধের জন্যে অনুপ্রেরণা দেয়ার পাশাপাশি বর্শা নিক্ষেপ, তলোয়ার এবং তীর ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এরপর উভয় দল মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে যুদ্ধ শুরু হয়। কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রথম যুদ্ধ উদ্যোক্তা, মুশরিকদের নিশানাদার তালহা ইবনে আবু তালহা আবদারী সামনে এগিয়ে আসে। এ লোকটি কুরাইশদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার ছিল। মুসলমানরা তাকে সেনাদলের কোলাব্যাঙ বলতেন। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সে মল্ল বা মুখোমুখি যুদ্ধের আহ্বান জানায়। তার অসাধারণ বীরত্বের কথা ভেবে মুসলমানরা ইতস্তত করছিলেন। হঠাৎ হযরত যোবায়র (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে চোখের পলকে বাঘের মত তালহার উটের উপর লাফিয়ে ওঠেন। পরক্ষণে তালহাকে নিজের কবজায় এনে তাকেসহ নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ার দ্বারা যবাই করে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যোবায়র (রা.)-এর অসীম সাহসিকতা দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তোলেন। মুসলমানরাও উচ্চ স্বরে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার বলে ওঠেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর হযরত যোবায়র (রা.)-এর প্রশংসা করে বলেন, 'সকল নবীরই একজন 'হাওয়ারী' থাকে। আমার 'হাওয়ারী' হচ্ছে যোবায়র। (সীরাতে হালাবিয়া)।

এরপর চারদিকে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ময়দানে এলোপাতাড়ি হামলা, জবাবী হামলা চলতে থাকে। কুরাইশদের পতাকা রণক্ষেত্রের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল। বনু আবদুদ দার তাদের কমাণ্ডার তালহা ইবনে আবু তালহার মৃত্যুর পর বনু আবদুদ দার গোত্রের দশ ব্যক্তি, যারা মুশরিকদের পতাকা ধারণ করছিল, একে একে সবাই মারা পড়ে। এরপর পতাকা তোলার মতো তাদের কিউ

www.nagorikpathagar.org

জীবিত ছিল না, কিন্তু সে সময় সওয়াব নামে তাদের এক হাবশী ক্রীতদাস পতাকা তুলে নিয়ে তার পূর্ববর্তী পতাকাবাহী মনিবদের চেয়ে অধিক বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত ক্রীতদাস সওয়াব নিহত হওয়ার পর পতাকা মাটিতে পড়ে যায় এবং এটা ওঠাতে পারে এমন কেউ বেঁচে ছিল না। এ কারণে তা মাটিতেই পড়ে থাকে।

এদিকে হযরত আবু দোজানা (রা.) মাথায় লাল পট্টি বেঁধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া তলোয়ার হাতে নিয়ে তার হক আদায়ে দৃঢ় সংকল্পে লড়াই করতে করতে অনেক দূর চলে যান। তিনি যে মুশরিকেরই মুখোমুখি হতেন, তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেন। মুশরিকদের কাতারের পর কাতার তিনি ওলট পালট করে দেন। এক সময় তিনি কুরাইশ নারীদের নেত্রীর কাছে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি জানতেন না, ওরা নারী। তিনি বলেন, আমি দেখলাম এক লোক যোদ্ধাদের জোরেশোরে উদ্বুদ্ধ উদ্দীপিত করছে। তাই আমি তাকে নিশানা করলাম, কিন্তু তলোয়ার দিয়ে হামলা করতে চাইলে সে মরণ চিৎকার দিয়ে ওঠে। এ চিৎকার শুনে আমি বুঝে ফেলি সে মহিলা। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ার দিয়ে কোনো মহিলাকে হত্যা করে তা কলঙ্কিত করতে চাইনি। এ মহিলা ছিল হিন্দা বিনতে ওতবা অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী।

এদিকে হযরত হামযা (রা.) ক্রুদ্ধ বাঘের মত লড়াই করছিলেন। অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রু ব্যূহ ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সামনে মুশরিক বীর বাহাদুর চতুর্মুখী ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো ঝরে যাচ্ছিল। তিনি মুশরিক বাহিনীর নিশানাদারদের নিশ্চিহ্নকরণে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন ছাড়াও তাদের বড় বড় জাঁ-বাজ বীর বাহাদুরদের অবস্থা শোচনীয় করে রেখেছিলেন। শত আফসোস, এসময়ই তিনি শহীদ হন, তাকে কিন্তু বীর বাহাদুরের মত সামনা সামনি যুদ্ধে হত্যা করা হয়নি; বরং ভীরু কাপুরুষের মত চুপিসারে হত্যা করা হয়েছে। হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারীর নাম ওয়াহশী ইবনে হারব। হত্যাকারী বলেন, আমি ছিলাম জোবায়র ইবনে মোতয়েমের ক্রীতদাস। তার চাচা মুয়ায়মা ইবনে আদী, বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। কুরাইশরা ওহুদ যুদ্ধে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে জোবায়র ইবনে মোতয়েম আমাকে বলল, যদি তুমি মুহাম্মদের চাচা হামযাকে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করতে পার, তবে তুমি মুক্তি পাবে। এ প্রস্তাব পাওয়ার পর আমিও কুরাইশদের সাথে ওহদ যুদ্ধে রওনা হই। আমি ছিলাম আবিসিনিয়ার অধিবাসী এবং বর্শা নিক্ষেপে সুদক্ষ। আমার নিক্ষিপ্ত বর্শা কমই লক্ষ্যভ্রষ্ট হত। যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর আমি হযরত হামযা (রা.)-কে খুঁজতে শুরু করি। এক সময় তাকে পেয়েও যাই। তাকে ধূলি ধুসরিত উটের মত মনে হচ্ছিল। তিনি লোকেদের ছিন্নভিন্ন করতে করতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সামনে কোনো বাঁধাই টিকতে পারছিল না।

আল্লাহর শপথ, আমি হযরত হামযা (রা.)-এর উপর হামলার সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে একটি পাথর অথবা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাকে সামনে আসার সুযোগ দিতে চাচ্ছিলাম। এ সময় সেবা' ইবনে আবদুল ওযযা আমাকে ডিঙ্গিয়ে তার কাছে পৌঁছে যায়। হযরত হামযা (রা.) হুঙ্কার দিয়ে সেবা'কে বলেন, ওরে লজ্জাস্থানের চামড়া কর্তনকারীর পুত্র, এই নে। একথা বলে তিনি সেবা'র উপর এমন জোরে তরবারির আঘাত করেন, যেন তার ঘাড়ে মাথা ছিলই না। আমি তখন বর্শা তুলে হযরত হামযার (রা.) প্রতি নিক্ষেপ করি। বর্শা তার নাভির নীচে বিদ্ধ হয়ে দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পিছনে বেরিয়ে যায়। তিনি পড়ে গিয়ে উঠতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সক্ষম হননি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি তাকে এ অবস্থায়ই রেখে দেই। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে আমি তার কাছে গিয়ে নিজের বর্শা বের করে নিয়ে কুরাইশ সেনা দলের মাঝে গিয়ে বসে থাকি। হযরত হামযা (রা.) ছাড়া অন্য কাউকে আঘাত করার কোনো ইচ্ছা বা প্রয়োজনই আমার ছিল না। আমি মুক্তি পাওয়ার জন্যেই হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যা করেছি। এরপর মক্কায় ফিরে এসেই আমি মুক্তি লাভ করি। (ইবনে হিশাম)

শেরে খোদা, শেরে রাসূল হযরত হামযার (রা.) শাহাদাতে মুসলমানদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত যোবায়র, হযরত মোসয়াব ইবনে ওমায়র, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, হযরত সা'দ ইবনে মা'য়ায, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা, হযরত সা'দ ইবনে রবী, হযরত নযর ইবনে আনাস (রা.) এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন, যাতে কাফেরদের পিলে চমকে যায়, মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, তাদের শক্তি সাহস অকার্যকর হয়ে পড়ে।

নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের একজন ছিলেন হযরত হানযালা (রা.)। তিনি সেদিন এক অনন্য গৌরবের সাথে জিহাদের ময়দানে হাযির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবু আমির রাহেবের পুত্র, যে ফাসেক উপাধি পায়। হযরত হানযালা (রা.) নতুন বিয়ে করেছিলেন। জিহাদের জন্যে যখন আহ্বান জানানো হচ্ছিল, তখন তিনি ছিলেন বাসর শয্যায়। জিহাদের আহ্বান শোনার সাথে সাথেই তিনি রওনা হয়ে

www.nagorikpathagar.org

যান। যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর হযরত হানযালা (রা.) মুশরিকদের ব্যূহ ভেদ করে তীব্র বেগে তাদের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে তার কাজ প্রায় শেষ করে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তার শাহাদাত নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তলোয়ার তোলার সাথে সাথে শাদ্দাদ ইবনে আওস দেখে ফেলে এবং হযরত হানযালার (রা.) উপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

যে সকল তীরন্দাজকে মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবালে রুমাতে নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন তারা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মক্কার ঘোড়সওয়াররা খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে এবং ফাসেক আবু আমিরের সহায়তায় ইসলামী ফৌজের বাম বাহু ভেঙ্গে দিয়ে একেবারে পিঠের উপর পৌঁছে, তাদের সারিতে চাঞ্চল্য ফেলে দিয়ে, পুরোপুরি পরাজিত করতে, পর্যায়ক্রমে তিন বার হামলা চালায়। কিন্তু মুসলমান তীরন্দাজরা তীর নিক্ষেপ করে তাদের এমনভাবে ঝাঁঝরা করে দেয় যে, তাদের তিন বারের হামলাই ব্যর্থ হয় (ফাতহুল বারী)। বেশ কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের এ বাহিনী যুদ্ধের গতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। অবশেষে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তাদের কাতারগুলো ডানে বামে, সামনে পেছনে বিক্ষিপ্ত বিশৃংখল হয়ে পড়তে শুরু করে। মনে হচ্ছিল যেন তিন হাজার মুশরিক সাতশ নয়; বরং ত্রিশ হাজার মুসলমানের মুখোমুখি হয়েছে। মুসলমানরা ঈমান, একিন, জীবনবাজি, বীরত্ব ও সাহসিকতার অত্যন্ত সমুচ্চ প্রতিকৃতি হয়ে তীর এবং তলোয়ার চালনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করছিলেন।

মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য হামলার মুখে মুশরিক বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজেদের অসীম শক্তি ব্যয় সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অক্ষমতা ও অপারগতা অনুভব করে। তাদের সাহস মনোবল এতোটাই ভেংগে পড়ে যে, যুদ্ধ পতাকাবাহী সওয়ারের পরিণতি দেখে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পতাকার কাছে গিয়ে তা তুলে ধরতেও তারা সাহস পাচ্ছিল না। তখন তারা পিছপা হতে শুরু করে এবং পলায়নের পথ অবলম্বন করে। মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজেদের সম্মান মর্যাদা ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি যত বড় বড় কথা তারা বলেছিল, সেসব একেবারে ভুলে বসে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর তাঁর সাহায্য নাযিল করেন এবং তাদের সংগে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করেন। মুসলমানরা তলোয়ারের মাধ্যমে মুশরিকদের এমনভাবে জবাব দেয়া, যাতে ওরা

www.nagorikpathagar.org

নিজেদের শিবির ছেড়ে দূরে পালিয়ে যায়। মোটকথা, তারা শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রা.) বলেন, তার পিতা বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি লক্ষ্য করেছি, হিন্দা বিনতে ওতবা এবং তার সঙ্গিণী মহিলাদের হাঁটু দেখা যাচ্ছিল। তারা কাপড় তুলে ছুটে পালাচ্ছিল। (ইবনে হিশাম)

স্বল্প সংখ্যক মুসলমান মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যখন ইতিহাসের পাতায় এক মর্যাদাপূর্ণ বিজয় প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন; যা স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে জৌলুসে বদর যুদ্ধের বিজয় থেকে কোনোভাবেই কম ছিল না। ঠিক তখনই তীরন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য এক ভয়াবহ ভুল করে ফেলেন। তাদের এ ভয়াবহ ভুলে যুদ্ধের চিত্রই পরিবর্তিত হয়ে যায়। মুসলমানরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত বরণ থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পান। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের বদর যুদ্ধে অর্জিত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জয় পরাজয় উভয় অবস্থায়ই তীরন্দাজদের স্বস্থানে অটল অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও, মুসলমানদের গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করতে দেখে এ বাহিনীর দুনিয়াপ্রীতি প্রবল হয়ে পড়ে। তারা একে অন্যকে বলে, গনীমত, গনীমত। তোমাদের সঙ্গীরা জয়ী হয়েছে, এখন আর কিসের প্রতীক্ষা। তীরন্দাজদের মধ্যে থেকে এ আওয়ায উঠতেই তাদের কমাণ্ডার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র (রা.) তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা কি ভুলে গেছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কি আদেশ দিয়েছেন? কিন্তু তাদের অধিকাংশই হযরত আবদুল্লাহর (রা.) কথা কানে তোলেননি। তারা বলেন, আল্লাহর শপথ আমরাও ওদের কাছে যাব এবং কিছু গনীমতের মাল অবশ্যই সংগ্রহ করব (সহীহ বুখারী)। এরপর তীরন্দাজদের চল্লিশ জন নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে গণীমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাধারণ সৈন্যদের শামিল হন। এভাবে মুসলিম বাহিনীর পিছনের দিক পাহারাশূন্য হয়ে পড়ে। তখন সেস্থানে শুধু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র (রা.) এবং তাঁর নয় জন সঙ্গী পাহারায় নিযুক্ত রইলেন। তাঁরা দৃঢ় সংকল্পের সাথে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন তবেই আমরা এখান থেকে যাব অথবা নিজেদের প্রাণ তার মালিকের কাছে সমর্পণ করব।

খালিদ ইবনে ওলীদ তিন বার এ গিরিপথ অতিক্রমের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে

www.nagorikpathagar.org

গিয়েছিলেন। এবার তিনি মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর অনুপস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে মুসলিম বাহিনীর একেবারে পিছনে পৌঁছে যান এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়র (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে পিছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর হামলা করেন। তার সঙ্গীরা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি তোলে। এতে পরাজিত মুশরিকরা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে বনু হারেস গোত্রের আমরাহ বিনতে আলকামা নামের এক মহিলা দৌড়ে গিয়ে মুশরিকদের ভূলণ্ঠিত পতাকা উচ্চে তুলে ধরে। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাফেররা তার চারিদিকে জড়ো হতে শুরু করে এবং একে অন্যকে ডাকতে থাকে। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। মুসলমানরা তখন সামনে পিছনে উভয় দিক থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠিক যেন যাঁতাকলের মাঝখানে পড়ে নিষ্পেষিত হওয়ার উপক্রম পূর্ব মুহূর্ত।

সে সংকট সন্ধিক্ষণে মাত্র নয় জন (সহীহ মুসলিম) সাহাবীকে সাথে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছন দিকে যাচ্ছিলেন এবং মুসলিমদের আক্রমণ আর মুশরিকদের পলায়নের দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি খালিদ ইবনে ওলীদের ঘোড়সওয়ার সংগীদের দেখতে পেলেন। সে সময় তাঁর সামনে মাত্র দু'টি পথ খোলা ছিল। হয় তো নয় জন সঙ্গীসহ নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া এবং শত্রুদের কবলে পড়ে থাকা সাহাবীদের তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়া। অথবা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহাবীদের ডেকে একত্রিত করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করে মুশরিকদের অবরোধ ভেংগে নিজের সৈন্যদের ওহুদের চূড়ায় যাওয়ার পথ করে দেয়া। এ নাজুক পরীক্ষার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে অতুলনীয় সমর নৈপুণ্য ও সাহসিকতার প্রকাশ ঘটে। কেননা, নিজের জীবন রক্ষায় নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহাবীদের প্রাণ রক্ষার সিদ্ধান্ত নেন।

অতএব খালিদ ইবনে ওলীদের ঘোড়সওয়ারদের দেখতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন, হে আল্লাহর বান্দারা, এদিকে, এদিকে। অথচ তিনি জানতেন, তাঁর এ ডাকার শব্দ মুসলমানদের আগে কাফেরদের কানে গিয়ে পৌঁছবে। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়ায শুনে মুশরিকরা বুঝতে পারে তিনি এখানেই রয়েছেন। এটা বুঝার পর মুশরিকদের ছোট একটি দল মুসলমানদের আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে যায়। অবশিষ্টরা দ্রুত মুসলমানদের ঘেরাও করতে থাকে।

মুশরিকদের অবরোধে শিকার হওয়ায় একদল মুসলমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। নিজেদের জীবন রক্ষার চিন্তাই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে তারা রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের পথ ধরে। পিছনে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। তাদের কয়েকজন মদীনায় গিয়ে ওঠেন, কয়েকজন পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নেন। অন্য একদল পিছনের দিকে গিয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে যান। মুশরিক আর মুসলমান চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের হাতেই কিছু মুসলমান নিহত হয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, ওহুদের দিন (প্রথমে) মুশরিকদের পরাজয় হয়েছিল। এরপর ইবলিস আওয়ায দেয়, ওহে আল্লাহর বান্দারা, পিছনে যাও। এতে সামনের কাতারের লোকেরা পিছনের কাতারে ঢুকে পড়ে। হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন, তার পিতা ইয়ামানের উপর হামলা করছে। তিনি বলেন ওহে আল্লাহর বান্দারা, ইনি আমার পিতা, কিন্তু আল্লাহর শপথ, লোকেরা তার থেকে হাত ফেরায়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেলল। হযরত হোযায়ফা (রা.) তখন বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনাদের মাগফিরাত করুন। হযরত ওরওয়া (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ, হযরত হোযায়ফার (রা.) পিতার মাঝে সব সময় কল্যাণ অবশিষ্ট ছিল। এ অবস্থায়ই তিনি আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হন। (সহীহ বুখারী)

মুসলিম সেনাদলে চরম বিশৃংখলা ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। তাদের অনেকে ছিলেন অস্থির। তারা বুঝতে পারছিলেন না, কোনদিকে যাবেন। সে সময় এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলেছিল, মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের অবশিষ্ট হুঁশও শেষ হতে থাকে। অধিকাংশের সাহস ভেংগে পড়ে। কোনো কোনো মুসলমান এ ঘোষণা শোনার পর যুদ্ধ বন্ধ করে হাতোদ্যম হয়ে হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলেন। কিছুসংখ্যক মুসলমান এতটুকু পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে : মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলবে, সে যেন আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে তাদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। কিছুক্ষণ পর এ লোকদের কাছ দিয়ে হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, তারা চুপচাপ হাতের উপর হাত ধরে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছ? তারা জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) বলেন তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো, যে জন্যে রাসূলুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন দিয়েছেন, সে জন্যে তোমরা জীবন দাও। এরপর বলেন, হে আল্লাহ, এ মুসলমানরা যা কিছু করেছে তা থেকে আমি তোমার দরবারে পানাহ চাই। আর মুশরিকরা যা কিছু করেছে তা থেকে স্বচ্ছতা পবিত্রতা অবলম্বন করছি। একথা বলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হলে হযরত সা'দ ইবনে মু'য়ায (রা.)-এর সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু ওমর, কোথায় যাচ্ছেন? হযরত আনাস (রা.) বলেন, জান্নাতের সুবাসের কথা কি আর বলব। হে সা'দ, ওহুদ পাহাড়ের ওপার থেকে জান্নাতের সুবাস অনুভব করছি। একথা বলে তিনি আরো সামনে এগিয়ে মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। যুদ্ধ শেষে তাকে শনাক্ত করাই সম্ভব হচ্ছিল না। তার বোন আঙ্গুলের কর দেখে তাকে শনাক্ত করেছিলেন। তার দেহে বর্শা, তীর ও তলোয়ারের আশির অধিক আঘাত লেগেছিল। (যাদুল-মায়াদ)

হযরত সাবিত ইবনে দারদাহ (রা.) তার গোত্রের লোকদের ডেকে বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি হত্যা করা হয়েই থাকে, আল্লাহ তো জীবিত রয়েছেন। তিনি তো চিরঞ্জীব। তোমরা নিজেদের দ্বীনের জন্যে লড়। সাবিত (রা.) কিছু সাহাবীর সহায়তায় খালিদ ইবনে ওলীদের বাহিনীর উপর হামলা করেন এবং লড়াই করতে করতে খালিদের হাতেই বর্ষার আঘাতে নিহত হন। তার সঙ্গী আনসাররাও তার মতোই লড়াই করতে করতে শাতাদাত বরণ করেন (আস সীরাতুল হালাবিয়া)। একজন মুহাজির সাহাবী এক রক্তাক্ত আনসার সাহবীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মুহাজির সাহাবী বলেন, ও ভাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন? আনসার বলেন, মুহাম্মদ যদি নিহত হয়েই থাকেন, তবে তিনি তো আল্লাহর দ্বীন পৌছে দিয়েছেন। এখন সে দ্বীনের হিফাযতের জন্যে লড়াই কর (যাদুল মায়াদ)। এ ধরনের সাহস প্রদান এবং উদ্দীপনাময় কথায় মুসলিম বাহিনীর সাহস, শক্তি, সামর্থ্য পুনর্বহাল হয়। তাদের হুঁশ জ্ঞান পুনরায় ফিরে আসে। এরপর মুসলমানরা অস্ত্র ফেলে দেয়া অথবা মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে মিলে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের কথা ভাবার পরিবর্তে, অস্ত্র তুলে নেয়। এরপর মুশরিকদের দুর্ভেদ্য ঘেরাও ভেদ করে নিজেদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার পথ তৈরীর চেষ্টা করতে থাকে। এ সময় জানা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হত্যার খবর নিছক মিথ্যা গুজব। এতে মুসলমানদের সাহস ও মনোবল বহুগুণে বেড়ে যায়। তারা দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের মাধ্যমে কাফিরদের বেষ্টনী ভেদ করে নিজেদের শক্তিশালী কেন্দ্রের আশেপাশে একত্র হতে সক্ষম হয়।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম বাহিনীর তৃতীয় একটি দল একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার কথা ভাবছিলেন। তারা অবরোধের খবর পাওয়ার পরই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ছুটে যান। তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) প্রমুখ। যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা প্রথম সারিতে সকলের আগে আগে ছিলেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্তার জন্যে ভয় শংকা দেখা দেয়ায় তারা তাঁর হিফাযত এবং নিরাপত্তা বিধানেও সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকেন। মুসলিম বাহিনী যখন মুশরিকদের অবরোধের যাঁতাকলের দু'পাটের মাঝে পড়ে পিষ্ট হবার উপক্রম; ঠিক সেই সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশেও চলছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুশরিকদের ঘেরাও তৎপরতার শুরুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নয় জন সাহাবী ছিলেন। তিনি তখন মুসলমানদের আগেই মুশরিকদের কাছে পৌঁছে যান। এতে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনে ফেলে। কেননা, সে সময় তারা মুসলমানদের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক কাছে ছিল। ফলে মুশরিক সৈন্যরা তাঁর উপর হামলা করে বসে এবং মুসলমানদের সমবেত হওয়ার আগেই প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এ ত্বরিত হামলার ফলে সেখানে বিদ্যমান নয় জন সাহাবী ও মুশরিকদের মাঝে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবীদের অসামান্য ভালোবাসা, বীরত্ব ও সাহসিকতার দুর্লভ পরিচয় ফুটে ওঠে।

ওহুদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতজন আনসার ও দু'জন কুরাইশ সাহাবীর সাথে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হামলাকারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর তিনি বলেন, কে আছো, যে ওদের আমার থেকে প্রতিরোধ করতে পারে? তার জন্যে জান্নাত রয়েছে অথবা তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথী হবে। এরপর একজন আনসার সাহাবী সামনে অগ্রসর হয়ে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। এরপর মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কাছে পৌঁছে যায়। এবারও পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এভাবে পুনঃপুনঃ প্রতিরোধ যুদ্ধে সাত জন আনসার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে অবশিষ্ট দু'জন কুরাইশ সাহাবীকে বলেন, আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে সুবিচার করিনি (মুসলিম)। এ সাত জন আনসার সাহাবীর সর্বশেষজন ছিলেন হযরত ওমারা ইবনে ইয়াযিদ ইবনে সাকান (রা.)। লড়াই করতে করতে তিনিও ক্ষতবিক্ষত হয়ে এক সময় ঢলে পড়েন। (ইবনে হিশাম)

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমারা ইবনে ইয়াযিদ (রা.)-এর ঢলে পড়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাত্র দু'জন কুরাইশ সাহাবী ছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু ওসমান (রা.)-এর সূত্র মতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় লড়াই করছিলেন, সে সময় লড়াইয়ে তাঁর সঙ্গে হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) এবং হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না (বুখারী)। সে সময়টা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের চরম সংকটময় মুহূর্ত আর মুশরিকদের জন্যে একটা সুবর্ণ সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে মুশরিকরা সে সুযোগ কাজে লাগাতে কোনো ক্রটিও করেনি। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে তাঁকে শেষ করেই দিতে চেয়েছিল। এ হামলায় ওতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর নিক্ষেপ করে। সে আঘাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিতে পড়ে যান। তাঁর নীচের মাঢ়ির ডান দিকের 'দাঁত' ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং নীচের ঠোঁট কেটে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মেহাব যুরী সামনে অগ্রসর হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালে আঘাত করে। আবদুল্লাহ ইবনে কোমায়া নামের এক দুর্বৃত্ত দুরাচার সামনে এসে তাঁর কাঁধে এমন জোরে তলোয়ারের আঘাত করে যে, এক মাস পর্যন্ত তিনি সে আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। তবে আঘাত তাঁর দেহের লৌহবর্ম কাটতে পারেনি। দুর্বৃত্ত ইবনে কোমায়া তরবারি তুলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দ্বিতীয় বার আঘাত করে। এ আঘাত, ডান চোখের নীচের হাড়ে লেগে বর্মের দু'টি কড়া চেহারায় বিঁধে যায়। সাথে সাথে সে দুর্বৃত্ত বলে উঠে, এ নাও, আমি ইবনে কোমায়া (ভঙ্গকারীর পুত্র)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখম লের রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের রক্তাক্ত মুখম ল মুছছিলেন আর বলছিলেন, সে জাতি কি করে সফল হতে পারে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা যখম করেছে, তার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ আয়াত নাযিল করেন, 'তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালিম (বুখারী)। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা কর, কেননা ওরা জানে না (বুখারী)। মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে,

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার বলছিলেন, হে পরওয়ারদেগার, আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও, ওরা জানে না।

নিঃসন্দেহে মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) অতুলনীয় আত্মত্যাগ, অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে মুশরেকদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন (বুখারী)। তারা দু'জনই ছিলেন আরবের সুদক্ষ তীরন্দাজ। তারা তীর নিক্ষেপ করে করে হামলাকারী মুশরিকদের, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুনীরের সব তীর হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে ছড়িয়ে দিয়ে বলেন, তীর চালাও, আমার মা বাবা তোমার জন্যে কুরবান হোন। তীর নিক্ষেপে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর দক্ষতা নৈপুণ্য এ থেকেই প্রমাণিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কখনই অন্য কোন সাহাবীর জন্যে তাঁর পিতা মাতা নিবেদিত হওয়ার কথা বলেননি। (বুখারী)

হযরত তালহার (রা.) বীরত্বের বিবরণ নাসাঈ শরীফের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়। যাতে হযরত জাবের (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মুশরিকদের সে সময়ের হামলার কথা উল্লেখ করেছেন। তখন তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন আনসার সাহাবীর সাথে ছিলেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘেরাও করে ফেললে তিনি বলেছিলেন, এদের সাথে লড়াই করার মতো কে আছো? হযরত তালহা (রা.) বলেন, আমি আছি। এরপর হযরত জাবের (রা.) আনসারদের সামনে অগ্রসর হওয়ার এবং একে একে শহীদ হওয়ার বিবরণ উল্লেখ করেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আনসাররা শহীদ হওয়ার পর হযরত তালহা (রা.) সামনে এগিয়ে একাই এগার জনের সমান বীরত্বের পরিচয় দেন। এক কাফির সেনা, তাঁর হাতে তরবারির আঘাত হানে, এতে তাঁর আঙ্গুল কেটে যায়। সাথে সাথে তিনি 'ইস সি' শব্দ উচ্চরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যদি বিসমিল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করতে, তাহলে ফেরেশতারা সকলের সামনে তোমাকে উপরে তুলে নিয়ে যেতেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ কাফিরদের অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী)

ওহুদের দিন তালহার (রা.) দেহে ঊনচল্লিশ অথবা পঁয়ত্রিশ আঘাত লেগেছিল। তার শাহাদাত আঙ্গুলসহ দুটি আঙ্গুল নিষ্ক্রীয় হয়ে যায় (ফাতহুল বারী)। ইমাম

www.nagorikpathagar.org

বুখারী কায়স ইবনে আবু হাযেম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি লক্ষ্য করলাম, তালহার (রা.) হাত নিষ্ক্রীয়। এ হাত দ্বারা ওহুদের দিন তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন (বুখারী)। তিরিমিযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুলাহ (রা.)-কে দেখে (মিশকাত)। আবু দাউদ তায়ালেসী হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ওহুদ যুদ্ধের আলোচনার সময় বলতেন, সেদিনের যুদ্ধের একক কৃতিত্ব ছিল তালহার (ফাতহুল বারী)। সেদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনিই সর্বাধিক পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে একথাও বলেন, 'হে তালহা, তোমার জন্যে জান্নাতসমূহ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তুমি হুরেঈনের মাঝে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছ'। (বুখারী)

সে সংকট সন্ধিক্ষণে আল্লাহ গায়েব থেকে সাহায্য প্রেরণ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সাদ (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের দিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে দেখেছি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন। এর আগে বা পরে সে দু'জন লোককে আমি কখনো দেখিনি। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তারা দু'জন ছিলেন হযরত জিবারাঈল (আ.) ও হযরত মিকাঈল (আ.) (বুখারী)। উল্লিখিত দুর্ঘটনা আকস্মিকভাবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত সাহাবীরা, যারা যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রথম কাতারে ছিলেন, তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান শোনার অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন। তারা চেষ্টা করছিলেন যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্তার ব্যাপারে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, কিন্তু এসব সাহাবী তাঁর কাছে পৌছার আগেই তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। ততক্ষণে ছয় জন আনসার সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন, সপ্তম আনসার সাহাবী আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ঢলে পড়েছেন। হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে মুশরিকদের হামলা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষার জন্যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীরা এসেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছে নিজেদের

www.nagorikpathagar.org

শরীর ও হাতিয়ার দিয়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলেন এবং শত্রুর হামলা প্রতিরোধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বপ্রথম ছুটে এসেছিলেন তাঁর গুহার সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ওহুদের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহরক্ষীরা ছাড়া অন্য সবাই তাঁকে অবস্থান স্থলে রেখে যুদ্ধ করতে সামনের কাতারে চলে গিয়েছিলেন। অবরোধের দুর্ঘটনার পর সর্বপ্রথম আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি একজন লোক তাঁকে রক্ষার জন্যে লড়াই করছেন আমি মনে মনে বললাম, আপনার নাম তো তালহা (রা.)। আপনার উপর আমার মা বাবা কুরবান হোন। এ সময় হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) চড়ুই পাখির উড়ার মতো দ্রুত ছুটে আমার কাছে আসেন। আমরা উভয়ে দৌড়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দেখি এক ব্যক্তি আড়াল হয়ে পড়ে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের ভাইকে তোলো। সে নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা পৌঁছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক যখম হয়ে গেছে। শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চোখের নীচে চেহারায় গেঁথে গেছে। আমি সেগুলো বের করতে চাইলে আবু ওবায়দা (রা.) বলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ওগুলো আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধরে ধীরে ধীরে বের করতে লাগলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথা কম পান। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি কড়া বের করেন। এতে হযরত আবু ওবায়দার নীচের মাড়ির একটি দাঁত পড়ে যায়। দ্বিতীয় কড়াটি আমি বের করতে চাইলাম, কিন্তু আবু ওবায়দা (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.), আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দ্বিতীয় কড়াটিও ধীরে ধীরে টেনে বের করেন। এতে তাঁর নীচের মাড়ির আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের ভাই তালহাকে সামলাও। সে নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরপর আমরা হযরত তালহার (রা.) প্রতি মনোনিবেশ করি। তার দেহে দশটির বেশি আঘাত লেগেছিল (যাদুল মায়াদ)। হযরত তালহা

www.nagorikpathagar.org

(রা.) সেদিন কি রূপ বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন তা এতেই বুঝা যায়।

সে সংকটময় মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদিত প্রাণ সাহাবীদের একটি দল এসে পৌঁছেন। তারা হলেন, হযরত আবু দুজানা, হযরত মুসয়াব ইবনে ওমায়র, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, হযরত সাহল ইবনে হোনায়ফ, হযরত মালেক ইবনে সেনান (হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর পিতা), হযরত উম্মে ওমারা নোসায়বা বিনতে কা'ব মাযেনিয়া, হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত হাতেব ইবনে আবু বালতায়া এবং হযরত আবু তালহা (রা.)। এদিকে প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের সংখ্যাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে তাদের হামলাও কঠিন হচ্ছিল। এক পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তের ভেতর পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পান। ফাসেক আবু আমির মুসলমানদের ক্ষতি করতে এ ধরনের কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিলেন। গর্তে পড়ে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরলেন এবং হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) তাঁকে কোলে তুলে নিলে তবেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হন।

নাফে ইবনে জোবায়র (র.) বলেন, আমি এক মুহাজির সাহাবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, ওহুদের যুদ্ধে আমি হাযির ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, চারদিক থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তিনি তীরের মাঝখানে রয়েছেন, সেসব তীর তাঁকে ঘিরে থাকা সাহাবীরা প্রতিরোধ করছিলেন। আমি আরো লক্ষ্য করলাম, আবদুল্লাহ ইবনে শেহাব যুহরী জানতে চাচ্ছিলেন, বলো, মুহাম্মদ কোথায়? এবার আমি থাকব অথবা সে থাকবে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশেই ছিলেন। তাঁর কাছে সে সময় অন্য কেউ ছিল না। জবাবে ইবনে শেহাব বলল, আল্লাহর শপথ, আমি তাকে দেখতেই পাইনি। আমাদের দৃষ্টি থেকে তাকে হিফাযত করা হয়েছে। এরপর আমরা চার জন প্রতিজ্ঞা করে বেরুলাম তাদের হত্যা করব, কিন্তু আমরা তাদের পর্যন্ত পৌছতে পারিনি। (যাদুল মায়াদ)

এ সময় মুসলমানরা এমন অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত আবু তালহা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বুক টান করে দাঁড়ান। তিনি বুক উপরে তুলে ধরতেন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর

www.nagorikpathagar.org

থেকে রক্ষা করতে পারেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, ওহুদের দিন সর্বসাধারণ মুসলমান পরাজিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে না এসে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছিল। হযরত আবু তালহা (রা.) একটি ঢাল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। নিপুণ হাতে তীর নিক্ষেপ করতেন। সেদিন তিনি দু'টি অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। পাশ দিয়ে কেউ তূনীর নিয়ে অতিক্রম করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এগুলো আবু তালহা (রা.)-কে দাও। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি মাথা উঁচু করে তাকালে হযরত আবু তালহা (রা.) বলতেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান হোন, আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না, এতে আপনার পবিত্র দেহে তীর বিদ্ধ হতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে রয়েছে। (বুখারী)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ একই ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীর নিক্ষেপের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে দেখতেন তা কোথায় গিয়ে পড়েছে (বুখারী)। হযরত আবু দুজানা (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠকে ঢাল বানিয়ে দেন, শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর তার পিঠে এসে বিধছিল, কিন্তু তিনি একটুও নড়াচড়া করছিলেন না। হযরত হাতেব ইনবে আবু বালতায়া (রা.) ওতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাসের পিছু নেন, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত মোবারক শহীদ করেছিল। হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা.) তরবারি দিয়ে প্রচ শক্তিতে ওতবাকে আঘাত করেন, যাতে তার মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। হযরত হাতেব (রা.) ওতবার তরবারি এবং ঘোড়া কবজা করেন। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) নিজের ভাই ওতবাকে হত্যা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু এ আগ্রহ পূরণে তিনি সফল হতে পারেননি। বরং এ সৌভাগ্য হযরত হাতেব (রা.) অর্জন করেন।

হযরত সাহল বিন হোনায়ফ (রা.)ও নামকরা তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিঁ ওয়াসাল্লামের কাছে মরণের বায়াত করে অত্যন্ত বীরবিক্রমে মুশরিকদের প্রতিরোধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তীর নিক্ষেপ করছিলেন। হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান (রা.) থেকে বর্ণিত,

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ধনুক থেকে এতো তীর নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে ধনুকের এক কিনারা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে ধনুক পরে হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান (রা.) নিয়েছিলেন এবং সেটা তাঁর কাছেই ছিল। সেদিন হযরত কাতাদা (রা.)-এর চোখে এমন আঘাত লেগেছিল যাতে চোখ চেহারার উপর ঢলে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাতে সে চোখ কোটরে প্রবেশ করিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে দুটি চোখের মধ্যে সে চোখটিই বেশী সুন্দর দেখাত এবং সেটির দৃষ্টি ছিল অধিক প্রখর। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) লড়াই করতে করতে মুখে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি বিশ বাইশটি আঘাত পেয়েছিলেন। এসব আঘাতের কিছু তার পায়েও লেগেছিল, যাতে তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রা.) পিতা হযরত মালেক ইবনে সেনান (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রক্ত চুষে পরিষ্কার করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, থুথু ফেলে দাও। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি থুথু ফেলব না। এরপর ফিরে গিয়ে তিনি লড়াই করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি কোন জান্নাতী মানুষকে দেখতে চায় তবে সে যেন মালেক ইবনে সেনান (রা.)-কে দেখে। এরপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান মহিলাদের ভূমিকাও ছিল অনন্য। মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে ওমারা নোসায়বা বিনতে কা'ব (রা.) অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি কয়েকজন মুসলমানের মাঝে থেকে লড়াই করতে করতে ইবনে কোমায়রের সামনে গিয়ে পৌছেন। ইবনে কোমায়ার তলোয়ার দিয়ে সজোরে আঘাত করলে তার কাঁধে যখম হয়। তিনিও তলোয়ার দিয়ে ইবনে কোমায়ারকে কয়েকবার আঘাত করেন। কিন্তু সে পাপিষ্ঠ বর্ম পরিহিত থাকায় বেঁচে যায়। হযরত উম্মে ওমারা লড়াই করতে করতে বারোটি আঘাত পান।

হযরত মোসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ইবনে কোমায়ার ও তার সাথীদের উপর্যুপরি হামলা প্রতিরোধ করেন। তার হাতে ছিল ইসলামী বাহিনীর পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তার ডান হাতে এমন জোরে তলোয়ার চালায় যাতে তার হাত কেটে যায়। এরপর তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন এবং কাফের বাহিনীর সামনে স্থির অবিচল থাকেন। অবশেষে তার বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন হাঁটুতে ঠেস দিয়ে বুক ও ঘাড়ের সাহায্যে পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে

www.nagorikpathagar.org

ধরেন। এ অবস্থায়ই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর হত্যাকারী ছিল ইবনে কোমায়ার। এ দুর্বৃত্ত হযরত মোসআব (রা.)-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করেছিল। হযরত মোসআবের (রা.) চেহারার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার মিল ছিল। হযরত মোসআব (রা.)-কে হত্যা করে ইবনে কোমায়ার মুশরিকদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করা হয়েছে (ইবনে হিশাম)। ইবনে কোমায়ার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তে তা মুসলমান ও মুশরিকদের কাছে পৌছে যায়। এটা ছিল সে নাযুক মূহূর্ত, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দূরে মুশরিকদের অবরোধের মাঝে যুদ্ধরত সাহাবীদের মনোবল ভেঙ্গে যুদ্ধের সংকল্প শিথিল হয়ে পড়ে। তাদের সারিগুলো উতাল পাতাল এবং অনৈক্য বিশৃংখলার শিকার হয়। হামলা কিছুটা কমে আসে। কেননা মুশরিকরা ভেবেছিল, তাদের আসল উদ্দেশ্য পুরো হয়ে গেছে। অতএব বহুসংখ্যক মুশরিক হামলা বন্ধ করে দিয়ে মুসলিম শহীদদের লাশ বিকৃত করতে শুরু করে।

হযরত মোসআব ইবনে ওমায়রের (রা.) শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে দেন। তিনি অবিচলতার সাথে দৃঢ়পদে লড়াই করেন। সেখানে উপস্থিত অন্য কয়েকজন সাহাবীও অতুলনীয়, বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পাল্টা আক্রমণ করেন। অবশেষে এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের কাতার চিরে সাহাবীদের কাছে যাওয়ার জন্যে পথ তৈরী করে নিতে পারেন। অতএব তিনি সাহাবীদের নিরাপত্তা বলয়ে প্রবেশের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। এ সময় প্রথমে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) তাঁকে চিনে ফেলেন। আনন্দে চিৎকার করে তিনি বলেন ওহে মুসলমানরা, তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, এতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন। তিনি তাকে চুপ করার ইঙ্গিত দেন, যাতে মুশরিকরা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানতে না পারে। কিন্তু মুসলমানরা তাঁর ডাক শুনে ফেলেছিলেন, ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে প্রায় ত্রিশ জন সাহাবী হাযির হন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে মুসলমানদের শিবিরের দিকে যেতে শুরু করেন। তিনি শিবিরে গিয়ে পৌছলে মুশরিকরা মুসলমানদের অবরোধের মাঝে নেয়ার যে কাজ শুরু করেছিল সেটা ব্যর্থ হয়ে

www.nagorikpathagar.org

যাবে, এ কারণে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তন ব্যর্থ করে দিতে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালায়, কিন্তু তিনি হামলাকারীদের ভিড় ঠেলে শিবিরে ফেরার রাস্তা করে নেন। এ সময় ওসমান ইবনে উবদুল্লাহ ইবনে মুগীরা নামের এক দুর্বৃত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগ্রসর হতে হতে বলে, হয়তো আমি থাকব অথবা সে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে থেমে যান, কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। কেননা তার ঘোড়া একটি গর্তে পড়ে যায়। ইত্যবসরে হযরত হারেস বিন সেম্মা (রা.) হুঙ্কার দিয়ে সামনে এগিয়ে তার পায়ে তলোয়ারের প্রচ আঘাত করে তাকে বসিয়ে দেন। এরপর তাকে হত্যা শেষে তার অস্ত্র খুলে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছেন। এরই মধ্যে এক মক্কী ঘোড়সওয়ার আবদুল্লাহ ইবনে জাবের ঘুরে এসে হযরত হারেস ইবনে সেম্মা (রা.)-এর কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু মুসলমানরা দৌড়ে এসে তাকে তুলে নেন। পরক্ষণে মাথায় লাল পট্টি পরিহিত হযরত আবু দুজানা (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে জাবেরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারের আঘাত হানেন, যাতে তার মাথা উড়ে যায়।

কুদরতের আরেক রহস্যময় ব্যাপার হল, এ ধরনের জীবন-মরণ যুদ্ধের মধ্যেও মুসলমানদের চোখে ঘুম পাচ্ছিল। পবিত্র কুরআনের বাণী অনুযায়ী এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রশান্তির নিদর্শন। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, ওহুদের বিভীষিকাময় যুদ্ধের সময় যাদের ঘুম পাচ্ছিল, আমিও তাদের একজন। ঘুমের চাপে কয়েকবার আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তরবারি পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তা তুলে নিচ্ছিলাম। একাধিকবার এরকম হয়েছিল (বুখারী)। মোটকথা, এরকম প্রাণপণ প্রচেষ্টায় মুসলমানদের এ ছোট দল সুশৃংখলভাবে পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থিত শিবিরে গিয়ে পৌছেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের জন্যেও সুরক্ষিত শিবির পর্যন্ত পৌছার পথ করে দেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রণকৌশলের সামনে খালিদ ইবনে ওলীদের রণকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাঁটিতে পৌছার পর উবাই ইবনে খালফ একথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হয় ঃ মুহাম্মদ কোথায়? হয়তো আমি থাকব অথবা সে থাকবে? সাহাবীরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের কেউ কি তার উপর হামলা করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওকে আসতে দাও। এ দুর্বৃত্ত

www.nagorikpathagar.org

কাছে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হারেস ইবনে সেম্মা (রা.)-এর কাছ থেকে ছোট একটা বর্শা নিয়ে তাতে ঝটকা মারেন। তখন লোকজন এমনভাবে এদিকে ওদিকে সটকে যায়, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটুখানি ঝাঁকুনি দিলে মাছি উড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর উবাইয়ের মুখোমুখি গমন করেন। তার শিরস্ত্রাণ এবং বর্মের মাঝামাঝি কণ্ঠনালীর কাছে একটুখানি জায়গা খালি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থান লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। এতে উবাই ইবনে খালফ ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে কুরাইশদের কাছে ফিরে যায়।

বর্শার আঘাতে তার গলার কাছে সামান্য ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেটা কোন বড় আঘাত ছিল না। রক্তও বের হয়নি। তবুও সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করেছে। লোকেরা তাকে বলল, কি বাজে বকছ, তোমার আঘাত তো তেমন গুরুতর নয়। সামান্য আঁচড় লাগার মত দেখা যাচ্ছে। উবাই বলল, মুহাম্মদ মক্কায় আমাকে বলেছিল আমি তোমাকে হত্যা করব। কাজেই আল্লাহর শপথ, সে আমার উপর থুথু নিক্ষেপ করলেও আমার প্রাণ চলে যেত। পরিশেষে আল্লাহর এ দুশমন মক্কায় ফেরার পথে সারেফ নামক জায়গায় মারা যায়। (ইবনে হিশাম)। আবুল আসওয়াদ হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, মৃত্যুর পূর্বে উবাই ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে বলতে ছিল, সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। আমার যে কষ্ট হচ্ছে, সে কষ্ট যদি যিল মাজাযের অধিবাসীদের হত, তাহলে তারা সবাই মরে যেত (মুখতাসার সীরাতুর রাসূল)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার পথে একটি উঁচু জায়গা দিয়ে উঠতে পারছিলেন না, একে তো তাঁর দেহ ছিল মজবুত ও শক্তিশালী, দ্বিতীয়ত তিনি দু'টো বর্ম পরিধান করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন মারাত্মকভাবে আহত। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) নীচে বসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁধে তুলে দাঁড়িয়ে যান। এভাবে তিনি চাতালের উপর ওঠেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তালহা নিজের জন্যে জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে (ইবনে হিশাম)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাঁটির ভিতরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পর মুশরিকরা মুসলমানদের পরাস্ত করতে সর্বশেষ চেষ্টা চালায়। ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাঁটির ভেতরে চলে যাবার পর আবু সুফিয়ান এবং খালিদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে মুশরিকদের একটি ছোট দল উপরে

www.nagorikpathagar.org

ওঠার চেষ্টা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। হে আল্লাহ, ওরা যেন উপরে উঠতে না পারে। এরপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এবং একদল মুহাজির সাহাবী যুদ্ধ করে ওদের পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দেয় (ইবনে হিশাম)।

মুশরিকরা পাহাড়ের উপরে সামান্য উঠে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, ওদের পিছনে ঠেলে দাও। সা'দ (রা.) বলেন, আমি একাকী কিভাবে তা পারব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার কথাটা উচ্চারণ করেন। পরে হযরত সা'দ (রা.) তার তুন থেকে একটা তীর বের করে এক শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করলে সে ওখানেই নিহত হয়। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, এরপর আমি সে তীরে আরেকজনকেও হত্যা করলাম। এরপর মুশরিকরা নীচে নেমে যায়। আমি ভাবলাম, এটি বরকতসম্পন্ন তীর। পরে আমি সে তীর আমার তুনের মধ্যে রেখে দেই। এ তীর জীবনভর হযরত সা'দ (রা.)-এর কাছে ছিল। পরে তার সন্তানরাও সেটি সংরক্ষণ করেন। (যাদুল মায়াদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এটা ছিল মুশরিকদের সর্বশেষ হামলা। সে সময় কাফিররা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই জানত না। বরং তারা এক রকম ধরেই নিয়েছিল যে, তিনি নিহত হয়েছেন। এ কারণে তারা নিজেদের শিবিরে ফিরে গিয়ে মক্কা অভিমুখে গমনের প্রস্তুতি শুরু করে। এ সময় কিছু মুশরিক নারী-পুরুষ মুসলমান শহীদদের অংগ প্রতংগ ছেদনে লিপ্ত হয়। তারা শহীদদের লজ্জাস্থান, কান, নাক প্রভৃতি অঙ্গ কেটে নেয় এবং পেট চিরে ফেলে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে ওতবা হযরত হামযার (রা.) বুক চিরে কলিজা বের করে মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করে এবং গিলতে না পারায় ফেলে দেয়। তারা মুসলিম শহীদদের কর্তিত নাক ও কান দিয়ে মালা গেঁথে নুপুর বানিয়ে গলায় এবং পায়ে পরিধান করে (ইবনে হিশাম)। শেষ দিকে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা থেকে সহজেই বোঝা যায়, নিবেদিত প্রাণ মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কিরূপ দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন বিসর্জন দিতে তাদের আগ্রহের কোন কমতি ছিল না?

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি সেসব মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসে। আমি লক্ষ্য করলাম, মুশরিকরা মুসলিম শহীদদের অংগ প্রতংগ কাটছে। আমি খানিকটা থেমে সামনে এগিয়ে গেলাম। লক্ষ্য করলাম, বর্ম পরিহিত বিশালদেহী এক মুশরিক শহীদদের মাঝখান দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

অতিক্রম করছে। সে যেতে যেতে বলছিল যবাই করা বকরীর মতো স্তূপ পড়ে গেছে। আর একজন মুসলমান এ লোকটির পথপানে চেয়ে আছে। সেও বর্ম পরিহিত। আমি আরো কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে তার পিছু নেই। আমি দাঁড়িয়ে উভয়ের শক্তি পরিমাপ করলাম। আমার মনে হল, কাফের লোকটি অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ সরঞ্জাম উভয় দিক থেকেই উত্তম। এবার আমি উভয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে উভয়ের সংঘর্ষ বেধে যায়। মুসলমান লোকটি ওই কাফিরকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করলেন যাতে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর সে মুসলমান নিজের মুখোশ খুলে বলেন,ও কা'ব, কাজটা কেমন হল? আমি হচ্ছি আবু দুজানা (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

যুদ্ধ শেষে কিছুসংখ্যক মুসলিম মহিলা জিহাদের ময়দানে পৌঁছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং উম্মে সোলায়ম (রা.)-কে দেখলাম, তারা পায়ের গোঁড়ালির উপর কাপড় তুলে পিঠে পানির মশক বয়ে নিয়ে আসছেন এবং মুসলমানদের পান করাচ্ছেন (বুখারী)। হযরত ওমর (রা.) বলেন, ওহুদের দিন হযরত উম্মে সালীত (রা.) আমাদের জন্যে মশক ভর্তি করে পানি নিয়ে আসছিলেন (বুখারী)। পানি বহনকারিণী মহিলাদের মধ্যে হযরত উম্মে আয়মানও ছিলেন। তিনি মদীনায় ফিরে যাওয়া পরাজিত মুসলমানদের দেখে তাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করে বলছিলেন, এ নাও সুতা কাটার চাক্কি, আর তোমাদের তলোয়ার আমাদের হাতে দাও। এরপর তিনি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে আহতদের পানি পান করাতে লাগলেন। হিব্বান ইবনে আরকা নামক এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। এতে তিনি পড়ে গেলে তার পর্দা খুলে যায়। আল্লাহর দুশমন তা দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে। ব্যাপারটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব খারাপ লাগল। তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে একটি পালকশূন্য তীর দিয়ে বলেন, এটি নিক্ষেপ কর। সা'দ তীর নিক্ষেপ করলেন এবং তা হিব্বানের গলায় বিদ্ধ হয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে যায় এবং তারও পর্দা খুলে যায়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসেন, যাতে তাঁর মাড়ির মূলের দাঁত দেখা যেতে থাকে। এরপর বলেন, সা'দ উম্মে আয়মানের বদলা গ্রহণ করেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার দোয়া কবুল করুন। (আস সীরাতুল হালবিয়া)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়ার পর হযরত আলী (রা.) তাঁর ঢালে করে মেহরাস থেকে পানি নিয়ে আসেন। বলা হয়ে থাকে, মেহরাস পাথরে তৈরী এক ধরনের কূপ, যাতে পানি বেশী আসে। এও বলা হয়,

www.nagorikpathagar.org

হেরাস ওহুদের একটি ঝর্ণা। হযরত আলী (রা.) পানি এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করতে দেন। কিন্তু কিছুটা গন্ধ অনুভব হওয়ায় তিনি সে পানি পান না করে চেহারার রক্ত ধুয়ে নেন এবং কিছু পানি মাথায় ঢালেন। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহর কঠিন গযব, যে আল্লাহর রাসূলের চেহারা রক্তাক্ত করেছে। (ইবনে হিশাম)

হযরত সাহল (রা.) বলেন, আমি জানি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রক্ত কে ধুয়েছেন, পানি কে ঢেলেছেন এবং চিকিৎসা কি বস্তু দ্বারা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন, আর হযরত আলী (রা.) ঢালে করে আনা পানি ক্ষতের উপর বইয়ে দিচ্ছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) লক্ষ্য করলেন, পানি ঢেলে দেয়ায় রক্ত আরো বেশী বের হচ্ছে। তখন তিনি চাটাইয়ের একটি টুকরো নিয়ে আগুনে পুড়ে ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন, যাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় (বুখারী)। এ দিকে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) সুপেয় মিষ্টি পানি নিয়ে আসেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পানি পান করে তাঁর কল্যাণের জন্যে দোয়া করেন (আস সীরাতুল হালবিয়া)। যখমের যন্ত্রণার কারণে এ দিন তিনি যুহরের নামায বসে আদায় করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর পেছনে বসেই নামায আদায় করেন। (ইবনে হিশাম)

এদিকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে আবু সুফিয়ান ওহুদ পাহাড়ের উপর উঠে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ আছে কি? কেউ কোন জবাব দিলেন না। সে আবার বলল, তোমাদের মধ্যে আবু জোহাফার পুত্র (আবু বকর) আছে কি? এবারও কেউ কোনো জবাব দিলেন না। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কি ওমর ইবনে খাত্তাব আছে? এবারও কেউ কোনো জবাব দিলেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জবাব দিতে নিষেধ করেছিলেন। আবু সুফিয়ান এ তিন জন ছাড়া অন্য কারো কথা জিজ্ঞেস করেনি। কারণ, তার সম্প্রদায় ভাল করেই জানত, এ তিন জনের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কোনো জবাব না পেয়ে আবু সুফিয়ান স্বগতোক্তি করে বলল, চল এ তিন জন থেকেই রেহাই পাওয়া গেছে। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আত্মসম্বরণ করতে না পেরে বলেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, তুমি যাদের নাম উচ্চারণ করেছ, তারা সবাই জীবিত আছেন। আল্লাহ তা'আলা এখনও তোমার অবমাননার উপকরণ অবশিষ্ট রেখেছেন। একথা শুনে আবু সফিয়ান বলল, তোমাদের নিহত

www.nagorikpathagar.org

লোকদের অংগপ্রতংগ কাটা হয়েছে। আমি এসব করতে বলিনি, তবে এতে আমি নাখোশও নই। এরপর সে ধ্বনি দিল, হোবলের জয় হোক! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, কি জবাব দেব? তিনি বলেন, বল, আল্লাহু আকবর আল্লাহ মহান এবং সর্বশক্তিমান। আবু সুফিয়ান আবার ধ্বনি তুলল, আমাদের জন্যে ওযযা আছে, তোমাদের ওযযা নেই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, কি জবাব দেব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বল 'আল্লাহু মাওলানা ওয়া-লা মাওলানা কুম'- আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নেই। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, কি চমৎকার কৃতিত্ব। আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের দিন। যুদ্ধ হচ্ছে একটা বালতি। হযরত ওমর (রা) জবাবে বলেন, তোমরা আর আমরা সমান নই। আমাদের যারা নিহত হয়েছেন তারা জান্নাতে, আর তোমাদের যারা নিহত হয়েছে তারা জাহান্নামে রয়েছে।

এরপর আবু সুফিয়ান বলল, ওহে ওমর, একটু কাছে আস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাও, দেখ কি বলে? হযরত ওমর (রা.) এগিয়ে গেলে আবু সুফিয়ান বলল ওহে ওমর, তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমরা কি মুহাম্মদকে হত্যা করতে পেরেছি? হযরত ওমর (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ,পারোনি; বরং এখন তিনি তোমার কথা শুনছেন। আবু সুফিয়ান বলল, ওমর, তুমি আমার কাছে ইবনে কোমায়রের চাইতেও অধিক সত্যবাদী ব্যক্তি (ইবনে হিশাম)। সাঙ্গপাঙ্গসহ ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান বলল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় লড়াই করার ওয়াদা রইল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে বলেন, বলে দাও, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একথাই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকল (ইবনে হিশাম)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-কে কাফিরদের পিছনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ওদের পিছনে পিছনে যাও, দেখ, ওরা কি করছে এবং ওদের পরবর্তী ইচ্ছা কি? যদি ওরা ঘোড়া পাশে রেখে উটের পিঠে সওয়ার হয়, তবে বুঝতে হবে, ওরা মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর যদি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে উট হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে ওরা মদীনার পথে রওনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মদীনায় গিয়ে ওদের সাথে মোকাবেলা করব। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি কাফিরদের অনুসরণ

করে লক্ষ্য করলাম, ওরা ঘোড়া পাশে রেখে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। (ইবনে হিশাম)

কুরাইশদের চলে যাওয়ার পর মুসলমানরা শহীদান এবং আহতদের খোঁজ নিতে শুরু করেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, ওহুদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সা'দ ইবনে রবীর (রা.) খোঁজ নিতে পাঠান। আমাকে বলে দিলেন, যদি সা'দকে পাওয়া যায় তবে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং জিজ্ঞেস করবে, সে এখন কেমন বোধ করছে। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি তাকে শহীদদের লাশের মধ্যে বের করলাম। কাছে গিয়ে দেখি তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় কাতরাচ্ছেন। তার দেহে বর্শা, তীর ও তলোয়ারের সত্তরটি আঘাত লেগেছিল। আমি বললাম, হে সা'দ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনি কেমন অনুভব করছেন, সে কথা জানতে চেয়েছেন? হযরত সা'দ ইবনে রবী (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূলকে আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, আমি জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। আমার আনসার ভাইদের বলবে, যদি তোমাদের একটি চোখের স্পন্দন বাকি থাকতেও শত্রুরা আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌছতে পারে, তবে আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন ওযর আপত্তি কাজে আসবে না। একথা বলার পর পরই তিনি ইন্তিকাল করেন। (যাদুল মায়াদ)

আহতদের মধ্যে আমি উসাইরেমকেও পেলাম। তার নাম আমর ইবনে সাবেত (রা.)। তখন তার সামান্য প্রাণ-স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। ইতোপূর্বে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সে দাওয়াত গ্রহণ করেননি। মুসলমানদের অনেকে অবাক হয়ে বলেন, উসাইরেম এখানে এলো কিভাবে? আমরা তো তাকে দ্বীন ইসলামের অস্বীকারকারী অবস্থায় রেখে এসেছি। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কিভাবে এখানে এলেন? ইসলামের প্রতি ভালোবাসা নাকি নিজ গোত্রের সাহায্যের প্রেরণা আপনাকে এখানে এনেছে? তিনি বলেন, ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় এসেছি। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্যে এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করেননি (যাদুল মায়াদ)। ইসলাম গ্রহণের পর কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আহতদের মধ্যে কোযমান নামের এক ব্যক্তিকেও পাওয়া গেল। তিনি এ যুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং সাত বা আট জন মুশরিককে হত্যা করেছেন। তার দেহে ছিল বহুসংখ্যক আঘাতের চিহ্ন। তাকে বনু যফর গোত্রের মহল্লায় নিয়ে যাওয়া হল এবং মুসলমানরা তাকে সুসংবাদ শোনাল। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি তো আমার গোত্রের সম্মান রক্ষার্থে লড়াই করেছি। তা না হলে আমি তো লড়াই করতাম না। যখমের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে গেলে কোযমান নিজেকে যবাই করে আত্মহত্যা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পূর্বে কোযমানের কথা আলোচনা করা হলে তিনি বলেছিলেন, সে তো জাহান্নামী (যাদুল মায়াদ)। এ ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া দেশের বা দশের জন্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যারা যুদ্ধ করে, তাদের সকলের পরিণাম কোযমানের মতই হবে। যদিও তারা ইসলামের পতাকা তলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করে, তবুও তাদের এ পরিণামেরই সম্মুখীন হতে হবে।

অপরদিকে নিহতদের মধ্যে বনু ছা'লাবা গোত্রের এক ইহুদীও ছিল। যখন যুদ্ধের দামামা বেজেছে তখন সে স্বগোত্রীয়দের বলল, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান, মুহাম্মদকে সাহায্য করা তোমাদের ফরয কর্তব্য। ইহুদীরা বলল, আজ শনিবার। সে বলল, তোমাদের জন্যে কোনো শনিবার নেই। এরপর সে তলোয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হয়। রওনা হওয়ার সময় বলল, যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই তবে আমার অর্থ-সম্পদের মালিকানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তিনি যা চান তাই করবেন। এরপর সে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে মারা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কথা শুনে বলেন, মোখায়রিক (ঐ ইহুদী) একজন ভালো ইহুদী ছিল (ইবনে হিশাম)। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শহীদদের লাশ পরিদর্শন করে বলেন, আমি এদের জন্য সাক্ষী থাকব। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ওঠাবেন, তখন তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সে রক্তের রং রক্তের মতই হবে। কিন্তু তা থেকে কস্তুরীর সুবাস নির্গত হবে। (ইবনে হিশাম)

কয়েকজন সাহাবী নিজেদের শহীদদের লাশ মদীনায় স্থানান্তর করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানার পর তাদের লাশ ফিরিয়ে এনে শাহাদাত বরণের জায়গাতেই দাফন করার নির্দেশ দেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শহীদদের অস্ত্র এবং চামড়ার পোশাক খুলে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

বিনা গোসলে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই দাফন কর। তিনি দু'তিন জন সাহাবীর লাশ একই কবরে এবং দু'জনকে একই কাফনে জড়িয়ে দাফন করার নির্দেশ দেন। দু'জন সাহাবীকে একই কাফনে জড়ানোর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, এ দু'জনের মধ্যে কুরআন করীম কার বেশী মুখস্থ ছিল? সাহাবীরা যার প্রতি ইশারা করেন তাকে কবরে ওপরের দিকে রাখার জন্যে বলেন। এ সময় তিনি বলেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিব। আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে হারাম (রা.) এবং আমর ইবনে জামুহ (রা.)-কে একই কবরে দাফন করা হয়। কেননা তাদের দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল (যাদুল মায়াদ)। হযরত হানযালার (রা.) লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্ধান করার পর এক জায়গায় এমন অবস্থায় পাওয়া গেল যখন তার লাশ থেকে পানি ঝরছিল এবং মাটি থেকে উপরে ছিল (শূন্যে ভাসছিল)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন, ফিরিশতারা তাকে গোসল করাচ্ছেন। এরপর বলেন, তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস কর, ব্যাপার কি? জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বাসর রাতের ঘটনা বলেন অর্থাৎ সাহাবী ফরয গোসলের সময় পাননি অথচ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে থেকে হযরত হানযালার (রা.) নাম হল গাসিলুল মালায়িকা অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যাকে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছেন। (যাদুল মায়াদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হামযার অবস্থা দেখে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁর ফুফু হযরত সফিয়া (রা.) এলেন। তিনিও হযরত হামযা (রা.)-কে দেখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সফিয়ার পুত্র হযরত যোবায়র (রা.)-কে বলেন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তিনি যেন তার ভাইয়ের অবস্থা দেখতে না পান। কিন্তু হযরত সফিয়া (রা.) বলেন, তা কেন? আমি জানি, আমার ভাইয়ের অংগপ্রতংগ কেটে ফেলা হয়েছে। হযরত হামযা (রা.) আল্লাহর পথে ছিলেন। কাজেই যা কিছু হয়েছে আমি তা মেনে নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ, আমি সওয়াবের আশায় সবর করব। এরপর তিনি হযরত হামযা (রা.)-এর কাছে এলেন, দেখলেন, ইন্না লিল্লাহ পড়লেন, তার জন্যে দোয়া করলেন। হামযা (রা.)-কে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের (রা.) সাথে দাফন হল। তিনি হযরত হামযার (রা.) ভাগিনা এবং দুধভাই ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযার (রা.) জন্যে যেভাবে কেঁদেছিলেন, তাকে অন্য কোন সময় ওই রকম কাঁদতে দেখা যায়নি। তিনি হযরত হামযা (রা.)-কে কেবলার দিকে রাখেন, এরপর তার জানাযার পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কাঁদলেন যাতে আমরা তাঁর কান্নার হু হু শব্দ শুনতে পেলাম। (মুখতাসারুস সীরাহ)

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতপক্ষে ওহুদের শহীদদের অবস্থা ছিল বড়ই হৃদয়বিদারক। হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) বলেন, হযরত হামযার (রা.) জন্যে কালো পাড়বিশিষ্ট একখানা চাদর ছাড়া অন্য কোনো কাফন পাওয়া যায়নি। এ চাদর মাথার দিকে টেনে দেয়া হলে পায়ের দিক, আর পায়ের দিকে টেনে দেয়া হলে মাথার দিক বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তার পা খোলা রেখে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় (মুসনাদে আহমদ)। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, ওহুদের যুদ্ধে হযরত মোসআব ইবনে ওমায়র (রা.) শহীদ হন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে ভাল। একখানা মাত্র চাদর দিয়ে তাকে কাফন দেয়া হয়। সে চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে দেয়া হলে পা; আর পা ঢেকে দেয়া হলে মাথা খুলে যায়। হযরত খাব্বাব (রা.)ও তার কাফনের এরূপ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে এটুকু বেশী বলেছেন, তার এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন, চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে পায়ের উপর ঘাস চাপিয়ে দাও। (বুখারী)

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, ওহুদের দিন মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন, তোমরা কাতারবন্দী হও, আমি আমার প্রতিপালকের কিছু প্রশংসা করব। এরপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে। তুমি যা প্রশস্ত করে দাও তা কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না। আর তুমি যা সংকীর্ণ করে দাও, কেউ তা প্রশস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে পথভ্রষ্ট করে দাও কেউ তাকে হিদায়েত করতে পারে না। পক্ষান্তরে তুমি যাকে হিদায়েত দাও, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। যে জিনিস তুমি আটক করে দাও, সে জিনিস কেউ দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জিনিস তুমি দাও, কেউ তা আটক করতে পারে না। যে জিনিস তুমি দূরে সরিয়ে দাও, সে জিনিস কেউ কাছে আনতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জিনিস তুমি কাছে এনে দাও, সে জিনিস কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, আমাদের উপর তোমার বরকত, রহমত, ফযল ও রিযিক বিস্তৃত কর। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে স্থায়ী নিয়ামতের আবেদন করছি, যে নিয়ামত কখনো শেষ হবে না। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দারিদ্র্যের দিনে সাহায্য এবং ভয়ের দিনে নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের যা কিছু দিয়েছ আর যা কিছু দাওনি, উভয়ের মন্দ থেকে আমি 'তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ, আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় এবং আমাদের অন্তরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দাও। কুফরী, ফাসিকী এবং নাফরমানী আমরা যেন পছন্দ না করি, সে ব্যবস্থা কর এবং আমাদের

www.nagorikpathagar.org

হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং পরকালে মুসলমান অবস্থায় জীবিত কর। অবমাননা ও ফিতনা ফাসাদ থেকে আমাদের দূরে রাখ। তোমার সালেহীন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি সে সকল কাফিরকে মেরে ফেল, তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার কর, আযাবে নিক্ষেপ কর। যারা তোমার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে এবং তোমার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; হে আল্লাহ, সেসব কাফিরকেও মার, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে।'

শহীদদের দাফন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পথে রওনা হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবীরা যে ধরনের মহব্বত ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন, মদীনায় ফেরার পথে ঈমানদার মহিলারা অনুরূপ আত্মত্যাগ এবং ধৈর্যের পরিচয় দেন। মদীনায় যাওয়ার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত হামনা বিনতে জাহশ (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। তার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত হামনা ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে ইন্না লিল্লাহ পড়েন এবং মাগফিরাতের দোয়া করেন। এরপর তাকে তার মামা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেয়া হলে তিনি পুনরায় ইন্না লিল্লাহ পড়েন এবং মাগফিরাতের দোয়া করেন। এরপর তার স্বামী হযরত মোসআব ইবনে ওমায়র (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেয়া হলে তিনি চিৎকার দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীর স্বামী তার কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। (ইবনে হিশাম)

অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু দীনার গোত্রের এক মহিলা সাহাবীর কাছ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেন। তার স্বামী, ভাই এবং পিতা শহীদ হয়েছিলেন। এ মহিলাকে তাদের শাহাদাতের খবর জানানো হলে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি খবর? তাকে বলা হল, তিনি ভালো আছেন। মহিলা সাহাবী বলেন, তাঁকে আমি একটু দেখতে চাই। সাহাবীরা ইশারায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দেন। মহিলা সাহাবী সাথে সাথে বলেন, আপনি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সকল বিপদই তুচ্ছ (ইবনে হিশাম)। এ সময় হযরত সা'দ ইবনে মো'য়ায (রা.)-এর মা ছুটে এলেন। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ হচ্ছেন আমার মা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে মারহাবা। এরপর তিনি হযরত সা'দ (রা.)-এর মায়ের

www.nagorikpathagar.org

সম্মানে ঘোড়া থামান। তিনি কাছে এলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক পুত্র হযরত আমর ইবনে মো'য়ায (রা.)-এর শাহাদাতের খবর জানান এবং সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বলেন। তিনি জবাবে বলেন, আপনাকে ভাল অবস্থায় দেখার পর সকল বিপদই আমার কাছে তুচ্ছ। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের শহীদদের জন্যে দোয়া করেন এবং বলেন হে উম্মে সা'দ, তুমি খুশী হও। শহীদদের পরিবারে গিয়ে সুসংবাদ দাও, তাদের সকল শহীদ একই জান্নাতে রয়েছে এবং নিজের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে তাদের শাফায়াত কবুল করা হয়েছে। এ কথায় হযরত সা'দ (রা.)-এর মা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, শহীদদের পরিবার পরিজনের জন্যেও দোয়া করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ, তাদের মনের শোক যাতনা দূর করে দাও, মসিবতের বিনিময় দাও এবং তাদের অবশিষ্টদের হিফাযত কর।

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল রোববার বিকেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছেন। ঘরে গিয়ে তাঁর তলোয়ার হযরত ফাতিমা (রা.)-কে দিয়ে বলেন, এ তলোয়ারে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে দাও। আল্লাহর শপথ, এ তরবারি আজ আমার জন্যে অত্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আলীও (রা.) তার তরবারি ঝাড়া দিয়ে হযরত ফাতিমা (রা.)-কে দিয়ে রক্ত ধুয়ে দিতে বলেন। আরো বলেন, আল্লাহর শপথ, এ তরবারি আমার জন্যে আজ অত্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদিও তুমি যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছ তবে মনে রেখ, সাহায়ল ইবনে হোনায়ফ এবং আবু দুজানা (রা.) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। (ইবনে হিশাম)

ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই এ সংখ্যার ব্যাপারে একমত। শহীদদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন আনসার। তাদের ৪১ জন খাযরাজ এবং ২৪ জন আওস গোত্রের। একজন ইহুদীও নিহত হয়েছিলেন। আর মুহাজির শহীদ হয়েছিলেন মাত্র ৪ জন। বাকি রইল মুশরিকদের নিহতদের কথা। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, তাদের ২২ জন নিহত হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ ইতিহাসবিদ এবং সীরাতবিদরা ওহুদ যুদ্ধের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন এবং প্রসংগক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে নিহত মুশরিকদের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার উপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে মুশরিকদের নিহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭ জন। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন। (ইবনে হিশাম)

ওহুদ থেকে ফিরে আসার পর তৃতীয় হিজরীর ৮ই শাওয়াল শনি ও রোববার রাত মুসলমানরা জরুরী পরিস্থিতিতে অতিবাহিত করেন। তারা সকলেই রণক্লান্ত হওয়া

www.nagorikpathagar.org

সত্ত্বেও সারারাত মদীনার পথে এবং মদীনার প্রবেশ পথসমূহে কাটিয়ে দেন এবং তাদের প্রধান সিপাহসালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ হিফাযতে নিয়োজিত থাকেন। কেননা নানাদিক থেকে তাঁরা আশঙ্কা বোধ করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় অতিবাহিত করেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, যদি মুশরিকরা এরূপ ভেবে থাকে যে, যুদ্ধের ময়দানে সংখ্যায় বেশী হয়েও আমরা কোন ফায়দা অর্জন করতে পারিনি, তবে নিশ্চয়ই তারা লজ্জিত হবে। ফলে তারা মক্কার পথ থেকে ফিরে এসে মদীনায় হামলা করবে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত নিলেন, মক্কার সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে হবে।

সীরাত বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা মতে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের পরদিন, তৃতীয় হিজরীর ৮ই শাওয়াল রোববার সকালে ঘোষণা করেন, শত্রুদের মুকাবিলার জন্যে রওনা হতে হবে। ওহুদের যুদ্ধে যারা শরীক হয়েছিল তারাই শুধু আমাদের সাথে যেতে পারবে। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সাথে গমনের অনুমতি চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। শারীরিকভাবে আহত, স্বজন হারানোর শোকে কাতর, ভয় শঙ্কায় উদ্বিগ্ন মুসলমানরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) ওহুদের যুদ্ধে হাযির হতে পারেননি। তিনি অনুমতি চেয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি সকল যুদ্ধে আপনার সঙ্গে থাকতে আগ্রহী। ওহুদের যুদ্ধে আমার পিতা আমাকে আমার বোনদের দেখাশোনার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন, এ কারণে আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি। তাই এবার আমাকে আপনার সাথে গমনের অনুমতি দিন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দেন। কর্মসূচী অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং মদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন।

মুসলিম বাহিনী হামরাউল আসাদে অবস্থানকালে মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ খোযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মতান্তরে তিনি শিরকের উপরই ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণ কামনা করতেন। খোযায়া এবং বনু হাশেম গোত্রের মধ্যে মৈত্রী ও সহায়তা চুক্তি বিদ্যমান ছিল। এ চুক্তির কারণেই তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিতকামী ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা যুদ্ধের ময়দানে কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, আল্লাহর কসম এতে আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছি। আমরা মনে প্রাণে কামনা করছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুস্থ নিরাপদ রাখুন। সে এ ধরনের সমবেদনা প্রকাশ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'বাদ-কে বলেন, আবু সফিয়ানের কাছে গিয়ে তার উদ্যম নষ্ট করে তাকে নিরুৎসাহিত কর।

মুশরিকরা পুনরায় মদীনা অভিমুখে রওনা হতে পারে বলে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আশঙ্কা করেছিলেন, সেটা যথার্থ ছিল। মুশরিকরা মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরবর্তী রাওহা নামক জায়গায় পৌছে যখন শিবির স্থাপন করে, তখন তারা একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকে। তারা একদল অন্য দলকে বলছিল, তোমরা কিছুই করোনি। শক্তি, প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করার পর তাদের এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে এসেছো। অথচ এখনো তাদের এত বেশী মাথা বিদ্যমান রয়েছে, যা কিনা পুনরায় তোমাদের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে। সুতরাং ফিরে চল, ওদের সমূলে উৎপাটন করে দিয়ে আসি।

যারা এ প্রস্তাব দিয়েছিল, মনে হয় তারা উভয় পক্ষের শক্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত ছিল না। এ কারণে তাদের দায়িত্বশীল একজন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এ অভিমতের বিরোধিতা করে বলল, তোমরা অমন কর না। আমি আশঙ্কা করছি, যে সকল মুসলমান ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়নি, এবার তারাও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কাজেই আমরাই জয়লাভ করেছি এরুপ আত্মপ্রসাদ নিয়ে মক্কায় ফিরে চল। অন্যথায় পুনরায় মদীনার উপর হামলা করলে তোমরা বিপদে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু অধিকাংশই এ মত গ্রহণ না করে মদীনার উপর হামলার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তারা মদীনা অভিমুখে রওনা হওয়ার আগেই মা'বাদ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। মুনাফিকরা জিজ্ঞেস করল, মা'বাদ, পিছনের খবর কি? মা'বাদ কৌশলের মাধ্যমে বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তোমাদের পিছু ধাওয়া করতে বেরিয়ে পড়েছেন। তারা সংখ্যায় এত বেশী, এতো বড় সৈন্যদল এর আগে আমি কখনো দেখিনি। সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলছে। ওহুদের যুদ্ধে যারা যোগ দান করেনি, এবার তারাও বেরিয়ে এসেছে। তারা যুদ্ধে যা কিছু হারিয়েছে, সে জন্যে লজ্জিত। বর্তমানে তোমাদের বিরুদ্ধে তারা ভয়াবহ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সে ক্রোধের উদাহরণ আমি ইতোপূর্বে আর দেখিনি।

আবু সুফিয়ান বলেন, আরে ভাই, তুমি এসব কি বলছ? মা'বাদ বলেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম, আমি সত্যি বলছি। আমার ধারণা, তোমরা এখান থেকে চলে

www.nagorikpathagar.org

যাওয়ার আগেই ঘোড়সওয়ার দল দেখতে পাবে অথবা মুসলিম সৈন্যদের অগ্রবর্তী দল এ টিলার পেছন থেকে বেরিয়ে আসবে। আবু সুফিয়ান বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা শপথ নিয়েছি, ওদের উপর পাল্টা হামলা করে নির্মূল করে দেব। মা'বাদ বলেন, অমন কর না। আমি তোমাদের ভালোর জন্যে বলছি। এসব কথা শুনে কাফিরদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়ে তাদের উপর ভীতি ও ত্রাস ছেয়ে যায়। তারা মক্কায় ফিরে যাওয়াই কল্যাণকর মনে করে। তবে আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীকে তাদের পিছু ধাওয়া থেকে বিরত রাখতে এবং পুনরায় সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করে। মদীনার পথে চলমান বনু আবদে কায়সের এক কাফেলার লোকদের আবু সুফিয়ান বলে, তোমরা কি মুহাম্মদের কাছে আমার একটি পয়গাম পৌঁছে দিতে পারবে? যদি পৌঁছে দাও, তবে আমি কথা দিচ্ছি, তোমরা মক্কায় এলে ওকাযের বাজারে তোমাদের এত বেশী কিশমিশ দেব, যতটা এ উটনী বহন করতে পারে। বনু আবদে কায়সের লোকেরা আবু সুফিয়ানের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হয়। আবু সুফিয়ান বলল, তোমরা মুহাম্মদকে বলবে, আমরা তাকে এবং তার সঙ্গীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে পাল্টা হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এরপর এ কাফেলা 'হামরাউল আসাদ' নামক জায়গা অতিক্রম করার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের কাছে আবু সুফিয়ানের এ বার্তা পৌঁছে দেয়। সাথে সাথে এও বলল, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, কাজেই তাদের ভয় করুন। কাফেলার লোকদের কাছে এ খবর পেয়ে মুসলমানদের ঈমান আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারা বলল, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।

এ ঈমানী শক্তির কারণে মুসলমানরা আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহের সাথে মদীনার পথে রওয়ানা হয়। কোনো প্রকার অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রেযামন্দির অনুসরণ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোববার দিন হামরাউল আসাদে গমন করেন এবং তৃতীয় হিজরীর ৯, ১০ ও ১১ই শাওয়াল সোম, মঙ্গল ও বুধবার পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় ফিরে আসার আগেই আবু ইযযা জুমহী তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসে। এ লোকটি বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, কিন্তু দারিদ্র্য এবং কন্যা সন্তানের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হয়। সে অঙ্গীকার করেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। কিন্তু সে কথা রাখেনি। কবিতার মাধ্যমে সে আল্লাহ, রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের উদ্দীপিত করতে ব্যস্ত ছিল। এরপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওহুদের যুদ্ধে অংশও নিয়েছিল। এ লোকটিকে গ্রেফতার করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করা হলে সে বলল, মুহাম্মদ, আমার ভুল ক্ষমা করে দাও, আমার উপর দয়া কর, আমার কন্যা সন্তানদের কথা ভেবে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এখন আর এটা হতে পারে না যে, তুমি মক্কায় গিয়ে মুখম লে হাত বুলাতে বুলাতে বলবে, মুহাম্মদকে আমি দ্বিতীয় বার ধোকা দিয়েছি। মুমিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যোবায়র (রা.), মতান্তরে হযরত আসেম ইবনে সাবেতকে (রা.) নির্দেশ দিলে এ বেঈমানের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও।

এভাবেই মক্কার অন্য একজন গুপ্তচরও নিহত হয়। তার নাম মোয়াবিয়া ইবনে মুগীরা ইবনে আবুল আস। সে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নানা। ওহুদের দিন মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর এ লোকটি মদীনায় তার চাচাতো ভাই হযরত ওসমান (রা.)-এর সাথে দেখা করতে আসে। হযরত ওসমান (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার নিরাপত্তার আবেদন জানান। তিনি এ শর্তে তাকে নিরাপত্তা দেন, সে সর্বোচ্চ তিন দিন মদীনায় থাকতে পারবে। এরপরও যদি তাকে মদীনায় দেখা যায়, তবে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু হামরাউল আসাদ অভিযানে গমনের কারণে মদীনা মুসলিম বাহিনী শূন্য হয়ে গেলে সে কুরাইশদের গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে তিনদিনের পরও মদীনায় থেকে যায়। মুসলিম সৈন্যরা ফিরে আসার পর সে পলায়নের চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে নির্দেশ দেন। উভয় সাহাবী তাকে তাড়া করে হত্যা করেন। (ইবনে হিশাম, যাদুল মায়াদ, ফাতহুল বারী)

এ যুদ্ধের জয় পরাজয় কিভাবে নির্ধারিত হবে? বাস্তবতা অস্বীকার না করলে বলতেই হয়, এ যুদ্ধে দ্বিতীয় পালায় কাফিররা প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং যুদ্ধের ময়দান, একরকম তাদের হাতেই ছিল। প্রাণহানিও মুসলমানদের পক্ষেই বেশী হয়েছে। মুসলমানদের একটি অংশ নিশ্চিত পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সে সময় যুদ্ধের গতি কাফেরদের পক্ষেই ছিল, কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে, যার কারণে ওহুদ যুদ্ধে কাফিরদের জয় হয়েছে এমন কথা

www.nagorikpathagar.org

কিছুতেই বলা যায় না। মক্কার সৈন্যরা মুসলমানদের শিবির দখল করে নিতে পারেনি, এটা স্পষ্টতই জানা যায়। মদীনার সৈন্যদের এক বিরাট অংশ ভয়াবহ উতাল-পাতাল অবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও পলায়ন করেনি। তারা অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে, তাদের প্রধান সেনাপতির কাছে অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমবেত হয়েছিলেন। মুসলমানদের সংখ্যা এত কমেনি যে, মক্কার সৈন্যরা তাদের ধাওয়া করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া একজন মুসলমানও কাফিরদের হাতে বন্দী হননি। কাফেররা কোন গনীমতের মালও হস্তগত করতে পারেনি। উপরন্তু তারা মুসলমানদের সাথে তৃতীয় দফা লড়াই করতে প্রস্তুত হয়নি। অথচ মুসলিম বাহিনী তখনো তাদের শিবিরেই অবস্থান করছিল। কাফিররা যুদ্ধক্ষেত্রে দু'এক দিন অথবা তিন দিন অবস্থান করেনি। অথচ সেকালে বিজয়ীরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের শিবিরে কমপক্ষে তিন দিন অবস্থান করত এবং এটা যুদ্ধ জয়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিদর্শন মনে করা হত। বিজয় সুসংহত করার প্রমাণ দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য, কিন্তু কাফিররা মুসলমানদের আগেই চটপট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছিল। মুসলমানদের সন্তানাদি এবং অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশের সাহসও তাদের হয়নি। অথচ ওহুদ প্রান্তর থেকে সামান্য দূরেই মদীনা নগরী পুরোপুরি সেনা শূন্য এবং খোলামেলা পড়েছিল। তার প্রবেশপথেও কোনো বাধা প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

এ সকল কথার সারমর্ম হল, কুরাইশ সৈন্যরা এতোটুকুই করতে পেরেছে যে, সাময়িক সুযোগে মুসলমানদের কষ্টে ও অসুবিধায় ফেলতে পেরেছে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীকে নিজেদের আয়ত্তে নেয়ার পর তাদের হত্যা বা বন্দী করে লাভবান হওয়া, যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে যা লাভ করা অত্যাবশ্যক ছিল, তাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনী বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও তারা কুরাইশ বাহিনীর বেষ্টনী ভেংগে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। এ ধরনের ক্ষতি তো অনেক সময় বিজয়ীদেরও হতে পারে। কাজেই ব্যাপারটা মুশরিকদের বিজয় বলে অভিহিত করা যায় না।

অপরদিকে আবু সুফিয়ানের মক্কার পথে দ্রুত পলায়ন দ্বারা প্রমাণিত হয়, সে আশঙ্কা করেছিল, তৃতীয় দফা যুদ্ধ শুরু হলে তার সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অবধারিত। হামরাউল আসাদ অভিযানে আবু সুফিয়ানের ভূমিকায় এ অভিমত আরো অধিক প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় ওহুদ যুদ্ধে কোন পক্ষের সুনিশ্চিত জয় পরাজয় হয়েছে না বলে একে অমীমাংসিত যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। বলতে পারি, এ যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না

www.nagorikpathagar.org

করে এবং নিজেদের শিবির শত্রু পক্ষের কবলে ফেলে না রেখে যুদ্ধ স্থগিত করা হয়েছে। ইতিহাসের আলোকে এ ধরনের যুদ্ধকেই বলা হয় অমীমাংসিত যুদ্ধ। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তোমাদের মত যন্ত্রণা পেয়েছে এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা কর, তারা তা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।' এ আয়াতে আল্লাহ কষ্ট দেয়া এবং তা অনুভব করার ক্ষেত্রে এক বাহিনীকে অন্য বাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, উভয় দলই সমান অবস্থানে ছিল এবং এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে, যাতে কেউই কারো উপর জয় লাভ করেনি।

পরবর্তী সময়ে কুরআনে এ যুদ্ধে প্রতিটি পর্যায়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে এমন সব কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে, যেসব কারণে মুসলমানদের এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, এমন একটা সিদ্ধান্ত কর মুহূর্তে ঈমানদাররা এবং এ উম্মত, যাদের অন্যদের বিপরীতে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। যাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। সে বিচারে ঈমানদারদের বিভিন্ন দলের মাঝে কি কি দুর্বলতা রয়েছে, কুরআনের পর্যালোচনায় সেসব তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপ পবিত্র কুরআন মুনাফিকদের ভূমিকা উল্লেখ করে তাদের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচন করেছে। তাদের অন্তকরণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লুকিয়ে থাকা শত্রুতার মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। সহজ সরল মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিক এবং তাদের সাথী ইহুদীরা যেসব কুমন্ত্রণা প্ররোচনা ছড়িয়ে রেখেছিল, সেসব অপসারণ করা হয়েছে। আর এ যুদ্ধের প্রশংসাযোগ্য প্রজ্ঞা, কৌশল এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা ছিল এ যুদ্ধের সারকথা।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ষাটটি আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আয়াতগুলোতে সর্বাগ্রে যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের কাছ থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মুমিনদের স্থানে স্থানে নিয়োগ করছিলে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ (সূরা আলে ইমরান, ১২১)। পরিশেষে এ যুদ্ধের ফল ও অন্তর্নিহিত রহস্যসমূহ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'অসৎ কে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ মুমিনদের সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের অবহিত করার নন, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ১৭৯)।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে সংকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে আল্লাহর অনেক বড় হিকমত লুকায়িত ছিল। যেমন, মুসলমানদের অপরাধ অবাধ্যতার মন্দ পরিণাম এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের অশুভ দিক সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তীরন্দাজদের নিজেদের অবস্থানস্থলে অবিচল থাকার যে নির্দেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন, তারা তা লংঘন করেছে, এ কারণেই তাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এছাড়া নবী রাসূলদের সে সুন্নতের কথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রথমে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হন, এরপর সফলতা লাভ করেন। এতে এ রহস্য কৌশলও নিহিত রয়েছে যে, যদি ঈমানদার মুসলমানরা সব সময় জয় লাভ করতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন সব লোকও প্রবেশ করবে, যারা ঈমানদার নয়। ফলে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। অপরদিকে তারা যদি সব সময় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তাহলে নবীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কারণে আল্লাহর হিকমতের দাবী ছিল উভয় রকম অবস্থা সংঘটিত হওয়া। যাতে সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য করা যেতে পারে। মুসলমানরা এ যুদ্ধে স্পষ্ট বুঝেছে, তাদের ঘরে মুনাফিক নামক এক শত্রু রয়েছে। এতে মুসলমানরা তাদের সাথে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হন। একটা হিকমত এও ছিল যে, অনেক সময় সাহায্য আসতে দেরী হলে বিনয় নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং প্রবৃত্তির দম্ভ অহংকার ভেঙ্গে যায়। অতএব ঈমানদাররা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর ধৈর্যধারণ করেন। অথচ মুনাফিকদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়, তারা আহাজারি শুরু করে।

আরেকটা হিকমত এও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জন্যে মর্যাদার বাসস্থান জান্নাতে এমন কিছু শ্রেণী রেখেছেন, আমলের মাধ্যমে তাদের সেখানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা, দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ-মসিবতের কিছু উপায় উপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন যাতে ঈমানদাররা জান্নাতের সে মর্যাদাকর শ্রেণীতে উপনীত হতে পারেন। এছাড়া একটা হিকমত এও ছিল যে, শহীদ হওয়া আল্লাহর বন্ধুদের জন্যে উচ্চতর মর্যাদার। অতএব আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের জন্যে এ মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তাঁর দুশমনের ধ্বংস করতে চাচ্ছিলেন। তাই তাদের ধ্বংসের

www.nagorikpathagar.org

উপায় উপকরণও প্রস্তুত করে দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে, কুফরী, যুলুম অত্যাচার এবং আল্লাহর ওলীদের কষ্ট দানে সীমাহীন ঔদ্ধত্য এবং বাড়াবাড়ি। এসব আমলের পরিণামে আল্লাহ গোনাহ থেকে ঈমানদারদের পাকসাফ এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী)

আহযাব বা পরিখা যুদ্ধ (৫ম হিজরী, ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

আহযাব শব্দটি হিযব এর বহুবচন, যার অর্থ দলসমূহ। আহযাব বা পরিখা যুদ্ধ অন্যান্য সকল যুদ্ধের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী এবং এর প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও অস্বাভাবিক ধরনের। আশ্চর্যজনকভাবে এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের সমস্ত মুশরিক, ইহুদী ও তাদের সকল মিত্র শক্তি একত্রিত হয়েছিল। এমনকি মদীনার ভেতরের মুনাফিকরাও গোপনে তাদের সাহায্য করেছিল। সকল শত্রুদের সম্মিলিত হওয়ার কারণে একে 'আহযাব' নামে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে হযরত সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদীনা নগরের চতুর্দিকে খন্দক বা পরিখা খনন করে শত্রুদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার নব কৌশল অবলম্বন করার কারণে একে 'খন্দক' বা পরিখা যুদ্ধও বলা হয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, যখন মু'মিনরা ঐ সৈন্য বাহিনী দেখতে পেল, তখন বলল, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুত বিষয় আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন, এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেল। (সূরা আল আহযাব-২২)

ওহুদ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে ইসলামী মুজাহিদের যে পরাজয় সূচিত হয়েছিল তার কারণে আরবের মুশরিক, ইহুদী ও মুনাফিকদের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ওহুদ যুদ্ধের পর প্রথম বছরেই যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা হতেই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যায়। ওহুদ যুদ্ধের পর দু'মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই নজদের বনী আসাদ গোত্র, মদিনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যাদের বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার নেতৃত্বে বাহিনী পাঠাতে বাধ্য হন। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আদাল' ও 'কারাহ' অন্য দু'টি গোত্রের আবেদনক্রমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন দায়ী বা ইসলাম প্রচারককে তাদের নিকট পাঠান। কিন্তু 'রাজী' নামক স্থানে দায়ীরা পৌঁছলে 'হোযাইল' গোত্রের কাফিররা নিরস্ত্র দায়ী বা ইসলাম প্রচারকদের উপর আক্রমণ করে। ফলে তাদের মধ্যে চারজন শহীদ হয়, আর খুবাইব বিন আদি ও যায়েদ বিন দাসেন্নাকে বন্দী করে মক্কার দুশমনদের

www.nagorikpathagar.org

হাতে বিক্রয় করে দেয়। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আমের গোত্রের এক নেতার আবেদনক্রমে ৭০ জনের এক দাওয়াতে তাবলীগের জামাতকে নজদে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের সাথেও চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে 'বিরে মাওনা' নামক স্থানে কতিপয় কাফির গোত্র আকস্মাৎ আক্রমণ করে। ফলে দায়ীদের সকলেই শহীদ হন। এ সময়ই মদিনার ইহুদী বনু নজীর গোত্র অসীম সাহসী হয়ে ক্রমাগত কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি তারা রবিউল আউয়াল মাসে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। অতঃপর জমাদিউল আউয়াল মাসে গাতফানের বনু সালাম ও বনু মুহাবির গোত্রদ্বয় মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই অগ্রসর হতে হয়। এভাবে ওহুদ যুদ্ধে পরাজয়ে মুসলমানদের যে শক্তি লাঘব হয়েছিল পরবর্তী সাত আট মাস পর্যন্ত তার জের চলতে থাকে। ফলে কাফির, মুশরিক, ইহুদী ও মুনাফিকরা চরমভাবে মারমুখি ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে।

ওহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিল, আগামীতে 'বদর' নামক স্থানে তোমাদের সাথে আমাদের আবার যুদ্ধ হবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তার জবাব দেয়া হয়েছিল। আচ্ছা, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একথা ঠিক রইল। সে অনুযায়ী নির্ধারিত সময় ৪র্থ হিজরী শাবান মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫শ সাহাবী নিয়ে বদর নামক স্থানে উপনীত হন এবং আট দিন পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান নানা কারণে মুসলিমদের মুকাবিলায় অগ্রসর হয়নি। অথচ সে বিপুল শক্তি অর্জন করে বিরাট সৈন্যের সমাবেশ নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঠিক এমন সময়ই আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বনু নজীর গোত্রের লোকেরা মদীনা হতে বিতাড়িত হয়ে খায়বারে অবস্থান করে। আর সম্মলিত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা চারদিকে ঘুরাফিরা করে কুরাইশ, গাতফান, হুযাইল ও অন্যান্য অসংখ্য গোত্রের লোকদেরকে মদীনার উপর আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তাদের চেষ্টার ফলে ৫ম হিজরী শাওয়াল মাসে সমগ্র আরব গোত্রের এক বিরাট সম্বলিত শক্তি মদীনার ক্ষুদ্র বস্তির উপর আক্রমণের নেশায় টালমাতাল হয়ে উঠে।

এমন নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের সাথে পরামর্শ করেন। সকলের ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হয়, এবার কিছুতেই মদীনার বাইরে

যাওয়া যাবে না। পারস্যের রণকৌশলের ন্যায় নগরের চতুর্দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন হযরত সালমান ফার্সি (রা.)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ প্রস্তাব পছন্দ হয়। তিনি তার তিন হাজার সাহাবী সাথী নিয়ে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে এক সপ্তাহের মধ্যে মদিনার উত্তর ও পশ্চিম দিকে পরিখা খনন করেন। মদিনার দক্ষিণ দিকে বিপুল বাগান-খেতখামারে ঠাসা ছিল। আর পূর্ব দিকে ছিল আলওয়া বা লাভার পর্বতমালা। পাশাপাশি পশ্চিম দক্ষিণ অংশটা দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা পূর্ব হতে সংরক্ষিত ছিল। বিশ্বনবী মদীনার যেদিক উন্মুক্ত ছিল, কেবল সেদিকেই পরিখা খনন করেন এবং মাটি ফেলে গর্তের ভেতরকার পার্শ্বে উঁচু করে বাঁধের মত করে দেন এবং উঁচু প্রাচীরের উপর বড় বড় পাথর রেখে দেন, যেন সময় মত তা শত্রুর উপর নিক্ষেপ করা যায়। পরিখার গভীরতা ছিল ১০ হাত, প্রস্থ ১০ হাত এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় হাজার হাত। উল্লেখ্য, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ পরিখা খনন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শীতকাল হওয়ায় শৈত্যপ্রবাহে পরিখা খনন কাজে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি হয়। সাহাবারা কেউ এ কাজে গাফলতি করেননি। ছোট বড় সকলে এ মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর ও ওমরের (রা.) মাটি কাটার জন্য কোন পাত্র ছিল না। তারা নিজ কাপড়ে মাটি ভর্তি করে গর্ত খনন কাজে সহায়তা করেন। এভাবেই মদীনার মুসলিম নর-নারী প্রস্তুত হয়। যেমন করে হোক মদীনাকে রক্ষা করতেই হবে। এটা তাদের দৃঢ় সংকল্প। এভাবেই দ্রুত গতিতে সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে যায়। মহিলা ও শিশুদেরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। ঠিক এমন সময় নগরের এক প্রান্তে অবস্থানকারী ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযা, যারা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল; তাদের বিশ্বাস ঘাতকতার সংবাদ পান আল্লাহর রাসূল। এ সংবাদ তাঁকে বিচলিত করে তুলে। তিনি আউস ও খাজরায গোত্রের দু'জন প্রবীন ব্যক্তিকে তাদের অবস্থা জানার জন্য পাঠান। তারা গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা নাকি সন্ধি ভেঙ্গে কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়েছো? তারা উত্তর দিল, দিয়েছি তো কী? তোমাদের কোন কথা আমরা শুনতে চাই না। কে তোমাদের মুহাম্মদ? কে তোমাদের রাসূল? তাকে আমরা মানি না, যাও।" ইহুদীদের এ জঘন্য আচরণে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন হন। এরা যে চরম বিপদের সময় মুসলমানদেরকে মহা বিপদে ফেলবে তিঁনি তা ভাবতেই পারেননি। মদীনার উপকণ্ঠে যে দিকে তাদের বাস, সে দিক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত ছিল। কাজেই বিপদের আশংকা মনে করে তিনি প্রতিকারের

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা করেন। তিন হাজার সৈন্যের মধ্য হতে পাঁচ সৈন্যকে আলাদা করে দু'জন সেনাপতির অধীনে তাদেরকে ইহুদী মহল্লার চতুর্দিকে টহল দেয়ার নির্দেশ দেন।

আবু সুফিয়ান মহাআড়ম্বরে ১০ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে হাজির হন। মদীনা সংরক্ষণের পরিখা দেখে তার চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এ কী? এত দীর্ঘ পরিখা! এমন ব্যাপার তো কখনো দেখিনি? কি করে এ পরিখা পার হওয়া যায়? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আবু সুফিয়ান সেখানেই তাবু ফেলে। এ দৃশ্য দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করেন, হে কিতাব নাযিলকারী আল্লাহ! হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! আপনি আহযাব অর্থাৎ সমস্ত কাফির দলকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে বিতাড়িত করে দিন। তাদেরকে টলটলায়মান করে দিন। এরূপ দোয়া করার পর পরই আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয়। মুসলমানদের সাফল্য লাভের উপকরণ প্রস্তুত হয়ে যায়। কাফির বাহিনীর মধ্যে নাঈম বিন মাসউদ নামক এক ব্যক্তি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের চাতুর্যের দ্বারা মক্কার মুশরিক বাহিনী ও মদীনার ইহুদীদের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে দেন এবং যুদ্ধের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেন। এতে আবু সুফিয়ান বাহিনী ইহুদীদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়।

এভাবে অবরোধ ২৫ দিনের অধিক দীর্ঘ হয়। বনু কুরাইযার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অনবরত অবরোধের দরুন তারা কিছুটা অতিষ্ঠ ও অস্থির হয়ে উঠে। সময় ছিল শীতকাল। এত বড় সৈন্য বাহিনীর জন্য পানি, খাদ্য জন্তু-জানোয়ারের রসদ সংগ্রহ করা কঠিনতর হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় একরাতে প্রচ ঝড় হয়। এতে শীতের প্রকোপ, বিদ্যুতের চমক ও বজ্রের গর্জনে কাফিররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঝড়ের তা বে শত্রু বাহিনীর তাঁবু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে তারা খোদায়ী কুদরতের এ কঠিন আঘাত সহ্য করতে না পেরে রাতেই পলায়ন করে। সকালে মুসলমানরা জাগ্রত হয়ে দেখতে পায় যে, ময়দানে একজনও শত্রু সৈন্য নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে বলে উঠেন, আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে পূবালী বায়ুর সাহায্যে জয়যুক্ত করা হয়েছে, আর আদ জাতিকে পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

খন্দক যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদাররা! স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ। যখন তোমাদের নিকট শত্রু সৈন্য চড়াও হয়ে এসেছিল, তখন আমি তাদের উপর এক প্রবল ঝটিকা বায়ু পাঠালাম এবং এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের গোচরীভূত হলো না। তোমরা যা কর আল্লাহ সব কিছুই দেখেন' (সূরা আহযাব-৯)। খন্দক যুদ্ধে আল্লাহ মু'মিনদের অবস্থা তুলে ধরেন

www.nagorikpathagar.org

এভাবে, যখন তারা উপর ও নীচ হতে (অর্থাৎ চতুর্দিক হতে) তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। আর যখন ভয়ের কারণে চক্ষু পাথর হয়ে গেল, কলিজা উপড়িয়ে মুখে এসে গেল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা শুরু করছিলে, তখন মু'মিনদের যথেষ্ট রকম পরীক্ষা করা হল এবং সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হল (সূরা আহযাব : ১০-১১)। আল্লাহ আরও বলেন, আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা হল। ঐ সব ধারণা, যা ইচ্ছা বহির্ভূত। যেগুলো সংকটকালে মানব মনে উদয় হয়। যেমন ঃ মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য; বাঁচার আর কোন উপায় নেই; ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্য বাহক। মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যখন মুনাফিক ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তার রাসূল যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়। (সূরা আল আহযাব ঃ ১২)

মুনাফিকদের এ ধরনের আচরণ ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরির বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যতঃ বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের দুটো শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিকরা কিছু না বলেই পালাতে লাগল। আর অপর শ্রেণীর মুনাফিকরা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদের খালি বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। এ দু'দল মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, যখন তাদের এক দল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, তাই ফিরে চল। আর একদল নবীর নিকট এসে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তারা বলেছিল যে, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত খালি। অথচ সেগুলো খালি ছিল না। পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা (সূরা আল আহযাব-১৩)। যদি শত্রু পক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হতো; বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতো; তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করতো এবং তারা মোটেই বিলম্ব করতো না। অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। মনে রেখ আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (সূরা আল আহযাব : ১৪-১৫)। অর্থাৎ বিজয়ী কাফিররা যদি শহরে প্রবেশ করে ঐসব মুনাফিকদেরকে আহবান করে বলতো, আমাদের সাথে মিলে মুসলমানদের খতম করে দাও। তবে তারা কাফিরদের সাথে শামিল হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সে সুযোগ দেননি। মহান আল্লাহ যখন যেভাবে চান, তাই ঘটে- এটাই মহাসত্য।

www.nagorikpathagar.org

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অন্তরঙ্গ সাহাবাদের সাথে ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে পরিখা খনন করেছেন। দুনিয়ার রাজা বাদশাহ ও নেতানেত্রী আর হিদায়াতের পথে আহ্বানকারী নবী ও রাসূলদের মধ্যে এটাই পার্থক্য। ইসলামের পতাকাতলে সত্যের খেদমতের জন্য খলিফা, ইমাম, আমীর ও যে কোন নেতা একজন সাধারণ লোকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিম্ন হতে নিম্নতম কাজেও শরীক হতে পারে। দুনিয়াদারদের মধ্যে এরূপ বৈশিষ্ট্য মোটেই পাওয়া সম্ভব নয়। পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন হযরত সালমান ফার্সি (রা.)। পারস্য দেশে ঐরূপ রণকৌশল অনুসৃত হতো। প্রিয়নবী পরামর্শ গ্রহণ করে প্রমাণ করলেন যে, যুগের উন্নত ধরনের পার্থিব উপকরণ গ্রহণ করা ইসলাম বিরোধী নয়। বরং তা ইসলামের উৎকৃষ্ট খেদমতের শামিল। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তা যেন ইসলামের মূলনীতি ও বিধানাবলির পরিপন্থি না হয়। জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। বস্তুত এ ফরয কাজ আদায় করার কারণে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের জন্য নামাযের ন্যায় অতিগুরুত্বপূর্ণ ফরযও কাযা হয়েছিল। তাঁরা আহযাব যুদ্ধে আসর নামায মাগরিবের নামাযের সাথে কাযা পড়েছিলেন। যুদ্ধের বেলায় এমন পন্থা অবলম্বন করা বৈধ। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে শত্রু পক্ষকে ধোঁকা দেয়া জায়েয। শত্রুকে Deception বা ধোঁকা দেয়া যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বিবেচিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যুদ্ধের কৌশল হিসেবে Deception বা প্রতারণা যুদ্ধেরই অংশ। খন্দক যুদ্ধে নাঈম বিন মাসউদ কৌশল গ্রহণ করে কাফিরদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

বনু কুরাইযার যুদ্ধ (৫ম হিজরী, ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

আহযাব বা খন্দক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের ঘরে পৌঁছলেন। তখন যুহরের নামাযের সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে আল্লাহর হুকুম শুনালেন। এখনই হাতিয়ার কোষবদ্ধ করা ঠিক নয়। বনু কুরাইযার ব্যাপারটি এখনই চুকিয়ে নেয়া আবশ্যক। এ নির্দেশ পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনতিবিলম্বে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। যারাই অনুগত্যশীল আছ, তারা যেন বনু কুরাইযার অঞ্চলে না পৌঁছা পর্যন্ত আসরের নামায আদায় না করে। এ ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলীর (রা.) সাথে অগ্রবর্তী এক বাহিনী সে অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন দেখলেন ইহুদী লোকেরা ঘরের ছাদে উঠে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও

মুসলমানদেরকে নানা রকম গালাগাল করছে। হযরত আলীর (রা.) বাহিনী দেখে তারা মনে করছিল যে, তাদেরকে শুধু ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এটা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একটু পরে স্বয়ং রাসূলের নেতৃত্বে যখন সমগ্র মুসলিম বাহিনী সেখানে উপস্থিত হল এবং তাদের পুরো এলাকাকে পরিবেষ্টন করে নিল, তখন তাদের প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অবরোধের তীব্রতা ইহুদীরা দু'তিন সপ্তাহের অধিককাল সহ্য করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা এ শর্তে নিজেদেরকে রাসূলের হাতে অর্পণ করল যে, আউস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ বিন মু'য়ায (রা.) তাদের সম্পর্কে যে ফয়সালা দিবে তারা তা মেনে নিবে।

হযরত সা'দ (রা.) কে তারা শালিস মেনে ছিল এ আশায় যে, জাহেলিয়াত যুগে আওস ও বনু কুরাইযার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সেদিকে খেয়াল করে হয়ত তিনি কিছুটা উদারতা দেখাবেন। ইতোপূর্বে বনু কাইনুকা ও বনু নযীর গোত্রদ্বয় যেভাবে মদীনা হতে চলে গিয়েছিল; হয়ত অনুরূপভাবে তাদেরও চলে যেতে, তিনি ফয়সালা দিবেন। আওস গোত্রের লোকেরা হযরত সা'দ এর নিকট মিত্র গোত্রের প্রতি উদার নীতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু হযরত সা'দ নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, মদীনা হতে যে দু'টি গোত্র চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল; তারা চতুর্দিকের সমগ্র গোত্র-কবিলাকে উত্তেজিত করে দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী তৈরি করে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল। এরা সে অভিশপ্ত ইহুদী, যারা কঠিন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে মদীনাকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এসব কারণেই তিনি যুক্তিসঙ্গত ফয়সালা দিলেন। বনু কুরাইযার পুরুষদের হত্যা করার ফয়সালা দিলেন। নারী ও শিশুদেরকে দাস দাসী বানিয়ে নেয়ার এবং তাদের যাবতীয় ধন সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করার ফয়সালা দিলেন। আর এ ফয়সালাকে কার্যকর করার জন্য, মুসলমানরা যখন বনু কুরাইযার মূল ভূখে প্রবেশ করল। তখন ভয়ঙ্কর কিছু তথ্য উৎঘাটিত হল। বিগত পরিখা যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণের জন্য এ বিশ্বাসঘাতকরা ১৫শ তরবারী, তিনশ বর্ম, দু'হাজার বল্লম এবং ১৫শ ঢাল সংগ্রহ করেছিল। আল্লাহ যদি মুসলমানদের সহায়তা না করতেন, আর মুশরিকরা যদি চূড়ান্তভাবে পরিখা অতিক্রম করত, ঠিক সে মুহূর্তে বনু কুরাইযা পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণ করার জন্য এসব অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করত। এজন্যে আল্লাহপাক বলেন, যদি শত্রু পক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত; তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না (সূরা আহযাব-১৪)। বনু কুরাইযার ক্ষেত্রে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.nagorikpathagar.org

নিজে বিচার করেননি। ইহুদীদের মনোনীত ব্যক্তির হাতে তাদের বিচার ভার অর্পণ করেছিলেন। এতখানি অধিকার নিশ্চয়ই কোন অপরাধীকে কোথাও দেয়া হয়নি। সা'দ (রা.) যদি ইহুদীদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিতেন, তবু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নির্বিবাদে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিতেন। ফলে এ সম্বন্ধে তাদের পক্ষ হতে কোন কিছুই আর বলার ছিল না। আল্লাহ বলেন, কিতাবীদের মধ্য হতে যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি ওদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং ওদের অন্তরে ভীতি প্রবেশ করালেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করেছ এবং একদলকে বন্দী করেছ। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘরবাড়ির, ধন সম্পত্তির এবং এমন এক ভূখণ্ডের মালিক করে দিলেন যেখানে তোমরা অভিযান করনি। (সূরা আহযাব : ২৬-২৭)

হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬ষ্ঠ হিজরী, ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ)

মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনী ও বনু কুরাইযার পরাজয়ের পর মুসলমানরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সমর্থ হন। তাদের মধ্যে তখন পবিত্র কা'বা যিয়ারত ও নিজেদের মাতৃভূমিকে এক নজর দেখার জন্য অদম্য ইচ্ছা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতোমধ্যে একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর তাঁর স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন কাবাঘর যিয়ারত করছেন। মক্কায় সাহাবাদেরকে নিয়ে ওমরা আদায় করছেন। নবীর স্বপ্ন এক প্রকার ওহী। ফলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কথা শুনার পর মুসলমানদের অন্তরে আগ্রহ আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। অবশেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসের প্রথম দিকে ১৪শ সাহাবীর কাফেলা নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। সাথে নেন কুরবানীর পশু। সাহাবীদের কাছে ছিল একটি করে তরবারী ও ইহরামের কাপড়। যুল হুলাইফাতে পৌঁছে সবাই ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। কুরবানীর জন্য ৭০টি উট নির্ধারিত ছিল। এসব উটের গলায় মুসলমানরা কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কিলাদা লটকিয়ে দেন।

অথচ মক্কার কাফিররা মুসলমানদের এ নেক নিয়তকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের ধারণা হয়, এ ছলনায় হয়ত মুসলমানরা মক্কা শরীফ দখল করতে চাচ্ছে। তাই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরামা বিন আবু জাহেলের নেতৃত্বে বিরাট এক সৈন্য দল প্রেরণ করে কাফিররা। তারা মুসলমানদের পথ রোধ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ

www.nagorikpathagar.org

খবর পেয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে 'হুদাইবিয়ায়' এসে উপনীত হন। বিশ্বনবী সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করার জন্য হযরত ওসমান (রা.) কে মক্কায় প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে কাফিররা, মুসলিম শিবিরে, আকস্মিকভাবে কয়েকটি হামলা চালিয়ে সাহাবীদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রিয়নবী বার বার ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তাদের সে অপকৌশল ব্যর্থ করে দেন।

অপরদিকে হযরত ওসমান (রা.) মক্কায় গিয়ে কাফিরদের ব্যাখ্যা করেন যে, মুসলমানরা রক্ত পাত করার জন্য মক্কায় আসছে না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, কা'বা শরীফ যিয়ারত করা। কিন্তু কুরাইশরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ওসমানকে (রা.) আটক করে। এদিকে মুসলিম শিবিরে রটে যায় যে, হযরত ওসমানকে শহীদ করা হয়েছে। তাঁর ফিরে না আসায় মুসলমানরাও নিশ্চিত হয়ে যায়, খবরটা সত্য। মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। এসময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে বসে সাহাবীদের থেকে এ মর্মে বাইআত গ্রহণ করেন যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে প্রস্তুত। তারা এখান থেকে আমৃত্যু পিছু হটবে না। অবস্থার নাজুকতা বিচারে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এটা কোন মামলি বাইআত ছিল না। সাহাবীরা সংখ্যায় মাত্র ১৪শ। নিজ নিজ তরবারী (যা বহন করা বৈধ ছিল) ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ সরঞ্জাম তাদের সাথে ছিল না। তারা সেদিন নিজেদের এলাকা থেকে আড়াইশ মাইল দূরে একেবারে মক্কার সীমান্তে উপনীত ছিল। যেখানে শত্রুপক্ষ পূর্ণশক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে সামর্থ্য ছিল। এসব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কাফেলার সবাই নবীর হাতে হাত রেখে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত ছিল। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার; এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এটাই ইসলামের ইতিহাসে 'বাইআতে রিদওয়ান' নামে খ্যাত। বস্তুত মহান আল্লাহ মুসলমানদের এ দীপ্ত চেতনা ও শহীদী প্রেরণায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি গাছের নীচে আপনার হাতে বাইয়াত করছিল। (সূরা ফাতাহ-১৮)

মুসলমানদের এ সংবাদ ক্রমে ক্রমে মক্কায় পৌঁছে গেল। এতে মক্কার মুশরিকরা ভীত ও আতংকিত হয়ে গেল। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের নিকট খবর পৌঁছাল যে, ওসমানকে হত্যা করার সংবাদ মিথ্যা। এরপরই হযরত ওসমান ফিরে আসেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা করার জন্য কিছু প্রস্তাব নিয়ে সুহাইল বিন আমরের নেতৃত্বে কাফিরদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। কুরাইশরা তাদের জিদ এবং একগুয়েমি পরিত্যাগ করে। তবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য

www.nagorikpathagar.org

পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং বলতে থাকে; বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এ বছর ফিরে যান। তাহলে আগামী বছর তিনি ওমরার জন্য আসতে পারেন। এরপর দীর্ঘ আলোচনার পর কিছু শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি পত্র লেখা হয়। শর্তগুলো ছিল এরূপ ঃ (১) দশ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন তৎপরতা চালাবে না। (২) কুরাইশদের থেকে যারা মুসলমানদের দলভুক্ত হতে চায় তাদেরকে অবশ্যই কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কুরাইশদের দলভুক্ত হলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। (৩) এ বছর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দল বল নিয়ে ওমরা না করে ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর ওমরার জন্য এসে মাত্র তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সে সময় মক্কাবাসীরা মুসলমানদের জন্য স্থান খালি করে দিবেন। তাদের সঙ্গে তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র থাকতে পারবে না। (৪) যে কোন আরব গোত্র যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তাদের সে অধিকার থাকবে।

এসব শর্তে যখন সন্ধি চুক্তিটি চূড়ান্ত হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের পুরো বাহিনী অত্যন্ত বিচলিত ও অপমান বোধ করছিল। যে মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব শর্ত মেনে নিচ্ছিলেন, তা কেহই বুঝে উঠতে পারে নি। এ সন্ধির ফলে যে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হতে যাচ্ছিল, তা দেখতে পাওয়ার মত দূর দৃষ্টি, সে মুহূর্তে সাহাবীদের ছিল না। এমনকি হযরত ওমরের (রা.) মত গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীজনের অবস্থাও ছিল নাজুক। তিনি বিচলিত হয়ে হযরত আবু বকরের নিকট গিয়ে বললেন, তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? এসব লোক কি মুশরিক নয়? এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নেব কেন? এমন কি ওমর (রা.) স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকেও অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন।

চুক্তির দু'টি শর্ত (২নং ও ৩নং) মুসলমানদের জন্য বাহ্যিকভাবে নেহাত অবমাননাকর ছিল বৈকি। সন্ধির ঘটনাটি জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মত হয়েছিল। যখন সন্ধি চুক্তিটি লিপিবদ্ধ হচ্ছিল, ঠিক তখন সুহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জানদাল কোন প্রকারে পালিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিবিরে গিয়ে হাজির হন। তখন তিনি পায়ে শিকল পরানো অবস্থায় ছিলেন। আর দেহে ছিল নির্যাতনের চিহ্ন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

www.nagorikpathagar.org

সরাসরি আবেদন জানান। আমাকে এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন। এ করুণ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুশরিক প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমর বলে, চুক্তি পত্র লেখা শেষ না হলেও চুক্তির শর্তাবলী স্থির হয়ে গেছে। তাই এ ছেলেকে আমার হাতে অর্পণ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জানদালকে যালিমের হাতে তুলে দিলেন। সন্ধি চুক্তি শেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন, তোমরা এখানে কুরবানী করে মাথা মুড়িয়ে এহরাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু কেউই জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। এভাবে তিনি তিনবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবারা বিমূঢ় রইলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিচ্ছেন, আর তা পালনের জন্য সাহাবারা তৎপর হচ্ছেন না; এমন ঘটনা এ একটি ক্ষেত্র ছাড়া বিশ্বনবীর পুরো নবুওয়াতী জীবনে আর কখনো ঘটেনি। এতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দুঃখ পান। তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে তা প্রকাশ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন বলেন, আপনি চুপ চাপ গিয়ে নিজের উট কুরবানী করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুড়ান। তাহলে সবাই আপনাকে দেখে অনুসরণ করবে। আশ্চর্যজনকভাবে হলও তাই। সাধ্যানুযায়ী সবাই কুরবানী করে এবং মাথা মুড়িয়ে এহরাম থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু দুঃখ ও মর্ম যাতনায় তাদের হৃদয় চৌচির হয়ে রইল। সাহাবীরা কোনভাবেই নিজেদেরকে বুঝ দিতে পারলেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই চুপ করে রইল। এই ছিল ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি।

এরপর কাফেলা যখন হুদাইবিয়া ত্যাগ করে মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিল তখন 'দাজনান' বা 'কুরাউল গাসীম' নামক স্থানে এ চুক্তিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে সূরা ফাতাহের আয়াত নাযিল হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে একত্রিত করে বলেন, আজ আমার উপর এমন জিনিস নাযিল হয়েছে, যা আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চেয়েও বেশি মূল্যবান। তারপর তিনি সূরা ফাতাহ পাঠ করেন। বিশেষ করে হযরত ওমরকে ডেকে তা শুনান। এখানে আল্লাহপাকের সরাসরি ঘোষণা ছিল, হে নবী! আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সব ক্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দেন (সূরা ফাতাহ : ১-২)। এ আয়াত শুনে হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ সে মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, এটা অবশ্যই বিজয়। তিনি আরো বলেন তোমরা একেবারে মুশরিকদের বাড়ির দরজায়

গিয়ে হাজির হয়েছিলে। তারা আগামী বছর ওমরা করতে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাদেরকে ফিরে যেতে সুযোগ করে দিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সন্ধি করার জন্য তারা নিজেরাই ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের মনে তোমাদের প্রতি যে শত্রুতা রয়েছে তা অজানা নয়। সে দিনের কথা ভুলে গেলে, যে দিন আহযাব যুদ্ধে শত্রুরা সব দিক থেকে চড়াও হয়েছিল এবং তোমাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল? (বায়হাকী)

হুদাইবিয়ার সন্ধি যে প্রকৃতই বিজয় ছিল, তা কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেয়ে যায়। সব শ্রেণীর মানুষ পুরাপুরি বুঝতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকেই ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছে। মূলতঃ সন্ধির শর্ত মোতাবেক দশ বছরের শান্তি প্রতিষ্ঠার কারণে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। ব্যাপকভাবে দাওয়াতের কাজ চলে। সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে মুসলমানদের সংখ্যা দশগুণ বেড়ে যায়। আর মক্কা বিজয়ের সূচনাও হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আরো বলেন, হে নবী! যারা আপনার হাতে বাইয়াত করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করেছিল। তাদের হাতের উপর ছিল আল্লাহর হাত। যে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে, অশুভ পরিণাম তার নিজের উপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন (সূরা ফাতাহ-১০)। অর্থাৎ সে সময় লোকেরা যে হাতে বাইয়াত করছিল, তা ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ছিল না। আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সাথে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহপাক বলেন, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইয়াত করছিল। তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন। পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করবেন এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ দান করবেন– যা তারা অচিরেই লাভ করবে (সূরা ফাতাহ-১৮ ও ১৯)। যে গাছটির নিচে বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পরবর্তীতে লোকজন এসে সে গাছের নিচে নামায পড়তে শুরু করেছিল, বিষয়টি জানতে পেরে হযরত ওমর (রা.) লোকদের তিরস্কার করেন এবং গাছটি কেটে ফেলেন।

আল্লাহর এ পুরস্কারটি কেবল বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ কারণে ৭ম হিজরীতে মুসলমানরা যখন খায়বার আক্রমণের জন্য যাত্রা করেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তাদেরকেই সাথে নিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। হুদাইবিয়ার

ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে (হুদাইবিয়ার) এ বিজয় দিয়েছেন যে, তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের হাত উত্তোলনকে থামিয়ে দিয়েছেন, যাতে মু'মিনদের জন্য তা একটি নিদর্শন হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দান করেন (সূরা ফাতাহ-২০)। আল্লাহপাক সেদিন কাফির কুরাইশদের এতটা সাহস দেননি যে, হুদাইবিয়াতে তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে বসতে পারে। অথচ সব কিছুই তাদের অনুকূলে ছিল। আর মুসলমানরা ছিল প্রতিকূল অবস্থায় এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল। এ অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদেরকে সহজভাবে বিজয় দান করেছেন। তাই আল্লাহ বলেন, এ মুহূর্তে যদি কাফিররা তোমাদের সাথে লড়াই বাঁধিয়ে বসতো, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত এবং কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী পেত না (সূরা ফাতাহ-২২)। এছাড়া আল্লাহ তোমাদেরকে আরও গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা এখনো লাভ করতে পারনি। কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (সূরা ফাতাহ ঃ ২১)। এখানে আল্লাহপাক মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন। অর্থাৎ মক্কা এখনো তোমাদের করায়ত্ব হয়নি। তবে মক্কাকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং হুদাইবিয়ার বিজয়ের ফলশ্রুতিতে তাও তোমাদের করায়ত্ত হবে। এরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, তিনি সে সত্তা যিনি মক্কা ভূমিতে তাদের হাত তোমাদের থেকে; আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য দান করার পর (সূরা ফাতাহ ঃ ২৪)। অতঃপর রাসূলের ওমরা করার স্বপ্ন যে সত্য ছিল; সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহান প্রতিপালক বলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন যা ছিল সরাসরি হক। ইনশাআল্লাহ তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। নিজের মাথা মু ন করবে, চুল কাটবে এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না, তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন (সূরা ফাতাহ ঃ ২৭)। অর্থাৎ পরের বছর ৭ম হিজরীর যিলকাদ মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়। ইতিহাসে এ ওমরাকে ওমরাতুল কাযা বলা হয়। ইসলামের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে, কাফির ও মুশরিকদের সাথে এমন সন্ধি স্থাপনে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরাজয় বরণ মনে হলেও; সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, পরিণামে তা মুসলমানদের জন্য স্পষ্ট বিজয়ের কারণ হয়েছে। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অনেক সময় আমাদের বাহ্যিকভাবে কোন কিছুকে, হীনতা ও অপমানকর বলে মনে হলেও, পরবর্তীতে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উত্তম ও সম্মানের হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় তার বিপরীতও হয়ে থাকে। তাই মুসলমানদের কর্তব্য হল, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশকে উত্তম আদর্শরূপে মেনে নেয়া এবং সেভাবেই অনুকরণ ও অনুসরণ করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, অনেক সময় কোন কিছুকে তোমরা অপছন্দ কর, অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। আবার অনেক সময় কোনকিছুকে ভাল মনে কর, অথচ তোমাদের জন্য তা খারাপ (আল কুরআন)। ইসলাম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে এবং তা দুনিয়াতে সম্মান দিতে পারে না। আর পরকালেও মঙ্গল বয়ে আনে না। কুরআনের নির্দেশ হল, অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকারের জন্য প্রশ্ন করা হবে (সূরা বনী ইসরাঈল)। যারা সংখ্যায় স্বল্পতা সত্ত্বেও, ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ও সত্যের বিশ্বাসী হয়ে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তারা ইহ ও পরকাল-উভয় জগতে সফলকাম হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সুফল নষ্ট করেন না। ইসলাম শান্তি র ধর্ম। তার প্রমাণ হুদাইবিয়ার সন্ধির মধ্যে পাওয়া যায়। মুসলিম জাতি নিজেদের আখলাক, আমল, কার্যকলাপ এবং কথা বার্তায় সমকালীন সমস্ত জাতি ও ধর্মালম্বীদের চেয়ে অধিক উন্নত। এ ব্যাপারটি হুদায়বিহার সন্ধির মাধ্যমে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছ।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিশ্বময় দাওয়াত ও তাবলীগের বিকাশ

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে নতুন পরিবর্তনের সূচনা। ইসলামের প্রতি শত্রুতায় কুরাইশরা সবচেয়ে মজবুত, হঠকারী এবং যুদ্ধাংদেহী ছিল। যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদের শান্তির দিকে আসার ফলে খন্দক যুদ্ধের সময়কালের কুরাইশ, গাতফান এবং ইহুদী এ তিন বাহুর সবচেয়ে শক্তিশালী বাহু ভেঙ্গে যায়। কুরাইশ ছিল সমগ্র জাযিরাতুল আরবে মূর্তিপূজার একচছত্র প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষক। তাদের যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে সরে যেতেই মূর্তিপূজারীদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে যায়। তাদের শত্রুতামূলক আচরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই দেখা যায়, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর গাতফান গোত্রের পক্ষ থেকে তেমন কোন শত্রুতামূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়নি। তারা যা কিছু করেছে ইহুদীদের উসকানিতেই করেছে। হুদাইবিয়ার পর থেকেই দাওয়াত ও তাবলীগের বিকাশ দ্রুততর হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ইহুদীরা মদীনা থেকে বহিষ্কারের পর খায়বারকেই নিজেদের ষড়যন্ত ও চক্রান্তের আখড়া হিসেবে গড়ে তোলে। মদীনায় পূর্ব হতেই ইহুদীরা ফেতনার আগুন জ্বালানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা মদীনার আশেপাশে বসবাসরত বেদুঈনদের উস্কানি দিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও মুসলমানদের ধ্বংস করে দেয়া অথবা বড় ধরনের কোন ক্ষতি করার চক্রান্ত করত। এসব কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সর্বপ্রথম ইহুদীদের দুষ্কৃতির আখড়া সমূলে উৎপাটনে মনোযোগী হন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর শান্তির যে নবযুগ শুরু হয়েছিল, এতে মুসলমানরা ইসলামের দাওয়াত, প্রচার, প্রসার এবং দ্বীনের তাবলীগ করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাই এ সময় দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে মুসলমানদের তৎপরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এমনকি তাদের তাবলীগী তৎপরতা যুদ্ধ তৎপরতাকে ছাড়িয়ে যায়। সে সময়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যুদ্ধ তৎপরতার আগে দাওয়াত ও তাবলীগের তৎপরতার উপর আলোকপাত করাই সমীচীন। কেননা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত এবং ইসলামের প্রকৃত কাজও তাই। উল্লেখ্য দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের প্রচার প্রসারের জন্যেই মুসলমানরা এত বেশী বিপদ, মুসিবত, অশান্তি, যুদ্ধ, হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সহ্য করেছিলেন।

বাদশাহ এবং আমীরদের নামে চিঠি প্রেরণ শুরু হয় হুদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকেই। এটাই বৃহত্তর দাওয়াত ও তাবলীগ। ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরের নামে চিঠি প্রেরণ করে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব চিঠি প্রেরণের উদ্দেশ্যে চিঠিতে সীলমোহর দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি একটি রুপার আংটি তৈরী করান এতে মুহাম্মদ, রাসূল ও আল্লাহ; এ শব্দ তিনটি খোদাই করা হয়। আল্লাহ ১ম, রাসূল ২য় এবং মুহাম্মদ, ৩য় লাইনে খোদাই করে লিখেন (বুখারী)। চিঠি লেখানোর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহাবীদের কয়েকজনকে চিঠিসহ বিভিন্ন দেশের বাদশাহর কাছে প্রেরণ করেন। আল্লামা সোলায়মান মনসুরপুরী বর্ণনা করেন, খায়বার রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগে সপ্তম হিজরীর ১লা মহররম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল দূত প্রেরণ করেন। (রাহমাতুললিল আ'লামীন)। নীচে এসব চিঠির বক্তব্য, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিল আসহামা ইবনে আবজার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর নামে লিখিত চিঠি আমর ইবনে উমাইয়া যামরীর হাতে ষষ্ঠ হিজরীর শেষে বা সপ্তম হিজরীর শুরুতে প্রেরণ করেন। আল্লামা তাবারী এ চিঠির বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা তাবারীর উল্লিখিত চিঠির বক্তব্য ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, এটা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর লেখা চিঠি নয়। বরং বিশ্বনবীর মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের হাতে নাজ্জাশীকে দেয়ার জন্যে যে চিঠি দিয়েছিলেন, এটা সে চিঠি। কেননা চিঠির শেষে মুহাজিরদের প্রসঙ্গ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; আমি আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফরকে মুসলমানদের একটি জামাতের সাথে পাঠিয়েছি। তারা আপনার কাছে পৌছলে তাদের আপনার তত্ত্বাবধানে রাখবেন এবং কোন প্রকার জবরদস্তি করবেন না।

ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অন্য আরেকটি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠিতে বলা হয়েছে ঃ 'এ চিঠি নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ্ আসহামার নামে। যিনি হিদায়াতের অনুসরণ এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তার উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই, তাঁর স্ত্রী পুত্র কিছু নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। কেননা আমি আল্লাহর রাসূল। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আস, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করব না। যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাকে বলে দাও, সাক্ষী থাক, আমি মুসলমান। যদি আপনি এ দাওয়াত গ্রহণ না করেন, তবে আপনার উপর আপনার কওমের নাসারাদের সমুদয় পাপ বর্তাবে।

ডক্টর মোঃ হামিদুল্লাহ তার গবেষণায় আরেকটি চিঠির বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। নিকট অতীতে যার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ চিঠিটি একটি শব্দের পার্থক্যসহ

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা ইবনে কাইয়েম সংকলিত যাদুল মায়াদ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ এ চিঠির বক্তব্যের সত্যতা নিরূপণে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বর্ণিত চিঠিতে লেখা আছে ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতি। সালাম সে ব্যক্তির উপর যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। আমি আপনার কাছে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। যিনি কুদ্দুস, যিনি সালাম, যিনি নিরাপত্তা ও শান্তি দেন, যিনি হেফাযতকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর রূহ এবং তাঁর কালিমা। আল্লাহ তা'আলা তা পূত পবিত্র সতী মারইয়ামের উপর স্থাপন করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত রূহ মোবারক ফুঁৎকারের কারণে হযরত মারইয়াম (আ.) গর্ভবতী হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদমকে (আ.) নিজের কুদরতি হাতে তৈরী করেছিলেন। আমি এক অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি পরস্পরকে সাহায্যের দাওয়াত দিচ্ছি। এছাড়া একথার প্রতিও দাওয়াত দিচ্ছি যে, আপনি আমার আনুগত্য করুন এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। কেননা আমি আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে এবং আপনার সেনাদলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তাবলীগ ও নসীহত করছি। কাজেই আমার তাবলীগ ও নসীহত কবুল করুন। (পরিশেষে) সালাম সে ব্যক্তির উপর, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন। (যাদুল মায়াদ, তৃতীয় খণ্ড)

আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রা.) আল্লাহর রাসূলের চিঠি নাজ্জাশীর হাতে সমর্পণ করলে বাদশা সে চিঠি চোখে লাগান এবং সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। এরপর তিনি হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের (রা.) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত চিঠির জবাবে নাজ্জাশী একখানি চিঠি মদীনায় প্রেরণ করেন। সে চিঠিতে লেখা ছিল ঃ পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নামে, নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ থেকে। হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম, তাঁর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছেছে। এ চিঠিতে আপনি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আসমান যমীনের মালিক আল্লাহর শপথ, আপনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন হযরত ঈসা (আ.) এর চেয়ে বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি সেরূপই

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন আপনি যেরূপ উল্লেখ করেছেন। আপনি আমার কাছে যা কিছু লিখে পাঠিয়েছেন, আমি তা জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাই ও আপনার সাহাবীদের মেহমানদারী করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর সত্য ও খাঁটি রাসূল। আমি আপনার কাছে বায়াত করছি, আপনার চাচাতো ভাইয়ের হাতে বায়াত করেছি এবং তার হাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে ইসলাম কবুল করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর কাছে একথাও দাবী করেছেন, তিনি যেন হযরত জাফর এবং হাবশায় অবস্থানরত অন্যান্য মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন। সে অনুযায়ী নাজ্জাশী হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরীর সাথে দুই কিশতিতে বা নৌকায় সাহাবীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এক নৌকাতে হযরত জাফর, হযরত আবু মূসা আশয়ারী এবং অন্য কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খায়বারে পৌঁছেন। এরপর সেখান থেকে মদীনায় হাযির হন। অন্য এক নৌকার অধিকাংশই ছিলেন শিশু-কিশোর। তারা হাবশা থেকে সরাসরি মদীনায় পৌঁছেন। বাদাশা নাজ্জাশী তবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আল্লাহর রাসূল তার ইন্তিকালের দিনেই এ সংবাদ সাহাবীদের জানান এবং গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে নাজ্জাশীর স্থলাভিষিক্ত বাদশার কাছেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিনা, তা জানা যায়নি।

মিসরের বাদশাহ মোকাওকিসের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরায়য ইবনে মাত্তা'র কাছে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। জোরায়যের উপাধি ছিল মোকাওকিস। চিঠির বিবরণে এসেছে ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মোকাওকিস আযম কিবতের নামে। তার প্রতি সালাম যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দু'টি পুরস্কার দিবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে কিবতীরা, 'এমন একটি বিষয়ের প্রতি এস, যা আমাদের এবং তোমাদের জন্যে সমান। আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করব না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আমাদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কেউ যেন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে না মানে। যদি কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা.) কে মনোনীত করা হয়। তিনি মোকাওকিসের দরবারে পৌঁছার পর বলেন, 'এ যমীনে আপনার আগেও একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যে নিজেকে রব্বে আ'লা মনে করত। আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত করেছেন। প্রথমে তার দ্বারা অন্য লোকদের উপর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। এরপর তাকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। কাজেই অন্যের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এমন যেন না হয়, অন্যরা আপনারা ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবে।

মোকাওকিস জবাবে বলেন, আমাদের একটা দ্বীন রয়েছে, যা আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন পাওয়া না যায়। জবাবে হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। এ দ্বীনকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সকল দ্বীনের পরিবর্তে যথেষ্ট মনে করেছেন। এ চিঠির প্রেরক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর কুরাইশরা তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর প্রমাণিত হয়। ইহুদীরা সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করে। আর নাসারারা ছিল অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহর শপথ, হযরত মূসা (আ.) যেমন হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা আপনাকে কুরআনের দাওয়াত দিচ্ছি। যেমন আপনারা তাওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জীলের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যে নবী যে কওমকে পেয়ে যান, সে কওম সে নবীর উম্মত হয়ে যায়। এরপর সে নবীর আনুগত্য করা উক্ত কওমের জন্যে অত্যাবশ্যক। আপনারা নবাগত নবীর জামানা পেয়েছেন, কাজেই তাঁর আনুগত্য করুন। আপনাকে আমরা দ্বীনে মসীহ থেকে ফিরে আসতে বলছি না। বরং আমরা মূলত সে দ্বীনের দাওয়াতই দিচ্ছি।

মোকাওকিস বলেন, সে নবী সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, তিনি কোনো অপছন্দীয় কাজের আদেশ দেন না এবং পছন্দনীয় কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন না। তিনি পথভ্রষ্ট যাদুকর নন, মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীও নন। বরং আমি দেখেছি, তাঁর সাথে নবুয়তের এ নিশানা রয়েছে, তিনি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন এবং অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে খবর দেন। আমি তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনা করব। মোকাওকিস আল্লাহর রসূলের চিঠি নিয়ে হাতীর দাঁতের একটি কৌটায় রাখেন। এরপর মুখ বন্ধ করে সীল লাগিয়ে তার

www.nagorikpathagar.org

এক দাসীর হাতে দেন। এরপর আরবী ভাষায় এক লিপিকারকে ডেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর কাছে নিম্নোক্ত চিঠি লেখান।

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নামে মোকাওকিস আযিম কিবত এর পক্ষ থেকে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার চিঠি পাঠ করেছি এবং চিঠির বক্তব্য ও দাওয়াত আমি বুঝেছি। জানি, এখনো একজন নবী আসার বাকি রয়েছে। আমি ধারণা করেছিলাম, তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। আপনার খেদমতে দুই জন দাসী পাঠাচ্ছি। কিবতীদের মধ্যে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্যে কিছু পোশাক এবং সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চরও হাদিয়া পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম।

মোকাওকিস আর কোন কথা লিখেননি। তিনি ইসলামও গ্রহণ করেননি। তার প্রেরিত দাসীদের নাম ছিল মারিয়া কিবতিয়া এবং সিরীন। খচ্চরটির নাম ছিল দুলদুল। এটি হযরত মোয়াবিয়া (রা.) এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারিয়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন ও বিয়ে করেছিলেন। মারিয়ার গর্ভ থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন এবং শিশুকালেই মৃত্যুবরণ করেন। সিরীনকে কবি হাসসান ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে সমর্পণ করা হয়।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য সম্রাট কেসরার কাছেও একখানি চিঠি প্রেরণ করেন। সেখানে লিখেন ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কেসরার নামে। সালাম সে ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, স্থাপন করেন; এবং সাক্ষ্য দেন, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ' তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। যারা বেঁচে আছে তাদের পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফিরদের উপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। যদি এতে অস্বীকৃতি জানান, তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। এ চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রা.) কে

www.nagorikpathagar.org

মনোনীত করা হয়। তিনি চিঠিখানি বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা দূতের মাধ্যমে নাকি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফার মাধ্যমে এ চিঠি সম্রাটের কাছে পৌছান। জানা যায় চিঠিখানি কেসরার সম্রাট পারভেজকে পড়ে শোনানোর পর' সে তা ছিঁড়ে ফেলে অহংকারের সাথে বলে, আমার প্রজাদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রজা নিজের নাম আমার নামের আগে লিখেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার বাদশাহী ছিন্নভিন্ন করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত কথাই হুবহু বাস্তবে পরিণত হয়।

পারস্য সম্রাট ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে লিখে পাঠিয়েছিল; তোমার কাছ থেকে তাগড়া দু'জন লোককে পাঠাও, তারা যেন হেজাযে গিয়ে সে লোককে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। বাযান, পারস্য সম্রাটের নির্দেশ পালনের জন্যে দু'জন লোককে তার চিঠিসহ আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রেরণ করে। সে চিঠিতে প্রেরিত লোকদ্বয়ের সাথে কেসরার কাছে হাযির হওয়ার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়। বিশ্বনবীর কাছে উভয় আগন্তুক গিয়ে হুমকিপূর্ণ কিছু কথা বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তভাবে তাদের বলেন, তোমরা আগামীকাল দেখা করো।

এদিকে মদীনায় যখন এ ঘটনা চলছে, ঠিক তখন পারস্যে খসরু পারভেজের পারিবারিক বিদ্রোহ কলহ তীব্র রূপ ধারণ করে। কায়সারের সৈন্যদের হাতে পারস্যের সৈন্যরা একের পর এক পরাজয় স্বীকার করছিল। এমতাবস্থায় পারস্য সম্রাট কেসরার পুত্র শেরওয়াহ পিতাকে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। ঘটনা ছিল মঙ্গলবার রাত, সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়ে যান। পরদিন সকালে পারস্য সম্রাটের আগন্তুক প্রতিনিধিদ্বয় আল্লাহর রাসূলের দরবারে এলে তিনি তাদের এ খবর জানান। তারা বলেন, আপনি এসব আবোল-তাবোল কি বলছেন? এর চেয়ে মামুলী কথাও আমরা আপনার অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছি। আমরা কি আপনার এ কথা বাদশার কাছে লিখে পাঠাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, লিখে দাও। সাথে সাথে একথাও লিখে দাও, আমার দ্বীন এবং আমার হুকুমত সেখানেও পৌছবে, যেখানে তোমাদের বাদশাহ পৌছেছে। শুধু তাই নয়; বরং এমন জায়গায় গিয়ে থামবে, যার আগে উট বা ঘোড়া যেতে পারে না। তোমরা তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো, যদি তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, তবে যা কিছু তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেসব আমি তোমাদের দিয়ে দেবো

www.nagorikpathagar.org

এবং তোমাদের কওমের পছন্দের কাউকে বাদশাহ করে দেব। উভয় দূত এরপর মদীনা থেকে ইয়েমেনে বাযানের কাছে গিয়ে তাকে সব কথা জানায়। এরপরই ইয়েমেনে এক চিঠি এসে পৌঁছায়, শেরওয়াহ তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। নতুন সম্রাট তার চিঠিতে ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে এ নির্দেশও দিয়ে ছিলেন, আমার পিতা যার সম্পর্কে অহংকারপূর্ণ কথা লিখেছেন, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিরক্ত করবেন না। এ ঘটনায় বাযান এবং তার পারস্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা সে সময় ইয়েমেনে উপস্থিত ছিল, সকলেই মুসলমান হয়ে যায়।

রোম সম্রাট কায়সারের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে এ চিঠির বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিতে লেখা ছিল ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সালাম সে ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে শান্তিতে থাকবেন এবং দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আস, যা আমাদের ও তোমাদের জন্যে একই সমান। সেটি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা ও আনুগত্য করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে এবং অন্য কিছুকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না, যদি লোকেরা অমান্য করে তবে তাদের বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দেহইয়া ইবনে খলীফা কালবী (রা.) কে মনোনীত করেন। তাকে বলা হয়, তিনি যেন এ চিঠি বসরার শাসনকর্তার হাতে দেন। বসরার শাসনকর্তা এটা সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পৌঁছে দিবেন। এরপর যা কিছু হয়েছে, তার বিবরণ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কুরাইশদের একদল লোকের সাথে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী এ কাফেলা ব্যবসার মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিল। সম্রাট (হিরাক্লিয়াস) এর আহ্বানে কাফেলার লোকজন ইলিয়ায় (বায়তুল মোকাদ্দাসে)

www.nagorikpathagar.org

তার দরবারে হাযির হয়। সম্রাট তাদের কাছে বসান। সে সময় তার আশেপাশে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মক্কার বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে সমনে রেখে তার দোভাষীকে তলব করেন। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেন, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন তার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন বাদশাহকে বলি, আমিই বংশগত দিক থেকে তার অধিক নিকটবর্তী। হিরাক্লিয়াস তখন বলেন, তুমি আমার কাছাকাছি এসো। তিনি বলেন, এর সঙ্গীদের পিছনে বসাও। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলেন, এ লোকটিকে আমি সে নবীর দাবীদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। যদি সে কোন কথার জবাবে মিথ্যা বলে, তবে তার সঙ্গীদের বলে দাও, তারা যেন সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি মিথ্যা বলার দুর্নাম হওয়ার ভয় না থাকত, তবে আমি তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। হিরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ানের দোভাষীর উপস্থিতিতে বিশদ আলোচনা হয়। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলেন, এ লোকটিকে বল, আমি যখন নবুওয়াতের দাবীদারের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন সে বলেছে, তিনি উচ্চ বংশ ও মর্যাদাসম্পন্ন। নিয়ম হচ্ছে, নবী রাসূলগণ উচ্চ বংশ ও মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ এ ধরনের কথা বলেছিল কিনা। সে বলেছে, বলেনি। যদি সে অন্য কারো বলা কথারই পুনরাবৃত্তি করত, তবে আমি বলতাম, এ লোকটি অন্যের বলা কথারই প্রতিধ্বনি করছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? সে বলেছে না, ছিল না। যদি তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত, তবে আমি বলতাম, এ লোক বাপ-দাদার বাদশাহী লাভের আকাঙ্ক্ষা করছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি যা বলেছেন এর আগে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলে কিনা? সে বলেছে, না। কাজেই মানুষের ব্যাপারে যিনি মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলবেন, এটা হতেই পারে না। আমি একথাও জিজ্ঞেস করেছি, বড়লোকেরা তার আনুগত্য করছে, নাকি দুর্বল লোকেরা? সে বলেছে দুর্বল লোকেরা। প্রকৃতপক্ষে দুর্বল লোকেরাই নবী রাসূলের আনুগত্য করে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার দ্বীন গ্রহণের পর কেউ মোরতাদ (বেদ্বীন) হয়েছে কিনা? সে বলেছে, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের সজীবতা অন্তরে প্রবেশের পর এরকমই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি চুক্তি

www.nagorikpathagar.org

অংগীকার ভংগ করেন কিনা? সে বলেছে, না। প্রকৃতপক্ষে নবী রাসূল এরকমই হয়ে থাকেন। তারা চুক্তি অংগীকার ভংগ করেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি কি কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন? সে বলেছে, তিনি আমাদের আল্লাহর ইবাদাতের, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আদেশ করেন, মূর্তিপূজা নিষেধ করেন এবং নামায, সত্যবাদিতা, পরহেযগারী, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার আদেশ দেন। সে যা কিছু বলেছে, যদি এসব সত্য হয়ে থাকে, তবে তিনি খুব শীঘ্রই আমার দুই পায়ের নীচের জায়গারও মালিক হয়ে যাবেন। আমি জানতাম, এ নবী আসবেন, কিন্তু আমার ধারণা ছিল না, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। আমি যদি নিশ্চিত জানতাম তাঁর কাছে পৌছতে পারব, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের কষ্ট স্বীকার করতাম এবং তাঁর কাছে থাকলে তাঁর দুই চরণ ধুঁয়ে দিতাম।

এরপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি চেয়ে নিয়ে পাঠ করেন। তিনি চিঠি পড়া শেষ করতেই সেখানে শোরগোল এবং উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা শুরু হয়। এরপর হিরাক্লিয়াসের আদেশে আমাদেরকে (অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে) সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। বাইরে এসে সঙ্গীদের আমি বললাম, আবু কাবশার পুত্রের ঘটনা তো দেখছি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে। তাকে তো দেখছি বনু আসফারের (রোমানদের) বাদশাও ভয় পায়। এরপর আমি সব সময় এ বিশ্বাস পোষণ করতাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন বিজয়ী হবেই। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরপর আমার মাঝে ইসলামের আলো জ্বেলে দিয়েছেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত চিঠির প্রভাবই ছিল আবু সুফিয়ানের এ বিবরণী যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ চিঠির আরেকটি প্রভাব এও ছিল যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র বাহক হযরত দেহইয়া কালবী (রা.) কে বেশ কিছু মালামাল ও কাপড় চোপড় প্রদান করেন। হযরত দেহইয়া (রা.) সেসব নিয়ে মদীনায় ফেরার পথে, হুসমা নামক জায়গায় জুযাম গোত্রের কিছু লোক ডাকাতি করে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মদীনায় পৌছে হযরত দেহইয়া (রা.) নিজের বাড়ীতে না গিয়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে সব কথা ব্যক্ত করেন। সব শুনে বিশ্বনবী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) এর নেতৃত্বে পাঁচশ সাহাবীকে হুসমা অভিযানে প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ (রা.) জুযাম গোত্রের লোকদের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়ে তাদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন। এরপর তাদের পশুপাল ও মহিলাদের হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। পশুপালের মধ্যে এক হাজার উট ও পাঁচ হাজার বকরী এবং বন্দীদের মধ্যে একশ নারী ও শিশু ছিল।

www.nagorikpathagar.org

বাহরাইনের শাসনকর্তা মোনযের এর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনের শাসনকর্তা মোনযের ইবনে সাওয়ার এর নামে চিঠি লিখে তাকেও ইসলামের দাওয়াত দেন। এ চিঠি হযরত আলা ইবনে হাযরামীর হাতে প্রেরণ করা হয়েছিল। জবাবে মোনযের লিখেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার চিঠি আমি বাহরাইনের অধিবাসীদের পড়ে শুনিয়েছি। কিছু লোক ইসলাম পছন্দ করেছে, পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার অনেকে পছন্দ করেনি। এখানে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকও রয়েছে। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিন। এর জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি লিখেন ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মোনযের ইবনে সাওয়ার নামে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে তা নিজের জন্যেই করবে। যে ব্যক্তি আমার দূতদের আনুগত্য করবে এবং তাদের আদেশ মান্য করবে, সে ব্যক্তি যেন আমারই আনুগত্য করেছে। যারা আমার দূতদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, তারা আমার সাথেই ভাল ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে। আমার দূতরা আপনার প্রশংসা করেছেন। আপনার জাতি সম্পর্কে আপনার সুপারিশ আমি গ্রহণ করেছি। কাজেই মুসলমানরা যে অবস্থায় ঈমান এনেছে তাদের সে অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি দোষীদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনিও তাদের ক্ষমা করুন। আপনি যতদিন সঠিক পথ অনুসরণ করবেন, ততদিন আমি আপনাকে পদ থেকে বরখাস্ত করব না। যারা ইহুদীদের ধর্মকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে অথবা অগ্নি উপাসনার উপর কায়েম রয়েছে, তাদের জিযিয়া (কর) দিতে হবে।

ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া এর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া ইবনে আলীর কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। তাতে লেখা ছিল ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হাওয়া ইবনে আলীর

www.nagorikpathagar.org

প্রতি। সে ব্যক্তির উপর সালাম, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। আপনার জানা থাকা উচিত, আমার দ্বীন উট ও ঘোড়ার শেষ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন। শান্তিতে থাকবেন এবং আপনার অধীনে যা কিছু রয়েছে সেসব আপনার জন্যে অক্ষুণ্ন রাখা হবে। এ চিঠি পৌছানোর জন্যে সালীত ইবনে আমরকে (রা.) দূত মনোনীত করা হয়। হযরত সালীত, সীলমোহর লাগানো এ চিঠি নিয়ে ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া বিন আলীর দরবারে পৌছেন। হাওয়া তাকে নিজের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে মোবারকবাদ জানান। হযরত সালীত চিঠিখানি শাসনকর্তাকে পড়ে শোনান। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মাঝামাঝি ধরনের কথা বলেন। এরপর বাদশা আল্লাহর রাসূলের কাছে নিম্নরূপ লিখিত জবাব দেন। 'আপনি যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। আরবদের উপর আমার প্রভাব রয়েছে। কাজেই আপনি আমাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিন, আমি আপনার আনুগত্য করব।'

ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া আল্লাহর রাসূলের দূতকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করেন। সে উপঢৌকনের মাঝে মূল্যবান পোশাকও ছিল। হযরত সালীত (রা.) সেসব নিয়ে আল্লাহর রাসূলের দরবারে আসেন এবং তাঁকে সব কিছু অবহিত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিঠি পাঠ শেষে মন্তব্য করেন, সে যদি এক টুকরো জমিও আমার কাছে চায়, তবু আমি তাকে দিব না। সে নিজেও ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তার হাতে রয়েছে, সেসবও ধ্বংস হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় থেকে ফিরে আসার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে খবর দেন, বাদশা হাওয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর সাহাবীদের বলেন, শোনো, ইয়ামামায় একজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং আমার পরে সে নিহত হবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাকে কে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা। পরবর্তীকালে আল্লাহর রাসূলের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

দামেশকের শাসনকর্তা হারেস এর কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দামেশকের শাসনকর্তা হারেস বিন আবী শেমার গাসসানীর কাছে প্রেরিত চিঠিতে লিখেন ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হারেশ ইবনে আবু শেমারের নামে। সে ব্যক্তির প্রতি সালাম, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন,

www.nagorikpathagar.org

ঈমান আনেন এবং সত্যতা স্বীকার করেন। আপনাকে আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি, যিনি এক অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোনো শরীক নেই। আপনাদের জন্যে আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ চিঠি আসাদ ইবনে খোযায়মা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত সাহাবী হযরত শুজা ইবনে ওয়াহাবের (রা.) হাতে প্রেরণ করা হয়। হারেসের হাতে এ চিঠি দেয়ার পর তিনি বলেন, আমার বাদশাহী আমার কাছ থেকে কে ছিনিয়ে নিতে পারে? শীঘ্রই আমি তার বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছি। এ বদনসীব ইসলাম গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে সে ও তার রাজত্ব ধ্বংসে পতিত হয়। বাদশা ও তার রাজ্য পরাভূত ও নিঃশেষ হয়ে যায়।

আম্মানের বাদশাহ জেফারের কাছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মানের বাদশাহ জেফার এবং তার ভাই আবদের নামেও একখানা চিঠি লিখেন। তাদের পিতার নাম ছিল জুলানদি। চিঠির বক্তব্যে লিখেন ঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে জুলানদির দুই পুত্র জেফার ও আবদের নামে। সালাম সে ব্যক্তির উপর, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসূল। যারা জীবিত আছে তাদের পরিণামের দায় দেখানো এবং কাফিরদের জন্যে আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যেই আমি কাজ করছি। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাদেরকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনাদের বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখণ্ড ঘোড়ার হামলার শিকার হবে। আপনাদের বাদশাহীর উপর আমার নবুওয়াত বিজয়ী হবে।

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কে মনোনীত করা হয়। তিনি বলেন, আমি রওনা হয়ে আম্মানে পৌঁছি এবং আবদের সাথে সাক্ষাৎ করি। দুই ভাইয়ের মধ্যে আবদে ছিলেন নরম মেজাযের। তাকে বলি, আমি আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে দূত হিসেবে এসেছি। জবাবে তিনি বলেন, আমার ভাই বয়স এবং বাদশাহী, উভয় দিক থেকেই আমার চেয়ে বড় এবং অগ্রগণ্য। কাজেই আমি আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি নিজেই আপনার আনীত চিঠি পড়বেন। এরপর আবদের সাথে আসের দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরদিন পুনরায় বাদশাহর কাছে যেতে চাই,

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেননি। আমি ফিরে এসে তার ভাইকে বলি, আমি বাদশার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। আবদে আমাকে বাদশার কাছে পৌঁছে দেয়। বাদশাহ বলেন, আপনার উপস্থাপিত দাওয়াত সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। আমি যদি বাদশাহী এমন একজনের কাছে ন্যস্ত করি, যার সেনাদল এখনো পৌঁছেনি, তবে আমি আরবে সবচেয়ে দুর্বল ভীরু বলে পরিচিত হব। যদি তার সৈন্যরা এখানে এসেই পড়ে, তবে আমরা তাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেব। জবাবে আমি বলি, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল ফিরে যাচ্ছি। আমার যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে নির্জনে মতবিনিময় করেন। বাদশাহ তার ভাইকে বলেন, এ রাসূল যাদের উপর বিজয়ী হয়েছে, তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। তিনি যার কাছেই পয়গাম পাঠিয়েছেন তিনিই দাওয়াত কবুল করেছেন। পরদিন সকালে পুনরায় আমাকে বাদশার দরবারে ডাকা হয়। বাদশাহ এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেন। সদাকা আদায় এবং বাদী বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা করতে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়। কেউ আমার বিরোধিতা করলে তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেন।

এ ঘটনার বিবরণ ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, অন্যান্য সকল বাদশার নিকট চিঠি প্রেরণের পরে আল্লাহর রাসূল এ চিঠি আম্মানের বাদশাহকে প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর এ চিঠি প্রেরণ করা হয়। এ সকল চিঠির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। জবাবে কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফরীর উপরই অটল থেকেছে। তবে এ সকল চিঠির প্রভাব এটুকু হয়েছে যে, যারা কুফরী করেছে তাদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের নাম এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন একটি পরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীতে চিঠি মারফত দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়টি ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। এভাবেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগ করেছেন। দ্বীন ইসলামকে সারাবিশ্বে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

খায়বারের যুদ্ধ (৭ম হিজরী, ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ)

সিরিয়া প্রান্তরের এক বিশাল শ্যামল ভূখণ্ডের নাম খায়বার। ছোট বড় বহু দুর্গ দ্বারা এ স্থানটি সুরক্ষিত ছিল। পূর্ব হতেই এখানে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করেছিল। মদীনার বনু কাইনুকা ও বনু নযীর গোত্রদ্বয় এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। বনু

কাইনুকা ও বনু নযীর গোত্রের ইহুদীরা খায়বরে তাদের জাতি ভাইদের সাথে যোগ দেয়ার পর, তাদের দুষ্ট ও কুচক্রি মনোভাব অরো পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিরাট ও ব্যাপকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের মনস্থ করল। সমস্ত আয়োজন ঠিক হলে, ইহুদীরা ছোট খাট কয়েকটি আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করল। ইহুদীদের এ চক্রান্তের গোপন খবর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেড়ে অনতিবিলম্বে ১৪শ কিংবা ১৬শ মুসলিম সৈন্য বাহিনী নিয়ে খায়বারের দিকে রওয়ানা হন।

মদীনা হতে খায়বার প্রায় একশত মাইল (তিন দিনের পথ) দূরে অবস্থিত। ৭ম হিজরীর মহররম মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুত বেগে সৈন্য চালনা করেন যে, ইহুদীরা কোন পূর্বাভাসই পেল না। তিন দিনের এ পথ অতিক্রম করে হঠাৎ একদিন খুব ভোরে ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুরক্ষিত দুর্গে এসে পৌঁছেন। কৃষকরা মাঠে এসে দেখতে পেল যে, সম্মুখে তাদের বিরাট মুসলিম সেনাদল। ভয়ে তারা দৌঁড়ে গিয়ে নগরবাসীকে এ সংবাদ দিল। ইহুদীরা হতভম্ব হয়ে গেল। তখন বনু গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের সহযোগিতা লাভের আর অবসর রইল না। তখন তাদের নেতা সালাম বিন মিসকামের সাথে পরামর্শ করে তাদের ছয়টি দুর্গের মধ্যে 'ওয়াতি' ও 'সামেল' নামক দুর্গে তাদের ধন সম্পদ ও মেয়েদের সুরক্ষিত করল। তাদের ধনাগার ছিল 'নায়িম' নামক দুর্গে। সৈন্য বাহিনী থাকত নাতীত নামক দুর্গে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নাতীত বা নায়িম দুর্গ আক্রমণ করেন। পঞ্চাশজন মুসলমান এতে আহত হন। আর ইহুহীদের নেতা সালাম নিহত হলে তার স্থলাভিসিক্ত হন হারিস বিন যয়নাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে। আরো কয়েকটি দুর্গ অধিকারে আসার পর, মুসলিম বাহিনী বিখ্যাত দুর্গ 'কানুস' এর সম্মুখীন হয়। মুসলমানরা এ দুর্গ দখল করতে পারছিল না দেখে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন হযরত আবু বকর (রা.) কে এবং দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর (রা.) কে সেনাপতি করে পাঠান। এ দু'দিনের আক্রমণে শত্রুরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দুর্গের পতন হয়নি। তৃতীয় দিন আল্লাহর সিংহ হযরত আলীকে (রা.) ইসলামের পতাকা দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই নাও ইসলামের পতাকা এবং যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করেন। মুসলমানরা হযরত আলীর নেতৃত্বে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলে কানুস দুর্গের পতন হয়। অতঃপর অন্যান্য দুর্গও মুসলমানদের করায়ত্তে আসে। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় ইহুদীদের নিহতের সংখ্যা ৯২ জন, আর মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

শহীদের সংখ্যা ১৯ জন। প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ থাকার পর খায়বারের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে মহাবীর আলী (রা.) ঢাল হিসেবে দুর্গের যে লোহার কপাট বা দরজাটি ব্যবহার করেছিলেন; তা উঠাতে ৭ জন সাহাবা হিমশিম খেয়ে যান। অথচ আলী (রা.) সেটাকে যুদ্ধের ঢাল হিসেবে স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করেছেন। সবই মহান রবের ইচ্ছা।

এরপর ইহুদীরা অতি বিনীতভাবে বিশ্বনবীর নিকট লিখিত শর্তে শান্তি প্রস্তাব দেয়। শর্ত ছিল এরূপ ঃ (১) তাদের জীবন, সম্পত্তি, মহিলা ও শিশুদের স্পর্শ করা হবে না। (২) তারা অর্ধেক ফসল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেবে। (৩) তারা মুসলমানদের অনুগত প্রজা হয়ে বসবাস করবে। (৪) ইহুদীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শর্ত মেনে নিলেন। প্রতিবছর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) খায়বারে এসে উৎপন্ন ফসল ভাগ করে দিতেন। এ সত্ত্বেও ইহুদীদের স্বভাব বদলায়নি। বিশ্বাসঘাতকতা ও কলা কৌশলে চতুরতা ইহুদী জাতির মজ্জাগত অভ্যাস। এরা পুনরায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্র করে। ইহুদী নেতা হারিসের কন্যা ও সালামের স্ত্রী যয়নাব, মহানবীকে দাওয়াত করে বিষ মিশ্রিত খাদ্য খেতে দেয়। মহানবী এক লুকমা মুখে দিয়েই ফেলে দেন। কিন্তু বিশর বিন রানা (রা.) নামক এক সাহাবী সামান্য গিলে ফেলায় সে শহীদ হন। ফলে এ হত্যার দায়ে যয়নাবকে প্রাণদ দেয়া হয়। খায়বার যুদ্ধে যে সব মহিলা বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত সফিয়াও (রা.) ছিলেন। তিনি একজন সাহাবীর ভাগে পড়েন। অথচ তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাসীরূপে থাকার জন্য আবেদন জানান। দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে আজাদ করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহ খায়বারের বিজয়ের ইঙ্গিত করেছিলেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন, মুমিনরা যখন গাছের নীচে আপনার হাতে বাইয়াত করছিল, তখন তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন। পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে অত্ম বিজয় দান করবেন এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ দান করবেন, যা তারা অচিরেই লাভ করবে (সূরা আল ফাতাহ ঃ ১৮-১৯)। হুদাইবিয়ায় আল্লাহ দেয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন হয়েছিল ফলে মুসলমানদের মনোবল আরও বেড়ে গিয়েছিল।

মক্কা বিজয় (৮ম হিজরী, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

৮ম হিজরীর রমযানে মক্কা বিজয় হয়। হুদাইবিয়ার সাথে মক্কা বিজয় সম্পর্কিত। হুদাইবিয়ার একটি শর্ত ছিল এরূপ ঃ মক্কাবাসী অথবা মুসলমানরা যে কোন গোত্রের সাথে চুক্তি বদ্ধ হতে পারবে। অপরপক্ষ এতে বাদ সাধতে পারবে না। এরই ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের সাথে বনু খোজায়ার এবং অপরদিকে বনু বকরের সাথে মক্কাবাসীদের চুক্তি হয়েছিল। অথচ কিছু দিন যেতে না যেতেই, মক্কার কাফিররা বনু বকরের পক্ষাবলম্বন করে, বনু খোজায়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেক লোককে হত্যা করে ফেলে। ফলে খোজায়ার গোত্রের লোকেরা এসে প্রিয় নবীর নিকট ফরিয়াদ জানায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর নিকট তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবী জানান। নতুবা চুক্তি ভঙ্গ বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু মক্কার কাফিররা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার কোন মূল্যই দিল না। শেষ পর্যন্ত সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ বলেই বিবেচিত হল। এবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে গোপনে মক্কা অভিযানের আয়োজন শুরু করে দিলেন। তিনি সবকিছু গোপন রেখে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। কারণ, এ অভিযানের খবর মক্কাবাসী জানতে পারলে তারাও বিপুল সমরায়োজন করত। ফলে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কা ঘটে যেতে পারত। অথচ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ ধ্বংসাত্মক বিজয় চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ভালবাসা দিয়ে ও মানবতা দিয়ে পবিত্র মক্কা জয় করতে। এজন্যই তিনি কুরাইশদেরকে প্রস্তুত হবার অবকাশ দেননি।

হাতিব বিন আবি বোলতা (রা.) নামক জনৈক বদরী সাহাবী এ সময় একটি কা করে বসেন। তখনও তার স্ত্রী-পুত্র মক্কায় অবস্থান করত। তাদের প্রতি মক্কার কুরাইশদের সহানুভূতির আশায় তিনি গোপনে জনৈকা ক্রীতদাসীর মাধ্যমে মক্কায় মুসলমানদের অভিযানের খবর পাঠানোর চেষ্টা করেন। আল্লাহ অহীর মাধ্যমে তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানিয়ে দেন। সাথে সাথে মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, মিকদাদ ও হযরত যুবাইরকে (রা.) বলে পাঠান যে, তোমরা দ্রুত যাও, 'রওযা খাক' নামক স্থানে গেলে উটে সওয়ারী এক মহিলা দেখবে, তাকে আটক করবে এবং তার নিকট একটা চিঠি পাবে। তোমরা তা নিয়ে আস। বিশ্বনবীর নির্দেশ পালন করা হলে ঘটনার সত্যতা মিলে। এ কাজের জন্য হাতিবের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। হাতিব অকপটে তার উপরোক্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিশ্বাস করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এটা ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা মু'জেযা।

www.nagorikpathagar.org

পরিকল্পনা অনুসারে ধীরে ধীরে মুসলমানদের দশ হাজারের বিরাট বাহিনী তৈরী হয়ে যায়। তাদেরকে নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ম হিজরীর ১০ই রমযান (৬৩০ খ্রীঃ) মক্কা অভিমুখী অভিযানে রওনা হন। মক্কার উপকণ্ঠে 'মারুর জাহরান' নামক স্থানে এসে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং মক্কা বিজয় করার জন্য কয়েকটি কৌশল গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর খাদ্য প্রস্তুতির জন্য তাবুর বাইরে চুল্লি জ্বালান হয়। রাতে অগণিত চুল্লিতে আগুন জ্বলতে দেখে কুরাইশরা ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। আবু সুফিয়ান এ দৃশ্য দেখতে এসে ধরা পড়ে যান এবং তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আবু সুফিয়ান! এখনও কি তোমার ভুল ভাঙ্গবে না? তুমি কি আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করবে না? এখনও কি দেবদেবীকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? নবীর দাওয়াতের কথায় আবু সুফিয়ানের মনে দাগ কাটে এবং তিনি তখন কালেমা পড়ে ইসলাম কবুল করেন। অপরদিকে আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়াও ইসলামের গুণে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ইসলাম গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কুরআনের ভাষায় বলেন, আজ তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি অতি দয়ালু করুণাময়। (সূরা ইউসুফ ঃ ৯২)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে তারা নিরাপদ, যারা মসজিদে হারামে থাকবে তারা নিরাপদ আর যারা নিজেদের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে তারাও নিরাপদ। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে ৪টি দলে বিভক্ত করে নগরে প্রবেশের নির্দেশ দেন। আর হযরত আব্বাস (রা.) কে বলেন, আবু সুফিয়ানকে এখন মক্কায় ফিরে যেতে না দিয়ে সম্মুখের পাহাড়ের উপর নিয়ে যান, যেন সে মুসলমানদের ক্ষমতা দেখতে পায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের যে চারটি দলে বিভক্ত হবার নির্দেশ দেন; সে দলগুলোর নেতারা ছিলেন ঃ (১) হযরত যুবাইর (রা.) (২) হযরত আবু ওবায়দা (রা.) (৩) হযরত সাদ বিন ওবাদা (রা.) ও (৪) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। হযরত আলী (রা.) পতাকা হাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশ ছিল; বাধা না দিলে কাউকে যেন আঘাত করা না হয়। বস্তুতঃ বিনা বাধায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুসলিম বাহিনী নগরীতে প্রবেশ করে। কাবা ঘরে পৌঁছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান বিন তালহার

নিকট হতে চাবি নেন এবং পবিত্র কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করেন। এরপর কা'বার মূর্তিগুলোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আঘাত করতে করতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করেন, সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসারিত হয়েছে, আর মিথ্যা না কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর না পুনরাবৃত্তি করতে পারে। (আল কুরআন)

মক্কাবাসীরা অপেক্ষা করছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেন? যেসব মুশরিকরা বহু বছর যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং মুসলমানদেরকে সর্বপ্রকারের দুঃখ কষ্ট দিয়েছিল আজ তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বন্দীদেরকে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে কুরাইশরা! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা ধারণা কর? তারা উত্তর দিল, আমরা আপনার নিকট হতে ভাল ব্যবহার পাওয়ার আশা করি। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাও তোমরা সকলে মুক্ত। এ ঘোষণায় ইকরামা, সাফওয়ান, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা; প্রমুখ অমার্জনীয় অপরাধী ক্ষমা পেয়ে যায়। এখানে এ সত্যটি পুনরায় স্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ পৃথিবীর রাজা বাদশাহ ও নবীদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল- নবী রাসূলরা মহানুভব ও মানবতাবাদী। নবীরা (আ.) বিশাল হৃদয়ের হন। ক্ষমা করা, পূর্বের দুঃখস্মৃতি ভুলে যাওয়াই নবীদের মূল আদর্শ। আর দুনিয়াবাদীরা প্রতিশোধপরায়ণ ও হঠকারী। পাশাপাশি এ ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষমা হতে কিছু লোককে আলাদা রাখা হয়, যারা ইসলামের অতিমাত্রায় ক্ষতি করেছিল। কিন্তু এরূপ লোকের অধিকাংশই তখন আত্ম গোপন করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তারা সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণপূর্বক ইসলাম কবুল করেছিল। এ ক্ষমা ও দয়ার ফলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণে সুভাগ্যবান হন। হযরত মুয়াবিয়া, আবু কাহাফা প্রমুখ সে দিনই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ভয়ঙ্কর শত্রুরাও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

সূরায়ে ফাতাহ, হাদীদ ও নাছর- এ তিনটি সূরাতে আল্লাহ মক্কা বিজয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। সূরা ফাতাহে এসেছে, আপনাকে সাহায্য করবেন জবরদস্ত সাহায্য। আর সে শক্তিশালী ও জবরদস্ত সাহায্য হল মক্কা বিজয় (সূরা ফাতাহ)। সূরা হাদীদে এসেছে, তোমাদের মধ্যে তারা- যারা ব্যয় করেছে মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং জিহাদ করেছে, তাদের মর্যাদা অধিক উচ্চ, ঐ সমস্ত লোকের চেয়ে; যারা ব্যয় করে মক্কা বিজয়ের পরে এবং জিহাদ করে। আর আল্লাহ তাদের সকলের

www.nagorikpathagar.org

সাথে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন (সূরা আল হাদীদ)। সূরা নাছরে এসেছে, যখন এসে পড়ে আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় এবং আপনি লোকদেরকে দেখেন যে তারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করছে। (সূরা আন নাছর)

মক্কা বিজয়ের বিশেষত্ব হল, তা শক্তি বলে বিজিত হওয়া সত্ত্বেও রক্তপাত হতে রক্ষিত ছিল। কা'বার হেরেমের সম্মান ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদকে (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন; কা'বা শরীফে প্রবেশ কালে কারো প্রতি যেন তরবারি না উঠায়। দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন কোন রাজা-বাদশাহ কোন দেশ জয় করে, তখন বিজিত দেশের উপর নানা প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন সংঘটিত হয়। তারা হত্যা ও লুটতরাজ করে। সে জাতিকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে কিংবা হত্যা করে। কিন্তু তদস্থলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ঘোষণা ছিল, আজ তোমাদের উপর কোন ক্ষোভ নেই। যাও তোমরা সকলেই মুক্ত? কাফির বা মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে যদি সন্ধি হয়, তবে সে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ কাফির দলের জান, মাল এবং ইজ্জত সব কিছু নিজের জান, মাল এবং ইজ্জতের মত মনে করতে হবে। অবশ্য প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে বিরোধিতা বা চুক্তি ভঙ্গ হলে, মুসলমানদের চুক্তি ভঙ্গসহ তাদের মূলোৎপাটন করা যাবে। মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের হৃদয় এতটাই সহানুভব ও উদার ছিল। যা অন্য কোথাও দেখা যায়নি। সত্যিই তিনি অতুলনীয়।

মক্কা বিজয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্ণতা অর্জন

মক্কা বিজয় ছিল মূলত একটি সিদ্ধান্তমূলক অভিযান। এর ফলে আরববাসীদের সামনে মূর্তিপূজার অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে তার অবসান ঘটে। সমগ্র আরবের জন্যে সত্য মিথ্যা চিহ্নিত হয়ে যায়। তাদের মনোজগৎ থেকে সন্দেহ সংশয়ের অবসান ঘটতে থাকে। এ কারণে মক্কা বিজয়ের পর তারা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আমর ইবনে সালামা (রা.) বলেন, আমরা একটি কূপের ধারে বাস করতাম, তার পাশ দিয়ে কাফেলা চলাচল করত। আমরা তাদের লোকদের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি কেমন তা জানতে চাইতাম। তারা বলত, মনে করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে ওহী পাঠান হয় এবং সে ওহীতে আল্লাহ তা'আলা এরূপ এরূপ বলেন। হযরত আমর ইবনে সালামা (রা.) বলেন, আমি সেসব কথা শুনতাম। কথাগুলো আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের জন্যে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা বলত, তাঁকে এবং তাঁর কওমকে বা জাতিকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি নিজের কওমের উপর জয় লাভ

www.nagorikpathagar.org

করেন তাহলে বুঝা যাবে, তিনি সত্য নবী। অতঃপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। সকল কওম ইসলাম গ্রহণের জন্যে অগ্রসর হয়। আমার পিতাও আমার কওমের কাছে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। তিনি বলেন, অমুক অমুক নামায আদায় কর। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়। এরপর তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণ কুরআন জানেন, তিনি যেন ইমামতি করেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মক্কা বিজয়ের ঘটনা পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামকে শক্তিশালী করেছিল। আরববাসীদের ভূমিকা নির্ধারণে এবং ইসলামের সামনে তাদের অস্ত্র সমর্পণে মক্কা বিজয় এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাবুকের যুদ্ধের পর এ অবস্থা আরো শক্তিশালী রূপ নেয়। এ কারণে দেখা যায় যে, নবম ও দশম হিজরীর দুই বছরে মদীনায় বহু প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। সে সময় মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে মক্কা বিজয়ের সময় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, অথচ এক বছরের কম সময়ের মধ্যে তবুকের যুদ্ধের সময় সে সংখ্যা ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়। বিদায় হজ্জের সময় দেখা যায়, মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ লাখ ২৪ হাজার, মতান্তরে ২ লাখ। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে তাঁরা লাব্বাইক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছিলেন। পাহাড়-পর্বতে, মাঠে-প্রান্তরে তাওহীদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এভাবেই মক্কা বিজয়ের পর খুব দ্রুত ইসলামের প্রচার, প্রসার ও দাওয়াত ও তাবলীগের কল্পনাতীত অগ্রগতি সাধিত হয়। মক্কা বিজয়ের মধ্যদিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্ণতা অর্জিত হতে থাকে।

হুনাইনের যুদ্ধ (৮ম হিজরী, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। মক্কা হতে প্রায় দশ মাইল দূরে। পূর্বেই মক্কা বিজয়ের প্রভাব সমগ্র আরব গোত্রের উপর পড়েছিল। অধিকাংশ আরব গোত্র ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা মক্কার কুরাইশদের পরাজিত করলেও প্রাচীন জাহেলী শক্তি হুনাইনের প্রান্তরে অবস্থানকারী দুর্ধর্ষ হাওয়াজিন, সাকীফ, নজর, জুশম এবং অন্যান্য জাহেলিয়াতপন্থি গোত্র ও কবিলার লোকেরা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের এ বিজয় তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ইসলামের দাওয়াত, প্রচার-প্রসার ও বিপবী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হয় এবং তাদের আশেপাশের অন্যান্য গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার

www.nagorikpathagar.org

জন্য আহ্বান জানায়। এ সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে মালিক বিন আউফ। সে সবাইকে তাদের স্ত্রী পুত্র, চতুষ্পদ জন্তু ও মাল সম্পদসহ যুদ্ধের ময়দানে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল, যেন দলের লোকেরা নিজেদের পরিবার পরিজন ও মাল সম্পদের লোভে হলেও যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে না যায়।

পবিত্র মক্কা অধিকার করার পর মুসলমানরা তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে- এ আশংকায় কাফিদের সকল গোত্র মিলে কালবিলম্ব না করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিল। কাফিররা 'আওতান' নামের একটি মাঠের সংকীর্ণ স্থানে সমবেত হয়ে। সংবাদ শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি তাঁর সৈন্য বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। মদীনা হতে আগত দশ হাজারের সাথে নব দীক্ষিত দু'হাজার কুরাইশ বীরও যোগ দেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার ঐ সৈন্যের মধ্যে আবু জেহেলের পুত্রদ্বয়, আবু সুফিয়ান এবং প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দও ছিলেন। কী অপূর্ব পরিবর্তন ঃ সারা জীবন যারা কাফিরদের নেতারূপে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারাই আজ বিশ্বনবীর ভক্তরূপে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মহান প্রতিপালক যেমনটি চান তাই হয়। বিশ্বনবী মা'আয বিন জাবালকে মক্কার মুয়াল্লিম এবং খাত্তাব বিন আসাদ কে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ১২ হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়ে রওনা হন। সংখ্যায়, যুদ্ধোপকরণে মাল সম্পদে পূর্বের তুলনায় মুসলমানরা ছিল সমৃদ্ধ। কে তাদের বিজয় ঠেকায়? ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কিছুটা অহংকারের ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আল্লাহ অলক্ষ্যে এ কথা শুনতে পেয়ে তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। মুসলমানরা 'হুনাইন' নামক স্থানে পৌঁছে রাত যাপন করে। এ সংবাদ জানতে পেরে শত্রু সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে পথের দু'ধারের পর্বতগুলোতে আত্মগোপন করে থাকে। ফলে মুসলিম বাহিনী যখন হুনাইন প্রান্তর অতিক্রম করতে যায়। হঠাৎ পথের দু'ধার হতে হাওয়াজিনরা বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষণ করতে থাকে। মহাবিপদ আসন্ন। অপ্রস্তুত ও অসতর্ক অবস্থায় কী করবে তারা? দিশেহারা হয়ে মুসলিম বাহিনী যে যেদিকে পারে পালাতে আরম্ভ করে।

মুসলমানদের সকল অহংকার পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদেরকে যে এ হীন লজ্জাকর পরাজয় বরণ করতে হবে, সেটি তারা ভাবেনি। এতদিন সংখ্যায় অল্প হয়ে বহু সংখ্যক শত্রু সেনাকে জয় করার অভিজ্ঞতা মুসলমানরা অর্জন করেছিল। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের যে শক্তি নেই- এ সত্য তারা

www.nagorikpathagar.org

কোন দিনই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেনি। সেদিন পার্থিব শক্তির অহংকারী মুসলমান, নিজে থেকে সে সত্য হৃদয়ঙ্গম করে। মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝতে পারে অল্প সংখ্যক হলেই যে কোন দল বা জামাত পরাজিত হয়-তাও যেমনি সত্য নয়। আবার অধিক সংখ্যক হলেই যে জয়লাভ করা যায়- তাও তেমনি সত্য নয়। জয় পরাজয়ের পিছে কাজ করে অন্য এক রহস্য। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থানের সময় হযরত আব্বাস (রা.), মুহাজির ও আনসারদেরকে বিশ্বনবীর চতুর্পাশে সমবেত হওয়ার জন্য উচ্চস্বরে আহ্বান জানান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনী একত্রিত হয়ে বীর বিক্রমে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। এভাবে সকলে একত্রিত হয়ে প্রচণ্ড বেগে কাফিরদেরকে আক্রমণ করে। এতে করে হাওয়াজিন ও সাকীফ গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়। তারা এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে থাকে যে, রসদ পত্র তো দূরের কথা, নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে সাথে নিয়ে যেতেও ভুলে যায়। ফলে গনীমতের মাল হিসেবে ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরী, প্রচুর সোনা-রূপা মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। ছয় হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হয়।

হুনাইন অভিযানে মক্কার কাফিরদের মাঝে অসংখ্য সাধারণ নর-নারী, যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের ধারণা ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে, তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর তারা জয়ী হলেও তাদের তেমন কোন ক্ষতি নেই। এ মনোভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা বিন ওসমানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযার (রা.) হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলীর (রা.) হতে নিহত হয়। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল তা বর্ণনার বাইরে। আমি হুনাইনের এ অভিযানকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায় মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে, তখন আমি এ সুযোগে তড়িৎবেগে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছি। কিন্তু দেখি যে, তার ডানদিকে হযরত আব্বাস (রা.) ও বাম দিকে আবু সুফিয়ান, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ রক্ষিরূপে রয়েছেন। এজন্য পিছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছি এবং সংকল্প করি যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁকে হত্যা করব (নাউযু

www.nagorikpathagar.org

বিল্লাহ)। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে তিনি বলেন, শায়বা! এদিকে এসো। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া করেন। হে আল্লাহ! ওর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও। অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই তখন আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক প্রিয় মনে হয়। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এমন অবস্থা হল যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফিরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তার খেদমতে হাজির হই। তিনি আমার মনের গোপন দূরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিল। আর আমাকে হত্যার জন্য আশে পাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো, পরিশেষে তাই হল। একই ধরনের ঘটনা ঘটে নযর বিন হারিসের সাথে। তিনিও অনুরূপ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তার অন্তরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফিরদের মুকাবিলা করেন।

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিজেদের সংখ্যাধিক্যের অহংকারের দরুন প্রথমে তাদের পরাজয় দেখা দেয়। পরবর্তীতে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বিজয় সূচিত হয়। সে অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ইতোপূর্বে অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। সে দিন হুনাইনের যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের সংখ্যা বিপুলতার অহংকার ও অহমিকা ছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পশ্চাদপসারণ করে পালাতে লাগলে (সূরা তাওবা ঃ ২৫)। অতঃপর আল্লাহ তার শান্তির অমিয় ধারা তার রাসূল ও মু'মিনদের উপর বর্ষণ করলেন। আর সে বাহিনীও পাঠালেন, যা তোমরা দেখতে পেলে না। আর তিনি কাফিরদের শাস্তি দান করলেন। কেননা, এটাই কাফিরদের প্রতিফল। (সূরা আত তাওবা ঃ ২৬)

হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন। আর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণের অর্থ হল, তারা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সান্ত্বনা ছিল দু'প্রকার। এক

প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্য, আর অন্য প্রকার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা সুদৃঢ় ছিলেন তাদের জন্য। ওহুদ ও হুনাইন-দু'টিই মুসলমানদের যথার্থ শিক্ষার ক্ষেত্র। ওহুদে তারা জয়ী হয়ে পরবর্তীতে পরাজিত হয়েছিল। হুনাইনে প্রথমে পরাজিত হয়ে, পর মুহূর্তেই জয়ী হয়েছিল। ওহুদে শিখেছে নেতার আদেশ লঙ্ঘন করার শোষণীয় পরিণাম। অপরদিকে হুনাইনে শিখেছে অহংকার করার মারাত্মক কুফল। সাথে সাথে ঈমানের পরীক্ষাও এ দু'স্থানে ভীষণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য ও করুণা ব্যতীত কোন কিছুই যে সম্ভব নয়- এ সত্যটি উভয় স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমানরা এ সত্যটি হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে যে, অল্প সংখ্যক হলেই যে দল বা জামাত পরাজিত হয়-তা যেমনি সত্য নয়। আবার অধিক সংখ্যক হলেই যে, দল বা জামাত জয়লাভ করে তাও তেমনি সত্য নয়। জয় পরাজয়; সম্মান-লাঞ্ছনা, লাভ-ক্ষতি উন্নতি-অবনতি; সফলতা ধ্বংস; সবকিছুই মহান আল্লাহর হাতে। মহান প্রতিপালক যেভাবে, যখন, যা চান– সেভাবে, তখন তাই হয়। মহান আল্লাহ মহাক্ষমতাবান।

মুতার যুদ্ধ (৮ম হিজরী, ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

মুসলমানদের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর দ্বীন ইসলামকে প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তর দিকে একটি দল সিরিয়া সংলগ্ন বিভিন্ন গোত্রের নিকট পাঠান। দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতটি হিজরত করতে থাকে। কিন্তু 'জাতুত তালাহ' নামক স্থানে মুসলিম জামাতের ১৫ জনকে হত্যা করা হয়। এ সময়ে বসরা অধিপতি শুরাহবিলের নিকট ইসলামের দাওয়াতপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র বাহক হারিস বিন উমাইরকে (রা.) হত্যা করে। এসব কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ম হিজরী জমাদিউল আউয়াল মাসে ৩ হাজার মুজাহিদের এক বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাঠান। এ বাহিনী 'ময়ান' নামক স্থানে পৌঁছলে জানা যায় যে, শুরাহবিল এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ এরূপ ভয়বহ খবর সত্ত্বেও ৩ হাজার প্রাণ উৎসর্গকারী মুসলিম বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে এবং 'মুতা' নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। আশ্চর্যজনক হলেও শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের জয় সাধিত হয়।

মুতা জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এ জায়গা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব মাত্র দুই মনযিল। এখানেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় মুসলমানরা যেসব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এ যুদ্ধ ছিল সেসবের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। এ যুদ্ধই মুসলমানদের খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশসমূহ জয়ের পথ খুলে দিয়েছিল। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল অর্থাৎ ৬২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ অভিযানের কারণ খুবই স্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেস ইবনে ওমায়র আযদী (রা.) কে একখানি চিঠিসহ বোসরার গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। রোমের কায়সারের গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী সে সময় বালকা এলাকায় নিযুক্ত ছিল। এ দুর্বৃত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দূতকে গ্রেফতার এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা করে। যেহেতু রাষ্ট্রদূত বা সাধারণ দূতদের হত্যা করা আন্তর্জাতিক নিয়মেই গুরুতর অপরাধ। সেহেতু এটা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল ছিল। এমনকি এর চেয়েও গুরুতর অপরাধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত হত্যার খবর শোনার পর খুবই মর্মাহত হন। এ কারণে তিনি সে এলাকায় অভিযান পরিচালনার জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী তৈরী করা হয়। খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া ইতোপূর্বে অন্য কোনো যুদ্ধেই মুসলমানরা তিন হাজার সৈন্য সমাবেশ করেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) কে এ সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করে বলেন, যায়েদ যদি শহীদ হয়, তবে জাফর (রা.) এবং জাফর শহীদ হলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) সিপাহসালার দায়িত্ব পালন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সেনাদলের জন্যে সাদা পতাকা তৈরী করে তা হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার (রা.) হাতে দেন। সৈন্যদলকে তিনি ওসীয়ত করেন, তারা যেন হারেস ইবনে ওমায়রের হত্যাকা ের জায়গায় স্থানীয় লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তো ভালো। তা না হলে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সাহায্যে কুফরকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। খেয়ানত করবে না। কোনো নারী, শিশু, অতীব বৃদ্ধ এবং গির্জায় অবস্থানকারী দুনিয়া পরিত্যাগকারীকে হত্যা করবে না। খেজুর এবং অন্য কোনো গাছ কাটবে না। কোন অট্টালিকা ধ্বংস করবে না।

মুসলিম বাহিনী রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সর্বসাধারণ মুসলমান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনোনীত সেনানায়কদের সালাম এবং বিদায় জানান। সে

সময় অন্যতম সেনানায়ক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) কাঁদছিলেন। তাঁকে এ সময় কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বা তোমাদের সাথে সম্পর্কের কারণে আমি কাঁদছি না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনে জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি। সে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমাদের প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' (সূরা মারইয়াম ঃ ৭১)। আমি জানি না, জাহান্নামে প্রবেশের পর ফিরে আসব কিভাবে? মুসলমানরা বলেন, আল্লাহর শান্তি ও নিরাপত্তা আপনাদের সঙ্গী হোক। আপনাদের হিফাযত করুন এবং গনীমতের মালসহ আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন। উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মুসলিম সৈন্যরা মাআন নামক এলাকায় পৌছেন। এ স্থান ছিল হেজাযের সাথে সংশিষ্ট জর্দানী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌছে অবস্থান নেয়। সেখানেই মুসলিম গুপ্তচররা খবর দিলেন, রোমের কায়সার বালকা অঞ্চলের মায়াব এলাকায়, এক লাখ রোমান সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে। এছাড়া তাদের পতাকাতলে লাখম, জুযাম, বালকিন, বাহরা এবং বালা গোত্রের আরো এক লাখ সৈন্য সমবেত হয়েছে। শেষোক্ত এক লাখ ছিল আরব গোত্রসমূহের সমন্বিত সেনাদল।

মুসলমানরা ধারণাই করতে পারেননি, তারা এমন এক বিশাল ও দুর্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখীন হবেন। মুসলমানরা দূরবর্তী এলাকায় হঠাৎ করেই ভয়াবহ শত্রু পক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন। তখন তাদের সামনে প্রশ্ন দেখা দেয়, তারা কি তিন হাজার সৈন্যসহ দুই লাখ দুর্ধর্ষ সৈন্যের সাথে মুকাবিলা করবেন? বিস্মিত ও চিন্তিত মুসলমানরা দুই রাত পর্যন্ত পরামর্শ করেন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিঠি লিখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হোক। তিনি হয়তো বা বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোনো নির্দেশ দিবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটা তো সেই শাহাদাত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন। স্মরণ রাখবেন, শত্রুদের সাথে আমাদের মুকাবিলার মাপকাঠি সৈন্যদল, শক্তি এবং সংখ্যাধিক্যের নিরিখে বিচার্য নয়। আমরা সে দ্বীনের জন্যেই লড়াই করি, যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন। কাজেই সামনের দিকে চলুন। আমরা দুটি কল্যাণের মধ্যে একটি অবশ্যই লাভ করব। হয়তো আমরা জয় লাভ করব অথবা শাহাদাত বরণ করে আমাদের জীবন ধন্য হবে। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মতের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.nagorikpathagar.org

মাআন এলাকায় দুই রাত অতিবাহিত করার পর মুসলিম বাহিনী শত্রুদের প্রতি অগ্রসর হয়ে বালকার মাশারেফ নামক জায়গায় হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদের মুখোমুখি হন। শত্রুরা আরো এগিয়ে এলে মুসলমানরা মুতা নামক জায়গায় সমবেত হন। এরপর যুদ্ধের জন্যে সৈন্যদের বিন্যস্ত করা হয়। ডান দিকে কাতাবা আযরীকে (রা.) এবং বাম দিকে ওবাদা ইবনে মালেক আনসারী (রা.) কে নিযুক্ত করা হয়। মুতার রণাঙ্গনের উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লাখ অমুসলিম সৈন্যের প্রবল হামলার মুকাবিলা করে। বিস্ময়কর ছিল এ যুদ্ধ। দুনিয়ার মানুষ বিস্ফোরিত নেত্রে এ যুদ্ধের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঈমানের বসন্ত বায়ু চলতে থাকলে এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটতে পারে। কোন হিসাব, নিয়ম বা কৌশলে এমন অসমযুদ্ধ হতে পারে না। একবার কল্পনা করলে সহজেই অনুমেয়; কি করে এমন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?

সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়পাত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) পতাকা গ্রহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এ ধরনের বীরত্বের পরিচয় মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় না। হযরত যায়েদ (রা.) এর শাহাদাতের পর হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) পতাকা হাতে তুলে নেন। তিনিও অতুলহীন বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লড়াই করতে থাকেন। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে তিনি নিজের সাদা কালো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে শত্রুদের ওপর আঘাত করতে থাকেন। শত্রুদের তরবারির আঘাতে তার ডান হাত কেটে গেলে, তিনি বাঁ হাতে যুদ্ধ শুরু করেন। বাঁ হাত কেটে গেলে দুই বাহু দিয়ে যুদ্ধ পতাকা বুকের সাথে জড়িয়ে রাখেন। শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত এভাবে পতাকা ধরে রাখেন। উল্লেখ রয়েছে, একজন রোমান সৈন্য তরবারি দিয়ে তাকে এমন আঘাত করেন, যাতে তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে বেহেশতে দুটি পাখা দান করেছেন। সে পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ান। এ কারণে তার উপাধি 'জাফর তাইয়ার' এবং জাফর 'যুলজানাহাইন'। তাইয়ার অর্থ উড্ডয়নকারী আর যুলজানাহাইন অর্থ দুই পাখাওয়ালা। (হাদীস)

ইমাম বুখারী নাফে (র.) এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধের দিন হযরত জাফর (রা.) শহীদ হওয়ার পর আমি তার দেহে আঘাতের চিহ্নগুলো গুনে দেখেছি। তার দেহে তীর ও তলোয়ারের পঞ্চাশটি আঘাত ছিল। এসব আঘাতের একটিও পেছনের দিকে ছিল না। অপর এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি মুতার যুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের সঙ্গে ছিলাম। জাফর ইবনে আবু তালিবকে সন্ধান করে নিহতদের মাঝে পেয়ে যাই। তার দেহে বর্শা ও তীরের ৯০ টির বেশি আঘাত দেখেছি। নাফে (রা.) থেকে ইবনে ওমর (রা.) এর বর্ণনায় এতোটুকু অতিরিক্ত রয়েছে, আমি এসকল যখম সবই তার দেহের সম্মুখভাগে দেখতে পেয়েছি। এরকম বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে হযরত জাফর (রা.) এর শাহাদাত বরণের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) পতাকা গ্রহণ করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হন।

উল্লেখ আছে হাজার হাজার শত্রু বেষ্টিত ময়দানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় তাঁর চাচাতো ভাই গোশত লেগে থাকা একটা হাড় তাঁর হাতে দেন। তিনি এক কামড় খেয়ে সময় ক্ষেপণ না করে দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। এরপর লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এর শাহাদাতের পর বনু আজলান গোত্রের সাবেত ইবনে আরকাম (রা.) নামক এক সাহাবী ছুটে গিয়ে পতাকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হে মুসলমানরা, তোমরা কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দাও। সাহাবীরা তাকেই সেনাপতির দায়িত্ব নিতে বললে তিনি বলেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। এরপর সাহাবীরা হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি পতাকা গ্রহণের পর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। বুখারীতে স্বয়ং খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে ৯টি তলোয়ার ভেংগে যায়। এরপর আমার হাতে একটি ইয়েমেনী ছোট তলোয়ার অবশিষ্ট ছিল। অপর এক বর্ণনায় তাঁর যবানীতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে, আমার হাতে মুতার যুদ্ধের দিন ৯টি তলোয়ার ভেংগে যায় এবং শেষে একটি ছোট সাইজের ইয়েমেনী যুদ্ধাস্ত্র অবশিষ্ট ছিল।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধের দিন রণক্ষেত্রের হুবহু খবর কোনো মাধ্যম ছাড়াই আগে ভাগেই ওহীর মাধ্যমে পেয়ে যান। তিনি মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, যায়েদ পতাকা গ্রহণ করেছে এবং শহীদ হয়ে গেছে। এরপর জাফর পতাকা গ্রহণ করেছে, সেও শহীদ হয়েছে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করেছে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ এ সময় অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, এরপর আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার পতাকা গ্রহণ করেছে, তার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের জয়যুক্ত করেছেন। অসীম বীরত্ব, বাহাদুরী এবং কঠিন জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের মাত্র তিন হাজার

www.nagorikpathagar.org

সৈন্য, দুই লাখ অমুসলিম সৈন্যের সামনে টিকে থাকা ছিল এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর ঘটনা। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এ সময় যে বীরত্বের পরিচয় দেন, ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তার মত এমন সেনানায়ক বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ভবিষ্যতে সম্ভব নয়।

এ যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। সকল বর্ণনার উপর দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, প্রথম দিনের যুদ্ধে দিনভর হযরত খালিদ (রা.) রোমান সৈন্যদের মুকাবিলায় অবিচল ছিলেন। তিনি সে সময় এক নুতন যুদ্ধকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, যাতে রোমানদের ধোঁকা ও ভয় দেখিয়ে এতটুকু সফলতার সাথে পিছনে নিয়ে আসবেন, যাতে কোনো অবস্থায়ই রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের ধাওয়া করার সাহস না পায়। কেননা, তিনি জানতেন, যদি মুসলমানরা পলায়ন, আর রোমানরা তাদের ধাওয়া করে, তাহলে তাদের কবল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা খুবই কঠিন হবে। পরদিন সকালে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) সেনা দলের বিন্যাসে রদবদল এনে তাদের নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন। ডান দিকের সৈন্যদের বাঁ দিকে এবং বাঁ দিকের সৈন্যদের ডান দিকে মোতায়েন করেন। পিছনের সৈন্যদের সামনে আর সামনের সৈন্যদের পিছনে নিয়ে যান। এরূপ সেনা বিন্যাসের দৃশ্য থেকে শত্রুরা বলাবলি করতে থাকে, মুসলমানদের সহায়ক সৈন্য দল এসে গেছে। সুতরাং তাদের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে সেনা পরিচালনায় আনা হয় নতুন কৌশল। ফলে যুদ্ধের পুরো চেহারাই পাল্টে দেয়া হয়। এছাড়া ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ, সামনে যাওয়া, পিছে এসে পুনরায় আক্রমণে পরিস্থিতি পুরোটাই পাল্টে যায়। প্রতিপক্ষ পুরোটাই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

এরপর উভয় দল সামনা সামনি হয়ে গেলে কিছুক্ষণ আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে। তখন হযরত খালিদ (রা.) নিজ বাহিনীর বিন্যাস সংরক্ষিত রেখে ধীরে ধীরে তাদের পিছিয়ে নিতে থাকেন, কিন্তু রোম সৈন্যরা ভয়ে মুসলমানদের পিছু নেয়নি। কারণ তারা ভাবছিল, মুসলমানরা ধোঁকা দিচ্ছে। তারা কোনো চাল চেলে তাদের বিস্তৃত মরুপ্রান্তরে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। ফলে রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের ধাওয়া না করে নিজেদের এলাকায় ফিরে যায়। এদিকে মুসলমানরা নিরাপদে সফলতার সাথে পিছনে হটে মদীনায় ফিরে আসে। মুতার যুদ্ধে ১২ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। রোমানদের কত নিহত হয়েছে তার বিবরণ জানা যায়নি। তবে যুদ্ধের বিবরণ পাঠে বুঝা যায়, তাদের বহু নিহত হয়েছিল। কেননা, শুধুমাত্র হযরত খালিদের (রা.) হাতেই তলোয়ার ভেংগেছে নয়টি। অতএব শত্রু

www.nagorikpathagar.org

সৈন্যদের নিহতের সংখ্যা সহজেই আন্দাজ করা যায়। এক ও একাশি এর পার্থক্য (১ ঃ ৮১) সমন্বিত এ সংঘর্ষেও কাফিররা মুসলমানদের উপর জয়ী হতে পারেনি দেখে সমগ্র আরব ও নিকট প্রাচ্যের লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। ঠিক এ ব্যাপারটিই সিরিয়া ও তৎসন্নিহিত অর্ধ স্বাধীন আরব গোত্র ও ইরাক নিকটবর্তী নজদী গোত্রসমূহ যারা ইরান সম্রাটের প্রভাবাধীন ছিল তারা ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মুতার যুদ্ধে এক এক করে যায়েদ বিন হরেসা, জাফর বিন আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহ (রা.) সেনাপতি হিসাবে শহীদ হন। এর পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) সৈনিক হতে সেনানায়ক হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বিজয়ী হন। এ যুদ্ধের পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাইফুলাহ বা আল্লাহর তরবারি উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি সৈন্য পরিচালনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। তিনি তাঁর পুরো জীবনে কোন যুদ্ধে কখনই পরাজিত হননি। এ ঘটনা কোন সেনানায়কের জীবনে বিরল।

যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, সেটা সম্ভব না হলেও এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের সুনাম সুখ্যাতি বহু দূর বিস্তার লাভ করে। সমগ্র আরব জগৎ, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কেননা, রোমানরা ছিল সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শক্তি। আরবরা মনে করত রোমানদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া আত্মহত্যার সামিল। কাজেই, উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তিন হাজার সৈন্য, দুই লাখ সৈন্যের মুকাবিলা করে সফলভাবে ফিরে আসা অভূতপূর্ব বিস্ময় ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ থেকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়, আরব জনগণ তখন পর্যন্ত যে ধরনের লোকদের সম্পর্কে অবহিত ছিল, সে সকল লোক থেকে মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের সাথে রয়েছে। তাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই আল্লাহর রসূল। এ কারণেই দেখা যায় যে, জেদী ও অহংকারী গোত্রসমূহ যারা লাগাতার মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়াত, তারা মুতার যুদ্ধের পর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব, বনু সোলায়মান, আশজা, গাতফান, যুবইয়ান ও ফাযারা প্রভৃতি গোত্র মুতার যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে। মুতার যুদ্ধে রোমানদের সাথে যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা রোমান রাজ্যসমূহে মুসলমানদের বিজয় এবং দূরদূরান্তের এলাকাসমূহে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুতিকাগার হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এ যুদ্ধের পর, মুসলমানদের খ্যাতি ও বিরত্বের কথা সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুসলমানরা হয়ে যায় অজেয় শক্তির নতুন মেরুকরণ।

www.nagorikpathagar.org

তাবুকের যুদ্ধ (নবম হিজরী, ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ)

পরবর্তী বছরই কাইজার মুসলমানদেরকে 'মুতা' নামক স্থানে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তুতির তাৎপর্য জানতে পেরে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সমসাময়িক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা দেন আল্লাহর নবী। পূর্বের যুদ্ধবিগ্রহে কোথায় যাচ্ছেন, কার সাথে মুকাবিলা হবে তা কাউকে না জানানোই ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি। অনেক সময় তিনি মদীনা হতে বের হয়ে লক্ষ্যস্থলের দিকে সোজা পথে অগ্রসর না হয়ে বাঁকা পথে অগ্রসর হতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি কোন গোপনীয়তা না রেখে স্পষ্ট ভাষায় সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, রোম শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

মুসলমানদের জন্য এটা ছিল খুবই কঠিন পরীক্ষার সময়। হেজায ভূমিতে চলছিল দুর্ভিক্ষ। জমির শস্য শূন্য, অপরদিকে বাগানের খেজুর পরিপক্ক হয়ে টসটস করছিল। খেজুর পাতার ঝুপড়ি নির্মাণের সময় হয়েছিল। একে তো গ্রীষ্মকাল। তার উপর পথ ছিল অতি দীর্ঘ। শত শত মাইলের পথ, ধূলিঝড় এবং উত্তপ্ত মরুভূমির বালুকার উপর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ইসলামের জন্য উৎসর্গকারী মুসলমানদের মধ্যে কোন দুর্বলতা ছিল না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পাওয়া মাত্র মুসলমানরা যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাসমারহে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। মক্কা বিজয়ের পর আরবের বহু গোত্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল গোত্রকেই সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার আহ্বান জানালেন। দলে দলে লোক এসে সৈন্য শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগল। প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হল। এত বিরাট বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে অর্থের যোগান ছিল না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থের জন্য সাহাবীদের নিকট আহবান জানালেন। এ আহ্বানে বিপুল সাড়া মিলল। আল্লাহর নামে, ইসলামের পথে সবাই অকাতরে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কে কত দান করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। হযরত ওসমান ও হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করলেন। হযরত ওমর নিজের উপার্জিত সামগ্রীর অর্ধেক এনে পেশ করলেন। হযরত আবু বকর নিজের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করলেন। আর বললেন, আমি আমার গৃহে আল্লাহ ও তার

www.nagorikpathagar.org

রাসূলকে রেখে এসেছি। দরিদ্র সাহাবীরা কষ্টে শিষ্টে মজুরী করে যা কিছু পেয়েছিলেন তা সবই এনে দিলেন। মহিলারা নিজেদের অলংকার খুলে দিলেন। প্রাণ উৎসর্গকারী স্বেচ্ছা সেবীদের বাহিনী চতুর্দিক হতে জমায়েত হতে লাগল। তারা দাবী করল, অস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা হলে আমরা আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

যারা যানবাহন পায়নি তারা কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং এমনভাবে নিজেদের প্রাণের কাতরতা প্রকাশ করতে লাগলেন। যা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে ব্যথা অনুভূত হল। বস্তুতঃ ঈমান ও মুনাফিকীর পার্থক্য সূচিত হওয়ার জন্য এ সময়টি, একটি নির্ভুল মানদ হয়ে দাঁড়াল। এ সময় কারো যুদ্ধ ময়দান হতে দূরে সরে থাকার অর্থই ছিল ইসলামের সাথে তার দূরবর্তী সম্পর্ক। এ জন্যে ঐসব মুনাফিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী জানিয়ে দেয়া হত।

নবম হিজরীর রজব মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বা ৩০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হন। এ বাহিনীতে ছিল দশ হাজার উষ্ট্রারোহী যোদ্ধা। উটের সংখ্যা এতই কম ছিল যে, এক একটি উটের পিঠে একাধিক লোক পালাক্রমে সওয়ার হয়েছিল। এর উপর ছিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম ও পানির অভাব। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রকৃত মুসলমানরা অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বের হন। তাবুকে পৌঁছার পরই মুসলমানরা নগদ ফল লাভ করেন। সেখানে পৌঁছে মুসলীম বাহিনী জানতে পারেন যে, কাইজার গুপ্তচরের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা জেনে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় আসতে সাহস করেনি। সীমান্ত পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে। কারণ মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী, কাফিরের লক্ষাধিক সৈন্যের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সে অবলোকন করেছিল। এ অভিযানে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে আগাত ৩০ বা ৪০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য এক বা দুই লক্ষ্য সৈন্য নিয়ে ময়দানে আসার মত সাহস রোম সম্রাটের ছিল না। মুসলমানদের রণকৌশল, ঈমানি জোর, সাহস এবং আত্মউদ্দীপনার কাছে রোমদের বিনা যুদ্ধে পরাজয় ঘটে।

কাইজারের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী শক্তির যে নৈতিক বিজয় সূচিত হয়, তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট মনে করলেন। ফলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অতিক্রম করে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করার পরিবর্তে, তাবুকে ২০ দিন অপেক্ষা করে রোম সম্রাজ্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলোতে সামরিক প্রভাব খাটিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত করদরাজ্যে পরিণত করে নিলেন। ফলে এর খ্রীষ্টান গোত্রপতি-আকিদার বিন মালেক, আযলার খ্রীষ্টান গোত্রপতি-ইউহানা বিন দুবা এবং মাকনা, জাররা, আজরাহসহ প্রভৃতি স্থানের খ্রীষ্টান দলপতিরা জিজিয়া আদায়ে মদিনা সরকারের আনুগত্য গ্রহণ করে। এভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি যেসব লোক তখন পর্যন্ত প্রাচীন জাহেলিয়াতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় দিন গুনছিল, তাদের মেরুদ সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়। সারা বিশ্বে মুসলমানদের জয়গান ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর শৌর্য বীর্য এবং বিজয় গাঁথার ইতিহাসের বুনিয়াদ রচিত হয় সারা বিশ্বে।

তাবুক হতে বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর চতুর্দিক হতে মহানবীর নিকট শান্তির প্রস্তাব আসতে আরম্ভ করে। বনু তামিম, বনু মুস্তালিক, বনু কিন্দা, বনু আজাদ, বনু তাঈ, প্রভৃতি বহু গোত্র ইসলাম কবুল করে। সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই এর পুত্র আদি বিন হাতেম এ সময় মুসলমান হন। বিখ্যাত কুরাইশ কবি কাব বিন যুহর ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের তাবুক হতে বিজয় বেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মুনাফিকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের নিকট এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও (সূরা তওবা ঃ ৯৫)। মুনাফিকদের মধ্যে এমন কিছু লোকছিল, যারা তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ গমনে অপারগতা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য তাবুকের জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বেশকটি ঘটনা ঘটেছিল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পূর্বেই পথিমধ্যে আল্লাহ তার হাবীবকে মুনাফিকদের বিশদ অবস্থা জানিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা যখন ফিরে এসে তাদের নিকট পৌঁছবে, তখন তারা নানা ওজর পেশ করবে। কিন্তু আপনি বলুন, ওজরের বাহানা করো না। আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ আমাদেরকে, তোমাদের অবস্থা বলে দিয়েছেন (সূরা তওবা ঃ ৯৪)। তোমরা ফিরে এলে তারা তোমাদের নিকট এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরায়ে নিবে। কেননা, তারা একটা কদর্য জিনিস। আর তাদের আসল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম (সূরা তাওবা ঃ ৯৫)। পাশাপাশি আল্লাহ তাবুক যুদ্ধে পিছনে পরে থাকা ঈমানদারদের ব্যাপারে বলেন, অপর তিনজনকেও তিনি মাফ করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মূলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। (সূরা তাওবা ঃ ১১৮)

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যা ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়ার পর, মহান আল্লাহ পিছনে পড়ে থাকা মু'মিনের দু'টি গ্রুপ বা দলের বর্ণনা দেন। একদল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আর কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও একটি মন্দ কাজ। আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন (সূরা আত তওবা ঃ ১০২)। অপর দল প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, কিছু লোক আরো রয়েছে, যাদের ব্যাপারটি আল্লাহর নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে। তিনি হয়তো তাদের আযাব দিবেন, না হয় তাদের ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ১০৬)

এছাড়া বাকী তিনজন প্রসঙ্গে আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করেন। যারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেনি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তারা নিজেদের দুর্বলতার কথা সত্য সত্য বলে দেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সমাজচ্যুত করেন। এমনকি তাদের সাথে সালাম কালামের আদান প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা যে কিরূপ ভয়াবহ হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলে দিচ্ছেন, অপর তিন জনকেও তিনি মাফ করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটা মূলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে দেখলেন, যাতে তারা ফিরে আসে (সূরা আত তওবা ঃ ১১৮)। এ তিন জন সাহাবী হলেন, হযরত কা'ব বিন মালেক, মুরারা বিন [illegible] ও হেলান বিন উমাইয়া (রা.)। এ তিনজনই আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং বাইয়াতে আকাবা ও বিভিন্ন যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দাওয়াতের কাজ এবং ইসলামের প্রচার তথা দ্বীন রক্ষার প্রয়োজনে সত্যিকারের জিহাদে বা ধর্মীয় যুদ্ধে, কোন মুসলমানই পিছে থাকতে পারবে না। কেউ যদি তা করে তবে, তা গুরুতর অন্যায়। ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় যুদ্ধে মুজাহিদদের স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। মুনাফিকরাই বিভিন্ন বাহানা বা কারণ দেখিয়ে জিহাদকে পরিহার করে। এর পরও যদি কোন দুর্বল ঈমানের মুসলমান এমন কাজ করে বসে, তবে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বয়কট করাই যুক্তি যুক্ত। এর পর সেসব দুর্বল ঈমানদারদের জন্য তওবার রাস্তা খোলা থাকবে। আল্লাহ চাইলে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। মহান আল্লাহ যেহেতু ক্ষমার মহাসাগর; তাই সত্যিকারভাবে তওবা করলে এমন গুরুতর পাপও মোচন হওয়া সম্ভব। অতএব দ্বীন প্রচারে, সংগ্রামে, জিহাদে অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফরয। এসবই তাবুক অভিযান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জ (দশম হিজরী, ৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ)

এক সময় পরিস্থিতি এমন হল যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে পূর্ণতা এসে গেছে। আল্লাহর রবুবিয়ত প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং অন্য সবকিছুর প্রভুত্বের বিলোপ সাধন হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসবের অদৃশ্য ঘোষক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেতনা ও মনোজগতে এ অনুভূতি জাগিয়ে দিচ্ছিল, যে পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'য়ায (রা.) কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা ও উপদেশের পর বলেন, হে মু'য়ায, সম্ভবত এ বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হয়তো এরপর তুমি আমার মসজিদ এবং কবরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে। হযরত মু'য়ায (রা.) একথা শুনে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে চিরবিদায়ের কথা ভেবে কাঁদতে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দাওয়াত ও তাবলীগের সুফল দেখাতে চাচ্ছিলেন। যে পথে তিনি দীর্ঘ বাইশ বছর দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন, তাকে দুঃখকষ্ট ভোগের সুফল দেখানোর ব্যবস্থা এভাবে হোক, তিনি যেন হজ্জের মাধ্যমে মক্কার প্রান্তে আরব গোত্রসমূহের সদস্য এবং প্রতিনিধিদের সাথে সমবেত হতে পারেন। এরপর তারা তাঁর কাছ থেকে দ্বীন ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। তিনি তাদের কাছ থেকে এ মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন, যেন তাঁর উপর অর্পিত আমানত তিনি আদায় করেছেন। আল্লাহর এরূপ ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সায়াহ্নে ঐতিহাসিক হজ্জে গমনের ইচ্ছা ঘোষণা করেন। তখন আরব মুসলমানরা দলে দলে মক্কায় পৌঁছতে শুরু করেন। সকলেই মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদাংক অনুসরণ করে তাঁর আনুগত্য মেনে নিবেন।

অতঃপর দশম হিজরীর শনিবার দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যিলকদ মাসের তখনো চার দিন বাকি। তিনি মাথায় তেল দেন। চুল আঁচড়ান। তহবন্দ বা লুঙ্গী পরেন। চাদর গায়ে জড়ান। কুরবানীর পশু সজ্জিত করেন এবং যুহরের পর মক্কার দিকে রওনা হন। আসরের আগেই তিনি যুল হুলায়ফা নামক জায়গায় পৌঁছেন। সেখানে

www.nagorikpathagar.org

আসরের দু'রাকাত নামায আদায় করেন। রাত যাপনের জন্যে তাঁবু স্থাপন করেন। সকালে তিনি সাহাবীদের বলেন, রাতে আমার মহান প্রভুর কাছ থেকে একজন আগন্তুক এসে বলেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন, হজ্জের মধ্যে ওমরা রয়েছে। এরপর যোহর নামাযের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের জন্যে গোসল করেন। হযরত আয়িশা (রা.) নিজ হাতে তার পবিত্র দেহে যারিরা ও মেশক মিশ্রিত সুগন্ধি লাগান। সুগন্ধির চমক তাঁর সিঁথি এবং পবিত্র দাড়িতে দেখা যাচ্ছিল। তিনি এ খোশবু ধৌত করেননি। যেমন ছিল তেমনি রেখে দেন। এরপর তিনি তহবন্দ (লুঙ্গী) পরিধান করেন। চাদর গায়ে দেন। যুহরের দু'রাকাত নামায আদায় করেন। পরে মোসাল্লায় বসেই একত্রে হজ্জ এবং ওমরার ইহরাম বেঁধে লাব্বায়েক আওয়ায দিয়ে বাইরে আসেন। পরে উটনীতে আরোহণ করে দু'বার লাব্বায়েক বলেন। উটনীতে চড়ে খোলা ময়দানে গিয়ে সেখানেও লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সফর অব্যাহত রাখেন। এক সপ্তাহ পর তিনি এক বিকেলে মক্কার কাছে পৌঁছে যী-তুওয়া নামক জায়গায় অবস্থান করেন এবং ফজরের নামায আদায়ের পর গোসল করে মক্কায় প্রবেশ করেন। সেদিন ছিল দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ; রোববার। মদীনা থেকে রওনা হওয়ার পর পথে আট রাত অতিবাহিত হয়। স্বাভাবিক গতিতে পথ চললে এরূপ সময়েরই প্রয়োজন হয়। মসজিদে হারামে পৌঁছে তিনি প্রথমে কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় সাঈ করেন, কিন্তু ইহরাম খোলেননি। কেননা তিনি হজ্জ ও ওমরার ইহরাম একত্রে বেঁধেছিলেন এবং নিজের সাথে কুরবানীর পশুও নিয়ে এসেছিলেন। তাওয়াফ এবং সাঈ শেষে তিনি মক্কার হাজুন নামক স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া কোনো তাওয়াফ করেননি।

তাঁর যে সকল সাহাবী কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসেননি, তিনি তাদের আদেশ দেন, তারা যেন নিজেদের ইহরাম ওমরায় পরিবর্তিত করে নেয় এবং কাবা ঘর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ শেষ করে পুরোপুরি হালাল হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে হালাল হচ্ছিলেন না, এ কারণে সাহাবীরা সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যা পরে জেনেছি, সেটা যদি আগে জানতাম, তবে কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত, তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। একথা শোনার পর

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীরা আনুগত্যে মাথা নত করেন। যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিল না, তারা হালাল হয়ে যান।

যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় গমন করেন। ৯ই যিলহজ্জ তারিখ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। পরে আরাফাত ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপর নামেরা প্রান্তরে পৌঁছে তাঁবু প্রস্তুত পান। তিনি সেখানে অবতরণ করেন। সূর্য ঢলে পড়লে তাঁর আদেশে কাসওয়া উটনীর পিঠে আসন লাগানো হয়। তিনি প্রান্তরের মাঝামাঝি স্থানে গমন করেন। সে সময় তাঁর চারদিকে এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লাখ মানুষের জনসমুদ্র বিদ্যমান ছিল। তিনি সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যাকে বিদায় হজ্জের ভাষণ বলা হয়। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'হে লোক সকল, আমার কথা শোনো, আমি জানি না, এবারের পর তোমাদের সাথে এ জায়গায় আর মিলিত হতে পারব কিনা।' তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্যে আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং বর্তমান শহরের মতোই নিষিদ্ধ। শোনো, জাহেলিয়াত যুগের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের খুনও খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যেকার প্রথম যে রক্ত আমি শেষ করছি তা হচ্ছে, রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের রক্ত। এ শিশু বনী সা'দ গোত্রে দুধ পান করছিল। সে সময় হোযারল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদ খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যেকার প্রথম যে সুদ আমি খতম করছি, তা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ শেষ করে দেয়া হল।

হ্যাঁ, নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তোমরা তাদের আল্লাহর আমানতের সাথে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের এটা অধিকার, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ কর না। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমরা তাদের প্রহার করতে পার। কিন্তু বেশী কঠোর প্রহার কর না। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভালোভাবে পানাহার করাবে এবং পোশাক দিবে।

তোমাদের কাছে আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। হে লোক

www.nagorikpathagar.org

সকল, মনে রেখ, আমার পরে কোন নবী নেই। তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। কাজেই নিজ প্রতিপালকের ইবাদাত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, সানন্দ চিত্তে নিজের ধন-সম্পদের যাকাত দিবে, নিজ প্রতিপালকের ঘরে হজ্জ করবে, নিজের শাসকদের আনুগত্য করবে। যদি এরূপ কর, তবে তোমাদের মহান প্রভু তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

তোমাদের আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা তখন কি বলবে? সাহাবী-রা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি পূর্ণাঙ্গ তাবলীগ করেছেন, হক পয়গাম পৌছে দিয়েছেন, কল্যাণ কামনার হক পুরোপুরি আদায় করেছেন। এ কথা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে, লোকদের দিকে ঝুঁকে তিন বার বলেন, ইয়া রাব্বাল আলামীন, তুমি সাক্ষী থেক। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহ রবিয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ উচ্চকণ্ঠে মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছিলেন। তিনি ভাষণ শেষ করার পর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা ঃ ৩)। হযরত ওমর (রা.) এ আয়াত শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, কাঁদছি এ জন্যে যে, পূর্ণতার পর তো অপূর্ণতাই শুধু বাকি থাকে। মহান আল্লাহই জানেন, বিশ্বনবীর সে ভাষণ কিভাবে লক্ষাধিক সাহাবী এক ময়দানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছেন। এটাও বিশ্বনবীর একটা মু'জেযা।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষণের পর হযরত বিলাল (রা.) আযান ও ইকামত দেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ান। এরপর হযরত বিলাল একামত দেন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আসরের নামায পড়ান। উল্লিখিত উভয় নামাযের মাঝে অন্য কোনো নামায আদায় করেননি। এরপর উটের পিঠে আরোহণ করে তাঁর অবস্থানস্থলে গমন করেন। সেখানে তিনি কাসওয়া উটনীর পেট চাতালের দিকে করে জাবালে মাশাত (পায়ে চলা লোকদের পথে অবস্থিত বালুকা স্তূপ) সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে লাগাতার (এ অবস্থায়ই) অবস্থান করেন। এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে যায়। সূর্যের হলুদ অবস্থা কিছুটা মিলিয়ে গিয়ে অতঃপর সূর্যগোলক পুরোপু-রি অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত ওসামা (রা.) কে পিছনে বসান এবং সেখান থেকে রওনা হয়ে মুযদালিফায় গমন

www.nagorikpathagar.org

করেন। সেখানে মাগরিব ও এশার নামায এক আযানে দুই একামতে আদায় করেন। মাঝখানে কোনো নফল নামায আদায় করেননি। এরপর তিনি শুয়ে পড়েন এবং ফজরের নামাযের সময় পর্যন্ত শায়িত থাকেন। ভোরের আলো উদ্ভাসিত হতেই আযান একামতের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর উটনীতে সওয়ার হয়ে 'মাশয়ারে হারামে' গমন করে কিবলার দিকে ফিরে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহর নামে তাকবীর ধ্বনি দেন; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং তাওহীদের কালেমা উচ্চারণ করেন। সকালে চারদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করেন। এরপর সূর্য ওঠার আগে আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) কে নিজের সওয়ারীর পিছনে বসান। 'বাতনে মুহাচ্ছারে' (আবরাহার সৈন্যদের উপর গযব অবতীর্ণ হওয়ার জায়গায়) পৌঁছে সওয়ারী জোরে চালান। এরপর মধ্যবর্তী রাস্তা, যা জামরায়ে কোবরার পথে বেরিয়ে গেছে, সে পথে চলে তিনি জামরায়ে কোবরায় পৌঁছেন। সে সময় সেখানে একটি গাছ ছিল। জামরায়ে কোবরা সে গাছের পরিচয়েও পরিচিত ছিল। জামরায়ে কোবরাকে জামরায়ে আকাবা এবং জামরায়ে উলাও বলা হত। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। প্রতিবার পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন। সেগুলো ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছিল। বাতনে ওয়াদীতে দাঁড়িয়ে তিনি এসব পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এরপর কুরবানীর জায়গায় গিয়ে নিজের হাতে ৬৩টি উট যবাই করেন। এরপর হযরত আলী (রা.) কে বাকি ৩৭টি উট যবাই করতে দেন। এভাবে একশ উট কুরবানী করা হয়। হযরত আলী (রা.) কেও তিনি নিজের কুরবানীতে শামিল করে নেন। এরপর তাঁর আদেশে প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরো করে গোশত নিয়ে একটি হাঁড়িতে রান্না করা হয়। তিনি এবং হযরত আলী (রা.) সে গোশত থেকে কিছু আহার করেন। তিনি গোশতের কিছু ঝোলও পান করেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কা মুয়াযযামায় গমন করে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফকে বলা হয় তাওয়াফে এফাযা। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায মক্কায় আদায় করেন। এরপর যমযম কূপের পাড়ে বনু আবদুল মুত্তালিবের কাছে গমন করেন। এ গোত্র হাজীদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিলেন।

সেখানে তিনি বলেন, হে বনু আবদুল মুত্তালিব, তোমরা পানি উত্তোলন কর। পানি উত্তোলনের কাজে অন্য লোকেরা তোমাদের পরাজিত করে দেবে, যদি এ আশংকা

www.nagorikpathagar.org

পোষণ না করতাম তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি উত্তোলন করতাম। সাহাবীরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি তুলতে দেখলে তারাও পানি তোলার চেষ্টা করতেন। ফলে হাজীদের পানি পান করানোর যে গৌরব এককভাবে বনী আবদুল মুত্তালিবের ছিল, সে ব্যবস্থা আর তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকত না। অতঃপর বনু আবদুল মুত্তালিবের লোকেরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বালতি পানি দেন এবং তিনি প্রয়োজনমত তা থেকে পান করেন।

সেদিন ছিল কুরবানীর দিন অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন চাশতের সময় একটি খোতবা প্রদান করেন। সে সময় তিনি খচ্চরের পিঠে আরোহিত ছিলেন। হযরত আলী (রা.) তার বক্তব্য সমবেত সাহাবীদের শোনাচ্ছিলেন। তাদের কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিনের ভাষণেও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের দিনের বক্তব্যের কিছু কিছু পুনরুল্লেখ করেন। বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবু বকর (রা.) এর বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াওমে নহর অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বলেন, 'যুগ ঘুরে ফিরে সে দিনের আকৃতিতে পৌছে গেছে। যে দিন আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চার মাস হচ্ছে হারাম। যার তিনটি একের পর এক আসে। যথা যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মহররম। অন্য একটি মাস হচ্ছে জমাদিউস সানী এবং শাবান মাসের মাঝামাঝি, সে মাসের নাম রজব।' এরপর আবু বকর বর্ণনা করেন; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন। আমরা তখন বুঝলাম, তিনি এ মাসের অন্য কোনো নাম রাখবেন। কিন্তু তিনি বললেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, কেন নয়? তিনি বললেন, এটা কোন শহর? আমরা বললাম আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি এ শহরের অন্য কোনো নাম রাখবেন, কিন্তু তিনি বললেন, এটি কি মক্কা শহর নয়? আমরা তখন বললাম, কেন নয়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দিনের পরিচয় কি? আমরা বললাম, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি এ দিনের অন্য কোনো নাম রাখবেন, কিন্তু তিনি

www.nagorikpathagar.org

বললেন, এ দিন কি ইয়াওমুন নহর (কুরবানীর দিন) - ১০ই যিলহজ্জ নয়? আমরা বললাম, কেন নয়? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা তবে শোন; তোমাদের রক্ত, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের ইযযত, আবরু, পরস্পরের জন্যে এরূপ নিষিদ্ধ ও সম্মানযোগ্য, যেমন তোমাদের এ শহর, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের আজকের এ দিন তোমাদের জন্যে সম্মানযোগ্য। তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে শীঘ্রই মিলিত হবে এবং তোমাদের নিজ নিজ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কাজেই লক্ষ্য রেখ, আমার পরে তোমরা এমন পথভ্রষ্ট হয়ো না যে, একে অন্যের ঘাড় মটকাতে শুরু করে দাও?। বল, আমি কি তাবলীগ করেছি? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেক। যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌছে দিবে। কেননা উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার এ বক্তব্য অধিক হৃদয়ংগম করবে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ভাষণে একথাও বলেছেন, 'স্মরণ রেখ', অপরাধী নিজের উপরই অপরাধ করে। সে নিজেই অপরাধের জন্যে দায়ী হবে। স্মরণ রেখ, কোনো অপরাধী পুত্র, নিজের পিতার উপর, কোনো অপরাধী পিতা, নিজের পুত্রের উপর অপরাধ করতে পারে না। পিতার অপরাধের জন্যে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্যে পিতাকে পাকড়াও করা হবে না। স্মরণ রেখ শয়তান এ মর্মে হতাশ হয়ে গেছে, এ শহরে আর কখনো তার উপাসনা করা হবে না। তবে নিজেদের যেসব কাজ তোমরা তুচ্ছ মনে করবে, সেসব শয়তানের আনুগত্যে সম্পন্ন হবে এবং তা দ্বারাই শয়তান সন্তুষ্টি লাভ করবে।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে তাশরীকে (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) মিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের রীতিসমূহ পালন করেন। সে সাথে জনসাধারণকে শরীয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেন। আল্লাহর যিকির করেন। মিল্লাতে ইব্রাহীমের সুন্নতসমূহ কায়েম করেন। শিরকের নিদর্শনসমূহ নির্মূল করেন। আইয়ামে তাশরীকের একদিন তিনি এ ভাষণ দেন। আবু দাউদে এ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ছারা বিনতে বিনহান (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রউসের দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং বলেন, এ দিন কি আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন নয়? তাঁর সেদিনের ভাষণও ছিল পূর্বের (কুরবানীর দিনের) ভাষণের অনুরূপ। এ ভাষণ সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর দেয়া হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

তাশরীকের শেষদিনে ১৩ যিলহজ্জ ইয়াওমুন নফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা থেকে রওনা করেন এবং আতবাহ উপত্যকার খায়ফে বনী কেনানায় অবতরণ করেন। দিনের বাকি অংশ এবং রাত সেখানেই কাটান। যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানেই পড়েন। অবশ্য এশার পরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন এবং উঠে সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে গমন করে বিদায়ী তাওয়াফ করেন। হজ্জের যাবতীয় কাজ শেষে তিনি সওয়ারী মদীনাভিমুখে চালনা করেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি বিশ্রাম নিবেন; উদ্দেশ্যে এমন ছিল না। বরং সেখানে গিয়ে আল্লাহর পথে ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগ এবং নতুন সংগ্রাম সাধনার সূচনা করবেন- এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সামরিক অভিযান (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ)

সমগ্র আরবে ইসলামের জয় জয়কার রব উঠে। সারা বিশ্ব শংকিত হয়। সুবিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের শাসকবর্গ ইসলাম এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের বেঁচে থাকার অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। এ কারণে রোম সম্রাটের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কারো ইসলাম গ্রহণ করা ছিল বিপদজনক। রোমের গভর্নর ফারওয়া ইবনে আমর জুযামীর ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকা অন্যদের জন্যেও প্রবল ছিল। রোমের শাসকদের এ ধরনের ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কারপূর্ণ আচরণের কারণে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাদশ হিজরীর সফর মাসে এক বিরাট বাহিনী তৈরীর কাজ শুরু করেন। বিশ্বনবী হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) কে এ বাহি-নীর সেনাপতি পদে নিযুক্তি দিতে আদেশ দেন। বলেন, বালকা এলাকা এবং দারুমের ফিলিস্তিনী ভূখ সওয়ারদের মাধ্যমে নাস্তানাবুদ করে এসো। রোমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের মনে সাহস সঞ্চার করাই ছিল সে পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, গির্জার বাড়াবাড়ি এবং স্বেচ্ছাচারিতার সামনে কথা বলার কেউ ছিল না। তাছাড়া একথা সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানান। সার্বিক বিবেচনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বড় সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন।

হযরত ওসামাকে (রা.) সেনাপতি নিযুক্ত করার কারণে কেউ কেউ সমালোচনা করে এ অভিযানে অংশ গ্রহণে বিলম্ব করেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যদি ওসামার সেনাপতিত্বের প্রশ্নে সমালোচনামুখর হও, তবে তো বলতেই হয়, ইতোপূর্বে তার পিতাকে সেনাপতি

নিযুক্ত করার সময়েও তোমরা সমালোচনামুখর হয়েছিলে। অথচ আল্লাহর শপথ, যায়েদ ছিল সেনাপতি হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন। এছাড়া সে ছিল আমার প্রিয়ভাজনদের অন্যতম। যায়েদের পর ওসামাও আমার প্রিয়ভাজনদের অন্যতম। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত ওসামার (রা.) আশপাশে সমবেত হয়ে তার বাহিনীতে শামিল হন। এ বাহিনী রওনা হয়ে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে মাকাতে যরফ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। অবশ্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পেয়ে তারা সামনে অগ্রসর হয়নি। আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় তারা সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পর ওসামার মিশন সাময়িক স্থগিত রেখে সবাই মদীনায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে আবু বকরের (রা.) খিলাফতের সময় এ অভিযান পুনরায় প্রেরণ করা হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর মদীনার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী

প্রথম হিজরী (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ প্রথম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে হযরত মুসয়াব ইবনে ওমায়র (রা.) কে দ্বিতীয়বার মদীনায় পাঠান। তিনি যাতে লোকদের তাওহীদ, আখিরাত, রিসালাত তথা কুরআন এবং দ্বীনের জরুরী বিষয়াবলী শিক্ষা দেন। তাঁর এই শিক্ষা দানের বরকতে বহু লোক মুসলমান হয়ে যান। বনু আবদে আশহালের গোটা কাবিলা একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কাবিলার নারী পুরুষ শিশুসহ কেহই এমন ছিল না যিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। প্রথম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাকাররামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাহ হিজরত করেন। এ মোবারক সফরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকত আদ দাইলী অংশগ্রহণ এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার, রবিউল আউয়ালের চন্দ্রিমা রাতে মক্কা মুকাররামাকে বিদায় জানিয়ে ছাওর পর্বতের দিকে রওনা হন। ছাওর পর্বতে তিন রাত অবস্থান করেন অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার রাত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কুবা বস্তিতে হাজির হন। সেখানে কয়েক রাত্রি অবস্থান করেন। সেখানে কুবা মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর শুক্রবার কুবা থেকে মদীনা পৌছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাত্রি কুবায় অবস্থান করেন। অতঃপর ২৩ রবিউল আউয়াল জু'মার দিনে মদীনায় এসে হাজির হন।

www.nagorikpathagar.org

যে রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মক্কা থেকে বের হয়ে ছাওর পর্বতের দিকে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন, সে রাতে একটি ঘটনা ঘটে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরের ঘরে ছিলেন। ঘরের লোকজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর জন্য সফরের সামান তৈরি করেন। একটি থলিতে কিছু খাবার সামগ্রী এবং একটি মশকে কিছু পানি ছিল। থলি এবং মশকের মুখ বাঁধার জন্য কোন রশি ছিল না। তখন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) তার কোমরের বেল্ট ছিড়ে দু'টুকরা করে একটি দিয়ে থলি এবং অপরটি দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দেন। এর ফলে তার উপাধি হয়ে যায় যাতুন নেতাকাইন অর্থাৎ দু'কমরবন্দওয়ালী।

প্রথম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। ছাওর গুহার মুখে মাকড়শা জাল বুনে রাখে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। এক জোড়া কবুতর গুহার মুখে ডিম পাড়ে। ফলে মাকড়শার জাল এবং কবুতরের ডিম গুহাটিকে একটি অব্যবহৃত ও শক্ত দুর্গে পরিণত করে দেয়। কাফিরগণ এতে বুঝে নেয় যে, এ গুহায় কোন লোক প্রবেশ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় আছে, 'কাফিরগণ বুঝতে পেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গুহায় থাকতেন তবে গুহার মুখে মাকড়শা জাল বুনতে পারত না এবং কবুতরও ডিম দিতে পারত না।'

একই রাত্রিতে ছাওর পর্বতে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি বিস্ময়কর মু'জেযা প্রকাশ পায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন গুহায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) তখন বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম এ অন্ধকার রাতে এ গর্তে আপনি আমার আগে প্রবেশ করবেন না। আমি প্রথমে প্রবেশ করি, যদি তাতে কোন সাপ বিচ্ছু অথবা বিষাক্ত জীব-জন্তু থাকে; তবে আমাকে কাটবে, আপনাকে না। সুতরাং হযরত আবু বকর (রা.) প্রথমে ভিতরে গেলেন। চারদিকে খোঁজ নিয়ে দেখলেন। সেখানে গর্তের ভিতরে অনেকগুলো ছিদ্র বিদ্যমান। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজ কাপড় ছিঁড়ে টুকরা দিয়ে সব গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু একটি ছিদ্র বাকী রয়ে গেল এবং তাঁর কাপড় নিঃশেষ হয়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) সে ছিদ্রে নিজ পায়ের গোঁড়ালী রেখে দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিতরে আসার আবেদন জানালেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে তাশরীফ নিয়ে যান। এক পর্যায়ে ঐ ছিদ্র থেকে একটি সর্প হযরত আবু বকর (রা.) কে দংশন করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামকে তিনি এ বিষয়ে অবহিত করলে, মহানবী নিজ মুখের লালা লাগিয়ে দেন। ফলে বেদনা এতটাই কমে গেল যে, যেন কোন বেদনাই ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন, 'আয় আল্লাহ আবু বকরকে কিয়ামতের দিন আমার সংগে আমারই স্তরে রাখুন।' আল্লাহ সাথে সাথে ওহী পাঠান। হে নবী ! আপনার দোয়া কবুল করা হয়েছে।

হিজরতের সফরের প্রাক্কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মা'বাদ (রা.)-এর তাঁবুর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। উম্মে মা'বাদ এর আরেক নাম আতিকা। তিনি কুদাইদে অবস্থান করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়েছিলেন। উম্মে মা'বাদ এবং তার স্বামী আবু মা'বাদ খেজায়ী ইসলাম এবং বাইয়াত গ্রহণ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মা'বাদের অনুমতিক্রমে তার বকরীর দুধ দোহন করেন। ছাগলটি অত্যন্ত দুর্বল এবং রুগ্ন ছিল। তাছাড়া ছাগলটি ছিল বাজি বা বন্ধ্যা। তার স্তনের মধ্যে দুধের নাম নিশানা ছিল না। তথাপি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড় পাত্রে দুধ দোহন করেন। সে দুধ নিজের সাথীদের পান করান এবং উম্মে মা'বাদকেও পান করতে বলেন। পরিশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দুধ পান করেন। পুনরায় এ পাত্রে দুধ বের করেন এবং উম্মে মা'বাদকে দুধ দিয়ে তিনি তাশরীফ নিয়ে যান। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফত কাল অর্থাৎ ১৮ হিজরী পর্যন্ত এ ছাগলটি সকাল বিকাল এভাবে দুধ দিতে থাকে। এটি বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময়কর মু'জেযার একটি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছাওর পর্বতের গুহা থেকে মদীনার পথে রওনা হন। তখন অনেক কাফির সমবেত হয়। কিন্তু কোন কাফির মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরতে সক্ষম হয়নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মে মা'বাদের তাঁবু থেকে রওনা করেন, তখন সুরাকা ইবনে মালিক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়। অভিশপ্ত আবু জেহেল এবং অন্যান্য কুরাইশ কাফিররা এ শর্ত রেখেছিল যে, যদি কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আবু বকর (রা.) কে হত্যা করতে কিংবা জীবন্ত ধরে আনতে সক্ষম হয়, তবে তাকে এক শত উট পুরস্কার দেয়া হবে। সুরাকা পুরস্কারের লোভে ঘোড়ায় চড়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছাকাছি চলে যায়। সে যখন মাত্র তিন গজ দূরত্বে চলে যায়, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!

www.nagorikpathagar.org

শত্রু আমাদের কাছে চলে এসেছে।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন।

'হে আল্লাহ আপনি আমাদের সহায়তা করুন, যেভাবে আপনি চান।' দোয়া শেষ হতে না হতে সুরাকা ঘোড়াসহ ভূমিতে ধ্বসে যায়। ফলে সুরাকা চিৎকার করে বলে উঠে, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আমি এ বিপদ থেকে রেহাই পাই, তবে আর কোনদিন এমন স্পর্ধা দেখাব না। আমি আপনার খবর কাউকে বলব না।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন এবং তার ঘোড়া মুক্তি পেয়ে যায়। সেখান থেকেই সে ফিরে যায়। সেদিন সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করেনি। মক্কা বিজয়ের পরে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধ শেষ করে আসেন, সেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে যান, বুরাইদা ইবনে হাসিব তার কওমের সত্তর-আশি জন লোক নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। তারা মক্কা মদীনার মধ্যখানে বাস করতেন। আবু জেহেল এবং অন্যান্য কুরাইশ কাফিররা তাদের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে ছিল যে যদি তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে পারেন তবে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। তারা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর পবিত্র জ্যোতির্ময় চেহারা দেখেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর বাণী শুনেন। যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত দেন। তখন হযরত বুরাইদা (রা.) তার সকল সংগী-সাথীসহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনা তৈয়িবাহ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে যান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে প্রথমে কুবায় দশ কিম্বা বার দিন অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ নির্মাণ কর্মকাে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অংশগ্রহণ করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মসজিদ। এ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় সে মসজিদ যার বুনিয়াদ তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, আপনি তাতে অবস্থান করার অধিক উপযুক্ত।' মসজিদ নির্মাণের ব্যস্ত তার দরুন ঐ কয়েকদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুবায় থাকতে

www.nagorikpathagar.org

হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে জু'মা পড়ান। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মিত এ মসজিদটি বনু সালিম ইবনে আওফের বস্তি কুবা এবং মদীনার মধ্যখানে ছিল। এটিকে মসজিদে জু'মা বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জু'মা এবং সর্বপ্রথম খুতবা। এ মসজিদ এখনও আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দিন কুবায় ছিলেন। অতঃপর কুবা থেকে মদীনা আসার পথে মধ্যখানে বনু সালিম ইবনে আওফের অনুরোধে এবং বরকতের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন। সেখানেই জু'মার আয়াত নাযিল হয়। তাই সেখানে জু'মা পড়েন এবং খুতবা দেন। এরপর উটে আরোহণ করে মদীনায় প্রবেশ করেন। অতএব জু'মার দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রবেশ করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনা শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশার্থে মদীনার নারী, পুরুষ এবং ছেলেমেয়েরা ঘর হতে বের হয়ে আসে। পর্দানশীল মহিলারা ঘরের ছাদে উঠে পড়ে। বনু নাজ্জার গোত্রের ছোট ছোট মেয়েরা কবিতা পাঠ করে। 'হে মহান ব্যক্তিত্ব! যাঁকে আমাদের মধ্যে নবী বানিয়ে পাঠান হয়েছে। আপনি এমন হুকুম আহকাম নিয়ে এসেছেন; যেগুলো পালন করা আমাদের জন্য জরুরী।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় শুভাগমন করেন তখন তিনি উষ্ট্রীর উপর আরোহী ছিলেন। মদীনার সকল অধিবাসী চাইতেন যেন মহানবী তাঁর গৃহে অবস্থান করেন। উষ্ট্রীর লাগাম ধরে সবাই নিজেদের প্রবল আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাচ্ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও, যেখানে আদেশ হবে উষ্ট্রী সেখানেই বসবে।' অবশেষে উষ্ট্রী হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা.) বাড়িতে গিয়ে বসে পড়ে। এ স্থানটি খুবই বরকতময়। লোকজন এর যিয়ারত করেন। মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের ফলে এ স্থানটি বর্তমানে মসজিদের অভ্যন্তরেই রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরে মেহমান হয়ে তাশরীফ নেন। এখানেই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা.) ঘরে অবস্থান করেই উম্মুল মুমেনীনদের জন্য হুজরা (কক্ষ) নির্মাণ করেন। এগুলো যখন নির্মিত হয়ে যায়, তখন তিনি সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যান। আবু আইয়ুব আনসারীর (রা.) বাড়িতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সাত মাস অবস্থান করেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, সেখানে এক মাসেরও

www.nagorikpathagar.org

কমসময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেন। হযরত আলী (রা.) তিনদিন পর হিজরত করেন। বিশ্বনবী তাকে জনগণের আমানত ফেরৎ দেয়ার জন্য মক্কায় রেখে এসেছিলেন। তিনি হিজরত করে কুবায় এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাক্ষাৎ করেন। হযরত আলী (রা.) যখন হিজরত করে কুবা পৌছেন; দ্রুত চলার কারণে তার পায়ে মারাত্মক ব্যথা বেদনা অনুভূত হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর ব্যথার জায়গায় হাত রাখেন ফলে ব্যাথা তৎক্ষণাৎ বিদূরীত হয়ে যায়। এরপর পরবর্তী জীবনে আর কখনও তার পায়ে ব্যথা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবায় অবস্থান করে আরবী তারিখ গণনা শুরু করার নির্দেশ দেন অর্থাৎ হিজরত দ্বারা তারিখ সূচনা করেন এবং হিজরী সনের প্রথম মাস মহররম নির্ধারণ করেন। আরবদের কাছে মহররম বছরের শুরু হিসেবে ধরা হয়। এ মাসেই হাজীগণ হজ্ব শেষে বাড়ি ফিরেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের কয়েকদিন পরে কয়েকজন সম্মানিত মহিলা হিজরত করেন। তারা হলেন, হযরত ফাতিমা (রা.) ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মুল মুমেনীন হযরত সওদা (রা.), মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধাত্রী উম্মে আইমান (রা.), মুসলিম জননী হযরত আয়িশা (রা.), তাঁর বোন আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), হযরত আয়িশার আম্মা উম্মে রুমান (রা.)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা পৌছার পর হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.) এবং হযরত আবু রাফেকে ঐসব মহিলাদের নিয়ে আসার জন্য মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন। তারা উভয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের সাত মাস পরে হিজরত করেন। হযরত আসমা (রা.) যখন মদীনায় পৌছেন তখন পরিপূর্ণ গর্ভবতী ছিলেন। কুবাতেই তার সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রথম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী এবং তার পবিত্রা স্ত্রীদের হুজরা নির্মাণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফে ইবনে আমরের ছেলে ছাহল ও সুহাইলের কাছ থেকে জমি খরিদ করে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে নববী নির্মাণের ইতিহাস অতি সুস্পষ্ট। মসজিদের পাশেই একটি ছায়াদার জায়গায় ছাপড়ার মত নির্মাণ করা হয়। যাতে মিসকীনগণ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। এ জায়গাকে 'সুফফা' বলা হয়। প্রথম হিজরীতে আযান এবং ইকামতের সূচনা হয়। প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রাব্বিহ

www.nagorikpathagar.org

আল আনসারী আল খাযরাজীকে আল্লাহ কর্তৃক স্বপ্ন যোগে আযান এবং ইকামতের নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়। অতঃপর এর সমর্থনে ওহী নাযিল হয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এর সত্যতার স্বীকৃতি দান করেন। অপর এক বর্ণনা মতে আযান এবং ইকামতের সূচনা দ্বিতীয় হিজরীতে হয়। হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, প্রথম হিজরীতে আযান এবং ইকামতের প্রচলনের বর্ণনা অধিক বিশুদ্ধ। হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম আযান দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) এর। তিনি প্রথমে ফজরের আযান দেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক আযানের যে শব্দাবলী শুনতে পেয়েছিলেন সেগুলো বলে যেতেন এবং হযরত বেলাল (রা.) উঁচু আওয়াজে তা আযান আকারে পেশ করেন।

প্রথম হিজরীতে এক রাখালের সংগে বাঘের কথা বার্তা হয়। বাঘ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সাক্ষী দেয়। এ রাখালের নাম ছিল আহ্বান ইবনে আওছ (রা.)। তাঁর উপনাম ছিল আবু আক্বাবাহ। রাখাল যখন বাঘের কথাবার্তা শুনে এবং তার সম্মুখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জেযা প্রকাশিত হয়, তখন সে বাঘকে বলে, যদি কেউ আমার ছাগলগুলো দেখাশুনা করত তবে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতাম। বাঘ বলে উঠে, 'তুমি যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাড়াতাড়ি ফিরে আস, তবে আমি এ সময়টুকু তোমার ছাগলের রাখালী করব।' রাখাল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাখাল, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে ঐ বাঘের ঘটনা ব্যক্ত করেন। ঘটনা শুনে মহানবী অত্যন্ত খুশি হন এবং তাকে ছাগলের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, বাঘ সত্যি সত্যি ছাগলের রাখালী করছে। এমনকি সকল ছাগল নিরাপদে আছে। হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা.) প্রথম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বপ্রথম মুহাজির সাহাবী যার দাফন হয় জান্নাতুল বাকীর গোরস্তানে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছেলে হযরত ইব্রাহীমের পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।

প্রথম হিজরীর জুমাদাল উলায় হযরত নো'মান ইবনে বশীর আল আনসারী আল খাযরাজীর জন্ম হয়। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহার ভাতিজা। তিনি সর্বপ্রথম আনসারী সন্তান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের

www.nagorikpathagar.org

পরে মদীনায় তার জন্ম হয়। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এর ছয় মাসের বড় ছিলেন। বিশ্বনবীর হিজরতের ছ'মাস পরে শাওয়াল মাসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) কুবায় জন্মগ্রহণ করেন। মুহাজির সাহাবার ঘরে মদীনা শরীফে তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। সীরাত বিষয়ের আলেমগণ বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় শুভাগমনের পরে যায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবু রাফে' (রা.) কে মক্কায় পাঠান যাতে করে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকরের (রা.) পরিবারবর্গকে মদীনায় নিয়ে আসেন। তারা সেখানে গেলেন এবং তাদেরকে নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে হযরত আসমা বিনতে আবু বকরও (রা.) ছিলেন। যিনি পূর্ণ গর্ভধারিণী ছিলেন। যখন তিনি কুবা এসে পৌঁছেন, তখন তার কোলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের ফলে মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশি হন। কারণ ইহুদীরা পূর্বেই সংবাদ প্রচার করে রেখেছিল যে তারা সাহাবায়ে কেরামকে যাদু করে রেখেছে। ফলে তাদের কোন ছেলে সন্তান হবে না। এরপর যখন আনসারদের মধ্যে প্রথম হযরত নোমান ইবনে বশীর জন্মগ্রহণ করেন। তখন মুসলমানগণ ভীষণ খুশি হোন। এ সময় ইহুদীরা বলল যে, আমরা মুহাজিরদের উপর যাদু চালিয়েছি, আনসারদের উপর নয়। অতঃপর যখন মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) সন্তান প্রসব করেন, তখন তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে রাখা হয়। মহানবী নিজ মুখের লালা নবজাতকের মুখে লাগিয়ে দেন। সর্বপ্রথম তার পেটে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের পবিত্র লালা প্রবেশ করে। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর এনে চিবিয়ে তার মাথার তালুতে লাগান। আরবীতে এটাকে তাহনীক বলে। অতঃপর তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। তিনি বিখ্যাত ও সম্পদশালী সাহাবী হয়েছিলেন।

হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) নিজ সন্তান হযরত আনাস (রা.) কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসেন যাতে তিনি মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমত করতে পারেন। আনসার সাহাবারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানা ধরনের হাদিয়া তোহফা দিতেন। পুরুষগণ যেমন, মহিলারাও তেমন। হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) তা দেখে খুবই ব্যথিত হলেন। কারণ তার কাছে হাদিয়া দেয়ার মত কিছুই ছিল না। অবশেষে তিনি নিজ সন্তান হযরত আনাসকে (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে আসেন এবং আরজ করেন, 'হুজুর! এ আপনার নগণ্য খাদিম। ওকে কবুল

www.nagorikpathagar.org

করুন।' তিনি একজন নামকরা সাহাবী হয়েছিলেন এবং বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নবীর দোয়ার বরকতে শতায়ু পান।

প্রথম হিজরীতে যাকাতের "নিসাব" পরিমাণ নির্ধারণ এবং যাকাত ফরযের বিধান নাযিল হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে, হিজরতের ছয় মাস পরে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর রুখসতী হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল নয় বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার বরকতে মহামারী এবং জ্বর রোগ মদীনা থেকে দূর হয়ে যায়। এর পূর্বে মদীনা ছিল বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক মহামারী অধ্যুষিত অঞ্চল। সেখানে মহামারীর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ছিল। দুর্বল মুহাজিরগণ এখানে আসার পর মারাত্মকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হতে থাকেন। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং মক্কার কথা তাদের বার বার মনে পড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদীনাকে এমন প্রিয় শহর করে দাও, যেমন মক্কা আমাদের কাছে প্রিয়। বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় এবং একে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর করে দাও, এর পরিমাপে বরকত দান কর। এখানকার জ্বর, জুহফার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ দোয়া কবুল করেন এবং মহামারী জুহফায় ফিরিয়ে দেন। জুহফায় ইহুদীরা বসবাস করত এবং মক্কা থেকে মদীনা আসার পথে মুহাজিরদের কষ্ট দিত। আল্লাহ এদের ধ্বংস করে দেন। এরপর তাদের বস্তি উজাড় হয়ে যায়। যা আজ পর্যন্তও আবাদ হয়নি। বলা হয় যে, আজ পর্যন্ত যে কেউ জুহফা প্রবেশ করলে তার তৎক্ষণাত জ্বর হয়ে যায়; যদিও সে মুসলমান হোক না কেন। এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার প্রভাব।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনা শুভাগমনের এক অথবা দু'মাস পরে নামাযের রাকাত বৃদ্ধি পায়। যুহর, আসর এবং এশার নামাযকে দু'রাকাতের স্থলে চার রাকাত করা হয়। এর আগে শবে মি'রাজে মাগরিবের নামায ছাড়া বাকী সকল নামায দু'রাকাত করে নির্ধারণ করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম থেকেই মাগরিব ছিল তিন রাকাত। পরবর্তীতে চতুর্থ হিজরীতে সফরকালীন সময়ের জন্য নামাযের রাকাত হ্রাস করে দেয়া হয় অর্থাৎ চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত করা হয়। সফরকালীন সংক্ষিপ্ত নামাযকে কসর বলে।

দ্বিতীয় হিজরী (৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ দ্বিতীয় হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা এবং হযরত ওসমান (রা.) এর স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা (রা.)

ইন্তিকাল করেন। তিনি রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যু বদর যুদ্ধের দু'দিন পরে হয়েছিল। ঘটনাক্রমে যে দিন হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) হযরত ওসমান (রা.), এর নিকট বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আসেন। সেদিনই হযরত রুকাইয়্যার (রা.) ইন্তিকাল হয়। এ সময় হযরত ওসমান (রা.) তার দাফনে ব্যস্ত ছিলেন। এ ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৯শে রমযান রোজ রবিবার। বদর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭ ই রমযান শুক্রবার। নবীকন্যার বয়স ছিল ২১ বছর। ২য় হিজরীতে ওবায়দা ইবনে হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল কুরশীর বাহিনীকে রাবেগ পাঠান হয়েছিল। সেখানে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ অভিযানে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর সেটা ছিল মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত সর্বপ্রথম তীর।

একই বছর বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়। এটা দ্বিতীয় হিজরীর মধ্যবর্তী রজব মাসে মঙ্গলবার দিনে হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় শুভাগমনের ঠিক সতের মাস পরের ঘটনা। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ ঠিক এমন সময় এসেছিল, যখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বনু সালামার মসজিদে যুহরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। দু'রাকাত নামায হয়ে যাওয়ার পর এ নির্দেশ আসে। সুতরাং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যেই কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বাকী দু'রাকাত বায়তুল্লাহর দিকে আদায় করেন। এ জন্য এ মসজিদের নাম মসজিদে ক্বিবলাতাইন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর আশুরার রোযা পালন করেন এবং এ রোযা পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ রোযাকে ওয়াজিব হিসেবে ঘোষণা করেন। অথচ একই তারিখে মক্কায় থাকাকালীন সময়েও নফল হিসেবে পালন করেছেন। দ্বিতীয় হিজরীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হয়, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। এরপর আশুরার রোযা পুনরায় নফল হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ জীবনের শেষ বছর বলেছিলেন, 'আমি যদি আগামী বছর জীবিত থাকি, তবে ১০ই মুহাররমের সাথে নয় তারিখের রোযাও পালন করব।' কিন্তু পরবর্তী রমযান আসার আগেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। অতএব, ১০ই মুহ-াররমের রোযার সংগে নয় বা এগার তারিখের আর একটি রোযা পালন করা মুস্ত াহাব। যাতে ইহুদী নাসারাদের সংগে অসামঞ্জস্য থাকে। মহররম বা আশুরার রোযার এটাই সর্বশেষ সুন্নাত বা মুস্তাহাব নিয়ম।

২য় হিজরীতে ক্বিবলা পরিবর্তনের একমাস পরে শাবানের ১৫ তারিখ রমযানের

রোযা ফরয করা হয়। আর এটা হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার ঠিক আঠারো মাস পরের ঘটনা। এই হিজরীতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ার হুকুম আসে। এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। 'মহান আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাকুল রহমত প্রেরণ করেন নবীর উপরে। হে ঈমানদারগণ তোমরা রহমত পাঠাও তাঁর প্রতি এবং সালাম পাঠাও, বল সালাম।' আল্লামা শামী লিখেছেন, এ হুকুম নাযিল হয় ১৫ই শাবান দ্বিতীয় হিজরীতে। ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের প্রস্তুতির পূর্বে নামাযে সালাম-কালাম অর্থাৎ কথা বার্তা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম নাযিল হয়। এর আগে নামাযে পরস্পরে কথাবার্তা বলা এবং সালাম ও তার জবাব দেয়া বৈধ ছিল। অতঃপর আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহর সামনে আদবের সাথে নীরবে দাঁড়িয়ে থাক। (বাকারা-২৩৮)।

২য় হিজরীতেই ঈদের নামাযের দু'দিন পূর্বে সদকায়ে ফিতরের হুকুম নাযিল হয়। তখনও যাকাত ফরয হয়নি। অধিক বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য উক্তি হচ্ছে যাকাত হিজরতের আগের বছর ফরয হয়েছিল। একই বছর ঈদের নামাযের হুকুম নাযিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লাঠি মোবারক গেড়ে দেয়া হয় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে সুতরা করে ঈদের নামায পড়ান। এটা ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম ঈদ। এ লাঠি মোবারক আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী, জুবায়র ইবনে আওয়ামকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ লাঠি উপহার হিসেবে দিয়ে ছিলেন। দুই ঈদে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে এলাঠিটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মাটিতে পুঁতে রাখা হত। একই বছর যিলহজ্ব মাসে ঈদগাহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার নামায পড়ান। এটা ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম ঈদুল আযহার নামায। এ বছর কুরবানীর নির্দেশ আসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায শেষ করে চাশতের সময় দু'টি ভেড়া কুরবানী করেন। ভেড়া দু'টি ছিল কাল এবং শিং বিশিষ্ট (ভেড়ার) খাসী। দুটি জন্তুই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে যবাই করেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে এবং অপরটি সকল উম্মতের পক্ষ থেকে। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর কুরবানী করেছেন।

এ বছর ১২ই সফর কাফিরদের সংগে যুদ্ধের অনুমতি আসে (হজ্জ-৩৯)। ইতোপূর্বে বাহাত্তরটি আয়াতে যুদ্ধ অবৈধ বলা হয়েছিল। কিন্তু উপরোক্ত আয়াত

www.nagorikpathagar.org

আগের নিষেধাজ্ঞাকে রহিত বা বাতিল করে দেয়। অতঃপর সূরা তওবার 'আয়াতে সাইফ' নাযিল হলে জিহাদ ফরয হয়ে যায়। এ আয়াতে বলা হয়েছে 'মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, ওদের ধর, বেঁধে ফেল, ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক' (সূরা তওবা-৫)। উক্ত আয়াতটি এর আগের নাযিলকৃত একশত বিশ আয়াতের রহিতকারী। কারণ এর দ্বারা জিহাদ ফরয করে দেয়া হয়েছে। এর আগের আয়াতসমূহে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। কিংবা কাফির যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে তার প্রতিরোধ হিসেবে যুদ্ধ করা জায়েয ছিল অর্থাৎ যুদ্ধের মোটামুটি অনুমতি থাকলেও তা ফরয ছিল না। ২য় হিজরীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) এর নখলায় প্রেরিত অভিযানে গনীমত অর্জিত হয়। এ ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গনীমত। ২য় হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) এর অভিযানে আমর ইবনে আলা হাযরামী নামক একজন কাফির নিহত হয়। সেছিল মুসলমানদের হাতে নিহত সর্বপ্রথম কাফির। একই অভিযানে দু'জন কাফির বন্দী হয়। তারা ছিল সর্বপ্রথম বন্দী কাফির সৈন্য। (১) হেকম ইবনে কাইসান (২) ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ। হেকাম ইবনে কাইসান ইসলাম গ্রহণ করে, পরবর্তীতে অত্যন্ত পাকা ঈমানদার মুসলমান হিসেবে সাব্যস্ত হোন। কিন্তু ওসমান মুক্তি পেয়ে মক্কায় চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

যদিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) কে ইসলামী বাহিনীর সর্বপ্রথম আমীর মনোনীত করা হয়েছিল। তবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, ইসলামের অভিযানের সর্বপ্রথম আমির ছিলেন হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)। মুশরিকগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) এবং তাঁর বাহিনীর উপর এ অভিযোগ দিয়েছিল যে, মুসলমানগণ সম্মানিত মাসের মর্যাদা রক্ষা করেননি। পবিত্র মাসেও তারা রক্তপাত করেছেন। অতএব এ পাপের ভাগী হবে তারা। এ কথা শুনে সাহ-াবায়ে কেরাম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ঈমান, আমাদের হিজরত, আমাদের জিহাদের উপর আমরা কি আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারি না?' তখন আল কুরআনে আয়াত নাযিল হয় 'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে- নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর রহমতের আশা রাখতে পারে এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং খুবই দয়াময়।' (সূরা বাকারা-২৮)

২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হামদ ও শুকরিয়া আদায় করেন। দু'রাকাত শোকরানার নামায আদায় করেন। বদর যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে বন্দী কাফির সৈন্যদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করে তাদের মুক্ত করার পরার্মশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) ফিদিয়া বা মুক্তিপণের পক্ষে রায় দেন। হযরত ওমর (রা.) এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মত দেন। 'ওদের নিকট থেকে ফিদিয়া নেয়া নয় বরং ওদের হত্যা করাই যুক্তিযুক্ত। যাতে পৃথিবী আল্লাহর শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত হয়।' সবশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিদিয়া নিয়ে তাদের মুক্তি দানের ফায়সালা দেন। এতে করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কতা আসে এবং হযরত ওমরের (রা) পরামর্শের পক্ষে আয়াত নাযিল হয় 'যদি আল্লাহর এটি লিখিত সিদ্ধান্ত না হত, তবে তোমরা যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তাতে তোমাদের উপর কোন বড় শাস্তি এসে পড়ত।'

বদর যুদ্ধে তিনজন মুসলমান অর্থাৎ হযরত হামযা (রা.) ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং ওবায়দা ইবনে হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তিন মুশরিক সৈন্যের সামনাসামনি মোকাবেলায় ময়দানে আসেন। মুশরিক তিনজন হল ওতবা, শাইবা এবং ওলীদ ইবনে ওতবা। মল্লযুদ্ধে হযরত আলী (রা.) ওলীদকে হত্যা করেন। হযরত হামযা (রা.) শাইবাকেও হত্যা করেন। অতঃপর উভয়েই হযরত ওবায়দার সাহায্যে এগিয়ে যান এবং উতবাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। এ ছয়জন সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। 'এ দু'পক্ষে যারা দু'বার তাদের প্রভুর মতবিরোধ করেছে, অতএব যারা ছিল কাফির এবং তাদের জন্য আগুনের কাপড় কাঁটা হবে।'

বদর যুদ্ধে আবু জেহেল ইবনে হেশাম নিহত হন। তাকে মায়ায এবং মুয়াওয়ায (যারা ছিলেন আফরার দু'সন্তান) হযরত মায়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহের সহায়তায় হত্যা করেন। যুদ্ধ শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দেখে এসো আবু জাহলের কি ঘটেছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তার খোঁজে বের হন। তিনি কাফিরদের মৃত লাশের পাশে দেখতে পেলেন তখনও তার শরীরে জীবনের সামান্য স্পন্দন বাকী রয়েছে। তিনি আবু জেহেলের বক্ষে চড়ে বসেন এবং তরবারী দিয়ে তার মাথা কেঁটে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রেখে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে খুশি হন এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়াস্বরূপ সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

বদর যুদ্ধে কাফির পক্ষের ৭০ জন নিহত হয়। তাদের বড় বড় প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে ছিল-উমাইয়া ইবনে খালফ, ওতবা ইবনে রবীয়া, শাইবা, ওলীদ ইবনে ওতবা, তোয়াইমা ইবনে আদী, জুমায়া ইবনে

www.nagorikpathagar.org

আসওয়াদ, হারিস এবং আকিল (আসওয়াদের পুত্রদ্বয়), আবুল খাইরী নাবিহ এবং মুনাব্বিহ (আপন সহোদর), আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসওয়াদ মাখজুমী এবং আরো অনেকে। এ যুদ্ধে ৭০ জন কাফির বন্দী হয়। যেমন-সুহাইল ইবনে আমর আলকুরশী আবুদায়াহ ইবনে সুবরাহ। মুত্তালিব ইবনে আবু দুদায়াহ, হানজালা, আমর, সখর ইবনে হারব, আবুল আস ইবনে রবীয়, আব্দুল উজ্জা ইবনে আবদে শামছ, ইবনে আবদে মানাফ আলকুরশী, ওতবা ইবনে আবি মুয়ীত, নজর ইবনে হারিছ।

বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসসাফরা পৌছান তখন হযরত আলীকে (রা.) নির্দেশ দেন, 'নজর ইবনে হারিছকে হত্যা কর।' তিনি তখনই এ পাপিষ্ঠকে হত্যা করেন। আবার যখন আজজাবিয়্যাহ পৌছেন তখন আমীর ইবনে ছাবিত (রা.) কে নির্দেশ দেন, ওকবা ইবনে আবু মুয়ীতকে হত্যা কর। সুতরাং তাকেও হত্যা করা হয়। এ সেই নজর ইবনে হারিছ, যে বিভিন্ন দেশ থেকে মিথ্যা কল্পকাহিনী ক্রয় করে সংগ্রহ করত এবং মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোকাবেলায় কেচ্ছা কাহিনী বলে বেড়াত অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কে উপহাস করত। বিদ্রূপ করে বলত, লও আমি তার চাইতে ভাল গল্প তোমাদের উপহার দিলাম। আল-কুরআনে তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছিল, 'আর কোন কোন লোক এমনও আছে যে, ঐসব জিনিসের ক্রেতা হয়ে থাকে, যা আল্লাহ থেকে মানুষকে গাফিল করে রাখে। যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে না বুঝে শুনে পথভ্রষ্ট করে এবং এসব নিয়ে উপহাস করে। এমন সব লোকের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি।' (সূরা লুকমান-৬১)

২য় হিজরীর বদর যুদ্ধের সাতদিন পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু লাহাব কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর হয় 'মদছা' নামক এক জটিল এবং নিকৃষ্ট চর্মরোগে। তার সমস্ত শরীরে মসুরীর ডালের মত দানা দানা দেখা দেয়। আরববাসী এ রোগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করত। তাদের মতে এ ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট সংক্রামক রোগ। তার লাশকে লাঠি দিয়ে সরিয়ে পাথরচাপা দেয়া হয়। বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আরও তিনদিন অবস্থান করেন। তিনি তৃতীয় দিন ঐ গর্তের কাছে আসেন; যেখানে কাফিরদের মৃতদেহসমূহ ফেলা হয়েছিল। গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমাদের সংগে আমাদের মহান রব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা বাস্তবে তা পেয়েছি। সুতরাং তোমাদের প্রভু তোমাদের সংগে যে ওয়াদা করেছিলেন, তোমরাও কি বাস্তবে সেটা সঠিক পেয়েছ?' অতঃপর মহানবী উপস্থিত

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি যা কিছু বললাম, তোমাদের চেয়ে তারা (নিহত কাফির) আরো ভালভাবে শুনতে পেয়েছে, কিন্তু জবাব দিতে তারা অক্ষম।' (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে বদর যুদ্ধে বন্দী করা হয়। তখন তিনি তখন ছিলেন কুরাইশ কাফিরদের দলভুক্ত। যখন মুক্তিপণ আদায় করে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়; তখন আব্বাস আপত্তি করে বলেন, তার কাছে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ দেয়ার মত কোন সম্পদ নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঐ স্বর্ণ থেকে আদায় করে দিন, যে স্বর্ণ বদরের যুদ্ধে আসার সময় আপনার স্ত্রীর উপস্থিতিতে নিজের ঘরের মেঝেতে পুতে রেখেছেন এবং তাকে অসিয়্যত করেছেন। এ যুদ্ধে যদি আমার কিছু ঘটে যায় তবে এ স্বর্ণ আমার তিন ছেলে ফযল, আব্দুল্লাহ এবং ক্বাসিমকে ভাগ করে দিও।" এ বক্তব্য শুনে হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আপনি সঠিক বলেছেন। এবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। কারণ, আমি এবং আমার স্ত্রী উম্মুল ফযল ছাড়া অন্য কেউ এ ঘটনা জানে না। আমি নিশ্চিত যে আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে, আপনি এ ঘটনা জানতে পেরেছেন। এ ঘটনাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের মূল কারণ হয়েছিল।

বদর যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর, হযরত ওমায়র ইবনে ওহহাব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কুরাইশের শয়তানদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনায় আসেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবার মক্কায় ফিরে যান এবং মক্কার কাফিরদের এমনি যাতনা দিতে থাকেন, যেভাবে ইতোপূর্বে সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের উপলক্ষ্য হল যে; তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সংগে হাতিমে কা'বায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার গোপন পরামর্শ করেছিলেন। যা এতই গোপন ছিল যে তৃতীয় ব্যক্তি তা জানতো না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাকে এ পরামর্শের বিষয় অবগত করেন। এতে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত এবং রিসালতের উপর তাঁর বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

২য় হিজরীর সফর মাসের শেষের দিকে হযরত ফাতিমার (রা.) শাদীর আক্বদ অনুষ্ঠিত হয়। এ হচ্ছে হযরত আয়িশার (রা.) রুখছতীর সাড়ে চার মাস পরের ঘটনা। হযরত ফাতিমার বয়স ছিল উনিশ বছর দেড় মাস। প্রসিদ্ধ উক্তি মতে

কাবা শরীফ মেরামতের সময় হযরত ফাতিমার (রা.) জন্ম হয়েছিল। আর তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ৩৫ বছর। বিয়ের সময় তখন হযরত আলীর (রা.) বয়স ছিল ২৪ বছর দেড় মাস। কারণ তাঁর জন্মের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ত্রিশ বছর।

তৃতীয় হিজরী (৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ৩য় হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রা.) এর কন্যা মুসলিম জননী হযরত হাফছা (রা.) কে শাদী করেন। সর্বাধিক বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী এটি শাবান মাসের ঘটনা। হযরত হাফছার (রা.) প্রথম স্বামী খুলাইস ইবনে হুজাফার ইন্তিকাল উহুদ যুদ্ধের পূর্বে হয়েছিল। তার মৃত্যুর কারণ ছিল আঘাত, যা তিনি বদর যুদ্ধে পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় বদর এবং উহুদের মধ্যবর্তী সময়ে। এ হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম জননী হযরত জয়নাব বিনতে খুজাইমাকে শাদী করেন। তিনি অত্যধিক দাতা ছিলেন বলে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন বলা হত। উম্মুল মাসাকীন অর্থ অসহায় দরিদ্রের মা। তার প্রথম স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর যিলহজ্ব মাসের শেষের দিকে তার সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে দুই বা তিন মাস কাটানোর পর, ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী মাসে ইন্তিকাল করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে কেবলমাত্র হযরত খাদীজা (রা.) এবং হযরত যয়নাব (রা.) এর মৃত্যু হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায়। কোন কোন মতে হযরত রায়হানাও (রা.) মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। রবিউল আউয়াল মাসে হযরত ওসমান (রা.) এর শাদী হয় নবী দুলালী হযরত সায়্যিদা উম্মে কুলসুমের (রা.) সংগে। তাযকিরাতুল ক্বারী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত জয়নাবের পরে এবং হযরত ফাতিমার আগে জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসেবে তাঁর জন্মের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিল ৩৪ বছর। এক বর্ণনায় তৃতীয় হিজরীতে মদ নিষিদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে আল কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

একই বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) কে ইহুদীদের লিখিত ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, 'আমি ওদের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। আমার চিঠিপত্রের মধ্যে তারা ঝামেলা করতে

www.nagorikpathagar.org

পারে।' একই বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতুর রেকার যুদ্ধে সালাতুল খওফ নামায আদায় করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, খাওফের নামায আসফান বা যিকিরদের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছিল। আর এ দুটি যুদ্ধ ৬ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উহুদের যুদ্ধের পর এ হুকুম নাযিল হয় যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য নাওহা বা বিলাপ করা, চেহারায় আঘাত করা, বক্ষ ছিঁড়ে ফেলা হারাম। এর আগে তা হারাম ছিল না। উল্লেখ্য যে, ওহুদের শহীদানের জন্য মহিলারা নাওহা এবং মাতম করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন এবং দেখেন হামযার জন্য কাঁদার মত কেউ নেই। কাজেই মহিলারা অন্যান্য শহীদানের মত হযরত হামযার জন্যও কাঁদতে থাকেন। কান্নাকাটির এ অনুষ্ঠান যখন সমাপ্ত হয় তখন নাওহা নিষেধ করে দেয়া হয়। এটাই আল কুরআনের নির্দেশনা।

এ বছর উহুদের যুদ্ধের পর মুশরিকরা হযরত হামযার (রা.) লাশ মোবারককে মুছলা অর্থাৎ বিকৃত করে। কান, নাক ইত্যাদি কেটে ফেলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'আমি এর বদলায় তোমাদের সত্তর জনের মুছলা করে ছাড়ব।' এ কথার প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, 'যদি বদলা নিতে হয় তবে এতটুকুই কর, যতটুকু তোমাদের সংগে আচরণ করা হয়েছে।' উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী, মুসলমানগণের কার্যক্রম, মুশরিকদের ধমক প্রদান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে ষাটটি আয়াত নাযিল হয়। (সূরা আলে ইমরান-১২১-১৮১)। উহুদ যুদ্ধের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযার (রা.) জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর অন্যান্য শহীদানের কফিন বা জানাযা এক একজন করে হযরত হামযার (রা.) লাশের পাশে এনে রাখা হয় এবং জানাযা নামায পড়া হয়। এমনিভাবে হযরত হামযার জানাযা ৭০ বার পড়া হয়। তার অর্থ এ নয় যে হযরত হামযার জানাযার নামায সত্তরবার পড়া হয়েছে। বরং প্রত্যেক শহীদের জানাযার নামায আলাদা আলাদা পড়া হয়েছে। প্রত্যেক শহীদের সংগে হযরত হামযার (রা.) লাশ ওছিল। কাজেই হযরত হামযার জানাযা সত্তর বার পড়া হয়েছে ধরা যায়।

বিশুদ্ধ সূত্রমতে ৪র্থ হিজরীতে মদ নিষিদ্ধ করার সময় এ আয়াত নাযিল হয়েছিল, 'হে ঈমানদারগণ! আসল কথা হল যে, মদ এবং জুয়া এবং মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর এগুলো নিকৃষ্ট ব্যাপার, শয়তানের কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থেকো; যাতে তোমাদের কল্যাণ হয়। শয়তান তো এটা চায় যে, মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে হিংসা, হানাহানি সৃষ্টি করে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ

www.nagorikpathagar.org

এবং নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখে। অতএব এখনও কি তোমরা বিরত হবে না?' (সূরা আল মায়েদা ৯০-৯১)। এ বছর যখন মদ হারাম ঘোষণা করা হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন উহুদের শহীদান সম্পর্কে অর্থাৎ কতিপয় সাহাবা উহুদের যুদ্ধের দিন মদ পান করেছিলেন। অতঃপর শহীদ হয়ে যান। তবে তারা কি পাপী হবেন? যেহেতু তখন পর্যন্ত মদ নিষিদ্ধ হয়নি তাই তাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। 'যারা ঈমান নিয়ে এসেছে এবং নেক আমল করেছে; তারা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যা পান করেছে তাতে তাদের গোনাহ হবে না।' (সূরা মায়েদা-৯৩)

এ বছর এবং মতান্তরে অষ্টম হিজরীতে সালাতুল খওফ এর বিধান নাযিল হয়। এ বছর এক ইহুদী যুগলকে পাথর মারা হয়েছে তাদের অপকর্মের (ব্যভিচারের) জন্য। এ বছর জুমাদাল উলায় হযরত আবু সালামা আব্দুল্লাহ আব্দুল আসাদ আল কুরসী আল মাখজামী (রা.) ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাম্পত্যে আসার পূর্বে তার গৃহে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং ৮ জুমাদাল উখরা চতুর্থ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আবু সালামার ইন্তিকালের পর হযরত উম্মে সালামা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করেন। তার পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে তার আক্বদ হয়। শাওয়ালের শেষদিকে চতুর্থ হিজরীতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে আসেন।

তোয়ায়মা ইবনে উবাইরিক নামক মুনাফিক হযরত কাতাদা ইবনে নোমান আল আনসারীর (রা.) ঘর থেকে ঢাল চুরি করে নিয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। সে পলায়ন করে মক্কায় চলে যায়। সেখানেও চুরি করে। মক্কাবাসী তাকে হত্যা করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবাদ জানিয়ে জানতে চাইলেন যে, হাত কাটার পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হল কেন? তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আয়াত নাযিল করেন, 'আপনি বিতর্কে জড়াবেন না। ওদের পক্ষ হয়ে, যারা নিজেদের জীবনের খেয়ানত করে থাকে।' (নিসা-১০৭)

৪র্থ হিজরী (৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ৪র্থ হিজরীতে বিরে মাউনায় এক হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়। এ অভিযানে ৭০ জন সাহাবী দাওয়াত ও তাবলীগে অংশ নিয়েছিলেন। একজন ছাড়া সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। বিরে মাউনার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর ফজরের নামাযের পরে এক মাসব্যাপী কুনুতে নাযেলার দোয়া পাঠ করা হয়। উক্ত দোয়ার মধ্যে অভিযুক্ত জালিম কাবিলাসমূহের নাম ধরে

www.nagorikpathagar.org

ধরে বদ দোয়া করা হয়। কাবিলাগুলো হচ্ছে, আসম, যাকওয়ান, ওকবা ও লাইহান। অতঃপর আয়াত নাযিল হয়, '(হে নবী) আপনার এ বিষয়ে কোন এখতিয়ার নেই। আপনাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন, অথবা তাদের শাস্তি প্রদান করেন।' (সূরা আলে ইমরান-১২৮)। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনুতে নাযেলা পাঠ করা বন্ধ করে দেন (বুখারী শরীফ)। একই বছর সফর মাসে হযরত খুবাইব ইবনে আদী (রা.) এবং যায়েদ ইবনে দাতনা (রা.) মক্কায় শহীদ হন।

এ হিজরীতে হযরত খুবাইব (রা.) কে হত্যার পূর্বে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দু'রাকাত নামায আদায় করা সুন্নত সাব্যস্ত হয়। যাকে অন্যায়ভাবে জোর করে হত্যা করা হয় সে দু'রাকাত সুন্নাত নামায পড়ে নিবে। এটা এজন্য সুন্নত যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় এটা করা হয়েছে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজকে পছন্দ করেছেন। এ বছর মক্কার মুশরিকরা হযরত খুবাইব (রা.) কে তানয়ীম নিয়ে জীবন্ত শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান যাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। কাফিরগণ যখন তাকে শূলে চড়ায় তখন তার মুখ কিবলার দিক থেকে সরিয়ে দেয়। অথচ শূলের সে লাকড়ী খ টি অটোমেটিক কিবলার দিকে ফিরে আসে। এ ঘটনাটি তার কারামাত হিসেবে বিবেচিত হয়। তাকে যে নরাধম হত্যা করেছিল তার নাম ছিল, আবু সারুয়া ওকবা ইবনে হারিছ। অথচ পঞ্চম হিজরীতে আবু সারুয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত খুবাইব (রা.) এর বীরত্বপূর্ণ শাহাদাতের ঘটনা জানতে পেরে বলেছিলেন, 'কে আছ! যে খুবাইবকে শূলে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে?' হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম এবং মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) দাঁড়িয়ে আরজ করেন, 'আমরা নিয়ে আসব।' সুতরাং উভয়েই সফরের প্রস্তুতি নিলেন এবং হযরত খুবাইবকে (রা.) শূলে চড়ানোর চল্লিশ দিন পরে রাতের বেলা তানয়ীম পৌঁছেন। দেখতে পেলেন, তাঁর লাশ সম্পূর্ণ তাজা টাটকা রয়েছে, যেন আজই ইন্তিকাল করেছেন। তার হাতে জখম রয়েছে। সেখান থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। রং ছিল রক্তের এবং সুগন্ধি ছিল মিশকের। মক্কার সত্তরজন কাফির শুয়ে শুয়ে লাশ প্রহরা দিচ্ছিল। তারা দু'জন মিলে শূল থেকে লাশটি নামিয়ে নিয়ে আসেন। অতপর লাশ হযরত আলী (রা.) এর ঘোড়ার উপর রেখে মদীনায় নিয়ে আসেন।

www.nagorikpathagar.org

সফরকালীন সময়ে ক্বসর নামাযের বিধান সম্বলিত আয়াত এ হিজরীতে নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে 'আর তোমরা যখন সফরে যাও, তখন নামায কসর করতে কোন বাঁধা নেই' (সূরা নিসা-১০১)। ৪র্থ হিজরীর পহেলা যিলক্বাদ তারিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা.) কে বিয়ে করেন। কোন কান সূত্র মতে সেটা পঞ্চম হিজরীতে হয়েছিল। হযরত যয়নবের তখন বয়স ছিল পয়ত্রিশ বছর। মুসলিম জননীগণের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম মদীনায় ইন্তিকাল করেন। এ হিজরীতে হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রুখসতীর দিনে পর্দার হুকুম নাযিল হয়। কারো কারো মতে এটা ছিল পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। তবে প্রথম উক্তি অধিকতর বিশুদ্ধ।

পঞ্চম হিজরী (৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ৫ম হিজরীর মহররম মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায়হানা বিনতে মায়মুনাকে শাদী করেন। তার সম্পর্ক ছিল বনু নযীরের সংগে। তিনি ছিলেন বনু কুরাইযার যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য নির্বাচন করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আজাদ করে নিজ দাম্পত্যে নিয়ে আসেন। একই বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পরে মুসলিম জননী হযরত জুয়াইরিয়াহ (রা.) কে শাদী করেন। তিনি বনু মুস্তালিকের নেতা হযরত হারিস ইবনে জেরারের কন্যা ছিলেন। এক উক্তি মতে, এই বিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হয়েছিল। এ বছর উম্মুল মুমেনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা হারিস ইবনে জেরার মুস্তালিকের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

খন্দক যুদ্ধের শেষ দিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মু'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশিত হয় অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়া কবুল হয়। মহান আল্লাহ প্রচ ঘূর্ণিঝড় এবং হিমেল বাতাস চালিয়ে দেন। ফলে কাফিরদের তাঁবু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। তদুপরি মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দেন। যারা অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে নারায়ে তকবীর ধ্বনি দেয়। এ দৃশ্য দেখে কাফিরদের চেতনা-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে গেলে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করাকেই নিরাপদ মনে করে। আর এটা ছিল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার ফসল। পবিত্র কুরআন সেদিকেই ইংগিত করেছে, 'অতঃপর আমি তাদের প্রতি এক ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত করলাম এবং এমন এক বাহিনী পাঠালাম যা তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল'

www.nagorikpathagar.org

(সূরা আল আহযাব-৯)। 'আর আল্লাহ কাফিরদের বিচলিত করে সরিয়ে দেন ফলে, তাদের কোন প্রত্যাশা পূরণ হল না। আর যুদ্ধে মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট ছিলেন।' (সূরা আল আহযাব-২৫)

৫ম হিজরীতে বনু কুরাইযার যুদ্ধে হযরত খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ ইবনে ছালাবা আল আনসারী আল খাযরাজী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। বনু কুরাইযার বান-ানাহ নামক এক মহিলা তাঁর প্রতি লোহার দরজার পাট নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, 'তিনি দুই শহীদের ছাওয়াব পাবেন।' খুনের বদলায় সে মহিলাকে হত্যা করা হয়। হতভাগা এ মহিলাটি ছাড়া, অন্য কোন যুদ্ধে কোন মহিলাকে হত্যা করা হয়নি। কুরাইযার এ যুদ্ধে হুয়াই ইবনে আখতার নামের ইহুদী কাফির নিহত হয়। সেছিল ইহুদীদের প্রধান এবং মুসলিম জননী হযরত সুফিয়ার (রা.) পিতা। সে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মারাত্মক হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করত। আল্লাহ তাকে কুফরীর অবস্থায় মৃত্যু দেন।

কুরাইযার যুদ্ধের সময় হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির আল আনসারী আল আওসী (রা.) এর তওবা কবুল হয়। যুদ্ধে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী হলেন এবং তিনি বুঝতে পেলেন যে তার রেহাই পাওয়ার আর কোন সুযোগ নেই। তখন তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দরখাস্ত করেন; আবু লুবাবাকে যেন বনু কুরাইযার নিকট যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তাদের সংগে তার কিছু জরুরী পরামর্শ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ আবেদন মনজুর করেন এবং হযরত আবু লুবাবাকে বনু কুরাইযার কাছে পাঠিয়ে দেন। বনু কুরাইযার সংগে আবু লুবাবার জানাশুনা ছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিদ্ধান্ত কবুল করে কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসা মনজুর করেন, তবে তাদের সংগে মহানবী কি আচরণ করবেন?' হযরত আবু লুবাবা তাদের জবাবে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে হাত দ্বারা গলার দিকে ইংগিত করেন। এর অর্থ ছিল তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ সময় আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা খেয়ানত করবে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে। আর নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না' (সূরা আনফাল-২৭)। কুরআনের এ আয়াতে আবু লুবাবাকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেন তার এ আচরণে আল্লাহ ও রাসূলের খেয়ানত হয়েছে। সুতরাং তিনি মদীনায় আসেন এবং নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সংগে বেঁধে রাখেন। তিনি শপথ করেন যে, আল্লাহর পক্ষ

www.nagorikpathagar.org

থেকে তার তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন তাঁকে খুলে না দেয়। পনের দিন পরে তার ক্ষমার ঘোষণা আসে এবং কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'আর কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। যারা মিলে ঝিলে আমল করেছে কিছু ভাল এবং কিছু মন্দ (সূরা তওবা)। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে গিয়ে তার বাঁধন খুলে দেন। মদীনা শরীফে আজও সে খুঁটি উস্তুয়ানায়ে আবু লুবাবা নামে পরিচিত হয়ে আছে।

এ বছর বনু কুরাইযা সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'আর যে আহলে কিতাবগণ তাদের সহায়তা করেছিল তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে এনেছে। তাদের অন্তরে তোমাদের ভয়ভীতি সঞ্চার করে দেয়া হয়। কিছু সংখ্যককে তোমরা হত্যা করতে শুরু কর এবং কিছু সংখ্যককে বন্দী কর। তাদের জমি, তাদের ঘর বাড়ি এবং সহায়-সম্পদের মালিক, তোমাদের করে দিলেন (সূরা আহযাব- ২৬-২৭)। এ বছর রজব মাসে হযরত বিলাল ইবনে হারিছ মুজনী (রা.) তার কাবিলা বনু মুজনিয়ার চারশত লোক নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হন। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং বলেন, 'তোমরা সেখানেই অবস্থান কর। তোমাদের মুহাজিরদের মর্যাদা দেয়া হবে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতিক্রমে নিজেদের ঘরবাড়িতে ফিরে আসেন। হযরত বিলাল ইবনে হারিছ (রা.) সুজনিয়া কাবিলার সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিনে বনু মুজনিয়ার ঝা া তারই হাতে ছিল।

৪র্থ হিজরীতে হযরত জেমাম ইবনে ছা'লাবা (রা.) তার কওম বনু সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধি হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে হাজির হন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্ব সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করে ফিরে গিয়ে তার কওমকে সেসব বিষয়ে অবগত করেন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর রজব মাসে মুজনিয়া কাবিলার প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হন। তাদের সংগে ছিলেন বহু সংখ্যক লোক। তন্মধ্যে নোমান ইবনে মুকরিন ইবনে আয়িজ মাজানী, বেলাল ইবনে হারিছ মাজানী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মূর্তির নাম ছিল "হাজিব"। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল সর্বপ্রথম প্রতিনিধি দল যারা মদিনায় এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে সাক্ষাৎ করেন।

www.nagorikpathagar.org

এ বছর যিলহজ্ব মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘোড়ার উপর আরোহণ করে 'আল গাবা' তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ঘোড়া থেকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়ে যান এবং ডান পায়ে আঘাত পান। এ সময় কয়েকদিন ঘরে অবস্থান করেন। আঘাতের কারণে বসে বসে নামায আদায় করেন। সে সময় মসজিদে হাজির হতে পারেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওমাতুল জানদাল যুদ্ধে ছিলেন। তখন হযরত সাদ ইবনে ওবাদার (রা.) আম্মা আমরা বিনতে সা'দ ইবনে আমর আনসারী ইন্তিকাল করেন। যেহেতু হযরত সাদও (রা.) এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে ছিলেন এজন্য তার জানাযা এবং দাফন কাজে শরীক হতে পারেননি। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা আকস্মিক ইন্তিকাল করেন। তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে সদাকা করার কথা বলতেন। এখন যদি আমি সদাকা করি তবে তার পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে কিনা?' ইরশাদ করেন, 'হ্যা।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন সদাকা সবচেয়ে উত্তম?' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন, 'পানি পান করাও। (অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন সেখানে কূপ খনন করে দাও)। সুতরাং হযরত সাদ (রা.) পানির কূপ তৈরি করে তার মাতার পক্ষ থেকে আল্লাহর পথে ইসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

এ বছর হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর বর্ণনা মতে তারা অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। এ বছর সাবান মাসে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উক্ত যুদ্ধে হযরত আয়িশা (রা.) এর হার হারিয়ে গিয়েছিল এবং এর সাথেই ঘটনাক্রমে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। এ যুদ্ধে হযরত আয়িশার (রা.) উপরে অপবাদ রটনার ঘটনা ঘটেছিল। (নাউযু বিল্লাহ)। এ বছর আয়িশার বিরুদ্ধে অপবাদের প্রতিবাদে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। সূরা নূরের ১৮নং আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়। এতে হযরত আয়িশার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। মুনাফিক এবং অপবাদ রটনাকারীরা লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়। উল্লেখ্য ইফকের ঘটনার শুরুতে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়েছিল। তায়াম্মুম অন্য কোন উম্মতের জন্য জায়েয ছিল না। এটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের খাস উপহার ও দয়া।

৫ম হিজরীতে হযরত আয়িশার নিদোর্ষিতা ও পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কসম খেয়ে ছিলেন যে, তিনি তার চাচাত ভাই

www.nagorikpathagar.org

মিসতাহ ইবনে আসাসাহ (রা.) এর আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিবেন। কারণ, ইফকের ঘটনায় তিনিও অংশ নিয়েছিলেন। তার ব্যয় ভার হযরত আবু বকর (রা.) গ্রহণ করেছিলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, 'আর তোমাদের যারা দ্বীনি লাইনে বুজুর্গ এবং আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী; তারা যেন নিজ আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের অনুদান বন্ধ করার ক্বসম না খায়। তাদের ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং তোমাদের মার্জনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান (সূরা নূর-২২)। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, 'আল্লাহর ক্বসম! আমি চাই যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।' অতঃপর মিসতাহ (রা.) এর আর্থিক অনুদান চালু করে দেন এবং বলেন, 'আল্লাহর ক্বসম ভবিষ্যতে তার অনুদান আর বন্ধ হবে না।'

কুরআনে করীমে হযরত আয়িশা (রা.) এর সাফাই ঘোষণা হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চার ব্যক্তিকে অপবাদ লাগানোর শাস্তিস্বরূপ আশিটি করে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন। যারা হযরত আয়িশা (রা.) কে অপবাদ দিয়েছিল তারা হলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল (মুনাফিক), হাসসান ইবনে সাবিত, মিসতাহ ইবনে আসাসাহ, হামনা বিনতে জাহশ (এ তিনজন মুসলমান)। এ চার ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হল মুনাফিকদের নেতা। সে মহানবী স ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অত্যন্ত হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করত। সে মা আয়িশার বিরুদ্ধে অপবাদের ঝড় বইয়ে দেয়। অপর তিনজন ছিলেন সত্যিকার মুমিন সাহাবী। তারা সরল বিশ্বাসে প্রোপাগাণ্ডাকে বিশ্বাস করে এ অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোর ধমক দেয়া হয়। এক বর্ণনায় এসেছে বা কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত ঘটনায় কাউকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

একই বছর বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় সূরায়ে মুনাফিকুনের শানে নুযুলের এ ঘটনা ঘটে। একজন মুহাজির সাহাবী অর্থাৎ জাহজাহ ইবনে কয়েস আল গেফারী (রা.) যিনি সেনান ইবনে ফারওয়াহ আলজাহনী (রা.) অথবা সেনান ইবনে নায়ীম ইবনে আওস (রা.) নামক এক আনসারীকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। এতে বিষয়টি গড়াতে গড়াতে বড় হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কোথায় আনসারগণ! অন্যদিকে মুহাজিরগণ কোথায়? এ ধরনের ডাকাডাকি শুরু হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বলেন, 'জাহেলিয়াতের যুগের এ ডাক কিসের? এ হচ্ছে পঁচা বাসী কথাবার্তা। এগুলো পরিত্যাগ কর।' মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই

তা শুনে বলে উঠে, 'আরে এসব আশ্রিত লোকেরা (মুহাজির) তোমাদের রুটি খেয়ে খেয়ে এবার তোমাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। ওদের খরচ বন্ধ করে দাও, এমনি তারা ভেসে যাবে।' সে আরও বলে, 'ঠিক আছে একটু মদীনা ফিরে যেতে দাও, যে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত সে নিকৃষ্টতমকে বের করে দিবে।' অধিক সম্মানিত বলতে সে নিজেকে বুঝাতে চেয়েছে আর নিকৃষ্টতম বলতে (নাউযু বিল্লাহ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝাতে চেয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) তার এ নিকৃষ্ট কথাবার্তা শুনতে পান। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে অবগত করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তা জানতে পেরে কৃসম খেয়ে তা অস্বীকার করতে থাকে। সে উল্টা হযরত যায়েদকে দোষারোপ করে। সে যায়েদের নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদকে ডেকে বলেন, 'সম্ভবত তুমি শুনতে ভুল করেছ।' এতে হযরত যায়েদের মনে খুবই ব্যথা লাগে। মহান আল্লাহ হযরত যায়েদের সমর্থনে এবং মুনাফিকের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইরশাদ ফরমান, 'আর আসমান ও যমীনের সকল ভা ার আল্লাহরই হাতে। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না"। (সূরা মুনাফিকুন-৭)। 'আর সম্মান তো আল্লাহর জন্য এবং তার রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকেরা তা জানে না।'

এ বছর জুমাদাল উলা মতান্তরে জমাদাল উখরাতে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) এবং তাঁর সাথীগণ যাঁরা আয়স যুদ্ধে গিয়েছিলেন তারা কুরাইশের একটি দলকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) এর স্বামী আবুল আসও ছিলেন। তিনি তখন পর্যন্ত অমুসলিম ছিলেন। আবুল আস হযরত যয়নবের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে নিরাপত্তা দিয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমাদের পক্ষ থেকেও তাকে আশ্রয় দেয়া হল।' এ বলে আবুল আসের সম্পদ তাকে ফেরত দেয়া হয়। যুদ্ধের পরে আবুল আস ইবনে রবী ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন সাবেক বিয়ে বহাল রেখে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব (রা.) কে আবুল আসের (রা.) সংগে দিয়ে দেন। অন্য এক উক্তি মতে নতুন করে আবার আকৃদ করা হয়েছিল। পরের উক্তিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত যয়নবের এ দ্বিতীয় রুখসতী ৭ম হিজরীতে হয়েছিল।

রমযান মাসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক আনসারীর (রা.) বাহিনী আবু রাফে

www.nagorikpathagar.org

সালাম ইবনে আবুল হাকীক ইহুদীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। এ প্রসংগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জেযা প্রকাশিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক যখন ঐ ইহুদীকে হত্যা করে ফিরেছিলেন। তখন অট্টালিকার সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে তার পায়ের গোঁড়ালী ভেংগে যায়। এমনকি গোঁড়ালীর টেনডন রগ ছিঁড়ে পা খসে যায়। সাহাবী শক্তভাবে তাতে পট্টি বাঁধেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ফিরে আসেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পা লম্বা কর।' তিনি (রা.) পা বিছিয়ে দেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর পায়ে মোবারক হাত বুলিয়ে দেন। ফলে সাহাবীর পা এমনভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে, যেন কখনও তাঁর পায়ে কোন ব্যথাই ছিল না।

শাওয়াল মাসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার (রা.) বাহিনী উসাইর ইবনে রেজাম ইহুদীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। এ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেকটি মু'জেযা প্রকাশিত হয়। উসাই ইহুদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের মাথার উপর এমন ভয়াবহ আঘাত হানে যে তার মাথা ঘাড় পর্যন্ত ফেটে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আঘাতের স্থানে মুখের লালা মোবারক লাগিয়ে দেন এবং সুস্থতার দোয়া করেন। এরপর বর্ণিত সাহাবীর মাথায় আর কোনদিন ব্যথা হয়নি। এমনকি কখনও রক্ত বা পুঁজ কিছুই বের হয়নি।

৬ষ্ঠ হিজরী (৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার উদ্দেশ্যে যিলক্বদের ১ম তারিখ সোমবার মদীনা থেকে রওনা করেন এবং যুল হুলাইফায় এসে এহরাম বাঁধেন। মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে প্রায় পনের শত সাহাবা ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) কে প্রতিনিধি করেন। সংগে নিয়ে আসেন কুরবানীর ৭০টি উট। উটের দায়িত্বে ছিলেন নাজিয়া ইবনে জুনদুব আসলাম (রা.)। তিনি বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে উটগুলো নিয়ে ছুটে যান। মহানবী যখন হুদাইবিয়ায় পৌছেন তখন মক্কার সব কাফির মিলে তাঁকে এগিয়ে যেতে নিষেধ করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে চুল কাটান, হাদির উটগুলি কুরবানী করেন। মুসলমানরা কেউ এ বছর ওমরাহ পালন করতে পারেননি। পরবর্তী বছর সপ্তম হিজরীতে এর ক্বাজা করেন। হুদাইবিয়ার সংগ্রাম শেষ করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় আবু জানদাল

(রা.) মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে হাজির হন। তাঁর আসল নাম হচ্ছে আস ইবনে সুহাইল ইবনে ওমর আল কুরশী। তিনি কিছুদিন পূর্বে মক্কার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর শাস্তিস্বরূপ তার পিতা তাকে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে মক্কা বিজয়ের দিন তার পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

সন্ধির সময় আরেক সাহাবী আবু বসীর হাজির হন। তার আসল নাম ছিল ওকবা ইবনে উসাইদ ইবনে জারিয়া ছাকাফী (রা.)। তিনি ছিলেন বনী জোহরার মিত্র। অনেক পূর্ব থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু বসীর এবং আবু জানদাল (রা.) মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আবার মক্কায় পাঠিয়ে দেন। কারণ হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তের মধ্যে ছিল যারা মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে যাবে, তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। অতঃপর আবু জানদাল এবং আবু বসীর (রা.) মদীনা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার যুদ্ধের পূর্বে হযরত খুফাফ ইবনে ইমা ইবনে রাহাযা আল গেফারী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ কওম বনু গেফারের ইমাম ও খতীব ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়া এবং বাইয়াতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণ করেন। হযরত খুফাফ তার পিতা ইমা, তার দাদা রাহাযা (রা.) তিনজনই সাহাবী ছিলেন।

এ হিজরীর রমযানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন ঃ হুজুর! বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে কান্নাকাটা করার, বিনয় প্রকাশ করার এবং সদাকা করার নির্দেশ দেন। তারপর সবাইকে নিয়ে ঈদগাহে ছুটে যান। দু'রাকাত নামায আদায় করেন। প্রথম রাকাতে সূরা আলা; দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করেন। প্রথম রাকাতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তকবীর পড়েন। তারপরে এক আকর্ষণীয় ও ঈমান বৃদ্ধিকারক ভাষণ দেন। লোকজন স্থান ত্যাগ করার আগেই বৃষ্টি শুরু হয় এবং কয়েকদিন ধরে অনবরত বৃষ্টি হতে থাকে। বৃষ্টি হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আজ লোকজন এভাবে সকাল করেছে যে কিছু সংখ্যক আমার উপর ঈমান রাখে এবং তারাকে অস্বীকার করেছে। আবার কিছু লোক তারার উপর ঈমান এনেছে এবং আমাকে অস্বীকার

করেছে। যারা বলেছে যে আল্লাহর ফযল ও করমে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমাকে ও আল্লাহকে স্বীকার করেছে এবং গ্রহের উপর ঈমান আনেনি।'

হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে এবং খাইবার যুদ্ধের পূর্বে হযরত রেফায়া ইবনে যায়েদ ইবনে ওহাব আল জুজামী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ গোত্রের এক দল নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে একখানা চিঠি লিখে দেন। তাঁর গোত্রের অবশিষ্ট লোক, পত্র পেয়ে সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হন। হযরত রেফায়া (রা.) সেই সাহাবী, যিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুদয়াম নামক হাবশী গোলাম হাদিয়াস্বরূপ দান করেছিলেন। তিনি খায়বারে নিহত হন।

এ বছর যিলহজ্ব মাসে মতান্তরে চতুর্থ হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের রাজা বাদশাহগণের উদ্দেশ্যে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাঠান। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান যে অনারব বাদশাহগণ সিল মোহর ছাড়া কোন চিঠি গ্রহণ করেন না। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার আংটি তৈরি করেন। তাতে তিন লাইন লেখা ছিল। উপরে আল্লাহ, মধ্যখানে রাসূল এবং নীচে ছিল মুহাম্মদ। বিশ্বের রাজা বাদশাহদের নামে চিঠি লিখে এ সিলমোহর দ্বারা তাতে সিল বা মোহর লাগাতেন। সিল মোহরটি তৈরি হলে যিলহজ্ব মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজা বাদশাহদের প্রতি দূত মারফত পত্র পাঠান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্ব মাসে একই দিনে নিম্নের সাহ-াবীদেরকে (রা.) বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশা-শাসকদের কাছে প্রেরণ করেনঃ

১। আমর ইবনে উমাইয়া আজ জামিরী (রা.) কে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে।

২। দিহইয়া ইবনে খলীফা কালবীকে (রা.) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে।

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা.) কে পারস্য সম্রাট পারভেজের কাছে।

৪। হাতিব ইবনে আবু বালতা আল লাখমীকে (রা.) মিসর ও আলেক জান্দ্রিয়ার রাজা মুকাওকিসের কাছে।

৫। সোজা ইবনে ওহাব আল আসাদীকে (রা.), দামেস্কের বাদশা হারিছ ইবনে আবু শামর আল গাছছানীর কাছে।

৬। আমর আল আমিরী (রা.) কে ইয়ামামার বাদশা হাওয়া ইবনে আলী হানাফীর কাছে।

www.nagorikpathagar.org

৭। আলা ইবনে হাজারামী (রা.) কে বাহরাইনের বাদশা শাহ মুনযির ইবনে সাওয়া আত তাইমী আদ দারমী আল আবদীর কাছে।

৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কে ওমানের দু'জন বাদশা/সর্দার জায়কর এবং আবদে ফিরানে জুলানদের কাছে।

একই বছর সূরা ফাতাহ নাযিল হয়। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ৬ষ্ঠ হিজরী হজ্ব ফরয হয়। আবার মতান্তরে দশম হিজরীতে হজ্ব ফরয হয়েছিল। একই বছর হজ্ব ও উমরা পালন এর ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব ও উমরা পালন কর।' (বাক্বারাহ-১৯৬)। কাফিরদের চরম শত্রুতার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্ব করতে পারেননি। তবে এ বছর যিলক্বদ মাসে ওমরার জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। তবে মুশরিকরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুদাইবিয়াতে আটকে দেয়। একই বছর জেহার (অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সংগে তুলনা করা) বিষয়ে আয়াত নাযিল হয়। জেহার যে তালাকের স্থলাভিষিক্ত নয় এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়।

এ বছর কতিপয় মহিলা সাহাবী (রা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন। তন্মধ্যে হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবি মুয়ীতও ছিলেন। মক্কার কাফিররা হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ফেরৎ পাঠাবার জন্য সংবাদ পাঠায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর অপেক্ষায় থাকেন। পরে তাদের ফেরত পাঠাতে নিষেধ করে আয়াত নাযিল হয়। সূরা মুমতাহিনায় এ ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। 'আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সকল কাফির মহিলাদের তালাক দিয়ে দেন। হযরত ওমর (রা.) এর ঘরে দু'জন কাফির মহিলা ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে ছেড়ে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন তখন উটের উপর আরোহী অবস্থায় মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সূরা ফাতাহ নাযিল হয়। এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণে সাহাবায়ে কেরাম সীমাহীন আনন্দিত হন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে সফরকালীন সময়ে যখন সূরা ফাতাহ নাযিল হয়, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরা নিয়ে বিশেষ ধ্যানে মশগুল ছিলেন। সময়টা ছিল রাত এবং সফর ছিল উটের। এ অবস্থায় হযরত ওমর (রা.), মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মহানবী নীরব থাকেন। এতে হযরত ওমরের মনে বড়ই কষ্ট হয়। তিনি মনে মনে ভাবেন, নিশ্চয় আমার থেকে কোন মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী থেকে যখন অবসর হন তখন ইরশাদ করেন, 'হে ওমর! ওহীর ব্যস্ততার করণে আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। সূরা ফাতাহ নাযিল হয়েছে। এটা আমার কাছে গোটা পৃথিবী থেকে অধিক প্রিয়।'

এ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা করান। এ প্রতিযোগিতায় ইবনে ওমর (রা.) শামিল ছিলেন। একই হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের দৌড় প্রতিযোগিতা করান। একজন গ্রাম্য লোকের সাধারণ একটি উট বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিখ্যাত উটনী ক্বাসওয়াকে পরাজিত করে এগিয়ে যায়। ক্বাসওয়ার সংগে কোন জন্তুর প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার ঘটনা ছিল এই প্রথম। কাজেই মুসলমানগণের নিকট ব্যাপারটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং খুবই কষ্টকর মনে হয়। এ কষ্টের কথা মহানবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ এ বিষয়টি নিজ যিম্মাদারিতে নিয়ে গেছেন যে, দুনিয়াতে কোন জিনিস যখন খুব উন্নত হয়, তখন সেটাকে অবনত করে দেখান।' একই বছর আবারও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঘোড়া প্রথম স্থান অধিকার করে এবং তিনি পুরস্কৃত হন। এ দু'টি ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতামূলক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত (উসদুল গাবাহ)।

এ বছর উম্মে রুমান বিনতে আমির ইবনে ওয়াইমির আল ফাসিয়ার (রা.) ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর স্ত্রী এবং হযরত আয়িশা সিদ্দীকার আম্মা। তার নাম ছিল যয়নব। তিনি প্রথম যুগের মুসলমান ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার কবরে অবতরণ করেছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে উক্তি করেন, 'কেউ যদি জান্নাতের বড় চক্ষুবিশিষ্ট হূর দেখতে চায়, তবে সে যেন তাকে দেখে নেয়।

৬ষ্ঠ হিজরীতে লবীদ ইবনে আসিম ইহুদী (আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত ব্যক্তি) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করে। এ নিকৃষ্ট কাজ সে ইহুদীদের উস্কানীতে করেছিল। এ কাজের জন্য ইহুদীরা তাকে তিনশত দিনার দান করেছিল। যেসব বস্তু দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছিল; সে তা যীইওয়ান নামক কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আল্লামা শামী লিখেছেন যে, সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে সে যাদু করেছিল। ফলে সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল হয়। এরপর কূপ থেকে ঐ যাদু বের করা হয়। এ যাদু একটি সুতার মধ্যে করা হয়েছিল। এতে এগারটি গিরা ছিল। উভয় সূরার এক

www.nagorikpathagar.org

একটি আয়াত দ্বারা একটি করে গিরা খুলতে থাকে। দুই সূরা পাঠ করার পর এগারটি আয়াতের দ্বারা এগারটি গিরা খুলে যায় এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ সুস্থ ও যাদুমুক্ত হন। এ সূরাদ্বয় এতটাই মর্তবাপূর্ণ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদাইবিয়াতে অবস্থান করছিলেন তখন হযরত কাব ইবনে উজরা (রা.) সাহাবীকে দেখতে পেলেন যে, তিনি এহরাম অবস্থায় চুলা জ্বালিয়েছেন এবং তার চেহারা থেকে একটি উকুন খসে পড়ছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, 'ওহে কা'ব, এসব উকুন তোমাকে যন্ত্রণা দিবে। তিনি আরজ করেন, 'জ্বী হ্যাঁ।' এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ কিংবা যার মাথায় কষ্ট আছে, সে যেন তার ফিদিয়াস্বরূপ রোযা পালন করে অথবা সদাকা দিয়ে দেয় অথবা কুরবানী করে' (বাকরা-১৯৬)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, 'তোমার মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেল এবং ঐ তিন বস্তুর কোন একটি আদায় কর।' এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন তিনটি রোযা, সদকার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ছয়জন মিসকীন এবং কুরবানীর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন একটি ছাগল যবাই কর।

৬ষ্ঠ হিজরীতে বনী লাহইয়ান যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আম্মাজান হযরত আমিনার কবর যিয়ারত করেন। সেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়। এতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ কষ্ট অনুভব করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে (বিশ্বনবীর মা'কে) জীবিত করেন। তিনি জীবিত হয়ে ঈমান আনেন। অতঃপর পুনরায় তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহকেও আল্লাহ জীবিত করেছিলেন। তিনিও ঈমানের মত মহাসম্পদে ভূষিত হয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতা মাতার জীবিত হওয়ার বর্ণনা প্রসংগে যদিও মুহাদ্দিসগণ অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। তবে অনেক গুণী মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে এর সনদ হাসান। সুতরাং এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে। তবে আল্লাহই ভাল জানেন সত্যিকার ঘটনা কি ছিল। এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক না করাই উত্তম।

এ হিজরীতে ওমরায়ে হুদাইবিয়ার সফরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আসফান পৌঁছেন, তখন মুশরিকগণ যুদ্ধের জন্য আসেন। এ সময় আল্লাহ

তা'আলা যুহর এবং আসরের সময় মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সালাতুল খাওফ নাযিল করেন। এটা ছিল সর্বপ্রথম সালাতুল খাওফ বা বিপদ কালীন নামায। যে নামাযে প্রথম কাতারে মুসলমানরা অস্ত্রসহ পাহারারত থাকবে এবং পিছনের কাতারে মুসলমানরা নামায আদায় করবে। হুদাইবিয়া সফরের সময় হযরত আবু কাতাদা (রা.) রাতের বেলা একটি জংলী গাধা শিকার করেন। তিনি তখন এহরামের মধ্যে ছিলেন না। এ জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতিতে মুহ-রিম যারা ছিলেন, সকলেই এর গোশত খেয়েছিলেন। হুদাইবিয়ার সফরের প্রাক্কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবওয়া বা উদ্যানে ছিলেন তখন সায়াব ইবনে জাছামা লাইসী (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জীবন্ত গাধা উপহার দেন। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা গ্রহণ করেননি। এতে সাহাবীর চেহারায় দুঃখের ছাপ লক্ষ্য করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি এটা এ জন্য গ্রহণ করতে অপারগ যে, আমি এহরামের মধ্যে আছি।' যেহেতু এটা জীবিত ছিল তাই গ্রহণ করেননি। অথচ আবু কাতাদার জন্তুটি যবাইকৃত ছিল সেটা গ্রহণ করেছিলেন।

হুদাইবিয়াতে কিকর-বাবুল (বা বাবলা) গাছের নিচে বাইয়াতে রেযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। এর উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ ফরমান, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রাজী হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন।' (সূরা ফাতাহ-১৮)। এ বাইয়াতে সাহাবাগণ শপথ করেছিলেন যে, প্রয়োজনে জীবন দিব, তথাপি ময়দান থেকে পিছপা হব না। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ওক্কাসা ইবনে মিহসান (রা.) এর ভাই আবু সানান ইবনে মিহসান (রা.) বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ওক্কাসার চেয়ে বিশ বছরের বড়। তার নাম ছিল ওহাব। তিনি এবং তার ছেলে সানান বদর থেকে শুরু করে বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশার সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবু সানানের ওফাত হয়েছিল বনী কুরাইযার যুদ্ধে এবং তার ছেলের মৃত্যু হয় হযরত ওসমান (রা.) এর খিলাফত আমলে।

এ বছর হুদাইবিয়ার কূপের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার মু'জেযা সংঘটিত হয়। হুদাইবিয়ার কূপে অল্প পানি ছিল। সাহাবীগণ সে পানি উঠিয়ে ফেলেছিলেন এবং কূপ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে কূপে পানি না থাকার অভিযোগ করেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তীরদানী থেকে একটি তীর দান করেন। সে তীর

কূপের ভেতরে গেঁড়ে দেয়া হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করার পর অবশিষ্ট পানি দান করেন। সে পানি উপরে থেকে কূপে ঢেলে দেয়া হয়। ফলে কূপের পানি ঝর্ণা ধারার মত উথলে উঠে। সাহাবায়ে কেরাম অতি তৃপ্তির সাথে পানি ব্যবহার ও পান করেন।

উভয়পক্ষের সর্বসম্মতভাবে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, দশ বছর যাবৎ উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন বা লিখেন হযরত আলী (রা.)। হুদাইবিয়াতে অপর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। আরও একবার পানি সংকট মারাত্মকভাবে দেখা দেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি পাত্রে সামান্য পানি ছিল। এছাড়া কাফেলায় আর কোন পানি ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পানি একটি পাত্রে ঢালেন। অতঃপর তাতে হাত মোবারক রাখেন। এতে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংগুলীসমূহ দিয়ে ঝর্ণা ধারার মত পানি বেরিয়ে আসতে শুরু করে। সমস্ত মুসলিম বাহিনী তৃপ্তির সাথে সে পানি ব্যবহার করে। সকলেই সে পানিতে ওযুও করেন। এ ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এ বাহিনীতে আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দেন, 'আমরা এক লক্ষ হলেও পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা সেদিন পনেরশত সাহাবা ছিলাম।' ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসের ইমামগণও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা আরও বলেছেন, 'বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংগুলী মোবারক থেকে নির্গত এ পানি সকল পানি থেকে উত্তম পানি ছিল।'

হুদাইবিয়া থেকে মদীনা যাওয়ার পথে সূরা আল ফাতাহ্ নাযিল হয়। উক্ত সূরায় মহাসুসংবাদসমূহ দেয়া হয়েছিল। যেমন ঃ মক্কা আল মুকররমার বিজয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগের ও পরের সকল গোনাহ্ মাফ করা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। খাইবার বিজয় হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে' 'আল্লাহ তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন, বিপুল পরিমাণ গনীমত যা তোমরা গ্রহণ করবে এবং শীঘ্রই হবে।' এটা ছিল খাইবার যুদ্ধের গনীমত যা শীঘ্র অর্জিত হয়েছিল।

সপ্তম হিজরী (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ৭ম হিজরীতে খাইবারের যুদ্ধের পর এক ইহুদী মহিলা যয়নব বিনতে হারিস (সাল্লামের স্ত্রী) ইবনে শিকম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাগলের গোশতে বিষ প্রয়োগ করে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। অপর উক্তিমতে সে ইসলাম গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করে এজন্য তাকে ক্ষমা করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু এ বিষমাখা গোশত খেয়ে বিশর ইবনে বারা (রা.) ইন্তিকাল করেন। ফলে সাহাবীর হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হয়। এ বছর খাইবার যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালামা ইবনে আকওয়ার পায়ের গোঁড়ালীতে আঘাত লাগলে তাতে তিনবার ফুঁক দেন। তিনি সাথে সাথে সুস্থ্ হয়ে উঠেন এবং তার পরে আর কখনো পায়ে ব্যথা অনুভব করেননি।

৭ম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধ থেকে অবসর হলে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব আবু মূসা আশয়ারী (রা.) নিজ সাথীদের নিয়ে আবিসিনিয়া থেকে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সপ্তম হিজরীতে খাইবার আসেন। উক্ত দলে শিশু এবং মহিলা ছাড়াও অনেক সাহাবী ছিলেন। একই বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে শাদী করেন। ৭ম হিজরীতে সফর মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুফিয়া বিনতে হুইয়াকে শাদী করেন। তিনি খাইবারের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাকে আজাদ করে বিয়ে করেন। তাঁর ওলীমার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত সাহাবাযে কেরামকে মেহমানদারী করেন।

খাইবার বিজয়ের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সাদীয়াকে শাদী করেন। তখন মুসলিম জননীর সম্মানার্থে সাহাবায়ে কেরাম সকল বন্দীকে বিনা মূল্যে আজাদ করে দেন, যাদের সংখ্যা ছিল একশত পরিবার। লোকসংখ্যা ছিল সাত শতাধিক। খাইবার যুদ্ধের সময় মহররম ও সফর মাসের মাঝামাঝি ইয়ামান থেকে দু'শ কাবিলার একটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। এ দলটি ছিল হযরত আবু হুরাইরার (রা.)। উক্ত দলে ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর আদ দুসী এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা.) প্রমুখ। এছাড়াও দু'শ কাবিলার সত্তর আশিটি পরিবারে আনুমানিক চারশত লোক ছিলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। একমাত্র তোফায়েল ইবনে আমর হিজরতের পূর্বেই মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এ বছর যিলক্বাদ মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাতুল কাযার সফরে, হযরত মাইমুন বিনতে হারিসের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ওমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পহেলা যিলকদ

রওনা হন এবং চার যিলহজ্ব ভোরে মক্কা আল মুকাররমাহ পৌছেন। তোয়াফ এবং সায়ী করে ওমরাহ পালন করেন। তিনদিন মক্কায় অবস্থান করে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত মাইমুনা বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহাতুল মুমেনীনদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম হিজরীতে কাযা ওমরাহ (ওমরাতুল কাযা) পালন করেন। পহেলা যিলক্বদ তারিখে এ উদ্দেশ্যে রওনা করেন। যুল হুলাইফায় এহরাম বাঁধেন। শিশু ছাড়াও বারশত সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। মদীনা তৈয়িবায় এ সময় আবু রহম কলছুম ইবনে হোসাইন আল গেফারীকে মতান্তরে উয়াইফ ইবনে আজবতকে অথবা আবুজর গেফারী (রা.) কে প্রতিনিধি করে রেখে যান। ওমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা উটের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার তোয়াফের উদ্দেশ্যে যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন তখন মসজিদের এক পাশে কতিপয় কাফির বসা ছিল। তারা মন্তব্য করে 'ওদেরকে ইয়াসরিবের জ্বরে দুর্বল করে দিয়েছে।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন কাফিরদের ধারণার প্রতিবাদে তোয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল কর। (রমল মানে বীরের মত ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চলা) বাকী চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে কর। ওমারাতুল কা'বার উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন তখন হযরত বিলাল (রা.) কে নির্দেশ দেন, 'কা'বার ছাদে উঠে আযান দাও।' ওমরার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ভিতরে তখন মূর্তি রাখা ছিল। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মূর্তি সরিয়ে নিয়ে সেগুলো ভেংগে ফেলা হয়। অতঃপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করেন।

ওমরাহ পালন শেষে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন তার চাচা মহাবীর হযরত হামযার (রা.) অল্প বয়স্কা এতীম শিশু কন্যা উমামাহ মতান্তরে আম্মারাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাচা বলে ডাক দিয়ে, পিছনে এসে দাঁড়ায়। ফলে এক হৃদয় বিদারক ঘটনার উদ্ভব হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) তাকে হযরত ফাতিমার কাছে সোপর্দ করেন। মদীনায় পৌছার

www.nagorikpathagar.org

পর তার লালন-পালন নিয়ে হযরত আলী (রা.), হযরত জাফর (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার মধ্যে পাল্লাপাল্লি ও বিতর্ক শুরু হয়। মামলা রাসূলুল্লাহর আদালতে দায়ের করা হয়। হযরত আলী তার অধিকারের কথা বর্ণনা করে বলেন, 'এ হচ্ছে আমার চাচার মেয়ে এবং আমিই তাকে মক্কা থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।' হযরত যায়েদ বলেন, 'সে আমার ভাই এর মেয়ে। আপনিই হামযা এবং আমার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দিয়েছেন।' হযরত জাফর (রা.) বলেন, 'সে আমার চাচার মেয়ে এবং ঐ মেয়ের খালা আমার স্ত্রী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফরের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বলেন খালার মর্যাদা মায়ের তুল্য। হযরত জাফর (রা.) জয়যুক্ত হন।

৭ম হিজরী মতান্তরে অষ্টম হিজরীতে অথবা দশম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাসসানের বাদশাহ জিবিল্লাহ ইবনে আইহামকে ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে পত্র লিখে পাঠান। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে সে মুর্তাদ হয়ে যান। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি ইসলামের উপর কায়েম ছিলেন। ৭ম হিজরীতে মিসরের আলেক জান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাউকিস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য হাতিব ইবনে আবু বালতার মাধ্যমে, বেশকিছু দামী জিনিসপত্র উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। (১) মারিয়া কিবতিয়া যিনি পরবর্তীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন সঙ্গিণী হয়ে ছিলেন, (২) তার বোন সিরীন, (৩) একটি গাধা, (৪) দুলদুল নামক খচ্চর, (৫) বিশ খানা মিসরীয় উন্নতমানের কাতান কাপড়, (৬) শিরিয়ান কাঠের সুরমাদানী, (৯) আয়না, (১০) কারুকাজের চিরুনী। তাছাড়াও বাদশা একশত নগদ দিনার এবং পাঁচটি জামা হযরত হাতিব (রা.) কে দান করেন।

৭ম হিজরীতে খাইবার যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বারের মত মুতা বিয়ে হারাম ঘোষণা করেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে খায়বার যুদ্ধ পর্যন্ত তা জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের পর আবার তা জায়েয বলে ঘোষণা করা হয়। আওতাসের যুদ্ধ পর্যন্ত তা বৈধ থাকে। আওতাস যুদ্ধের তিনদিন পর থেকে পুনরায় মুতা বিয়ে হারাম ঘোষণা করা হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। এতে বুঝা যায় যে, মুতা বিয়ে দু'বার হালাল হয়েছিল এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে গেছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বলেছেন ঃ আজ থেকে মুতা বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করা হল। লম্বা সফরে বা অভিযানে কোন এলাকায় মুসলমানদের সাময়িক

www.nagorikpathagar.org

বসবাসের সময় সাময়িক বিয়ের নিয়মকে মুতা বিয়ে বলা হত। এটা চিরতরে হারাম হয়ে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারে গাধার গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করেন। খাইবার যুদ্ধের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা পিয়াজ এবং রসুন খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশু এবং ছোঁ মেরে খায় যেসব পাখী, সেগুলো নিষেধ করেন। গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে বিক্রি বা ব্যক্তিগতভাবে নেয়া নিষেধ করেন।

এ হিজরীতে কুরমান আজ জাফরী নামক এক লোক বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান দাবী করে। মূলতঃ সে ছিল মুনাফিক। সে আনসার কাবিলার বনু জাফরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে মুনাফিক এবং জাহান্নামী। খাইবারে যখন যুদ্ধ শুরু হয়। সে খুব বীরত্বের সাথে লড়তে থাকে এবং যুদ্ধে আহত হয়। লোকজন দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ার উপক্রম হয়ে যায় যে, এমন একজন বীর মুজাহিদ কেমন করে জাহান্নামী হতে পারে। হযরত আকসাম ইবনে আবুল জুন আলখেজায়ী নামক সাহাবী বলেন, 'আমি ইচ্ছা করলাম ঐ ব্যক্তির সংগে থাকব। যাতে আমি দেখতে পারি যে তার শেষ পরিণতি কি হয়?' পরে দেখা গেল, ঐ ব্যক্তি মারাত্মক আহত হয়ে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আত্মহত্যা করে ফেলেছে। সাহাবী আকসাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বাণী আল্লাহ বাস্তবায়ন করে দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে ফেলেছে।' এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রা.) কে বলেন, 'উঠো! ঘোষণা করে দাও যে, একমাত্র মুমিনগণ জান্নাতে যাবে। আর আল্লাহ কখনও কখনও কোন কাফির পাপী বান্দাকে দিয়ে তার দ্বীনের খেদমত করান।' (বুখারী)

খাইবার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম যখন অত্যধিক ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দু'টি ছাগল যবাই করার নির্দেশ দেন। এ দু'টি ছাগলের রান্না করা গোশত সকল সাহাবার মধ্যে ভাগ বন্টন করে দেন। সাহাবার সংখ্যা ছিল এক হাজার ছয়শত। সমস্ত বাহিনী খুব তৃপ্তির সাথে পেটপুরে এ গোশত খান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের সকল বাগান এবং জমিতে ফসল ফলাবার জন্য ইহুদীদের নির্দেশ দেন এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা পাবে বলে নির্ধারণ করেন। এরপরে বলেন, 'যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা আমি তোমাদের সংগে এ চুক্তি বহাল

রাখব।' এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানুভতা প্রকাশ পায়। কেননা, পরাজিত ইহুদীদের তিনি হত্যা বা বিতাড়িত করতে পারতেন। খাইবারের যুদ্ধে একটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। ইহুদীদের একটি হাবশী গোলাম ছিল। তার নাম ছিল আসলাম। সে ইহুদীদের ছাগল চরাত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হয়ে তিনি আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কিছু ছাগল আছে; এগুলো আমার মালিকের আমনতস্বরূপ। সুতরাং এ ছাগলগুলো মালিকের নিকট ফেরত দেয়া কি আমার জন্য জরুরী?' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ছাগলগুলো দল থেকে বের করে আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের মালিকের কাছে হাকিয়ে দাও। আল্লাহ নিজেই তোমার আমানত নিজ নিজ মালিকের কাছে পৌছে দিবেন।' তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকটি ছাগল কোন তত্ত্বাবধান ছাড়াই নিজ নিজ মালিকের কাছে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বরকতে মহান আল্লাহ এমনিভাবে তাঁর আমানত সম্পন্ন করে দেন। অতঃপর ঐ ভৃত্য যুদ্ধের পোশাক পরে অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়তে লড়তে শাহাদাতবরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ "আমি দেখেছি দু'জন হূর তার মাথার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। হাফিয ইবনে কাছীর (রহ.) আলবেদা গ্রন্থে লিখেছেন এ কাল গোলাম শহীদ হয়েছিলেন। অথচ আল্লাহর সামনে একটি সিজদা করার সুযোগও তার হয়নি। কোন প্রকার নামায, রোযা হজ্ব বা অন্য কোন আমল ছাড়াই সে সাহাবী এবং শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

খাইবার যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আলী (রা.) এর চোখে মারাত্মক ব্যথা হয়। ফলে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হতে পারেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে পাঠান। তার চোখে হাত রাখেন, সামান্য লালা মোবারক লাগান এবং দোয়া করে দেন। এতে করে তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠেন; যেন তার কোন রোগই ছিল না। খাইবার যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ একদিন ফরমান, 'আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ইসলামের ঝা ৷ দিব, যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসেন। আল্লাহ এবং রাসূলও তাকে ভালবাসেন।' সকলেই এ কথা শুনে গভীর আগ্রহের সাথে রাত কাটালেন। সকলেই মনে মনে ঝা ৷ পাওয়ার আশাবাদী রইলেন। সকাল বেলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের ঝা ৷ হযরত আলীর (রা.) হাতে দিয়ে বলেন, দেখ! ওদের সংগে যুদ্ধ করতে তাড়াহুড়া করবে না। প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিবে। আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

হক্ব সম্পর্কে তাদের বুঝাবে। আল্লাহর ক্বসম! একজন লোককেও যদি আল্লাহ তোমার মাধ্যমে হিদায়ত করেন, তবে তা লাল উটের চেয়েও উত্তম।' অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তা এমন সবকিছু থেকে উত্তম যাতে সূর্য উদয় হয়। আর এক বর্ণনায় আছে, একজন লোকের ইসলাম গ্রহণ, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সকল কাফিরকে হত্যার চেয়ে উত্তম। দাওয়াত এবং তাবলীগের শান-মর্যাদা এত উপরে।

৭ম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমেনীন হযরত ছাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) কে শাদী করেন। তিনি ছিলেন খাইবারের নেতার কন্যা এবং হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম [হযরত মূসা (আ.) এর ভাই] এর বংশদ্ভূত। তার পৈতৃক বংশে একশত নবী এবং একশত রাজা জন্ম নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। যে সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার শুভাগমন করছিলেন, তখন হযরত ছাফিয়া স্বপ্নে দেখেন; সূর্য অথবা চন্দ্র যেন আসমান থেকে অবতরণ করে তার কোলে চলে এসেছে। তিনি এ স্বপ্নের কথা স্বামী কেনানের কাছে প্রকাশ করেন। স্বপ্নের কথা শুনে কেনান ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং মুখে সজোরে আঘাত করে। উত্তেজিত হয়ে বলে, 'সম্ভবতঃ তুমি সে রাজার অপেক্ষায় আছো; যিনি হেজায ভূমি থেকে আমাদের এখানে আসছেন।' সৌভাগ্য তাকে ইসলামে টেনে নিয়ে আসে। স্বামী কেনান নিহত হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। খাইবার যুদ্ধে ইহুদীদের দু'জন বীর যোদ্ধা মারহাব এবং তার ভাই হারিছ এবং দু'জন নেতা আমির এবং ইয়াছির মারা যায়। প্রথম তিন ব্যক্তিকে হযরত আলী (রা.) এবং চতুর্থ ইহুদীকে হযরত যুবায়র ইবনে আওয়াম হত্যা করেন।

এ বছর খাইবার যুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ ছিল ভয়াবহ ও ক্ষীপ্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় বলেছিলেন, 'এবার তান্দুর গরম হয়েছে।' এ বাক্যটি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরাট অর্থবোধক বাক্যসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার থেকে ফিরে এসে 'সাহাবা' নামক স্থানে যখন পৌছেন, তখন হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের সৌভাগ্য সূর্য ফিরে আসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করে হযরত আলীর উরুতে মাথা মোবারক রেখে শুয়ে পড়েন। এমন অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ওহী

www.nagorikpathagar.org

নাযিল হতে শুরু করে। কোন ওজরের কারণে হযরত আলীর (রা.) আসরের নামায বাকী রয়ে গিয়েছিল। তিনি ওহী নাযিলের কারণে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানার্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলেননি। এরই মধ্যে সূর্য অস্ত হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবগত হলেন এবং দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আলী আপনার এবং আপনার রাসূলের আনুগত্যে ছিল। তার খাতিরে সূর্যকে ফিরিয়ে দিন।' সুতরাং অস্তমিত হওয়ার পরও; সূর্য আবার উদয় হয়। এটি হযরত আলীর (রা.) কারামত হিসেবে গণ্য হয়। সূর্য উদয়ের এ হাদীস কোন কোন মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় সহীহ এবং হাসান।

খাইবার থেকে ফেরার পথে লাইলাতুল তারীসের ঘটনা ঘটে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সফর শেষ করে রাতে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এমনভাবে ঘুম লেগেছিল যে সূর্য উঠে যায়। ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। সূর্যের হলুদ বর্ণ কেটে যাবার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান ও ইকামতের সাথে জামাতে নামায আদায় করেন। তখন ক্বেরাত জোরে পাঠ করেন। লাইলাতুল তারীসের সময়কাল সম্পর্কে আরো দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম কথা হল, এটা হুদাইবিয়া থেকে ফেরার পথে ঘটেছিল। দ্বিতীয় কথা হল, তাবুক থেকে ফেরার পথে। তবে প্রথম উক্তিই অধিক বিশুদ্ধ।

খাইবার থেকে ফেরার সময় কাফেলা যখন মদীনা তৈয়্যিবার নিকটে পৌঁছে; তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টি উহুদ পাহাড়ের উপর পড়লে মহানবী বলে উঠেন, 'এটা সে পাহাড় যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! আমি মদীনার দু'পার্শ্বে হারাম আখ্যা দিলাম যেভাবে ইব্রাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন।' যাতুর রেকার যুদ্ধের সফরে এক বাচ্চাকে আনা হয়; যার উন্মাদ রোগ ছিল। তার আম্মা তাকে নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হন এবং তার রোগের কথা জানান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালা মোবারক লাগিয়ে দেন এবং দোয়া করেন, ছেলেটি তখনই সুস্থ হয়ে উঠে। যাতুর রেকার যুদ্ধে আরেকটি মু'জেযা প্রকাশিত হয়। আলবা ইবনে যায়েদ আল হারেসী (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উট পাখির কয়েকটি ডিম হাদিয়া দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সে ডিমগুলো একটি বড় প্লেটে রাখা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সকলেই তা থেকে তৃপ্তির

www.nagorikpathagar.org

সাথে আহার করেন। কিন্তু ডিমগুলো যেমন ছিল তেমনি রয়ে যায়। এ সময় সৈন্যদের সংখ্যা ছিল সাত বা আটশত।

যাতুর রেকার যুদ্ধে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। সৈন্যদলের পানি ফুরিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের ওযুর পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক সাহাবীর নিকট সামান্য পানি ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পানিটুকু একটি পাত্রে ঢালতে বলেন। অতঃপর সে পাত্রে নিজের পবিত্র হাত রাখেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অংগুলি মোবারকের মধ্যদিয়ে পানি নির্গত হতে শুরু করে। সকলেই তা থেকে পানি পান করেন। ওযু করেন এবং জীব জন্তুকেও পানি পান করান। এ যুদ্ধে সাহ-াবায়ে কেরাম পেটের ক্ষুধার অভিযোগ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, 'অচিরেই আল্লাহ তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।' সাহাবায়ে কেরাম সমুদ্র বন্দরের দিকে যান। আল্লাহ সাগর থেকে একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দেন। সাহাবায়ে কেরাম খুব তৃপ্তির সাথে মাছ খান। এ মাছটি এত বড় ছিল যে, পাঁচজন লোক এর চোখের উপর বসতে পেরেছিল। খায়বার যুদ্ধে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। এ যুদ্ধে সাহাবাগণ একটি পাখীর বাসা থেকে পাখীর বাচ্চা ধরে নিয়ে আসেন। সে পাখীটি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এর অভিযোগ নিয়ে আসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাখির বাচ্চাগুলো ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর ইরশাদ ফরমান, 'এ পাখীটি যেভাবে তার বাচ্চাদের প্রতি স্নেহশীল, মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক দয়াবান।'

যাতুর রেকার এ যুদ্ধে হযরত উবাদা ইবনে বিশর (রা.) এবং আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রহরার জন্য নির্ধারিত ছিলেন। উভয়ে পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এক সাথী অর্ধরাত পর্যন্ত পাহারা দিবেন এবং দ্বিতীয় সাথী শেষ অর্ধেক রাত জেগে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রথমার্ধের দায়িত্ব ছিল হযরত উবাদার (রা.) উপর। তিনি নামাযের নিয়ত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সূরা কাহাফ তিলাওয়াত শুরু করেন। হযরত আম্মার (রা.) শুয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে জনৈক কাফির হযরত উবাদাকে (রা.) লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তাতে সাহাবীর দেহ রক্তের ফোয়ারায় ভেসে যায়। তবুও তিনি নামায ত্যাগ করেননি। যখন রক্ত খুব বেশী বের হতে শুরু করে তিনি রুকু সিজদা করে নামায শেষ করেন এবং তার বন্ধু হযরত আম্মার (রা.) কে জাগালেন। হযরত উবাদা (রা.) এ অবস্থা দেখে বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দা! তীর

www.nagorikpathagar.org

বর্ষণের সাথে সাথে তুমি কেন আমাকে জাগালে না। হযরত আম্মার বলেন, 'আমি সূরা কাহাফ শুরু করেছিলাম, বন্ধ করতে মন মানেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রহরার দায়িত্বে ত্রুটি হচ্ছে এ আশংকা না হলে আমি নামাযও ত্যাগ করতাম না এবং তোমাকেও জাগাতাম না। সুবহানাল্লাহ। একে একে তিনটি বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়েছে। অথচ সাহাবী (রা.) নামায ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান কেমন মজবুত ছিল এতেই বুঝা যায় এবং তারা কেমন নামায পড়তেন, বুঝা উচিত।

এ বছর যাতুর রেকার যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে একদিন দুপুর বেলার ঘটনা। গরম ছিল অত্যধিক, যে ময়দানে মহানবী অবস্থান করছিলেন সেখানে বন-জংগল ছিল প্রচুর। সাহাবায়ে কেরাম গাছের ছায়া খুঁজতে এদিকে সেদিকে ছুটে যান। তাঁরা একেক জন একেক গাছের নীচে শুয়ে পড়েন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘন ছায়া ঘেরা গাছের নীচে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ গারছ ইবনে হারিছ নামের এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসে। তরবারী উত্তোলন করে কাফির বলল, এবার কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধীর এবং শান্তকণ্ঠে জবাব দেন, 'আল্লাহ।' এদিকে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে গারছকে সজোরে ধাক্কা দেন। এতে সে মাটিতে লুটয়ে পড়ে। তার হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী হাতে নিয়ে বলেন, 'এবার তোকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা শুনে গারছ হতভম্ব হয়ে যায়। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে এবং শপথ করে যে, বাকী জীবনে কখনও শত্রুতা করবে না। যারা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে লড়াই করে সে তাদের সংগে কোন প্রকার সহযোগিতাও করবে না। এ প্রতিশ্রুতির পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ এমনিভাবে তাঁর নবীর হিফাযত করেছেন। সৈয়দ জামাল উদ্দিন 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে লিখেছেন, পরবর্তীতে গারছ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কলিমা পাঠ করেন, ফলে মহানবী তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তিনি আপন কওমে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তার দাওয়াতে বহু লোক মুসলমান হয়।

৭ম হিজরীর ১০ জুমাদাল উলা মঙ্গলবার রাতের ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর পারস্যের বাদশাহ কিসরা পারভেজ ইবনে হরমুজ নওশের নিহত হয়। সে মহানবী

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্রের অবমাননা করেছিল। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি বদদোয়া করেছিলেন। বিশ্বনবী বলেছিলেন, "আল্লাহ যেন ওকেও ছিঁড়ে ফেলেন।" ফলে আল্লাহ তার পুত্র শেরভিয়াকে লেলিয়ে দেন। সে পিতাকে তরবারী দিয়ে পেট চিরে হত্যা করে। যে রাতে সে নিহত হয়েছিল, পরদিন ভোরে মহানবী সাহাবায়ে কেরামকে সংবাদ দেন যে, আজ রাতে আল্লাহ পারস্যের সম্রাট কিসরা পারভেজকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ সংবাদ পরিবেশন ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা। এ বছর মসজিদে নববীর মিম্বার মোবারক তৈরী হয়। এর আগে খেজুর গাছের যে টুকরার উপর ভর করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেন, সেটার কান্নার ঘটনা ঘটেছিল। ইসলামে এটিই সর্বপ্রথম মিম্বার।

অষ্টম হিজরী (৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ ৮ম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনবী তাঁর নাম আপন উর্ধ্বতন দাদা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর নামে রাখেন। জন্মের সপ্তম দিন আকীকায় দু'টি ভেড়ী যবাই করেন। ছেলের মাথার চুল কাটার নির্দেশ দেন। আবু হিন্দ আল বাইয়াজী মাথার চুল কাটেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার চুলের সমওজন পরিমাণ রৌপ্য সদাকাস্বরূপ গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। কোন কোন বর্ণনা মতে সপ্তম দিন নাম রাখেন। আবার কোন কোন বর্ণনা মতে জন্মের রাতেই নাম রাখেন। এ বছর শুরুতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বড় কন্যা হযরত যয়নব (রা.) ইন্তিকাল করেন। তার জন্মের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ত্রিশ অর্থাৎ নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে, তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

জুমাদাল উলায় হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.), জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) মুতার যুদ্ধে সিরিয়াতে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের শাহাদাতের সংবাদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে খুৎবার মাঝে একে একে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জেযা। কারণ, মদীনা থেকে মুতা ছিল ১৮ দিনের রাস্তা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি জাফরকে জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের দু'টি বাহুসহ ফেরেশতাদের সংগে উড়ে বেড়াতে দেখেছি।' হযরত জাফরের শাহাদাতের পর যখন মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করেন তখন জনৈক ব্যক্তি মহানবী

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এর অভিযোগ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তাদেরকে থামিয়ে দাও। তথাপি মহিলারা থামল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, 'ওদের মুখে মাটি ঢেলে দাও।' মুতার যুদ্ধে মহান আল্লাহ হযরত খালিদের (রা.) হাতে বিজয় দান করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় তাঁকে সাইফুল্লাহ উপাধি দেন। মহানবী এ বছর হযরত জাফর (রা.) কে তাইয়ার উপাধি দিয়ে ছিলেন।

এ বছর মক্কা বিজয়ের সময় হযরত এতাব ইবনে উসাইদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে নামায এবং হজ্বের জন্য মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি এ বছর লোকজনকে হজ্ব করানোর দায়িত্ব পালন করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হুজার দেশের অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া ট্যাক্স আদায় করেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা.) এর যে বাহিনী বতনে আজম পাঠান হয়েছিল সেখানে একটি ঘটনা ঘটে। হযরত মিহলাম ইবনে জুছামা লাইছী (রা.) এ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। বনু সাজার আমীর ইবনে আজজা নামক ব্যক্তির সংগে তার সাক্ষাৎ হয়। ঐ গোত্রের আমীর, হযরত মিহলাম এবং তার সাথীদের সালাম দেন। কিন্তু সাবাহী (রা.) মনে করলেন যে, বর্ণিত সেনাপতি মুসলমান নয়। তাই তাকে হত্যা করে ফেলেন। যুদ্ধ শেষে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে ফিরে এলেন, তখন এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর তখন অনুসন্ধান করে নিবে। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য স্বীকার করে, তাকে বলো না যে, সে মুসলমান নয়।'

হযরত আমর ইবনে আসসুহমী, খালিদ ইবনে মুগিরা আল মাখজুমী এবং ওসমান ইবনে আবু তালহা আল আবদারী (তিনি কা'বা শরীফের চাবি সংরক্ষক ছিলেন) ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা ৮ই সফর মদীনা তৈয়িবায় হাজির হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ ইসলাম গ্রহণের দু'মাস পরে মদীনায় পৌঁছে মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে ইসলামের পক্ষে কোন যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। এ বছর পারস্যবাসী, তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর বুরান নামক এক মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করে নেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সে জাতি কখনও সফল হবে না, যারা তাদের ব্যাপার মহিলার হাতে তুলে দিয়েছে।'

www.nagorikpathagar.org

মক্কা বিজয়ের দিনটি ছিল শুক্রবার। রমযানুল মোবারকের ১৯ তারিখ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ তোয়াফ করেন। অত্যধিক ভীড়ের কারণে প্রতিটি চক্করের সময় তিনি নিজ হাতের ছড়ি দিয়ে হজরে আসওয়াদে চুমু খান। এ তোয়াফ ওমরার জন্য নয় বরং তা ছিল নফল তোয়াফ। যা বায়তুল্লাহ শরীফের বরকত হাসিল করার জন্য করেছিলেন। কারণ এ সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এহরাম ছিল না। তাওয়াফ শেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইব্রাহীমে তাশরীফ নিয়ে আসেন। এখানে জমজমের পানি পান করেন এবং ওযু করেন।

এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করেন। কাবা শরীফের চাবি সংরক্ষক ওসমান ইবনে আবু তালহার (রা.) নিকট চাবি চান। তিনি জবাব দেন, চাবি আমার আম্মার নিকট। তার নাম ছিল সুলাকা বিনতে সায়ীদ আল আনসারিয়াহ। হযরত ওসমান ঘরে গিয়ে তার কাছে চাবি চান। তিনি চাবি দিতে অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান জোর করে তার নিকট থেকে চাবি নিয়ে আসেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে দেন। মহানবী (রা.) নিজ হাতে বায়তুল্লাহর তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা পোষণ করেন যে, খানায়ে কা'বার চাবি হযরত ওসমান এবং তার মায়ের নিকট ফেরৎ দিবেন না। কারণ তার মাতা চাবি দিতে কড়াকড়ি করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানতসমূহ তার মালিকের কাছে ফেরৎ দাও' (সূরা নিসা-৫৮)। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আবার চাবি ফেরত দিয়ে দেন এবং বলেন, 'হে বনু তালহা! লও এখন থেকে চিরদিন এ চাবি তোমাদের নিকটই থাকবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চাবি ফিরিয়ে দেন তখন ওসমান এবং তাঁর মাতা সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অপর এক বর্ণনা মতে জানা যায় যে, হযরত ওসমান ইবনে আবু তালহা মক্কা বিজয়ের সাত মাস পূর্বে অষ্টম হিজরীর সফর মাসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় ওসমান ইবনে আবু তালহার চাচাত ভাই শাইবা ইবনে আবু তালহা ইবনে আব্দুল উজ্জা ইসলাম গ্রহণ করেন। মতান্তরে তিনি হুনাইন যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান ইবনে আবি তালহার নিকট যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাবি ফেরৎ দেন, তখন মৃত্যু পর্যন্ত এটা তাঁর নিকট ছিল। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি চাবি আপন চাচাত ভাই

www.nagorikpathagar.org

শাইবা ইবনে ওসমানের নিকট হস্তান্তর করে যান। আজ পর্যন্ত পবিত্র খানায়ে কাবার চাবি শাইবার বংশে রয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে খাতালকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নিজেও কটূক্তি করত এবং তার দু'জন দাসী দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুৎসা রটনা ও বাজে গান রচনা করাত। লোকজন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান যে, ইবনে খাতাল কা'বার পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং এ অবস্থাতেই তাকে হত্যা করা হয়। আবু বারজা আসলামী (রা.) তাকে হত্যা করেন। মক্কা বিজয়ের সময় আবু লাহাবের দু'ছেলে মুয়াত্তাব এবং ওতবা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা সাহাবীর মর্যাদা লাভে ধন্য হন। হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবু লাহাবের মেয়ে দুতারাও ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাদের ভাই, ওতাইবা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুবই কষ্ট দিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি ওর উপর আপনার কোন কুকুর লেলিয়ে দিন।' এ অভিশাপের ফলে একটি হিংস্র বাঘ তাকে চিরে খেয়ে ছিল। সিরিয়াতে তার পিতার সংগে জারকা নামক স্থানে সে কুফরীর অবস্থায় নিকৃষ্টভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল।

মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ, শুকর, মৃত জন্তু এবং এ ধরনের জন্তুর চর্বি বেচাকেনা হারাম ঘোষণা করেছিলেন। তেমনিভাবে গণকের শিরনীও হারাম ঘোষণা করেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৭/১৮ অথবা ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। এ অবস্থায় নামায ক্বসর আদায় করেন। কারণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় ১৫ দিনের বেশী থাকার ইচ্ছা ছিল না। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন শয়তান চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। শয়তানের সন্তানাদী যখন তার পাশে এসে সমবেত হল, তখন সে বলল, 'আজ থেকে আরব দেশে শিরক চলবে না, এ ব্যাপারে তোমরা নিরাশ হয়ে যাও। তবে তাদের মধ্যে 'নওহা' বিস্তার কর। কোন লোক মারা গেলে মৃত ব্যক্তির জন্য সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কান্নাকাটির নাম নওহা। সুতরাং মৃত্যু দিবস পালন করা এবং জন্ম দিবস পালন করা উভয় শয়তানী চক্রান্ত। মক্কা বিজয়ের পরে ফাতিমা বিনতে আসওয়াদ আলমাখজুমিয়া অলংকার চুরি করে। অপর এক বর্ণনা মতে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর থেকে তা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য হাত কাটার নির্দেশ জারী করেন।

মক্কা বিজয়ের পরে মদীনার আনসার সাহাবা পরস্পরে কানাঘুষা শুরু করেন যে, মহান আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মক্কা বিজয় করে দিয়েছেন। মক্কা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৈতৃক বাড়ি-ঘর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন সবাই এখানে আছেন। সম্ভবতঃ মহানবী আমাদেরকে ছেড়ে এখানে (মক্কায়) থেকে যাবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তা জানতে পেলেন, তখন আনসার সাহ-াবাদের বলেন, 'তোমাদের এবং আমার জীবন মরণ এক সাথে। অন্য সকল লোকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, বাইরের পোশাকের মত এবং আনসারদের দৃষ্টান্ত হল শরীরের সংগে লেগে থাকা ভিতরের পোশাকের মত। তারা আমার গোপনীয়তা রক্ষাকারী।' মহানবী আরও বলেন, 'যদি হিজরত না হত; তবে আমিও আনসারদের একজন হতাম। লোকজন যদি কোন এক মাঠ দিয়ে চলে এবং আনসাররা (রা.) অপর মাঠ দিয়ে তবে আমি আনসারদের সংগে চলব।'

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনাইন যুদ্ধের জন্য বের হন, তখন এতাব ইবনে উসাইদকে (রা.) মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। এসময় তার বয়স হয়েছিল বিশ বছর। হুনাইনের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে বার হাজার অপর বর্ণনা মতে চৌদ্দ হাজার সৈন্য ছিল। হুনাইনের রাস্তায় অত্যন্ত ঘন সবুজ একটি বরই গাছ দেখে কোন কোন নওমুসলিম বলে উঠেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যও একটি 'আনুয়াত' নির্ধারণ করে দিন, যেভাবে কাফিরদের জন্য এটা নির্ধারিত আছে।' উল্লেখ্য যে এ গাছটিকে আনুয়াত বলা হতো। এটা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহু আকবার! তোমরা এমন কথা বললে; যা মূসা (আ.) এর কওম বলেছিল।' তারা বলেছিল, 'হে মূসা! আমাদের জন্য একটি দেবতা নির্ধারণ করে দিন, যেভাবে কাফিরদের দেবদেবী আছে।' মূসা (আ.) বলেছিলেন, 'তোমরা এমন জাতি, যারা অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলে থাকো।' আনুয়াত বলতে হাতিয়ার লটকানোর উদ্দেশ্যে কাফিরগণ এ গাছের সম্মানার্থে এর উপর গিলাফ চড়াত।

এ বছর হুনাইন যুদ্ধে, প্রথমদিকে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল। কাফির বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। এ অবস্থায় মুসলমানগণ গনীমতের মাল সঞ্চয় করতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ সংখ্যাধিক্যের কারণে অহংকার করতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

ইতোমধ্যে কাফির বাহিনী পাল্টা প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দেয়। তীর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সবাই মক্কার দিকে পালাতে থাকেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী শত্রু সৈন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সাদা রং এর খচ্চরের উপর মহানবী আরোহী ছিলেন। এটা বিশ্বনবীকে ফাওয়া ইবনে নেফাছা আল জুজামী হাদিয়াস্বরূপ দান করেছিলেন। এর নামছিল "ক্বিছছ"। অপর বর্ণনা মতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দুলদুলের উপর আরোহী ছিলেন। সেটা মিশর বা আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ বিশ্বনবীকে দান করেছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হারিছ এর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার যখন সাহাবায়ে কেরামকে আহ্বান জানালেন, তখন সকলেই ফিরে আসেন। মুসলমানগণ যখন ফিরে আসেন তখন একটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। মহানবী খচ্চরের পিষ্ঠ থেকে নীচে নেমে আসেন। এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে কাফির সৈন্যদের লক্ষ করে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, 'কা'বার ররেব ক্বসম! কাফির বাহিনী পরাজিত হয়েছে।' আবার তিনবার বলেন, 'কাফিরদের চেহারা বিগড়ে যাক।' 'তাদের সাহায্য হবে না।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে সেগুলো সকল কাফিরের চোখে গিয়ে বিদ্ধ হয়। এ সময় সকল কাফিরের এমন মনে হচ্ছিল যে, প্রতিটি গাছ পালা পাথর এবং সকল বস্তু যেন এক একটি অশ্বারোহী সৈনিক হয়ে তাদেরকে ধাওয়া করছে। মোটকথা মহান আল্লাহ পাক একমাত্র তার নিজ সাহায্যে কাফিরদের পরাজিত করে দেন। মুসলমানদের আর কোন যুদ্ধই করতে হয়নি। মুসলমানগণ সে যুদ্ধে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ময়দানে একা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সওয়ারীকে কাফির বাহিনীর দিকে হাকাচ্ছিলেন এবং নিম্নের কবিতা পাঠ করছিলেন, 'আমি সত্যিকার নবী। মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।' হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে ফিরিশতা পাঠিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন সাদা রং বিশিষ্ট মানুষের আকৃতিতে। তাদের মাথায় ছিল লাল পাগড়ী। সকলেই অশ্বারোহী। পাঁচ হাজার ফিরিশতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহায্যের জন্য অবতরণ করেছিলেন। যেমন কুরআন পাকে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সৈন্য পাঠিয়ে ছিলেন যা তোমাদের দৃষ্টিতে আসেনি' (সূরা তওবা-২৬)। হুনাইন যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে ঐ কাফিরের মালামাল

www.nagorikpathagar.org

পাবে, তবে এ বিষয়ে সাক্ষী থাকতে হবে। এ যুদ্ধে হযরত আবু তালহা যায়েদ ইবনে ছাহল আনসারী একা বিশজন কফিরকে হত্যা করেন এবং তাদের ছামানা খুলে ফেলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছামানার সব কিছু তাঁকে দিয়ে দেন।

হুনাইনের যুদ্ধে অনেক কাফির এবং তাদের মালামাল জীবজন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হস্তগত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মালামাল সাহাবায়ে কেরামকে হস্তান্তর করে সেগুলো জিয়িয়ারানায় পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তায়েফ অভিযান থেকে জিয়িয়ারানায় ফিরে এসে সেগুলো বণ্টন করে দেন। হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কে তখন এ আয়াত নাযিল হয়, 'মহান আল্লাহ বহু জায়গাতে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও যখন তোমরা সংখ্যাধিক্যের কারনে গর্বিত ছিলে' (সূরা-তওবা)। হুনাইন যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'কে তাকে হত্যা করেছে?' হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের কথা বলা হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদকে নির্দেশ দেন ঃ কোন মহিলা, কোন শিশু এবং কোন দুর্বল বৃদ্ধ লোককে যেন হত্যা করা না হয়। হুনাইন যুদ্ধে চারজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন, আইমন ইবনে উম্মে আইমন (রা.)। উম্মে আইমন ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাসী, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লালন পালন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এ আইমন ভিন্ন একজন; আনসারী কাবিলার ছিলেন। তার বংশ ধরা হচ্ছে আইমন ইবনে উবায়েদ ইবনে যায়েদ আল খাযরাজী আল আনসারী। এ উভয় কথার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে যে, উম্মে আইমনের শাদী হয়েছিল উবায়েদ আনসারীর (রা.) সংগে। তার ঔরসে উম্মে আইমন (রা.) জন্ম নিয়েছিলেন। উবায়দের (রা.) ইন্তিকালের পরে উম্মে আইমনের বিয়ে যায়েদ ইবনে হারিসের (রা.) সংগে হয়েছিল। তার ঘরে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই আইমন হচ্ছেন উসামার মা (জুরকানী শরহে মাওয়াহিব)। হুনাইন যুদ্ধে বাকী তিনজন শহীদ সাহাবী হলেন, এজীদ ইবনে জুময়া ইবনে আসওয়াদ (রা.), সুরাকা ইবনে হারিছ আনসারী (রা.) এবং আবু আমির আশয়ারী (রা.)।

এ যুদ্ধে আবু লাহাব গেফারীও (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে তিনশত কাফির নিহত হয়েছিল। কোন কোন উক্তি মতে সত্তর জন নিহত হয়েছিল। অর্থাৎ পরাজয়ের পূর্বে ৭০ জন এবং পরে তিনশত নিহত হতে পারে। হুনাইনের যুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

কাফিরদের অনেক মহিলা বন্দী হয়েছিল। তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে তাদেরকে বিয়ে দেয়া হয়। যেহেতু তাদের কাফির স্বামী জীবিত ছিল তাই মুসলমানগণ দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'আর বিবাহিত মহিলা, সেসব মহিলা ব্যতীত যাদের মালিকানা তোমাদের রয়েছে। যদিও তাদের কাফের স্বামী থাকে তথাপি তারা তোমাদের জন্য হালাল।' এ বছর সাহাবায়ে কেরাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আজল (বীর্য প্রত্যাহার করা) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। মহানবী উত্তর দেন, 'না তোমাদের উচিৎ তোমরা এভাবে করবে না। যে প্রাণ কিয়ামত পযর্ন্ত জন্ম নিবে, সে জন্ম নিয়েই থাকবে।'

তায়েফ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এটা আবু রেগালের কবর। সে ছিল ছামুদ বংশীয়। তার সংগে স্বর্ণের সিলও দাফন করা হয়েছে।' সাহাবাগণ এ স্থানটির মাটি খুঁড়েছিলেন এবং এতে স্বর্ণের সিল বের হয়ে আসে। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জেযা। অষ্টম হিজরীতে তায়েফের যুদ্ধের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, যে গোলাম তায়েফবাসী থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে, সে আজাদ হবে। এ ঘোষণা শুনে তিনজন গোলাম এগিয়ে এলে, তিনজনকেই আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বাকরাহ লুফাই ইবনে মাসরোহ। তিনি ছিলেন হারিছ ইবনে কেলদার গোলাম। তিনি এবং তাঁর সকল সাথী ইসলাম গ্রহণ করেন। তায়েফের যুদ্ধে ছাবিত ইবনে জিয়া আল আনসারী (রা.) শহীদ হন। তিনি ৰাইয়াতে আকাবা এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তায়েফের যুদ্ধে হযরত সালমান ফার্সীর (রা.) পরামর্শে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রেন বা ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছিলেন। এ ছিল মুসলমানদের ব্যবহৃত সর্বপ্রথম মিনজানিক বা ক্রেন বা ক্ষেপণাস্ত্র। সেখান থেকে গোলা বর্ষণ করা হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.) তায়েফে শহীদ হন।

নবম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের যাকাত আদায় করে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য কিছু ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করেন। নবম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে যখন বনু তামীমের একটি প্রতিনিধি দল আসে এবং তারা হুজরার বাইরে থেকে চীৎকার করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক দেয়, তখন আয়াত নাযিল

www.nagorikpathagar.org

হয়, 'নিশ্চয় যে সকল লোক আপনাকে হুজরার বাইর থেকে আহবান করছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধি রাখে না' (সূরা হুজরাত-৪১)।

একই বছর বনু তামীমের প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে প্রশ্ন করে যে, তাদের নেতা কে হবেন? হযরত আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) এ দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। হযরত আবু বকরের অনুরোধ ছিল কাইনুক ইবনে মা'বাদকে আমীর করা হোক এবং হযরত ওমরের আবেদন ছিল আফরা ইবনে জালিসকে আমীর করা হোক। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) কে বলেন, 'তুমি শুধু আমার বিরোধিতা করতে চাও।' এ বিতর্কে উভয়ের শব্দ উঁচু হয়ে গেলে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগে বাড়া-বাড়ির চেষ্টা কর না' (আল হুজুরাত-১)। এরপর থেকে তাঁরা অত্যন্ত ধীর শব্দে কথা বলতেন এবং এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, 'নিশ্চয় যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে নিজেদের আওয়াজ নীচু রাখেন, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে তাক্বওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।' (সূরা হুজুরাত-৩)

নবম হিজরী (৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ নবম হিজরীতে রজব মাসে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর ইন্তিকাল হয়। তার নাম ছিল আসহিমা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামাযে জানাযা পড়েছিলেন। তাতে চার তকবীর পাঠ করেছিলেন এবং বলেছিলেন তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর। একই বছর আব্দুল কয়েসের (রা.) প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা দীন ইসলাম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন এবং জানতে চান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন, 'আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ করছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। তোমাদের ঈমান, নামায, যাকাত এবং রোযা পালনের নির্দেশ করছি এবং কদুর পাত্র, মাটির তৈলাক্ত রংগীন পাত্র, খেজুরের গুড়ির পাত্র এবং তার কুলের রঙ্গিন বাসন ব্যবহার নিষেধ করছি।' শরহে মাওয়াহিবে আছে যে, আব্দুল কয়েসের (রা.) দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দু'বার হাজির হয়েছিলেন। প্রথমতঃ পঞ্চম হিজরীতে, দ্বিতীয়ত নবম হিজরীতে। প্রথম দফায় তের বা চৌদ্দজন এবং দ্বিতীয় বার চল্লিশ জন এসেছিলেন।

নবম হিজরীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দূর-দুরান্ত হতে প্রতিনিধিসমূহ আসতে থাকেন। তাই এর নাম 'প্রতিনিধি আগমনের সন' রাখা

www.nagorikpathagar.org

হয়। প্রতিনিধিগণের আগমন তখন থেকে শুরু হয়েছিল, যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ যুদ্ধ থেকে ফিরে জিয়িয়ারানা অবস্থান করেন। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষদিকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ৫ই যিলক্বদ তারিখে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়িয়ারানা তাশরীফ নিয়ে আসেন। হাফিয মুগলতায়ী তার সীরাত গ্রন্থে যেসব প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ যারা জিয়িয়ারানা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত দরবারে নবুওয়াতে হাজির হয়েছিলেন। তাদের সংখ্যা ষাটেরও অধিক। আল্লামা শামী একশতের অধিক দলের কথা লিখেছেন। অতি সংক্ষেপে ক'টি দলের আলোচনা করা যেতে পারে।

বনু ফাজারা অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগ নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মু'জেযা এভাবে প্রকাশ পায়। মহানবী দোয়ার জন্য হাত উঠালেন সংগে সংগে বৃষ্টি হতে শুরু করে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত অনাবরত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে। অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন খারিজা ইবনে মিহসান। বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে যে বেদুঈনের কথা বলা হয়েছে ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা দানরত অবস্থায় এ অভিযোগ করা হয়েছিল।

বনু আসাদ ইবনে খুজাইমার প্রতিনিধি দল হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ওয়াবিসা ইবনে মুয়ীদ এবং তোলাইহা ইবনে খুয়াইলিদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দয়ার ভংগিতে বলেন, 'আমরা দুর্দিনে আঁধার রাতের পোশাক পরিধান করে আপনার কাছে এসেছি, অথচ আপনার কোন বাহিনী আমদের নিকট প্রেরণ করতে হয়নি।' এ কথা প্রসংগে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'তারা আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শন করছে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। আপনি বলে দিন, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না। বরং তোমাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন যে, তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত করেছেন' (সূরা হুজুরাত-১৭)। অতঃপর তাঁরা ইসলামের উপর কায়েম থাকে একমাত্র তোলাইহা ইবনে খুয়ালিদ ব্যতীত। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে মুর্তাদ (ধর্মান্তরিত) হয়ে যায় এবং নবুওয়াতী দাবী করে বসে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজ খেলাফতকালে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কে সৈন্যসহ তাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তুমুল সংঘর্ষ হয়। সে পলায়ন করে সিরিয়াতে চলে যায়। পরবর্তীতে সে যথাযথভাবে

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এর শাসন আমলে মদীনায় এসে হাজির হয়।

বনু কেলাবের প্রতিনিধি দল বিশ্বনবীর কাছে হাজির হয়। তাদের মধ্যে লবীদ ইবনে রবিয়া এবং আবু আকিল আল আমেরীও শরীক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কবি। তার সম্পর্কেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কোন কবির সবচেয়ে সত্যকথা হচ্ছে লবীদের এ কবিতাংশ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল এবং পার্থিব সকল ভোগ বিলাস একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে।' তিনি এবং তাঁর সাথীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সহধর্মিণীগণের সংগে 'ঈলা' করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আল্লাহর কৃসম! একমাস পর্যন্ত তোমাদের সংস্পর্শে আসব না।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে ডান বাহুতে এবং পায়ের গোঁড়ালীতে জখম হয়েছিল। এ জন্য ঘরে অবস্থান করেন। এ সময় মসজিদে নামাযের জন্য হাজির হতে পারতেন না। ঘরে বসে বসে নামায আদায় করতেন। সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে আসলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। এ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন 'ইমাম এ জন্য নিয়োগ করা হয় যাতে তার অনুসরণ করা যায়। অতএব, তিনি যখন তাকবীর বলবেন, তোমরা তাকবীর বলবে, যখন রুকু করবেন, তোমরাও রুকু করবে। যখন রুকু থেকে মাথা উঠাবেন, তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি যখন বসে নামায পড়েন, তোমরাও বসে নামায পড়বে।'

ঈলা এবং আহত হওয়ার উভয় ঘটনা একই সময় ঘটেছিল। তবে ঘটনার সন সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, নবম হিজরীতে। ইয়ামারী 'হাদীস' গ্রন্থে এবং ক্বাসতালানী 'মাওয়াহিব' গ্রন্থে এবং অন্যান্য অনেক আলিম অকাট্যভাবে তাই বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। হাফিয ইবনে হাজার এবং ক্বাসতালানী বুখারীর ব্যাখ্যাকার এর উপর জোর দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এ ঘটনাদ্বয় ৬ষ্ঠ হিজরীতে ঘটেছিল। তবে এ দু'টি ঘটনা যে, যিলহজ্ব মাসে এবং পর পর একসাথে ঘটেছিল তাতে যেন মতবিরোধ নেই। যখন ঈলার সময়সীমার মেয়াদ অর্থাৎ একমাস শেষ হল, তখন সূরা আহযাবের দুটি আয়াত নাযিল হয়। এতে বিশ্বনবীর সম্মানিত স্ত্রীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগ-

www.nagorikpathagar.org

বিলাসিতা কামনা করেন তবে তাদেরকে বিদায় দেয়া হবে। আর যদি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের বাড়ি চান, তাহলে তাঁদেরকে সকল দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করতে হবে।' এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে শুনান। তখন সকলেই একবাক্যে বলে উঠেন, 'আমরা আল্লাহ, রাসূল এবং আখিরাতের সুখ-শান্তিই চাই।' সর্বপ্রথম এ জবাব দিয়েছিলেন হযরত আয়িশা (রা.)। তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য সকল স্ত্রীগণ একই কথা বলেছিলেন।

৯ম হিজরীতে মহিলা সাহাবী গামিদিয়াকে (রা.) প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। সে ব্যভিচারের কারণে অন্তঃসত্তা ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তিনি চারবার ব্যভিচারের কথা স্বীকার করেন এবং নিজেই নিজেকে শাস্তি প্রদানের আবেদন করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সন্তান প্রসব এবং সন্তানের দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। সাহাবী (রা.) যখন সন্তান প্রসব এবং দুধ ছাড়ানো মেয়াদ পূরণ করেন তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর বিশ্বনবী জানাযা পড়ান। পরে তাকে দাফন করা হয়। এই সাহাবী (রা.) সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'এ মহিলা এমন তওবা করেছে যে, যদি ট্যাক্স উসুলকারীও এমন তওবা করে তবে তারও ক্ষমা হয়ে যাবে। কত গভীর ও মজবুত ঈমান থাকলে মুমিন আল্লাহর নির্দেশকে মেনে নিতে পারে এটি তারই উদাহরণ।

৯ম হিজরীতে কোন কোন সাহাবা (রা.) অস্ত্র বিক্রি করে ফেলেন। তাঁরা বলেন জিহাদ শেষ হয়ে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জিহাদ শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম অবতরণ করবেন।' অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ বন্ধ হবে না; তা চলবে। একই বছর হযরত জিব্রাঈল (আ.) লোকজনকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শুভাগমন করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান, ইহসান এবং কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত হাদীসকে উম্মুল হাদীস অর্থাৎ হাদীসসমূহের মা বলা হয়ে থাকে।

এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেকটি মু'জেযা প্রকাশিত হয়। জনগণ অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে জনৈক বেদুঈন মসজিদে এসে হাজির হন। তিনি আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!

www.nagorikpathagar.org

অনাবৃষ্টির কারণে জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সন্তানাদি অনাহারে মারা যাচ্ছে। আমদানী রফতানী বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ বৃষ্টি দান করেন।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার অবস্থাতেই হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন। 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পর্যাপ্ত বৃষ্টি দান করুন।' হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর কৃসম! মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও মিম্বার থেকে অবতরণ করেননি, বৃষ্টিপাত শুরু হল। আমি দেখতে পেলাম বৃষ্টির ফোঁটা তাঁর দাড়ি মোবারক থেকে পড়তে শুরু করেছে।' পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত একাধারে বিরামহীন বৃষ্টি হতে থাকে। সপ্তাহব্যাপী সূর্যের মুখ কেউ দেখেনি। পরবর্তী জুমু'আর দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে খুতবা দান করছিলেন। সে বেদুঈন অথবা অন্য কেউ এসে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ অতি বৃষ্টির কারণে মালামাল জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি যথেষ্ট হয়েছে। এবার তা বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করুন।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যেই হাত উঠালেন এবং দোয়া করলেন। 'হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে হোক, আমাদের উপরে নয়। আয় আল্লাহ! পাহাড়ে বা টিলায় মাঠে গাছ-পালায় এবং জংগলে বৃষ্টি হোক।' দোয়ার সাথে সাথে মেঘের কাল ছায়া দূর হয়ে গেল। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দু'বার দোয়া করেছিলেন। বুখারী শরীফে দ্বিতীয়বারের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবারের ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীতে হয়েছিল।

যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসেন তখন আব রুক্বিয়া তামীম ইবনে আওস ইবনে খারিজা আদদারী (রা.) ছয় সদস্য বিশিষ্ট দল নিয়ে হাজির হন। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান। দলের সকলেই ইসলাম কবুল করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাসাসা এবং দাজ্জালের কাহিনী বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বর্ণনা মিম্বরে বয়ান করেছেন। সে কথাটি তামীম দারীর মান মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। তামীমদারী (রা.) হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতকালে তার অনুমতি নিয়ে ওয়াজ করা শুরু করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদে বাতি জ্বালানোর প্রথা চালু করেন। তিনি পরিপূর্ণ কুরআন মজীদ এক রাকাতে সমাপ্ত করতে পারতেন।

এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু মুয়ীতকে বনু মুস্তালিকের যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

জাহেলিয়াতের যুগে ওলীদ এবং বনু মুস্তালিকের মধ্যে শত্রুতা ছিল। ওলীদকে সম্ভবত কেউ ভুল তথ্য দিয়েছিল যে তারা তোমাকে হত্যা করতে চায়। তাই তিনি ভীত হলেন এবং রাস্তা থেকে ফিরে এলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলেন, 'তারা ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে। তারা যাকাত দেয়নি।' এ সংবাদ শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ইতোমধ্যে বনু মুস্তালিকের লোকজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, 'আমরা মুর্তাদ হইনি কিংবা যাকাত আদায়ের অস্বীকৃতি প্রকাশ করিনি। ওলীদকে কেউ ভুল সংবাদ দিয়েছে, যা তিনি যাচাই না করে, বিশ্বাস করে নিয়েছেন।' এ প্রসংগে আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে খবর নিয়ে আসে, তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করবে' (আল হুজুরাত-৬১)। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুঃখ দূর হয়ে যায় এবং তিনি এ আয়াত পাঠ করে তাকে শুনান এবং বলেন, 'চিন্তা ভাবনা করে কাজ করা রহমানের পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।' অতঃপর তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আব্বাস ইবনে বিশর (রা.) কে বনু মুস্তালিকবাসীর নিকট পাঠান। তিনি যাকাত উসুল করে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবিহিত করেন।

আলকামা ইবনে মুহাতারাজ আল মাদলাজীর (রা.) বাহিনী আবিসিনিয়ার কিছু লোকের সংগে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আলকামা তার বাহিনীর কিছু লোকের আমীর হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা আস সামীকে (রা.) নিযুক্ত করেন। আব্দুল্লাহ কোন কারণবশতঃ তার সাথীদের উপর খুব নারাজ হয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে কাঠ জমা করে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ করেন। তারা নির্দেশ পালন করেন। তিনি তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমীরের নির্দেশ পালন করার কথা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের বলেননি।' তারা উত্তর দেন, 'নিশ্চয়।' তিনি তখন বলেন, 'আমি আমীর হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়।' কেউ কেউ বলেন যে, আমীরের নির্দেশ হলে আমাদের তা মেনে নেয়া উচিৎ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্যই তো ইসলামে এসেছি। কাজেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ব না। ফলে একজনও আগুনে ঝাঁপ দেয়নি। ইতোমধ্যে আব্দুল্লাহর ক্রোধও প্রশমিত হয়। মদীনায় ফিরে আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে বিষয়টির আলোচনা চলে আসে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা যদি আগুনে প্রবেশ করতে, তাহলে আর কোনদিনই

www.nagorikpathagar.org

তা হতে বের হতে পারতে না। শিক্ষণীয় বিষয় হল, নেতা বা আমীরের আনুগত্য ভাল কাজেই করতে হয়। শরীয়ত বিরোধী কাজে নয়।'

তাবুক থেকে ফিরে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যেরার ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ মসজিদটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে মুনাফিকেরা নির্মাণ করেছিল। এ মসজিদ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, 'কিছুলোক রয়েছে, যারা এসব হীন উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে। যাতে ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে পারে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে আর ঈমানদারগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।' (সূরা তওবা-১০৭)

৯ম হিজরীতে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বিশ দিন অসুস্থ থাকার পর মৃত্যুবরণ করে। ওমর (রা.) এর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও, দয়ার কা রী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়ান। তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়, 'এসব মুনাফিকদের কেউ মারা গেলে আপনি (বিশ্বনবী সা.) কখনও তাদের জানাযা পড়াবেন না। তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবেন না।' হযরত ওমর (রা.) এর অভিমতও ছিল তাই। এভাবে পনেরটি বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) এর অভিমত অনুযায়ী আয়াত নাযিল হয়েছিল।

দয়ার সাগর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মুনাফিক সর্দারের প্রতি এতই সদ্ব্যবহার এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তার কবরে অবতরণ করেন। নিজের জামা মোবারক তাকে কাফনে পরিধান করান। কোন কোন সাহাবা (রা.) তাতে আপত্তি করেন। তারা এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে কথা বলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'এর মধ্যে কৌশল রয়েছে। আশা করি আমার এ সদাচরণের ফলে তার কওমের কিছু লোক ঈমান নিয়ে আসবে।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশাবাদ বাস্তবে রূপ নিল। এ কৌশল অবলম্বনের সুফল এভাবে প্রকাশ পেল যে, মুনাফিকরা দেখল তাদের সর্দার কিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার কষ্ট দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণও প্রত্যক্ষ করল। মুনাফিক সর্দার তার মৃত্যুর পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামা মোবারকও প্রত্যাশা করছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও দান করেন। এ আচরণ দেখে এক হাজার মুনাফিক সত্যিকার অন্তরে তওবা করে এবং মুসলমান হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

নবম হিজরীতে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সংগে হজ্ব পালন করেন। কুরবানী বা হাদীর জন্তু সংগে নিয়ে যান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পেছনে হযরত আলী (রা.) কে পাঠালেন যাতে সূরা বারাতের প্রথম পাঁচটি আয়াতের ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়। হযরত আলী (রা.) আরজ নামক স্থানে গিয়ে হযরত আবু বকরের সংগে মিলিত হন। মক্কা মুকাররামা পৌঁছার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) কে বলেন, তিনি যেন সূরা বারাতের আয়াত সম্বলিত ঘোষণা পত্র পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তা ছিল ঃ আজ থেকে ভবিষ্যতে কোন মুশরিকের সংগে কোন ধরনের সন্ধি চুক্তি নেই। এ বৎসরের পরে আর কোন মুশরিক হজ্ব করতে আসতে পারবে না। কোন ব্যক্তি বায়তুল্লার তোয়াফ উলংগ হয়ে করতে পারবে না। এ ছিল সর্বশেষ হজ্ব যে হজ্বে, মুশরিকরাও অংশ নিয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মুশরিকরা (তাদের বাতিল আকীদা বিশ্বাসের কারণে) নিরেট নাপাক। সুতরাং তারা এ বছরের পরে মসজিদুল হারামের পাশেও যেন না আসে' (সূরা তওবা-২৮)। এ বিধান নাযিলের পর মুসলমানগণ ভাবতে লাগলেন মুশরিকরা যদি না আসে তবে আমাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কে নিয়ে আসবে? এ প্রেক্ষিতে আয়াতের পরবর্তী অংশ নাযিল হয়, 'তোমরা যদি দারিদ্র্যতার আশংকা করো তবে (আল্লাহর উপর ভরসা কর)। আল্লাহ তোমাদের তার ফযলে কারো মুখাপেক্ষী রাখবেন না যদি তিনি চান।' (সূরা তওবা-২৮)

৯ম হিজরীর শাবান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন হযরত ওসমান (রা.) এর সহধর্মিণী। তবে তার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। তাবুকের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। কেউ কেউ বলেছেন তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে দশ হাজার মতান্তরে বার হাজার ঘোড়া ছিল। তাবুক যুদ্ধের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সদাকার জন্য উৎসাহিত করেন এবং মুক্তহস্তে চাঁদার জন্য নির্দেশ দেন। এতে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর ঘরের যাবতীয় মালামাল নিয়ে হাজির হন। এসবের মূল্য ছিল চার হাজার দিরহাম। হযরত ওমর (রা.) তার সকল সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) দু'শত ওকিয়া, কারও মতে চার হাজার দিরহাম চাঁদা দেন। এটা ছিল তার গোটা সম্পদের অর্ধেক।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আসিম ইবনে আদী (রা.) ষাট ওসক খুরমা পেশ করেন। আবু আকিল এক সা কিংবা অর্ধেক সা খেজুর চাঁদা দেন। মোটকথা সকলেই সাধ্যানুযায়ী দান করেন। এমনিভাবে মহিলারা তাদের হাতের চুড়ি, বাজুবন্দ, গলার হার, পায়ের মল, আংটি, নাকের ফুল ইত্যাদি পেশ করেন।

মুনাফিকরা উভয়পক্ষকে দোষারোপ করে। যারা বেশী দান করে তাদেরকে রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানোর অপবাদ দেয়। যারা কম দিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলে, 'এটা না দিলে আর জিহাদ করাই সম্ভব হত না।' মুনাফিকদের এ ধরনের অন্তর বিদীর্ণকারী কটুকথার জবাবে আয়াত নাযিল হয়, 'এ মুনাফিকরা হচ্ছে এমন যে, নফল সদাকা দাতা, চাঁদা দানকারীদেরকে অপবাদ দিয়ে থাকে এবং সেসব দাতাদের নিয়েও কথা বলে যাদের মেহনত মজদুরী ব্যতীত তাদের অন্য কোন অবলম্বন নেই।' (সূরা তওবা)

তাবুক যুদ্ধে হযরত ওসমান (রা.) মুক্তহস্তে দান করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি খাদ্য সামগ্রী এবং যুদ্ধের রসদপত্র ভর্তি নয়শত উট, একশত ঘোড়া, এক সহস্র দীনার আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অত্যধিক খুশি হলেন এবং ইরশাদ করেন, 'হে ওসমান! আল্লাহ তোমার প্রকাশ্য এবং গোপনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আজকের পরে তুমি যে আমলই কর না কেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' বিরাশি জন মুনাফিক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে তাবুকের যুদ্ধে যায়নি। তারা ঘরে বসে থাকে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে মিথ্যা টালবাহানা করে। তাদের সম্পর্কে দুটি আয়াত নাযিল হয়। 'কিছু বাহানাকারী লোক বেদুঈনদের মধ্য থেকে এসেছিল, যাতে তাদের ঘরে বসে থাকার অনুমতি হয়ে যায়' (সূরা তওবা-৯)। 'পশ্চাৎ অবলম্বনকারীরা খুশি হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে বসে থাকার কারণে' (সূরা তওবা-৮১)।

সে বছর তাবুক যুদ্ধ থেকে বিরতকারী মুনাফিকদের মধ্যে দু'ভাই ছিল। তারা হলেন, (১) জালাস ইবনে সুয়াইদ, (২) হারিছ ইবনে সুয়াইদ। তারা দু'জন ছিল আওস গোত্রের সদস্য। জালাস বলেছিল, 'এ ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমরা গাধার চেয়েও অধম।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে তাকে জিজ্ঞাস করলে সে স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন। 'তারা কসম খেয়েছে যে, আমরা এমন কথা বলিনি। অথচ তারা কুফরীর কথা বলেছিল। আর তারা এ কুফরীর কথা বলায়

নিজেদের বাহ্যিক মুসলমান দাবী করার পর স্পষ্ট কাফির হয়ে গেছে' (সূরা তওবা-৭৪)। এতে তার কুফর এবং নিফাক প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে করে ভাবনায় পড়েন। তখন আয়াত নাযিল হয়, 'আল্লাহ এমন সব লোকদের কেমন করে হিদায়াত করবেন যারা ঈমান নিয়ে আসার পরে কাফির হয়ে গেল।' (সূরা আলে ইমরান-৮৬)

তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'রোম সাম্রাজ্যের সংগে জিহাদ কর।' রোমানদের মেয়েরা তোমাদের দাসী হবে। একথা শুনে সাদ ইবনে কয়েস ইবনে সাখরা আল আনসারী আস সালমী (বনু সলীমের সর্দার) বলে উঠলো আমি যদি ঐ মহিলাদের দেখতে পাই তখন নিজেকে সামাল দিতে পারি কি না ফিতনায় পড়ে যাই। তার মধ্যে মুনাফিকীর খাসলত বা নমুনা ছিল। সে আরও বলল, সে কারণে আমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি আর্থিক সহযোগিতা করব। এ প্রসংগে আয়াত নাযিল হয়, 'ঐসব মুনাফিকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছে, যে বলে থাকে আমাকে অনুমতি দিন। আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না' (সূরা তাওবা-৪৯)। তার আর একটি ঘটনা হল, হুদাইবিয়ার সময় যখন সকল সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত করেন, তখন সে নেকাবের কারণে তা থেকে বিরত থাকে। সে তার উটের নীচে আত্মগোপন করে।

৯ম হিজরীতে সকল সাহাবায়ে কেরাম যারা সক্ষম ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে তিনজন সাহাবী অংশগ্রহণ করেননি। তারা হলেন, কাব ইবনে মালিক, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরার ইবনে রবী (রা.)। তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবাকে, এ তিনজনকে বয়কট করার নির্দেশ দেন। এভাবে পঞ্চাশ দিন চলে যায়। তাদের উপর চিন্তা এবং অশান্তির পাহাড় নেমে আসে। তখন আল্লাহ তাঁদের তওবা কবুল করেন। কারণ তারা মুনাফিকদের মত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে মিথ্যা ওজুহাত খাড়া না করে সত্য কথা বলেছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন হযরত আলী (রা.) এর কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগী হওয়া থেকে মদীনায় বিছিন্নভাবে অবস্থান করা কষ্ট ও বিরক্তিকর মনে হয়। তিনি আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে ফেলে যাচ্ছেন?' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আলী! তুমি কি

www.nagorikpathagar.org

তাতে রাজী নও। যেন আমার সংগে তোমার সম্পর্ক এমন হোক যেভাবে মূসা (আ.) এর সংগে সম্পর্ক ছিল হারুন (আ.) এর। তবে মনে রেখো আমার পরে আর কোন নবী নেই।' জুরকানী শরহে মাওয়াহিবে লিখেছেন যে' এটাই গ্রহণযোগ্য যা বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ শরীফে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তাবুকের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে মদীনায় তার প্রতিনিধির দায়িত্বে নিয়োজিত করে গিয়েছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাথী সংগীসহ বিরত থাকে। তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় একটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে ওদীয়া ইবনে ছাবিত মুনাফিকদের এক গ্রুপের সংগে গোপনে বৈঠক করে। তারা পারস্পরিক কথাবার্তার মাঝে বিদ্রূপের স্বরে বলেছিল, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থা দেখো! তিনি রোম এবং সিরিয়ার দুর্গ এবং মহলগুরো জয় করতে চলেছেন, এটা কখনও হবে না। কোন দিনই সম্ভবপর নয়।' মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে বিষয়ে অবগত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রা.) কে তাদের কাছে পাঠান এবং বলেন ওদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, তোমরা কোন বিষয়ে আলোচনা করছিলে? এতে যদি তারা অস্বীকার করে তবে বলে দিও যে তোমরা এসব কথা বলছিলে। হযরত আম্মার (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তারা পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করে বসে। তাদেরকে যখন বলা হল যে, তোমরা এভাবে ঐসব কথা বলেছ। তখন তারা বাধ্য হয়ে ওজর পেশ করে বলল, হ্যাঁ, আমরা তামাশাস্থলে এসব কথা বলেছিলাম।' এ সময় কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। 'আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা বলে দিবে আমরা তো কেবল হাসি ঠাট্টা করছিলাম। আপনি ওদের বলে দিন! তোমরা কি তাহলে আল্লাহর সংগে এবং আল্লাহর আয়াতের সংগে এবং তার রাসূলের সংগে হাসি তামাশা করছিলে? অতএব, এভাবে কোন বাহানা তৈরি করবে না। অথচ তোমরা নিজেদের মুমিন বলে কুফরী করছ। (সূরা তাওবা-৬৫-৬৬)

তাবুক যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওনা হবার সময় মুনাফিকরা পরস্পরে বলাবলি করছিল এবং মুসলমানদেরকেও ইন্ধন যুগিয়ে ছিল যে, বর্তমানে গ্রীষ্ম মওসুম চলছে। এ কথার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়, 'তারা বলছিল যে, এমন গরমে বের হবে না। আপনি বলে দিন যে, জাহান্নামের আগুন

এর চেয়ে অধিক গরম' (সূরা তাওবা-৮১)। একই বছর কিছু গ্রাম্য লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে ওজর পেশ করে বলল, তাদেরকে যেন জিহাদে যাওয়া থেকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি আলোচিত ৮২ জন মুনাফিক বিনা অনুমতিতেই ঘরে বসে থাকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। এ প্রসংগে আয়াত নাযিল হয়। অথচ কিছু সংখ্যক বাহানাবাজ লোক গ্রাম্যদের মধ্য থেকে আসে যাতে তাদেরকে ঘরে থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। আর যারা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী করেছিল; তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছিল। তারা একেবারেই বসে রইল।' (সূরা তাওবা-৯)।

তাবুকের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। হিজরের পানি দিয়ে আটার খামির তৈরি কিংবা সে পানি পান করা নিষেধ করে দেয়া হয়। ভোরে দেখা গেল কারো কাছে পানি নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পানির সমস্যার কথা বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত নামায আদায় করে দোয়া করেন। সংগে সংগে আল্লাহ তা'আলা একখ মেঘমালা পাঠান। যা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থানস্থলে বর্ষিত হয়। মুসলিম সৈন্য যেখানে ছিলেন কেবলমাত্র সে সীমানায় বৃষ্টি হয়। একটু এদিক সেদিকেও বৃষ্টিপাতের নাম নিশানা ছিল না। সাহাবাগণ নিজেরা পানি পান করেন এবং তাদের জীবজন্তুকেও পান করান। পানির পাত্রগুলোও ভর্তি করে নেন। অতঃপর মেঘমালা চলে যায়। জনৈক মুনাফিক বলে উঠে, 'এ হচ্ছে একখ মেঘমালা যা অমুক নক্ষত্রের আকর্ষণে আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে।' এর প্রেক্ষিতে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'আর তোমরা নিজেদের অংশ এভাবে করে নিয়েছ যে তোমরা অস্বীকার করছ।' এ বছর তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে ওয়াদিউল কুরা পৌছেন। সেখানে জনৈক মহিলার বাগান ছিল। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বাগানের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য নিবেদন করে। সকলেই নিজেদের মত অনুমান পেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আপন অনুমান পেশ করেন। মহিলা কোন পরিমাণের কথা বলা থেকে বিরত থাকে। পুনরায় তাবুক থেকে ফিরে আসার সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাগানের উৎপাদন কত হল?' সে বলল, 'আপনি যা বলেছিলেন তাই হয়েছে। তাতে সামান্যতম কমী বেশী হয়নি। ঘটনায় সকলের ঈমান বর্ধিত হয়।

তাবুক যাওয়ার সময় ওয়াদিউল কুরায় বনু আরীজ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামকে আপ্যায়নের জন্য হারিছা পেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খান। এর বিনিময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিউল কুরার উৎপাদিত খেজুরের চল্লিশ ওসক প্রতি বছর তাদেরকে দান করতেন। এখানে অপর একটি মু'জেযাও প্রকাশ পায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরে সামুদের কাছে সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন 'আজ রাতে সকলেই নিজ নিজ উটগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে এবং কোন ব্যক্তি সাথী সংগী ছাড়া একাকী বাইরে যাবে না। বনু সায়েদার দু'ব্যক্তি ছাড়া সকলেই এ নির্দেশ পালন করেন। এ দু'জনের একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাহিরে একাকী যায়। সেখানে বসা অবস্থাতেই তার খেনাক রোগ দেখা দেয়। অপর ব্যক্তির উট হারিয়ে যাওয়ায়, সে তার উটের সন্ধানে বাইরে যায়। এ সময় ঝড় এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে তার কাবিলার পাহাড়ে নিক্ষেপ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে সংবাদ দেয়া হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমি কি তোমাদের এভাবে বাইরে যেতে নিষেধ করিনি?' খেনাকগ্রস্ত (গলার ফাঁস লাগা রোগী) লোকটিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে নিয়ে আসা হয়। মহানবী দোয়া করেন এবং গলায় হাত বুলিয়ে দেন। সে পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। আর যে সাহাবা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন; মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পর ঐ কাবিলার লোকজন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পৌঁছে দেয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'হিজর' থেকে তাবুক রওনা হন তখন তার উটনী 'ক্বাসওয়া' হারিয়ে যায়। সাহাবাগণ তালাশ করেন। কিন্তু উটকে কোথাও পাওয়া যায়নি। এতে যায়েদ ইবনুল নামের মুনাফিক ঠাট্টা করে বলে ছিল, 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট আসমানের খবর আসে। অথচ নিজের উটনী কোথায় সে খবর নেই।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ আমাকে যা জানান এর বাইরে আমি অন্য কিছুই জানি না।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, উটনী ওমুক স্থানে রয়েছে এবং এর লাগাম একটি গাছের সংগে আটকে আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে সেখানে পাঠান এবং ঠিক সেভাবেই উটকে পাওয়া যায়। তারা উটনী নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়। এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

তাবুক সফরের পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চলার রাস্তায়

বিরাট একটি সাপ পাওয়া যায়। সে কিছুক্ষণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর রাস্তা ছেড়ে সরে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি জান এ সাপটি কে ছিল?' সাহাবারা আরজ করেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, 'এটা জীনদের মধ্য থেকে ছিল, যারা মক্কায় এসে আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন। তাদের বসবাস এখানে। সে আমাকে সালাম দেয়ার জন্য এখানে এসেছিল এবং তোমাদেরকেও সালাম দিয়েছে।' সাহাবাগণ উত্তর দিয়ে বলেন, 'ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।'

তাবুক যুদ্ধের সময় একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম জমায়েত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রা.) কে বলেন, 'বিলাল আমার থলির মধ্যে যে খেজুর আছে তা নিয়ে এসো।' হযরত বিলাল (রা.) খেজুর নিয়ে এলেন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমানে খেজুরগুলো ছড়িয়ে দিলেন। সকল সাহাবারা খুব তৃপ্তিসহকারে তা থেকে খেলেন। খাওয়ার পরেও খেজুর আগে যতগুলো ছিল ততই রয়ে গেল। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটা মু'জেযা। তাবুক যুদ্ধের সময় পানির তীব্র সংকট দেখা দিলে; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার বরকতে তাবুকের ঝর্ণায় প্রচুর পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে। অতঃপর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ পানি অত্যধিক পরিমাণে প্রবাহিত হতে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়াজ (রা.) কে বলেছিলেন, 'হে মায়াজ! তুমি যদি দীর্ঘায়ু লাভ কর তবে দেখতে পাবে এ পানি দ্বারা বাগানগুলো সতেজ হচ্ছে।' বাস্তবেও তাই হয়েছিল।

অপর একটি মু'জেযা তাবুক যুদ্ধের সময়কালে ঘটেছিল। যুদ্ধে যখন সাহাবায়ে কেরামের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গেল এবং খাওয়ার জন্য তারা উট যবাই করতে প্রস্তুত হল, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাদ্য সংকটের বিষয় অবহিত করা হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দেন। এরপর ঘোষণা করেন, যদি কারো নিকট কিছু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তবে সে যেন তা দস্তরখানে নিয়ে আসে। তখন কেউ এক মুষ্টি যব, কেউ এক মুষ্টি খেজুর, কেউ রুটির একখানা টুকরা নিয়ে আসে। এতে দস্তরখানে তিন প্রকার খাদ্য জমা হয়। সব মিলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে তিন সের। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করেন। দু'রাকাত নামায আদায় করেন এবং

www.nagorikpathagar.org

বরকতের জন্য দোয়া করেন। ফলে তাতে এমন বরকত হয় যে, ময়দানের হাজার হাজার মুসলমানের সকলেই তৃপ্তির সাথে আহার করেন। তারপরও খাদ্য অবশিষ্ট রয়ে যায়। এরপর সকলেই পাত্র ভরে খাদ্য সংগ্রহ করে। যার কাছে যত বাসন-কোসন ছিল সব ভরে যায়। অথচ এরপরও কিছু খাদ্য অবশিষ্ট রয়ে যায়।

তাবুকের ময়দানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যুদ্ধ শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে ভাষণ দেন। এমন প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী বয়ান; যা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য কারো ছিল না। বয়ান শুনে সকলেই হতভম্ব হয়ে যায়। সাহাবীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়। তাবুক থেকে ফেরার পথে একটি মু'জেযা প্রকাশিত হয়। অত্যধিক গরমের মধ্যে সাহাবাগণ সারাদিন ঘামতে থাকেন। এমন কোন স্থান খুঁজে পেলেন না, যেখানে একটু পানি পাওয়া যেতে পারে বা যেখানে বিশ্রাম নেয়া যায়। পুরো সৈন্যবাহিনীর কাছেও পানি ছিল না। অত্যধিক পিপাসার কারণে মানুষ এবং জীবজন্তুর মরণাপন্ন দশা হয়ে পড়ে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পানির পাত্রে খুব সামান্য পানি ছিল। তিনি সে পানি একটি জগের মধ্যে ঢালেন। তাতে হাত মোবারক রাখেন। ফলে অংগুলিসমূহ থেকে ঝর্ণার ধারার মত পানি নির্গত হতে শুরু করে। গোটা বাহিনী পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার অথবা সত্তর হাজার। সাথে ছিল পনের হাজার উট এবং বার হাজার ঘোড়া। এসব জীবজন্তুকেও পানি পান করানো হয়।

তাবুক থেকে ফেরার পথে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক এবং ওয়াদিয়ে মুনতাফানের মধ্যবর্তী এলাকায় পৌঁছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার বরকতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার আরও একটি মু'জেযা দেখা যায়। তাদের কাছে যে অল্প পানি ছিল সে পানি একটি পাত্রে জমা করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে হাত মুখ ধুয়ে কুলি করেন এবং অবশিষ্ট পানি ঐ পাত্রেই ফেলেন। তার পরে দোয়া করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার বরকতে পানি প্রবাহিত হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা পানি পান করেন এবং উট ও ঘোড়াগুরোও পান করে। কাব ইবনে জুহাইর ইবনে আবু সুলামা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে তিনি তওবা করেন। তিনি যখন তওবা করে মদীনায় আসেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বিখ্যাত কবিতা "লামিয়া"

www.nagorikpathagar.org

পাঠ করেন। 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল এমন একটি নূরের মত যা থেকে হিদায়াতের আলো অর্জন করা যায় এবং আল্লাহর তলোয়ারের মধ্য থেকে এক উন্মুক্ত হিন্দী তলোয়ারের মত।' তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজ চাদর মোবারক দান করেন, যা ছিল তার জন্য বিরাট বরকতের ব্যাপার। এ চাদর দীর্ঘকাল তার নিকট ছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তার উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে বিশ হাজার দিরহাম দিয়ে এ চাদর খরিদ করে নেন। এভাবে পরপর খলীফাগণের নিকট এ চাদর পৌছতে থাকে এবং একসময় তা হারিয়ে যায়। আল্লামা শামী লিখেছেন, বর্তমানে এ চাদর নেই। তাতারীদের ফিতনার সময় চাদরখানি হারিয়ে গিয়েছে।

এ বছর তাবুক যুদ্ধের সময় ইয়ায়লা ইবনে উমাইয়া (রা.) নামক সাহাবীর চাকর জনৈক ব্যক্তির সংগে ঝগড়া-ঝাটি করে। ঐ ব্যক্তি চাকরকে দাঁত দিয়ে কাঁমড়ে দেয় এবং আহত করে ফেলে। সে সজোরে হাত কামড়াতে গেলে, তার সামনের দুটি দাঁত ভেংগে যায়। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ বিষয়ে বিচারপ্রার্থী হন এবং এর বিনিময় দাবী করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি কিছুই পাবে না। কেননা, সে কি তাহলে তার হাত তোমার মুখের ভিতরে প্রবেশ করে রেখে দিত। যাতে তুমি উটের মত চিবোতে থাকতে?' এভাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

তাবুক থেকে ফিরে আসার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে বিশটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইবনে ইছহাক এবং ক্বাস্তালানী এভাবেই বর্ণনা করেছেন। সৈয়দ সামহুদী বলেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিশটি স্থানে নামায আদায় করেছিলেন; সেসব স্থান চিহ্নিত করে রাখা হয় এবং পরে সব জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আল্লাহ পাক ঐ তিন সাহাবীর তওবা কবুল করেন, যারা তাবুকে অংশগ্রহণ করেননি। তারা হলেন কাব ইবনে মালিক (রা.), হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.) এবং মুরারাহ ইবনে রাবী' (রা.)। এ প্রসংগে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে, 'মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেন এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও যারা এমন সংকটকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী হয়েছিলেন। অতঃপর বলেন, ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করেন যাদের বিষয়টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। অতঃপর যখন তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, জমি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।' (সূরা তাওবা-১১৭)

www.nagorikpathagar.org

মহানবী যখন তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, সে সময় বিভিন্ন রাজা বাদশাহর পক্ষ থেকে তাদের দূত বা পত্র নিয়ে আসে। তাতে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা লেখা ছিল। এসব বাদশারা হলেন, হারিছ ইবনে আবদে কেলাল, নায়ীম ইবনে আবদে কেলাল এবং নো'মান। এরা ছিলেন বাহয়াইন, হামদান এবং মায়াফিরের অধিপতি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবুকে অবস্থানের সময়, মদীনা তৈয়িবায়, মায়াবিয়া ইবনে মায়াবিয়া আল লাইছী আল মুজানী (রা.) ইন্তিকাল করেন। জিব্রাঈল (আ.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সাহাবীর ইন্তিকালের খবর দেন। অথচ মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব ছিল চৌদ্দ দিনের পথ। জিব্রাঈল (আ.) আরও জানান যে, মায়াবিয়ার জানাযায় আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফিরিশতা পাঠিয়েছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'কেন'? উত্তর দিলেন, 'এ জন্য যে তিনি দাঁড়িয়ে বসে, চলতে ফিরতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।' অতঃপর আরেক রহস্যময় ঘটনায় জিব্রাঈল (আ.) যমীনকে সংকুচিত করে দেন। তাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরত (টয়লেট) সারার জন্য বাইরে যান। এতে করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাত নামায আব্দুর রহমান ইবনে আওফের পিছনে আদায় করেন। বাকী এক রাকাত সালাম ফেরানোর পরে উঠে দাঁড়িয়ে আদায় করেন। সাহাবায়ে কেরাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসবুক দেখতে পেয়ে খুব ঘাবড়ে যান। মহানবী নামায শেষ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তোমরা সঠিক করেছ, ভাল করেছ।' এ ঘটনা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের বিরাট মর্যাদার কারণ স্বরূপ গণ্য হয়।

তাবুক থেকে ফেরার পথে মতান্তরে বনু মুস্তালিক থেকে ফেরার সময় এক রাতে ভয়াবহ ঝড় ওঠে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এ ঝড় জনৈক মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে এসেছে। পরে জানা যায় যে, এ রাতে একজন বড় মুনাফিক মারা গেছে। তার নাম ছিল তেফায়া ইবনে যায়েদ ইবনে তাবুত। সে ছিল বনু কাইনুকার ইহুদী সন্তান। বাহ্যিকভাবে সে ছিল মুসলমান। অথচ বাস্তবে সে ছিল মুনাফিকদের বড় সর্দার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে আসার পর ওয়ায়মের আজলানী এবং তার স্ত্রীর মধ্যে 'লেয়ান' হয়েছিল। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের সাক্ষীবিহীন অপবাদ। উভয়ে আল্লাহর নামে কসম করে একে অপরের উপর লানত দিয়ে নিজেকে সত্যবাদী দাবী করাকে লেয়ান বলে। যেনাকারী একজন মহিলা গামেদিয়া (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে

এসে নিজের পাপের কথা স্বীকার করে, শাস্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। তাকে সন্তান প্রসবের পর আসতে বলা হয়েছিল। সন্তানের দুধ ছাড়ানোর পর তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা (রজম) করা হয়। এভাবে নিজের পাপ স্বীকার করে, ইসলামের শাস্তি মাথা পেতে নেয়াটা একটা বিস্ময়কর, বিরল ও উচ্চ ঈমানের কথা? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ মহিলা সাহাবীর উন্নত মর্যাদা, তওবা কবুল ও আখিরাতের উচ্চ আসনের কথা বলেছেন।

হাবশার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশী ইন্তিকাল করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। নবীনন্দিনী উম্মে কুলসুম (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকে কাতর হন। তিনি হযরত ওসমান (রা.) কে বলেছিলেন, যদি আমার তৃতীয় কোনো মেয়ে থাকত, তবে তাকেও আমি তোমার সাথে বিয়ে দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাবুক থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করেন এবং হযরত ওমর (রা.) এর নিষেধ সত্ত্বেও তার জানাযার নামায আদায় করেন। এরপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। ফলে হযরত ওমর (রা.) এর বক্তব্যের সমর্থনে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়া নিষেধ করা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন হয়। নবম হিজরীর যিলকদ বা যিলহজ্জ মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.) কে আমিরুল হজ্জ (হাজীদের নেতা) বানিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন। সূরা তাওবার প্রথমাংশ নাযিল হয়। এতে মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি অঙ্গীকার সমতার ভিত্তিতে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ আসার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী (রা.) কে এ ঘোষণা প্রকাশের জন্যে প্রেরণ করেন। রক্ত এবং ধন সম্পদ সম্পর্কিত অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এটাই আরবদের রীতি ছিল। চুক্তির কোনো পক্ষ তা রহিত করতে চাইলে, হয় তো সে নিজে এ রহিত করার ঘোষণা দিবে অথবা নিজের গোত্রের কাউকে দিয়ে ঘোষণা করাবে। বংশের বাইরের কোনো লোককে দিয়ে ঘোষণা করানো হলে, তা মানা হত না। হযরত আবু বকর (রা.) এর সাথে হযরত আলীর (রা.) দাজনান মতান্তরে আরজ প্রান্তরে সাক্ষাৎ হয়। হযরত আবু বকর (রা.), আলী (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমীর নাকি আমীরের অধীন? হযরত আলী (রা.) বলেন, আমীরের অধীন। এরপর উভয়ে সামনে অগ্রসর হন। হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের হজ্জ করান। ১০ই যিলহজ্জ

www.nagorikpathagar.org

কুরবানীর দিন হযরত আলী (রা.) জামরায় দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী সকল প্রকার চুক্তি অঙ্গীকার সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাদের সাথে কোনো অঙ্গীকার ছিল না, তাদেরও চার মাস সময় দেয়া হয়। তবে মুসলমানদের সাথে যেসব মুশরিক অঙ্গীকার পালনে ত্রুটি করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এক দল সাহাবীকে পাঠিয়ে এ সাধারণ ঘোষণা প্রচার করেন। ভবিষ্যতে কোনো মুশরিক হজ্জ করতে এবং কেউ নগ্নাবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না; বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এ ঘোষণা ছিল প্রকৃতপক্ষে জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তিপূজা অবসানের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এ বছরের পর মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে মক্কা বা কা'বায় আসার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়।

দশম হিজরী (৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ দশম হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব আদায় করেন যা বিদায় হজ্ব নামে খ্যাত। এ হজ্বের আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যথা ঃ হিজ্জাতুল ইসলাম, হিজ্জাতুল বালাগ, হিজ্জাতুল তামাম, হিজ্জাতুল কামাল। হিজরতের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র এ হজ্জই করেছিলেন। এ হজ্জের সংগে ওমরাহও পালন করেছিলেন যা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত সর্বমোট চারটি ওমরার মধ্যে একটি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৫ যিলক্বদ শনিবার যুহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনা শরীফ থেকে রওনা করেন। মদীনা শরীফে যুহরের নামায চার রাকাত আদায় করেন। যুল হুলাইফায় পৌঁছে আসর দু'রাকাত (কসর) আদায় করেন। মদীনা শরীফে আবু দুজানা আনসারী আসসায়ীদি (রা.) কে অথবা সেবা ইবনে আরফাতা আল গিফারীকে (রা.) নিজের প্রতিনিধি করে যান। ৪র্থ যিলহজ্ব শনিবার সকালবেলা মক্কায় পৌঁছেন। ওকুফে আরাফাত জুমু'আ বারে (শুক্রবার) হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশে পাশে ঘোষণা করেন যে, তিনি হজ্বে যাচ্ছেন। ঘোষণা শুনে চতুর্দিক থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে লোকজনের ঢল নামে। এমনভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে সাহাবীদের যারা মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। মক্কা শরীফে যারা বাস করতেন তাদের সংখ্যা আলাদা। তাছাড়া আরও অনেকেই এসেছিলেন হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবু মূসার (রা.) নেতৃত্বে ইয়ামেন থেকে।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীর এক শত উট নিয়ে গিয়েছিলেন। ইহরাম খোলার দিন নিজ হাতে ৬৩ টি উট কুরবানী করান। এ সংখ্যা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়সের সংখ্যার অনুপাত। বাকী উটগুলো কুরবানী করার জন্য হযরত আলী (রা.) কে নির্দেশ দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল হুলাইফা থেকে ইফরাদ হজ্বের নিয়ত করেন। যুল হুলাইফার কাছে ওয়াদিয়ে আক্বীকে যখন পৌছেন তখন জিব্রাঈল (আ.) হাজির হন এবং বলেন, 'এ বরকতময় মাসে দু'রাকাত নামায আদায় করুন। তাছাড়া আপনি বলুন, হজ্ব এবং ওমরার নিয়ত করলাম।' ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের সাথে ওমরার ইহরামও বাঁধেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুল হুলাইফায় অবস্থান করছিলেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে ওমায়ের গর্ভবতী ছিলেন। সময় আসন্ন ছিল। সেখানেই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের জন্ম হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে জানতে চাইলেন যে, এখন কি করতে হবে? মহানবী উত্তর দেন, 'গোসল করে কাপড় পাল্টে নিয়ে ইহরাম বেঁধে ফেল।'

বিদায় হজ্জের সফরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবওয়া এবং উদ্দান পৌছেন তখন সায়ব ইবনে জুনামা আললাইসী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত খরগোস হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেননি। একই বছর বিদায় হজ্বের সফরকালে 'ইহাই জামাল' নামক স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় সিংগা লাগান। তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রোযাও রেখেছিলেন (বুখারী শরীফ)। 'ইহাই জামাল' মদনিা ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। ইহা মদীনার অধিক নিকটবর্তী। এতে বোঝা যায় রোযাদারের জন্য সিংগা লাগানো যা পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল, তা পরে রহিত হয়ে গেছে। (সে সময়কার Minor Operation কে সিংগা বলা হত। এতে চিকিৎসার খাতিরে দেহ থেকে দূষিত রক্তক্ষরণ করা হত)।

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে হযরত ফাতিমা (রা.) এবং মুসলিম জননীগণও ছিলেন। মক্কা পৌছে ওমরার তোয়াফ এবং সায়ী শেষ করে হযরত আয়িশা (রা.) ছাড়া সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেন। হযরত আয়িশার (রা.) মক্কায় প্রবেশ করার আগে সারিফ নামক স্থানে ঋতু বা মাসিক শুরু হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন ওমরাহকে হজ্জে রূপান্তরিত করে ফেলেন। (অর্থাৎ ওমরার ইহরাম ভেংগে

www.nagorikpathagar.org

হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধে নেন)। তিনি তাই করেন এবং হজ্জের ইহ্‌রামের উপর কায়েম থাকেন। হজ্জ শেষ করে তিনি ইহ্‌রাম খুলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন লোকজন ওমরাহ্‌ এবং হজ্জ নিয়ে বাড়িতে ফিরবে অথচ আমি কেবল হজ্জ নিয়ে ফিরব! একথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে সংগে নিয়ে তানয়ীম থেকে বদলা ওমরাহ্‌ করান।

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী ক্বাসওয়ার উপর আরোহণ করে ওকুফে আরাফা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের মাঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাতে গুরুত্বপূর্ণ আহকাম এবং শরীয়তের অনেক জরুরী বিষয়াবলীর উল্লেখ করেন। এ বক্তব্যে ঘোষণা করেন যে, জাহেলিয়াতের সকল খুন মুওকুফ করা হল। সুতরাং জাহেলিয়াতের যুগে যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যতে সে খুনের দাবী করতে পারবে না। জাহেলিয়াতের সকল সুদ মওকুফ করা হল। অতএব, সর্বপ্রথম আমি আমার চাচাত ভাই রবীয়া ইবনে হারিসের খুনের দাবী মওকুফ করছি এবং সর্বপ্রথম আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদও মওকুফ করে দিলাম। আরাফাতের ময়দানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর এবং আসরের নামায এক আযান এবং দু'ইকামতসহকারে (যুহরের সময় কসর) আদায় করেন। এ দিন সন্ধ্যায় মুযদালিফাতে মাগরিব এবং এশা এক আযান এবং এক ইকামতের সাথে (এশার সময়) আদায় করেন।

৯ই যিলহজ্ব আরাফাতে খুৎবা দানকালে আলকুরআনের বিশেষ আয়াত নাযিল হয়। 'আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর আমি তোমাদের প্রতি আমার দান পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই পছন্দ করলাম' (সূরা মায়েদা-৩)। সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান করেন। সূর্যাস্তের পরে মুযদালিফা রওনা হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফাতে ছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি এসে আরজ করেন, 'ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন কোন কাপড় পরিধান করা যায়?' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জামা সেলওয়ার, পাগড়ী, টুপী, মোজা পরিধান করা যাবে না। তাছাড়া এমন কাপড়ও পরা যাবে না, যা জাফরান দিয়ে রঙ্গীন করা হয়েছে এবং তাতে জাফরান লেগে আছে।' ওকুফে আরাফাতের সময় এক ব্যক্তি উটের উপর থেকে পড়ে যায়। এতে সে ঘাড় ভেংগে মারা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'এ

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তির মুখ এবং মাথা কাফন দিয়ে ঢেকে দিও না। খুশবুও লাগাবে না। সে তালবিয়্যাহ পাঠ করতে করতে কিয়ামতের দিন উঠবে।' আরাফাত থেকে মুযদালিফা যাওয়ার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) কে পিছনে আরোহণ করিয়েছিলেন।

কুরবানীর দিন সকাল বেলা ওকুফে মুযদালিফা করেছিলেন এবং এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। খুতবা শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে মিনা রওনা করেন। সেখানে গিয়ে জুমরায়ে উকবার রমী করেন। মুযদালিফা থেকে মিনা আসার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) কে নিজের পিছনে আরোহণ করান। ফযল ইবনে আব্বাস যখন মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে সাওয়ার ছিলেন তখন কাবিলায়ে খাসয়ামের এক মহিলা মহানবীর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করেন, 'আমার পিতার উপর এ অবস্থায় হজ্ব ফরয হয়েছে যে, তিনি এতই বৃদ্ধ যে, যানবাহনে আরোহণ করতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ (বদলা) এবং ওমরাহ পালন করতে পারি?' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হ্যাঁ, তোমার বাবার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ এবং ওমরাহ পালন কর।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমরায়ে উকবায় পাথর নিক্ষেপ শেষে এক গুরুত্বপূর্ণ খুতবা দেন। উক্ত খুতবায় ইরশাদ করেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত, আবরু পরস্পরের জন্য এমনই সম্মানিত, যেভাবে আজকের এদিন, সম্মানিত এ মাস, এ শহর হারাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, 'যামানা ঘুরে সে অবস্থায় ফিরে এসেছে, যেভাবে সেদিন মহান আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টি করেছিলেন। যামানা ঘুরে এসেছে এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বলেছিলেন অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যুগে এমন নিয়ম ছিল যে; তারা নিজেদের স্বার্থের কারণে মাসগুলোকে আগে পিছে করে দিত। কাজেই যেসব ইবাদত বিশেষ মাসে করা হত যেমন হজ্জ বা যিলহজ্ব মাসের বিশেষ তারিখের সাথে সংশ্লিষ্ট, তারা এটাকে কখনো যিলক্বদ কখনো বা মুহাররম মাসে নিয়ে যেত। কখনো আবার নির্দিষ্ট তারিখ মত রেখে দিত। যেমন বিদায় হজ্জটি ঠিক সময় মতই হয়েছিল। স্বার্থের কারণে মাসসমূহকে আগে পিছে করার জাহেলী প্রথা চিরদিনের তরে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ যামানা ঘুরে ফিরে তার আসল স্থানে অবস্থান নিল। কিয়ামত পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হবে না।

www.nagorikpathagar.org

কুরবানী শেষে, চুল কেঁটে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যুহরের সময় ফরয তোয়াফ (তোয়াফে যিয়ারত) আদায় করেন। অতঃপর জমজম কূপের কাছে যান এবং পানি পান করেন। অতঃপর মিনা ফিরে যান। সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। প্রতিটি জুমারাতে কংকর নিক্ষেপ করেন। এ ছিল রবি, সোম এবং মঙ্গলবার। মঙ্গলবারে মিনা থেকে গিয়ে বিদায়ী তোয়াফ করেন। অতঃপর মক্কা থেকে বিদায় নিয়ে মদীনার পথে রওনা করেন। বিদায় হজ্জের সময় একটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে একটি শিশুকে তার জন্মের দিনেই নিয়ে আসা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবজাত শিশুকে জিজ্ঞেস করেন, 'বল তো আমি কে?' এক দিনের শিশু উত্তর দেয়, 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' মহানবী বলেন, 'তুমি সত্যি বলেছ। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।' এরপর থেকে শিশুটি পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আর কথা বলেনি। তার নাম ছিল ইয়ামামাহ। বিদায় হজ্জে যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করছিলেন, তখন মিনার মসজিদে খাইফের পাশে একটি গুহায় ওয়াল মুরসালাত সূরা নাযিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সম্মুখে সদ্য নাযিলকৃত সূরাটি তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছিলেন। তখন বিশ্বনবীর তিলাওয়াত শুনার জন্য একটি সাপ এসে উপস্থিত হয়। সাহাবাগণ তাকে মারার জন্য দৌড়ে যান কিন্তু সে অদৃশ্য হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, 'সে তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেছে, যেভাবে তোমরা তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেছ।'

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহফার গদীরেখম নামক স্থানে পৌছেন। সেখানে যুহরের নামায আদায় করেন। নামাযের পরে খুতবা দেন। তাতে বলেন, 'আল্লাহ আমার মাওলা, আমার সহায়। আর আমি সকল মুমিনের মাওলা অর্থাৎ প্রিয়পাত্র।' অতঃপর হযরত আলীর (রা.) হাত ধরে বলেন, 'আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। আয় আল্লাহ! তার সংগে যে বন্ধুত্ব করে, তুমিও তার সংগে বন্ধুত্ব কর। আর যে ব্যক্তি তার সংগে শত্রুতা পোষণ করে, তুমিও তার সংগে শত্রুতা পোষণ কর। যে তাকে সাহায্য করবে না, তুমিও তাকে অসহায় করে দিও। আলী যেখানেই থাকবে, সত্য তার সাথী করে দিও।' বিদায় হজ্জ শেষে মদীনা ফিরে আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সেনান আনসারী (রা.) নামের এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এবার কেন আমাদের সংগে হজ্জ করতে গেলে না?' তিনি বলেন, 'হজ্জে যাওয়ার মত

www.nagorikpathagar.org

আরোহী আমার ছিল না।' মহানবী বলেন, 'তাহলে রমযানে ওমরাহ্ পালন করে নিও। কারণ রমযানের ওমরাহ্ হজ্জের সমান।' বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাসী রাইহানা (রা.) ইন্তিকাল করেন। সে বিদায় হজ্জে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। তিনি মদীনায় এসে ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

এ বছর মুসাইলামাতুল কাযযাব তার গোত্র বনু খলীফার চৌদ্দজনের একটি দল নিয়ে ইয়ামামাহ থেকে মদীনায় আসে। তার দলের লোকেরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসাইলামা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। সে বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তার পরবর্তীতে আমাকে খিলাফত দিয়ে যান, তবে আমি মুসলমান হব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যান। সে সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। উক্ত ডালের প্রতি ইংগিত করে বিশ্বনবী বলেন, 'তুই যদি আমার কাছে এ ধরনের একটি খেজুরের ডালও দাবী করিস, তবে আমি তাও দেব না। আর তুই তোর সীমানা থেকে এগিয়েও যেতে পারবি না।' এক বর্ণনা মতে, সে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খেলাফতকালে ১১ হিজরীতে সে নিহত হয়। জানা যায় যে, সে বেশকিছু অমঙ্গল ও খারাপ ধরনের অলৌকিক কা রপ্ত করেছিল। সে কারও জন্য দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করলে ঐ ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যেত। একবার পানির মধ্যে বরকতের জন্য কূপের ভিতর থুথু নিক্ষেপ করলে সংগে সংগে কূপের সব পানি শুকিয়ে যায়। একবার জনৈক চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ভাল চোখে তার মুখের লালা লাগালে, সে ব্যক্তি তখনই অন্ধ হয়ে যায়। কোন ছাগলের স্তনে সে হাত লাগালে ঐ ছাগলের দুধ শুকিয়ে যেত। সে এক ছেলের মাথায় হাত বুলালে ছেলেটির মাথায় টাক পড়ে যায়। জনৈক ব্যক্তির দুই সন্তানের জন্য সে দীর্ঘায়ু কামনা করলে তার একটি ছেলে বাড়িতে গিয়ে কূপে পড়ে মারা যায়। অপর ছেলেকে বাঘে খেয়ে ফেলে। মুসাইলামা এমনই অভিশাপপ্রাপ্ত ছিল। ফলে লোকেরা তাকে ভয় করত।

এ হিজরীতে ইয়েমান দেশে আসওয়াদ ইবনে কাব ইবনে আলয়ানী নামের এক মিথ্যাবাদী নবী আত্মপ্রকাশ করে। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নবুওয়াতের দাবী করেছিল। বিদায় হজ্জের পর সে আত্মপ্রকাশ করে। আসওয়াদের নাম ছিল আবহালা ইবনে কাব। তার উপাধি ছিল যুরখেমারীল আসওয়াদ। কারণ সে সর্বদা কালো ওড়না দিয়ে তার চেহারা ঢেকে রাখত। কেউ

কেউ বলেছেন যে, তার উপাধি ছিল যুলহেমার। তার কাছে একটি কালো গাধা ছিল। সে ঐ গাধাকে এমন প্রশিক্ষণ দিয়ে ছিল যে, গাধাটি তাকে সিজদা করত। এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানের বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র লিখেন। নাজরান হল মক্কা থেকে সাতদিনের পথ ইয়ামানের একটি বড় শহরের নাম। এর অধীনে কয়েকটি বস্তি এবং খামার ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র পেয়ে চব্বিশ জন, লোকের একটি প্রতিনিধি দল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়। এ দলের মাঝে ছিল আকীব। যার আসল নাম আব্দু মাসীহ। আকিব তার উপাধি ছিল। সূরা আল ইমরানের প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে আলাপ আলোচনা এবং বাহাস বা বিতর্ক করেন। এ সময় মুবাহালার আয়াত নাযিল হয়। 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুবাহালার দাওয়াত দেন। ফলে তারা নীরব হয়ে যায়। পরে এ শর্তে সন্ধিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা দু'হাজার সেট কাপড় (প্রতি জোড়া চল্লিশ দিরহাম মূল্যমানের), এক উকিয়া করে গম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট, ত্রিশ খানা লৌহবর্ম, ত্রিশটি বল্লম, প্রতি বছর ট্যাক্সস্বরূপ আদায় করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করতঃ সন্ধি পত্র লিখে দেন। মোটকথা, তারা ইসলাম থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

এ বছর বাজান ইবনে সাসান ইন্তিকাল করেন। সে ছিল বাহরামের বংশধর। বাহরাম ছিল সাসানের বাদশাহ। বাজান ছিল কেসরার পক্ষ থেকে ইয়ামানের গভর্নর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেসরার পারভেজের মৃত্যু হয়, তিনি ইয়ামানে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামানের গভর্নর পদে বহাল রাখেন। তিনি ছিলেন ইয়ামানের মুসলমানের প্রথম গভর্নর। আজমী বাদশাহগণের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ১০ম হিজরীর রবিউল আউয়ালে, মতান্তরে নবম হিজরীর শেষ ভাগে তাবুক থেকে ফেরার পথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) এবং আবু মূসা আশয়ারী (রা.) কে ইয়ামান পাঠান। এ সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন করবে না। সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা জন্মাবে না।' উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় পাঠিয়েছিলেন। মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) কে যখন ইয়ামানে পাঠান; তখন তাকে বিদায় জানাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম এগিয়ে যান। তাকে তখন দ্বীন এবং শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। এ সময় হযরত মায়াজ আরোহী ছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সংগে হেঁটে হেঁটে চলছিলেন। তিনি আরজ করেন, 'হে নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি পায়ে হেঁটে চলছেন, অথচ আমি সওয়ার অবস্থায়! অনুমতি প্রদান করুন, আমিও নেমে পড়ি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'এ পায়ে হেঁটে চলাকে আমি আল্লাহর রাস্তায় চলা হিসেবে গণ্য করি।' এ জন্যেই পায়ে হেঁটে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সর্বোত্তম। আজও পায়দাল জামাতের মর্তবা অনেক।

রমযান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবু তালিবকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইয়ামান পাঠান। তারা হযরত আলী (রা.) এর দাওয়াত কবুল করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে কুরআন এবং দ্বীনের জরুরী বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। অবশেষে বিদায় হজ্বের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তলব করে মদীনায় নিয়ে আসেন। তিনি মদীনায় এসে বিদায় হজ্বের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফর সংগী হন। এমনিভাবে হযরত আবু মূসা (রা.) ও মায়াজ (রা.) ইয়ামানে থেকে যান। এ বছর সা'দ ইবনে খাওলা আমেরীর (রা.) ইন্তিকাল হয়। তিনি ছিলেন বনু আমির ইবনে লুয়াই এর অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলছেন যে, তিনি এ কাবিলার মিত্র ছিলেন। তাছাড়া তিনি সুরাইয়া বিনতে হারিছ আল আস লামিয়ার স্বামী। তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি মদীনায় হিজরতকারীদের মধ্যে একজন মুহাজির ছিলেন। মুহাজির ব্যক্তির জন্য পুনরায় মদীনায় যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এতে করে হিজরত বাতিল হয়ে যেত। তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর ইন্তিকালের পনের বিশ দিন পরে সন্তান প্রসব করেন। তখন তার ইদ্দত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন যে, সন্তান প্রসব হওয়ার কারণে তার ইদ্দত খতম হয়ে গিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেছিল, ইদ্দত খতম হয়নি। তাকে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করতে হবে। সুরাইয়া বিষয়টি মহানবীর খেদমতে পেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সন্তান প্রসব করায় তোমার ইদ্দত খতম হয়ে গেছে। যেখানে ইচ্ছে বিয়ে করতে পার।'

এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রা.) কে জুলকিলা এর নিকট পাঠান। সে ছিল ইয়ামান এবং

www.nagorikpathagar.org

তায়েফের নেতৃবৃন্দের অন্যতম। তার উচ্চাভিলাস এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র পাওয়ার পর সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মেনে নেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য রওনা করেন। পথিমধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের খবর পৌঁছে। হযরত জারীর (রা.) মদীনায় চলে আসেন এবং যুলকিলা তার বাড়িতে ফিরে যায়। সে বাড়িতে অবস্থান করতে থাকে। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে তার কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। সে সময় বার হাজার গোলাম সাথে করে নিয়ে খলিফার দরবারে হাজির হয়েছিলেন। তন্মধ্যে চার হাজার আজাদ করে দেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, 'অবশিষ্ট সকল গোলাম আমার কাছে বিক্রি করে দাও।' সে বলেছিল, 'বিক্রি করব না। বরং আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করে দিলাম।'

এ বছর বিদায় হজ্বের পূর্বে হযরত আলী (রা.) যখন দ্বিতীয় বার ইয়ামান গিয়েছিলেন তখন সেখানে একটি আশ্চর্য দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কিছুলোক আসওয়াদে আনাসীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একটি কূপ খনন করে। অথচ কূপটি গোপন রাখার উদ্দেশ্যে উপর থেকে ঢেকে রাখে। সে কূপে একটি বাঘ পড়ে যায়। বাঘ দেখার জন্য লোকজন জড় হলে এক ব্যক্তি তাতে পড়ে যায়। পড়ার সময় সে অপর এক ব্যক্তিকে ধরে তাকেও কূপের ভিতর ফেলে দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে ধরলে সেও কূপে পড়ে যায়। তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তিকে ধরে। ফলে সেও কূপে পড়ে যায়। বাঘ চারজনকেই মেরে ফেলে। আর এক ব্যক্তি বল্লম নিক্ষেপ করে বাঘটিকে মেরে ফেলে। অবশেষে নিহত চার ব্যক্তির ওয়রিসগণ হযরত আলী (রা.) এর আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, 'তোমাদের জন্য কূপ খননকারীদের যিম্মায় এক চতুর্থাংশ খেসারত, এক তৃতীয়াংশ খেসারত পাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কারণ তার উপর তিন ব্যক্তি মরেছে। অর্ধেক খেসারত পাবে তৃতীয় ব্যক্তি, কারণ তার উপর দু'ব্যক্তি পড়ে মারা গেছে এবং চতুর্থ ব্যক্তি পাবে পূর্ণ খেসারত। অন্যথায় মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যেতে পার। তারা ফায়সালা মেনে নিলেন না, বরং মামলাটি নিয়ে মদীনা তৈয়িবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে দুর্ঘটনার বিবরণ দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি এর ফায়সালা করে দিব ইনশাআল্লাহ।' তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত আলী (রা.) উক্ত ঘটনার

www.nagorikpathagar.org

বিচার ফায়সালা করে দিয়েছেন।' মহানবী জিজ্ঞেস করেন, 'কিভাবে?' ফায়সালার কথা বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বলেন, 'হযরত আলী যে ফায়সালা করেছে, ব্যাস, এই তো ফায়সালা।' এতে আলীর (রা.) প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আলীর (রা.) বিচারের প্রতি বিশ্বনবীর সমর্থন মিলল।

ফারওয়া ইবনে ওমর আল জোজামী এ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে সিরিয়াতে বাক্কার কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ইসলাম গ্রহণ করার খবর লিখে পত্র পাঠান। পত্রের সংগে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন। দশম হিজরীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জেযা প্রকাশ পায়। যখন সালমান প্রতিনিধি দলের লোকজন তাঁর কাছে হাজির হন। তারা অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেন, 'আয় আল্লাহ! তাদের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করুন।' তারা বাড়ী ফিরে এসে জানতে পান যে, বৃষ্টি হয়েছে। আরও জানতে পান যে, রাতে যে সময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, ঠিক সে সময়েই বৃষ্টি হয়েছিল। এ বছর হামদানের প্রতিনিধি দল আসে। তাবুক থেকে ফিরে আসার পর তাদের আগমন হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মালিককে (রা.) তাদের আমীর নিযুক্ত করেন।

এ বছর যুবায়েদ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ বিশ্বনবীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে আমর ইবনে মা'দিকারও (রা.) ছিলেন। কারো কারো মতে, এ বছর আব্দুল কয়েসের (রা.) প্রতিনিধিবৃন্দ হাজির হয়েছিলেন। এ বছর কাবিলায়ে কুন্দার ষাট অথবা আশিজন অশ্বারোহী প্রতিনিধি দল মহানবীর দরবারে হাজির হন। তাদের মধ্যে আশয়াম ইবনে কয়েস আল কুন্দী এবং প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কয়েস ইবনে আবিস আল কুন্দীও (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকলেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর আশয়াম ইবনে কয়েস মুর্তাদ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করেন। তিনি দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকেন। এ বছর ইয়ামামা থেকে বনু হানফিয়ার প্রতিনিধি দল হাজির হন। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর। তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী মুসাইলামাও ছিল। সে ছাড়া অন্যান্য সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে কেউ কেউ উক্তি

করেছেন। তবে পরে সে নবুওয়াতের দাবী করে মুর্তাদ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খেলাফতকালে মুসাইলামা কুফরীর অবস্থায় নিহত হয়।

এ বছর কিংবা ১১ হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) কে যুল খালাছা নামক মূর্তি ধ্বংসের অভিযানে প্রেরণ করেন। এ বছর বনু আরস প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। তারা ছিলেন সাত জন। আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা কোন কোন লোকের মুখে শুনতে পেলেন যে, যে ব্যক্তি হিজরত করবে না, তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হিজরত না করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়ে বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় করে চলবে। তোমাদের আমলে কোন কমতি (কম) হবে না। এ বছর শা'বান মাসে খাওলান প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। এটি ছিল ইয়ামানের এক কাবিলা। ১০ সদস্যের এ দলটি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিজ এলাকায় মূর্তি ভেংগে ফেলার নির্দেশ দেন। তারা ফিরে গিয়ে সেটা ভেংগে ফেলেন। এর আগে তারা নিজেদের সম্পদের এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং এক অংশ মূর্তির জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিল। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, 'আল্লাহ যে ফসল এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তার কিছু অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছে এবং তাদের ধারণামতে বলে থাকে এটা আল্লাহর জন্য। আর এটা আমাদের প্রভুদের জন্য।' (সূরা আনআম-১৩৬)। এমন বলা বা করা হারাম ও গৃহিত কাজ।

এ বছর ছা'ছা' গোত্রের প্রতিনিধি দল হাজির হয়। উক্ত দলে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আমীর ইবনে তোফায়েল এবং আবেদ ইবনে রবিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দু'ব্যক্তি গোপনে আকস্মিকভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পৌঁছে; মহান আল্লাহ তাদের দুরভিসন্ধি এবং অনিষ্ট থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিফাযত করেন এবং আল্লাহ তার নিজ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। আবেদকে আসমানী বজ্রপাতে ধ্বংস করে দেন। এবং আমীরের শরীরে মারাত্মক খোঁস-পাঁচড়া বের হয়। সে এ অবস্থায় ঘোড়ার উপর আরোহণ করে তার বাড়ির পথে পলায়ন করে। মহান আল্লাহ পথিমধ্যেই ঘোড়ার পিঠে তাকেও ধ্বংস করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

www.nagorikpathagar.org

যুদাইল ইবনে আবি মারিয়া (রা.) যিনি ছিলেন আস ইবনে ওয়ায়িলের মুক্ত কৃত গোলাম। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়াতে গিয়েছিলেন। তামীমে দারী এবং আদী আবদে বদদা তাদের সফর সংগী ছিলেন। তারা উভয়ই ছিলেন খৃষ্টান। এ সফরকালে যুদাইলের ইন্তিকাল হয়। তারা একটি গোপন ওসিয়ত নামা লিখে তাদের মালামাল নিয়ে আসেন। তাতে একখানা তরবারী কমতি ছিল। অর্থাৎ যা গোপন তালিকায় ছিল। এটা তামীম এবং আদী খেয়ানতের বশীভূত হয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো' (সূরা আল মায়েদা-১০৬)। অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পরে এ দু'ব্যক্তির হলফ গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন সে তরবারী মদীনা তৈয়িবায় বিক্রি হতে দেখা গেল, তখন এ দু'ব্যক্তির অসত্য বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আদী এবং মুত্তালিব ইবনে আবি ওয়াদায়া হলফ উঠালেন। ফলে তাদেরকে তরবারীর হকদার ঘোষণা করা হয়।

এ বছর হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজানী (রা.) তার একশত পঞ্চাশ জন সাথী নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছর কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ভ্রাতাদের অনুমতি নিয়ে আসা উচিত।' এ বছর ১০ই রবিউল আউয়াল শনিবার মতান্তরে বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর যিলহজ্ব মাসের শেষ দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্রাহীম (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ মাস, মতান্তরে ২৪ মাস। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইব্রাহীমের ওফাতের দিনে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। লোকজন বলতে শুরু করে, ছেলে ইব্রাহীমের ইন্তিকালের কারণে সূর্য গ্রহণ হয়েছে।' এ ধরনের মন্তব্য শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণ দান করেন। তাতে ইরশাদ করেন, 'সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। এগুলো কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে আলোবিহীন হয় না।'

<u>১১তম হিজরী (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ</u> একাদশ হিজরীর মুহাররম মাসে অথবা রজব মাসের মাঝামাঝি ইয়ামানের 'নাখা'র প্রতিনিধি দল বিশ্বনবীর খেদমতে হাজির হন। এটি ছিল সর্বশেষ প্রতিনিধি দল যারা দরবারে নববীতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। উক্ত দলে একশত সদস্য ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদের জানাযার নামায আদায় করেন। তাদের জন্য দোয়া এবং ইস্তেগফার করেন। অথচ তাদের শাহাদাতের আট বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অর্ধরাতে (আযাদকৃত গোলাম) আবু মুয়াইহিবকে সাথে নিয়ে জান্নাতুল বাকীর দিকে গমন করেন। মুক্ত গোলামকে বলেন, 'আমার সংগে চল। আমাকে বাকীবাসীর জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে, দীর্ঘসময় ধরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে থাকেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে দুনিয়ার খাজানা (ধন ভাণ্ডার) পেশ করা হয়েছে এবং নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আমি কি পৃথিবীতে থাকতে চাই অথবা চির সুখময় জান্নাতে গিয়ে আমার আল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ করতে চাই? আমি জান্নাতে যাওয়াকে গ্রহণ করে নিয়েছি।'

এ বছর সফর মাসের ৩০ তারিখ বুধবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগের সূচনা হয় হযরত মায়মুনার ঘর থেকে। অসুস্থ থাকার সময়সীমা তেরো দিন পর্যন্ত ছিল। রোগাক্রান্ত হওয়ার এ সময়ে একদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ ইহুদীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, তারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় আরও বলেছিলেন, 'সাবধান নামাযের পাবন্দী এবং অধীনস্থদের সংগে সদ্ব্যবহার করবে।' অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) জন্য খিলাফতের (নিয়োগ) পত্র লিখার ইচ্ছা করেন। যাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে লোকজন মতবিরোধ না করেন। এ হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের মাত্র পাঁচদিন আগের ঘটনা। এ দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগের মাত্রা ছিল অত্যধিক। অত্যধিক অসুস্থতা দেখে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লিখে দেয়ার কষ্ট দিবেন না। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট।' এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখার ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং বলেন, 'আল্লাহ এবং মুমিনরা আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকেই গ্রহণ করবে না' (বুখারী এবং মুসলিম)। শিয়া সম্প্রদায় দাবী করেন যে, খিলাফতের পত্র হযরত আলী (রা.) জন্য লেখা হচ্ছিল, অথচ শিয়া সম্প্রদায়ের এ দাবী মনগড়া বাতিল কল্পনা মাত্র। হাদীসের কোন কিতাবে এর কোন প্রামাণ নেই। এ সংগে বিশুদ্ধ বা হাসান হাদীস দূরের কথা কোন যায়ীফ বর্ণনাও পাওয়া

যায় না। এটা তাদের মনগড়া আবিষ্কার মাত্র। অতএব, এটা অগ্রহণযোগ্য বা অবিশ্বাসযোগ্য।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের (মুমিনদের মাতাদের) নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন যে, অসুস্থতার অবশিষ্ট দিনগুলো হযরত আয়িশা (রা.) এর ঘরে অবস্থান করার জন্য। সকল স্ত্রীরা খুশি হয়ে অনুমতি প্রদান করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়ালের ৫ তারিখ শনিবার হযরত আয়িশা (রা.) এর গৃহে চলে আসেন। এটা তাঁর নিধারিত (পালার) দিনও ছিল। অতঃপর ৮ দিন পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে অবস্থান করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখান থেকে অন্যত্র যাননি এবং আজ পর্যন্ত এখানেই আছেন। ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে তাশরীফ নিলেন। অপারগতার কারণে বসে বসে খুতবা দেন, তাতে উম্মাহর প্রয়োজনীয় বিষয়ে নসীহত উপদেশ ছিল। দাওয়াত ও তাবলীগের উপর জোর দেন। খুতবার মধ্যে ইরশাদ ফরমান, 'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তিনি পৃথিবীতে থাকতে চান অথবা আখেরাতের স্থায়ী জগতে চলে যেতে চান। তিনি আল্লাহর কাছে যাওয়ার বিষয় গ্রহণ করে নিয়েছেন।' হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, 'বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটির মর্ম একমাত্র আবু বকর (রা.) ব্যতিত আমরা কেহই উপলব্ধি করতে পারিনি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে হযরত আবু বাকর (রা.) কেঁদে উঠেন। প্রকৃতপক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কথাই বলছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। এ খুতবায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'আবু বকর ব্যতিত অন্য সকলের জানালা যেগুলো মসজিদের দিকে খোলা হয়, সব বন্ধ করে দাও।' ফলে আবু বকরের জানালা ছাড়া অন্যান্য সকল জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়। এখনও মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে তা খোলা রয়েছে এবং সোনালী অক্ষরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে নির্দেশ লেখা রয়েছে। এ ভাষণে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের, আনসার সাহাবার সংগে সদ্ব্যবহার এবং শিষ্টাচার প্রদর্শনের জন্য ওসিয়ত করছি। তাদের পুণ্যবানদের খেদমত করবে এবং অন্যান্যদের ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবে।'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৭ ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়তে পারেননি। একাকী ঘরে নামায পড়েছেন। এ তিন দিনের মধ্যে একদিন বিশ্বনবী

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য সুস্থতা বোধ করেন। তখন দু'জনের সহায়তায় মসজিদে এসে নামায আদায় করেন। পা মোবারক টেনে টেনে মসজিদে আসার কারণে মসজিদে নববীতে কদম মোবারকের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আবু বকর নামায পড়াচ্ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারে গিয়ে পৌঁছেন এবং আবু বকরের পাশে বসে যান এবং জামায়াতে নামায আদায় করেন। সে তিন দিনের শেষদিন সোমবার ছিল। এটাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ দিন। ফজরের নামাযের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফের পর্দা সরালেন। সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) নামাযের ইমামতি করছিলেন। মুসলমান জনতা তার পিছনে নামায আদায় করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং মুচকি হাঁসলেন। অতঃপর পর্দা ফেলে দেন। এদিনেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবী ত্যাগ করেন। ইন্তিকালের তিন দিন আগে মালাকুল মউত [আজরাঈল (আ.)] বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন এবং রূহ মোবারক কবয করার অনুমতি চান। আজরাঈল (আ.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'আপনার অনুমতি হলে জান কবয করতে পারি।' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন। এর তিন দিন পর এসে আজরাইল (আ.) রূহ মোবারক কবয করে নিয়ে যান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল করেন। দিনটি ছিল সোমবার। ইন্তিকালের সময় ছিল দ্বিপ্রহরের পরে। এ বছর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৬৩ বছর।

এ বছর মুসলমানরা হযরত আবু বকরের (রা.) হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করে। ১১ হিজরীর ১২ ই রবিউল আউয়াল এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) রমযানের তিন তারিখে ইন্তিকাল করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ২৯ বছর। এ বছর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচারিকা এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজাদকৃত দাসী হযরত উম্মে আইমন হাবশিয়া (রা.) ইন্তিকাল করেন। তার ওফাত হয় বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পাঁচ অথবা ছ'মাস পরে। তিনি ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমে হাবশার দিকে অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। এ বছর উমামার যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) এর পক্ষ থেকে মুসলিম সৈন্যদের সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)। মহান আল্লাহ নিজ দয়া এবং সাহায্যে তাঁকে বিজয়ী করেন।

www.nagorikpathagar.org

এ বছর মিথ্যাবাদী আসওয়াদে আনাসী, হযরত ফিরোজ (রা.) এর হাতে নিহত হন। ফিরোজকে (রা.) স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যাবাদী আসওয়াদে আনাসীকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ফিরোজ (রা.) মিথ্যাবাদী আসওয়াদের ঘরে হামলা করে তাকে হত্যা করেন। এ সময় তার বাড়ির ফটকে এক হাজার লোক প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছিল। ফিরোজ (রা.) তাকে হত্যা করার সংবাদ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সংবাদদাতা মদীনায় পৌঁছার আগেই বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল হয়ে যায়। অথচ ইন্তিকালের একদিন আগে ওহীর মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়েছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'আজ রাতে আসওয়াদে আনাসী নিহত হয়েছে। তাকে একজন মোবারক ব্যক্তি হত্যা করেছেন। যিনি বরকতময় একটি পরিবারের সন্তান।' আরজ করা হল, 'কে এ ব্যক্তি?' বিশ্বনবী বলেছিলেন, 'ফিরোজ সফল হয়েছে।'

এ বছর ইমামার যুদ্ধে কাফিরদের মধ্য থেকে মুসাইলামা কাজ্জাব নিহত হয়। সে বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। হযরত ওহশী (রা.) তাকে হত্যা করেছিল। এই ওহশীর হাতেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত হামযা (রা.) শহীদ হয়েছিলেন। তখন মুসাইলামার বয়স ছিল একশত পঞ্চাশ বছর। ইমামার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.) শহীদ হন। তিনি ছিলেন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের বড় ভাই এবং প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা। একই যুদ্ধে ছাবিত ইবনে কয়েস শাম্মাদ খতীব আল আনসারী এবং উব্বাস ইবনে বিশর আল খাযরাজী (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। জিহাদে মুসাইলামা কাজ্জাবের বিশ হাজার কাফির নিহত হয় এবং হযরত খালিদের বাহিনীর বার শত মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল ঃ দশম হিজরীতে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছিল। সম্পূর্ণ আরব জাহান তখন ইসলামের নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। এ সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি, বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় এমন সব নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এ পৃথিবীর অধিবাসীদের শীঘ্রই বিদায় জানাবেন। দশম হিজরীর রমযান মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ দিন ই'তিকাফ পালন করেন। অথচ অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

রমযানে ই'তিকাফ পালন করতেন দশ দিন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এ বছর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র কুরআন শরীফ দু'বার পাঠ করে শোনান। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এ জায়গায় তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত হতে পারব কিনা? জামরায়ে আকাবার কাছে তিনি বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও। কেননা আমি এ বছরের পর সম্ভবত আর কখনো হজ্জ করতে পারব না। আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি (১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ) সময়ে সূরা নাসর নাযিল হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝে নিয়েছিলেন যে, এখন তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পালা। এ সূরা নাযিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মৃত্যুর একটি আগাম সংবাদ দেয়া।

একাদশ হিজরীর সফর মাসের শুরুতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ প্রান্তরে গমন করেন। সেখানে তিনি শহীদদের জন্যে এমনভাবে দোয়া করেন যেন, জীবিতরা মৃতদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছে। এরপর ফিরে এসে তিনি মিম্বরে বসে বলেন, আমি তোমাদের কাফেলার আমীর এবং তোমাদের জন্যে সাক্ষী। আল্লাহর শপথ, এখন আমি আমার হাউয অর্থাৎ হাউযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে সমগ্র বিশ্ব জাহান এবং এর ধন-ভা ারের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি এ আশংকা পোষণ করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে; বরং এ আশংকা করছি, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে। এরপর একদিন মধ্য রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে যান এবং সেখানে মৃতদের জন্যে দোয়া করেন। সে দোয়ায় তিনি বলেন, হে কবরবাসীরা, তোমাদের প্রতি সালাম। মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে, তার চেয়ে তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো, তা তোমাদের জন্যে শুভ হোক। ফেতনা আঁধার রাতের মত একের পর এক চলে আসছে। পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে মন্দ। এরপর কবরবাসীদের এ সুখবর প্রদান করেন, আমিও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হব।

একাদশ হিজরীর (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯শে সফর রোববার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ফেরার পথে মাথা ব্যথা শুরু হয় এবং উত্তাপ এত বেড়ে যায় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপর দিয়েও তাপ অনুভব করা যাচ্ছিল। এটা ছিল তাঁর মরণ রোগের শুরু। তিনি সে অসুস্থ অবস্থায়ই এগার দিন নামায পড়ান। অসুখের মোট মেয়াদ ছিল তের অথবা চৌদ্দ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানস প্রকৃতি ক্রমেই

www.nagorikpathagar.org

ভায়াবহ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এ সময় তিনি বারবার সহধর্মিণীদের জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কোথায় থাকব? আমি আগামীকাল কোথায় থাকব? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য তাঁর সহধর্মিণীরা বুঝে ফেলেন। তাই তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন সেখানেই থাকবেন। এরপর তিনি হযরত আয়িশার (রা.) ঘরে স্থানান্তরিত হন। স্থানান্তরের সময় তিনি হযরত ফযল ইবনে আব্বাস এবং হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। পবিত্র চরণযুগল মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় তিনি হযরত আয়িশার (রা.) ঘরে স্থানান্তরিত হন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহ সেখানেই কাটান। হযরত আয়িশা (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শিক্ষা করা দোয়াসমূহ পাঠ করে তাঁর পবিত্র দেহে ফুঁ দিতেন এবং বরকতের আশায় তাঁর পবিত্র হাত দেহে মেলাতেন। এ অবস্থাতেও তিনি আয়িশার (রা.) ঘরে উম্মুল মুমেনিন ও মহিলাদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দেন। দাওয়াত ও তাবলীগ অব্যাহত রাখেন।

ইন্তিকালের পাঁচ দিন আগে চাহার শোম্বায় (বুধবার) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহের উত্তাপ অতিরিক্ত আকার ধারণ করে। এতে তাঁর কষ্ট বেড়ে যায় এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ সময় তিনি বলেন, বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি আমার উপর ঢাল। আমি যেন লোকদের কাছে গিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগ করতে পারি। তাঁর এ আদেশ পুরো করতে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হয় এবং দেহে এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালা হয়, যাতে তিনি বলেন, ব্যস, ব্যস, আর প্রয়োজন নেই। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করে মসজিদে যান। এ সময়ও তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বারে আরোহণ করে ভাষণ দেন। সাহাবায়ে কেরাম আশেপাশে সমবেত ছিলেন। তিনি বলেন, ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তিনি আরো বলেন, তোমরা আমার কবরকে পূজার বেদীতে বা মাজারে পরিণত করো না।

এরপর তিনি নিজেকে অন্যদের বদলা নেয়ার জন্যে পেশ করে বলেন, আমি যদি কারো পিঠে চাবুকের আঘাত করে থাকি, তবে এ আমার পিঠ হাযির, সে যেন বদলা নিয়ে নেয়। যদি কাউকে অসম্মান করে থাকি, তবে সে যেন আমার কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করে। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর থেকে নীচে নেমে আসেন এবং যুহরের নামায পড়ান। এরপর তিনি পুনরায়

www.nagorikpathagar.org

মিম্বারে উপবেশন করে শত্রুতা, হিংসা, বক্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা কথা পুনরায় বলেন। এক লোক বলেন, আপনার কাছে আমি তিন দিরহাম পাওনা রয়েছি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) কে সে ঋণ পরিশোধের আদেশ দেন। এরপর তিনি আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের আনসারদের ব্যাপারে ওসিয়ত করছি। কেননা তারা আমার অন্তর ও কলিজা। তারা নিজেদের যিম্মাদারী পূর্ণ করেছে, কিন্তু তাদের অধিকারসমূহ বাকি রয়ে গেছে। কাজেই তাদের মধ্যেকার নেককারদের গ্রহণ করবে এবং বদকারদের ক্ষমা করবে। তিনি আরও বলেন, মানুষ বাড়তে থাকবে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে, এমনকি তারা খাবারে লবণের পরিমাণের মত হয়ে পড়বে। কাজেই তোমাদের যারা কোনো উপকার বা ক্ষতি করার মত কাজের দায়িত্ব পাবে, তারা আনসারদের মধ্যেকার নেককারদের গ্রহণ করবে এবং বদকারদের ক্ষমা করবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর বা ওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার তিনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি বলেন, আমি তোমাদের ক'টি কথা লিখে দিচ্ছি, এরপর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। সে সময় ঘরে কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমরও (রা.) ছিলেন। তিনি বলেন, আপনি অসুখে খুবই কষ্ট পাচেছন। আমাদের কাছে পবিত্র কুরআন রয়েছে, সেটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। একথা শুনে ঘরে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা লিখে দিতে চাচ্ছিলেন, তা লিখিয়ে নেয়া হোক। কেউ কেউ বলছিলেন, না দরকার নেই। হযরত ওমর (রা.) বলেন, সেটাই ঠিক। মতভেদ এক সময়ে কথা কাটাকাটিতে পরিণত হয়। শোরগোল বেড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। সেদিনই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যাপারে ওসিয়ত করেন। প্রথমত উহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদের জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দেবে। দ্বিতীয়ত আগন্তুক প্রতিনিধি দলের সাথে আমি যে রকম ব্যবহার করতাম, সে রকম ব্যবহার করবে। তৃতীয় কথা বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন। সম্ভবত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অথবা ওসামার (রা.) বাহিনীকে প্রেরণ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে।

অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও ওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাসূল

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নামাযে নিজেই ইমামতি করেন। সেদিনের মাগরিবের নামাযে তিনিই ইমামতি করেছিলেন। সে নামাযে তিনি সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। এশার সময় রোগ এত বেড়ে যায়, যাতে মাসজিদে যাওয়ার শক্তি থাকেনি। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, সেদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমি বললাম, জ্বি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার জন্যে পাত্রে পানি লও। আমি তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন, এরপর ওঠতে চাইলেন কিন্তু বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? তাঁকে জানানো হল, জ্বি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও একই অবস্থা হয়। তিনি গোসল করলেন এরপর ওঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুশ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.) কে খবর পাঠান, তিনি যেন নামায পড়িয়ে দেন অর্থাৎ নামাযে ইমামতি করেন। এরপর তাঁর অসুস্থতার জন্য বাকী দিনগুলোতেও, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নামায পড়ান। তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সতের ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেন। হযরত আয়িশা (রা.) তিন অথবা চারবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এ মর্মে আরয করেন, ইমামতির দায়িত্ব হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়া হোক। তিনি চাচ্ছিলেন, লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ না করুক। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই সহধর্মিণীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমরা সবাই ইউসুফ (আঃ) এর সাথীদের মত হয়ে গেছ। আবু বকরকে আদেশ দাও, তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান।

শনি অথবা রোববার; বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। অতএব দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যুহরের নামাযের জন্যে মসজিদে যান। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সাহাবীদের নামায পড়াচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে তিনি পিছনে সরে আসতে থাকেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করেন, পিছনে সরে আসার দরকার নেই। যাদের কাঁধে ভর দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়েছিলেন তাদের বলেন, আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। এরপর তাঁকে হযরত আবু বকরের (রা.) ডান পাশে বসিয়ে দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তখন নামাযে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একতেদা করছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের একদিন আগে (রোববার দিন) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সব দাস দাসীকে মুক্ত করে দেন। তাঁর কাছে সে সময় সাত দিনার ছিল, সেগুলো সদাকা করে দেন। তাঁর অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের হেবা করে দেন। রাতের বেলা চেরাগ বা বাতি জ্বালানোর জন্যে হযরত আয়িশা (রা.) এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে জয়তুনের তেল ধারে আনেন। তাঁর বর্ম এক ইহূদীর কাছে তিরিশ সা' (৭৫ কিলোগ্রাম) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষদিনটি ছিল সোমবার। মুসলমানরা ফজরের নামায আদায় করছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইমামতির দায়িত্বে ছিলেন। হঠাৎ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা সিদ্দিকার হুজরার পর্দা সরিয়ে সাহাবীদের কাতার বাঁধা অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখে মৃদু হাসেন। এদিকে হযরত আবু বকর (রা.) কিছুটা পিছনে সরে গেলেন, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতারে শামিল হতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি হয়ত নামাযে আসতে চান। হযরত আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে সাহাবীরা এত আনন্দিত হলেন, যাতে নামাযের মধ্যেই তাদের ফেতনায় পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল। তারা নামায ছেড়ে দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক অবস্থার খবর নিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের হাতে ইশারা করলেন, তারা যেন নামায পুরো করেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার ভেতর চলে গিয়ে পর্দা ফেলে দেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অন্য কোনো নামাযের সময় আসেনি। দিনের শুরুতে 'চাশত' নামাযের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বলেন। এতে নবী কন্যা ফাতিমা (রা.) কাঁদতে থাকেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ফাতিমার কানে কিছু কথা বলেন এবার হযরত ফাতিমা (রা.) হাসতে থাকেন।

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি হযরত ফাতিমাকে তাঁর কান্না ও হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রথমবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, এ অসুখেই আমার মৃত্যু হবে। একথা শুনে আমি কাঁদলাম। এরপর তিনি আমাকে কানে কানে বলেন, আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার অনুসারী হবে। একথা শুনে আমি হাসলাম। এ সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা (রা.) কে বিশ্বের সকল মহিলার নেত্রী হওয়ার সুসংবাদও প্রদান করেন। শেষদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যন্ত্রণার তীব্রতা দেখে হযরত ফাতিমা (রা.) হঠাৎ বলে ফেলেন, হায় আমার আব্বার কষ্ট। একথা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোনো কষ্ট নেই। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) কে ডেকে চুম্বন করেন এবং তাদের ব্যাপারে কল্যাণের ওসিয়ত করেন। সহধর্মিণীদের ডেকে তাদেরও ওয়ায-নসহীত করেন। মৃত্যুর শেষ দিনেও দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন।

বিশ্বনবী কষ্ট ক্রমেই বাড়ছিল। খাইবারে ইহুদী মহিলার দেয়া বিষের প্রভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল। খাইবারে দাওয়াত করে তাঁকে খাদ্যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রা.) কে বলেন, হে আয়িশা, খাইবারে আমি যে বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়াজনিত কষ্ট সব সময় অনুভব করছি। এখন মনে হচ্ছে, সে বিষের প্রভাবে যেন আমার প্রাণের শিরা কাটা যাচ্ছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগ, নসিয়ত ও নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের তিনি বলেন, 'আস সালাত, আস সালাত ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম অর্থাৎ নামায, নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী।' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা কয়েকবার উচ্চারণ করেন।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতকালীন অবস্থা শুরু হয়। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেহে ঠেস দিয়ে ধরে রাখেন। তিনি বলেন, আমার উপর আল্লাহর একটি নেয়ামত হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার কোলের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর এবং আমার থুথু একত্রিত করে দেন। মৃত্যুর পূর্বে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) এসেছিলেন। সে সময় তার হাতে ছিল মিসওয়াক। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গায়ের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি মিসওয়াকের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

তাকিয়ে আছেন। আমি বুঝলাম তিনি মিসওয়াক চান। বললাম, আপনার জন্যে নেবো কি? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করেন। আমি মিসওয়াক এনে তাঁকে দেই। কিন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শক্ত অনুভব করেন। আমি বললাম, আপনার জন্যে কি নরম করে দেব? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। আমি দাঁত দিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি বেশ ভালোভাবে মিসওয়াক করেন। তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি ছিল। তিনি হাত ভিজিয়ে চেহারা মুছছিলেন আর বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, মৃত্যু বড় কঠিন।

মিসওয়াক শেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত অথবা আঙ্গুল তোলেন। এ সময় তাঁর দৃষ্টি ছিল ছাদের দিকে। উভয় ঠোঁট তখনো নড়ছিল। তিনি বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন। হযরত আয়িশা (রা.) মুখের কাছে কান পাতেন। বিশ্বনবী তখন বলছিলেন, হে আল্লাহ, নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎব্যক্তি, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আমাকে মার্জনা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে 'রফিকে 'আলায় পৌছে দাও। হে আল্লাহ আমাকে রফিকে আলায় পৌছে দাও! বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ কথাটি তিন বার উচ্চারণ করেন। এরপর তাঁর হাত ঝুঁলে পড়ে এবং তিনি পরম বন্ধু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন।' অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। এ ঘটনা ঘটেছিল একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, চাশতের নামাযের শেষ সময়ে (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

হৃদয়বিদারক এ শোক সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মদীনার জনগণের উপর শোকের পাহাড় ভেংগে পড়ে। চারদিকে শোকের কালো ছায়া। হযরত আনাস (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন আমাদের মাঝে মদীনায় আগমন করেছিলেন সেদিনের চেয়ে সমুজ্জ্বল দিন আমি আর কখনো দেখিনি। আর যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনও আমি আর কখনো দেখিনি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর হযরত ফাতিমা (রা.) শোকে কাতর হয়ে বলেন, 'হায় পিতা, যিনি পরওয়ারদেগারের ডাকে লাব্বায়েক বলেছেন। হায় আব্বা, যাঁর ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস। হায় আব্বা, আমি জিবরাঈল (আঃ) কে আপনার ওফাতের খবর জানাচ্ছি।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর শুনে হযরত ওমর (রা.) জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন। তিনি দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, কিছু কিছু মুনাফিক মনে করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছে; কিন্তু আসলে তাঁর ওফাত হয়নি। তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে ঠিক সেভাবে গেছেন, যেভাবে হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ) গিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর কওমের কাছ থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ তাঁর ফিরে আসার আগে তাঁর জাতির লোকেরা বলাবলি করছিল, মূসা (আঃ) এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ফিরে আসবেন এবং যারা মনে করছে তিনি মারা গেছেন, তিনি তাদের হাত পা কেটে ফেলবেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সুনহে নামক জায়গায় নিজের বাড়িতে ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর শুনে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। এরপর কাউকে কোনো কথা না বলে, সোজা হযরত আয়িশার (রা.) ঘরে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মোবারক তখন ডোরাকাটা ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে চুম্বন করে কেঁদে ওঠেন। এরপর বলেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর কুরবান হোন। আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে দু'টি মৃত্যু একত্রিত করবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্যে লেখা ছিল তা হয়ে গেছে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বাইরে আসেন। হযরত ওমর (রা.) সমবেত লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে বলেন, ওমর বসে পড়। হযরত ওমর (রা.) বসতে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে সাহাবীরা হযরত ওমরকে ছেড়ে হযরত আবু বকরের (রা.) প্রতি মনোযোগী হন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করতে, সে জেনে রাখুক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, 'মুহাম্মদ কেবল একজন রাসূল, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখন আল্লাহর ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

www.nagorikpathagar.org

মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির দিশেহারা সাহাবীরা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর বক্তব্য শুনে নিশ্চিত হন, প্রকৃতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ, কেউ যেন জানতই না আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আবু বকরের উচ্চারিত এ আয়াত নাযিল করে রেখেছেন। আবু বকর (রা.) এর তিলাওয়াতের পর সবাই এ আয়াত মুখস্থ করে নেয়। মুখে মুখে তখন এ আয়াত ফিরছিল। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ, হযরত আবু বকর (রা.) কে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনে, আমি যেন মাটি হয়ে গেলাম। আমি দাঁড়াতে পারলাম না, মাটিতে ঢলে পড়ে যাচ্ছিলাম। কেননা তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যি সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাফন দাফনের আগেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনায়ন প্রশ্নে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। সাকিফা বনী সায়েদায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর খেলাফতের ব্যাপারে সবাই একমত হন। এ কাজে সোমবারের বাকি দিন কেটে গিয়ে রাত এসে যায়। সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরদিন সকাল হয়। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। তখনও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দেহ একখানা ডোরাকাটা ইয়েমেনী চাদরে আবৃত ছিল। ঘরের লোকেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীরের কাপড় না খুলেই তাঁকে গোসল দেয়া হয়। গোসলদানকারীদের মধ্যে ছিলেন হযরত আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আব্বাসের দুই পুত্র ফযল এবং কাসেম। আরও ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত করা দাস শোকরান, হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ এবং আওস ইবনে খাওলা (রা.)। হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাশ ফেরাচ্ছিলেন। হযরত ওসামা ও হযরত শোকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের বুকের সাথে ঠেস দিয়ে রেখেছিলেন।

গোসল শেষে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা ইয়েমেনী সাদা চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়। এতে কোর্তা এবং পাগড়ি ছিল না। তাকে শুধু চাদর দিয়েই জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথায় দাফন করা হবে, সে সম্পর্কেও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সকল নবীকে যেখান থেকে তুলে নেয়া হয়েছে, সেখানেই দাফন করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর, হযরত আবু তালহা (রা.) সে বিছানা ওঠান। যে বিছানায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন। সে বিছানার নীচে কবর খনন করা হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ শয্যায় থাকাকালীন চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। হযরত আয়িশা (রা.) এর কামরায় থাকাকালীন সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়ত করেছিলেন, 'ইন্তিকালের পরে আমাকে গোসল দিবে, কাফন পরাবে, আমার কফিন কিছুক্ষণের জন্য আমার এ হুজরায় রেখে তোমরা বেরিয়ে যাবে। সর্বপ্রথম জিব্রাঈল এসে আমার জানাযা পড়াবে। অতঃপর মিকাইল, তারপর ইস্রাফীল, তারপর আজরাঈল। তাদের প্রত্যেকের সংগে ফিরিশতাদের বিরাট দল থাকবে। অবশেষে ইমাম ছাড়া আমার পরিবারের পুরুষ, তারপরে মহিলাগণ আলাদা আলাদাভাবে আমার জানাযা বা দোয়া পড়বে। অতঃপর তোমরা (সাহাবারা) দলে দলে এসে আমার জানাযা পড়বে।

এরপর ওসিয়ত মত দশ জন, দশ জন করে সাহাবী হুজরায় প্রবেশ করে পালাক্রমে জানাযার নামায দোয়ার আকারে আদায় করেন। এ নামাযে কেউ ইমাম হননি। সর্বপ্রথম বনু হাশেম গোত্রের লোকেরা নামায আদায় করেন। এরপর মুহাজির, এরপর আনসাররা, এরপর অন্যান্য পুরুষ, এরপর মহিলা, সবশেষে শিশুরা জানাযার নামায আদায় করেন। জানাযার নামায আদায়ে মঙ্গলবার পুরো দিন অতিবাহিত হয় এবং মঙ্গলবার দিবাগত অর্থাৎ বুধবার রাত এসে যায়। এ রাতেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ আহমদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দাফন করা হয় অর্থাৎ কবরে শুইয়ে দেয়া হয়। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক কোথায় দাফন করা হয় আমরা জানতে পারিনি। তবে বুধবার রাতের মাঝামাঝি সময়ে কোদালের শব্দ পেয়েছিলাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারক হযরত আয়িশার (রা.) গৃহে ঠিক ঐ জায়গাতে তৈরি করা হয়, যেখানে হযরত আয়িশার (রা.) বিছানা ছিল। যাঁরা গোসল দিয়েছিলেন একমাত্র হযরত উসামা ছাড়া সকলেই কবরে নেমেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর কাঁচা ইট দিয়ে বন্ধ করা হয়। মোট নয়খানা ইট বিছানো হয়েছিল। কোন ধরনের দেয়াল দেয়া হয়নি। আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যু সত্য এবং

www.nagorikpathagar.org

সবাইকে কবরে যেতে হবেই। কবরের নির্জন প্রকোষ্ঠে সবাইকে একাকী যেতে হয়েছে। আমার ও আপনার ব্যাপারেও একই অবস্থা অপেক্ষা করছে। মৃত্যুর পূর্বেই পরকালের সঞ্চয়, ঈমান ও আমলকে সঠিক এবং সম্পূর্ণ করে করে নিয়ে যেতে হবে। মৃত্যুর পরের জীবন অনন্ত এবং যা কখনই শেষ হবে না।

শেষ কথা

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (সূরা আল হাশর : ৭)। আল্লাহ পাক বলেন, "মুহাম্মদ আপনি বলে দিন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সমস্ত আসমান যমীন যার অধীন, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই শক্তি দান করেন। অতএব, আল্লাহর উপর, তার উম্মী নবীর উপর ঈমান আন, যিনি ঈমান এনেছেন আল্লাহর উপর; আল্লাহর আহকামের উপর। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। তাহলে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।" (সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮) আর ঈমান না আনাদের জন্য আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা "যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে না, আমি সেই কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সূরা আল ফাতাহ : ১৩) আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সা.) আনুগত্য করতে বলেছেন, "(হে নবী) আপনি বলেদিন, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা আলে ইমরান : ৩২) আর এই আনুগত্যের বিনিময়ও আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, " আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ নবী, সিদ্দিকীন, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে, তারা খুবই ভাল সঙ্গী।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৬৯) আর আনুগত্যের নগদ পুরস্কার হচ্ছে হিদায়ত। "যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে" (সূরা আন নূর ঃ ৫৪) আল্লাহপাক নবীর ইত্তেবা করতে বলেছেন। "হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত রাখ, তবে আমার ইত্তেবা (অনুকরণ) কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩১) আল্লাহপাক পূর্ণ মুমিনের সংজ্ঞা দেন এভাবে, "পূর্ণ মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর এতে কোন সন্দেহ পোষণ করে না। অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে

www.nagorikpathagar.org

সংগ্রাম করেছে। বস্তুত তারাই সত্যবাদী।" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫) বিশ্বনবী (সা.) বলেন, "ফিৎনা-ফাসাদের যামানায় আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে।" (মিশকাত) মহানবী (সা.) নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন "তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আমার আনীত শরীয়তের ও আহকামের তরে অনুগত না হবে।" (মিশকাত) "তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট পিতা, সন্তান এবং অপরাপর সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হই। (বুখারী) আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর (সা.) উপর ঈমান আনার ও পূর্ণ আনুগত্য এবং বিশ্বনবীকে পরিপূর্ণভাবে চেনা, জানা তথা তাঁর (সা.) সুন্নাতের উপর চলার তৌফিক দিন। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

৩য় খণ্ড

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের গবেষণা ও বিশ্লেষণ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বাভাস

আল কুরআনে এসেছে, আর নিশ্চয় তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; যার বর্ণনা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহে আছে। (শু'আরা ঃ ১৯৬)। আল্লাহ তা'আলা আখেরী যামানার দুর্বল বান্দাদের হিদায়াতের জন্য সকল নবীদের শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে, পৃথিবীতে পাঠাবেন এটা তিনি আগেই নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। পবিত্র কুরআন নাযিলের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, প্রত্যেক কিতাবেই তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন। সূর্য উঠার আগে যেমন পূর্বাকাশ আলোময় হয়ে; সুসংবাদ ঘোষণা করে আর বলে সূর্য তার তেজদ্বীপ্ত আলো নিয়ে উঠছে। তেমনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের অনেক আগে থেকেই নানা প্রকার ঘটনা তাঁর শুভাগমনের ইঙ্গিত বহন করছে। হযরত ইরবাস ইবনে সারিয়া (রা.) কে লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে আমি যখন নবী, আদম (আ.) তখনও মাটিতে সুপ্ত অবস্থায়; অর্থাৎ তখনও তিনি সৃষ্টি হননি। তারপর বলেন, আমার প্রকাশের সূচনা কোথা হতে তা শোন। পিতা ইব্রাহীমের দোয়া, আমার সম্পর্কে ঈসা (আ.) এর সুসংবাদ ও আমার সম্পর্কে আমার মায়ের স্বপ্ন হচ্ছে আমি নবী মুহাম্মদ আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিবি হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার সাফা-মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রেখে আসার সময় তাঁদের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। হে আমার রব! আমি আমার সন্তানকে এ কৃষি অনুপযোগী (তরুলতাবিহীন) উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট রেখে গেলাম। হে আমার প্রভু! তা এজন্য করলাম, যেন তারা নামাজ কায়েম করে। তাই আপনি মানুষের অন্তরকে তাদের

www.nagorikpathagar.org

দিকে ফিরিয়ে দিন, যেন তারা তাদের দিকে ঝুকে পড়ে (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৭)। পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর যোগ্য পুত্র ইসমাঈল (আ.) দু'জনে মিলে পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করার পর হারাম শরীফ ও সে স্থানের বাসিন্দাদের জন্য দোয়া করেন। আর তারা দু'জনে মিলে আল্লাহর দরবারে এভাবে প্রার্থনা করেন ঃ হে আমাদের রব! তাদের মধ্য থেকেই তাদের জন্য একজন নবী প্রেরণ করুন। যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করে দিবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (সূরা বাকারা ঃ ১২৮, ১২৯)। উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এ দোয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে তার প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈলও (আ.) শরীক ছিলেন। আর যে নবীর জন্য তারা দোয়া করেছিলেন; তিনি উভয়ের বংশোদ্ভূত হবেন এবং মক্কা নগরে প্রেরিত হবেন। সুতরাং এ নবী যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মক্কা শহরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবী, হযরত ইসমাঈলের আওলাদ হতে আবির্ভূত হননি। আবুল আলিয়া ও কাতাদাহ (রা.) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে জানান হয়েছিল যে, তোমাদের দোয়া কবুল করা হল। তবে সে নবী আখেরী যমানায় আসবেন। (ইবনে কাসীর)

ঈসা (আ.) এর সুসংবাদ ঃ হযরত ঈসা (আ.) যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তা ইঞ্জীল কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তারই পুনরোক্তি করেছেন আল কুরআনে। স্মরণ কর, যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.) বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূলরূপে আগমন করেছি, আমার পূর্বে যে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল আমি তা সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং আমার পর 'আহমদ' নামক যে একজন রাসূল আগমন করবেন আমি তার সুসংবাদ দিচ্ছি (আল কুরআন)। হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য নবী রাসূলের মুখে একথাই উচ্চারিত হয়ে আসছে যে, সর্বশেষ একজন নবী আসবেন যিনি হবেন আম্বিয়া শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বনবী। ইতিহাসে এটা প্রমাণিত যে, হযরত মূসা (আ.) এর পর নতুন ধর্ম নিয়ে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। যারা এসেছেন তাদের সবাই তার অনুসারী ছিলেন। মূসার (আ.) পরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন ঘটে। এ কারণে তাকে জিজ্ঞাস করা হলে, তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি নন বরং তারই পরবর্তী ব্যক্তি। হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.) তাদের নিজ নিজ কিতাবে যে রাসূলের কথা বলা হয়েছে, তা কুরআনের আয়াতেও উল্লেখ করা

হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তার বর্ণনা নিজেদের কাছে (তাওরাত ও ইঞ্জীলে) লিখিত পাচ্ছে। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

মা আমিনার স্বপ্ন ঃ হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম; আপনার ব্যাপারে প্রথম পূর্বাভাস কি ছিল? উত্তরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে স্বপ্ন আমার মা দেখতে পান অর্থাৎ এক নূর তাঁর শরীর থেকে বের হয়ে শামদেশের প্রাসাদগুলো উদ্ভাসিত করে দিল (আল হাদীস)। এতে সে ইশারাই ছিল যে, তাঁর গর্ভের সন্তানের মাধ্যমে যে ধর্ম প্রচারিত হবে তা দূর দেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। এ কারণে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা ইব্রাহীমের দোয়া, হযরত ঈসার (আ.) সুসংবাদ এবং মায়ের স্বপ্নই ছিল আমার ব্যাপারে পূর্বাভাস।

সকল ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন বার্তা ঃ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরাই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের কথা জানতেন। তাঁর আবির্ভাবের সময় পৃথিবীতে হিন্দু, ফার্সী (অগ্নি উপাসক), বৌদ্ধ, ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ বেদ-পুরাণে, ফার্সীদের ধর্মগ্রন্থ যিন্দাবেস্তায় এবং বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক ও দিঘানিকায়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তৌরাত এবং খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীল যে আল্লাহর তরফ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ কিতাব দু'টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী এবং তাঁর শুভাগমনের ভবিষ্যৎ বাণী স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিজ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে বহু পূর্বেই তারা বিশ্বনবীর আগমনবার্তা জানতে পেরেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থের (তাওরাত) সমর্থনকারী কিতাব (কুরআন) পৌঁছল, অথচ ইতোপূর্বে তারা কাফিরদের (আরব পৌত্তলিকদের) কাছেও এর বর্ণনা করত। কিন্তু যখন তাদের জানা-শোনা বস্তু অর্থাৎ কুরআন তাদের কাছে পৌছল; তখন তারা তা অমান্য করে বসল। সুতরাং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। (সূরা বাকারা-৮৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইহুদী ধর্মের বিজ্ঞ আলেম ছিলেন (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে)। পবিত্র তাওরাত সম্পর্কে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ করার পর সালামা এবং মুহাজির নামক তাঁর দুই ভাতিজাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়, তোমরা উভয়ে নিঃসন্দেহভাবে অবগত আছ যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তাওরাতে

বলেছেন, নিশ্চয় আমি হযরত ইসমাঈল (আ.) এর আওলাদদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করব, তাঁর নাম আহমদ। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, সে হিদায়াত ও যথার্থ পথ প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে অভিশপ্ত। অনন্তর সালামা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। অথচ মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করল (বায়ানুল কুরআন)। এ সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, মিল্লাতে ইব্রাহীম (ইসলাম) হতে শুধু সে ব্যক্তি বিমুখ থাকতে পারে, যে স্বভাবগতভাবেই নির্বোধ (সূরা বাকারা ঃ ১৩০)। ইহুদী ধর্মের অভিজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী লিখিত আছে এবং একথাও লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) কে তাঁর কবরের পাশে দাফন করা হবে।

বাইবেলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বাভাস ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যোহনের বাইবেলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

১। আর আমি আমার পিতার (আল্লাহর) কাছে নিবেদন করব এবং তিনি আর এক সহায় বা সমর্থনকারী ফারাক্লীতস (বা নবী)। তোমাদের দান করবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সাথে থাকেন। (বাইবেল, যোহন অধ্যায়-১৪)

২। আর সে সহায়, যিনি পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা (আল্লাহ) আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি, তোমাদেরকে যা যা বলেছি সে সকল পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিবেন। (বাইবেল, যোহন অধ্যায়-১৪, পদ-২৬)

৩। যাকে আমি পিতার (আল্লাহর) নিকট হতে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিব। সত্যের সে আত্মা, যিনি পিতার নিকট হতে বের হয়ে আসবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। (বাইবেল, যোহন অধ্যায়-১৪)

৪। তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। কারণ, আমি না গেলে সে সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে আমি তোমাদের নিকট তাকে পাঠিয়ে দিব। আর তিনি এসে পাপ সম্বন্ধে, ধার্মিকতা সম্বন্ধে এবং বিচার সম্বন্ধে জগৎকে জ্ঞানী করবেন। (বাইবেল, যোহন অধ্যায়-১৪)

৫। তোমাদেরকে বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করতে পারবে না। পরন্তু সে সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সত্যের সন্ধান দিবেন। কারণ তিনি নিজ হতে কিছু বলবেন

www.nagorikpathagar.org

না, যা যা শুনবেন (ওহী মারফত) তাই বলবেন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। (বাইবেল, যোহন অধ্যায়-১৪)

বাইবেলে বর্ণিত বাক্যগুলোতে হযরত ঈসা (আ.) বার বার বিশ্বনবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাকে তিনি ফারাক্লিতস বলে অভিহিত করেন। এ শব্দটি ইবরানী বা সুরইয়ানী। এ শব্দটির হুবহু আরবী অনুবাদ মুহাম্মদ এবং আহমদ। অর্থাৎ প্রশংসিত এবং পরম প্রশংসাকারী। প্রাচীন ইউনানী (গ্রীক) ভাষায় এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে পাইরিকিলইউটাস। যার অর্থ অতি প্রশংসাকারী বা প্রশংসিত। কিন্তু পরবর্তীতে খ্রীষ্টানরা যখন দেখতে পেল যে, এর দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, তখন তারা শব্দটি পরিবর্তন করে 'পাইরিকিলিটাস' অর্থাৎ শান্তিদাতা বানিয়ে দিল। খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং মুসলমান আলিম সমাজের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত এ শব্দটি নিয়ে তর্ক যুদ্ধ চলে আসছে। আলিমরা প্রাচীন খ্রীষ্টানদের লিখিত প্রমাণ দ্বারা বহুবার প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এ শব্দটি পাইরিকিলইউটাস অর্থাৎ আহমদ বা মুহাম্মদ। যারা এ সংবাদ বাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যাকে তারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত কথা অনুযায়ী পায়। (সূরা আ'রাফ-১৫৭)

বাইবেলে মুহাম্মদ বা আহমদ নামের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা মসীহ আকাশে উত্থিত হওয়ার অল্পক্ষণ পূর্বে বলেছেন, আর দেখ আমার পিতা যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু যে পর্যন্ত ঊর্ধ্ব হতে শক্তি প্রকাশ/আবির্ভূত না হয়, সে পর্যন্ত তোমরা এ নগরে অবস্থান কর (বাইবেল, লুক, অধ্যায় ২৪)। বর্ণিত উক্তির কয়েকটি পংতির পরেই লুকের বাইবেল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত নবীর আবির্ভাবের কোন কথা, কোথাও উল্লেখ নেই। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.) এর পরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং তিনিই সে প্রতিশ্রুত নবী। ঊর্ধ্ব হতে শক্তি (প্রতিশ্রুত নবীর) প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা এ নগরে অবস্থান কর। এ কথার অর্থ এ নয় যে, তোমরা সেখানে ঘর বসতি বানাও। বরং এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে প্রতিশ্রুত নবীর আগমন পর্যন্ত জেরুযালেমের 'বায়তুল মুকাদ্দাস' তোমাদের কিবলা থাকবে। যখন তিনি আসবেন তখন মক্কা মুকাররমার পবিত্র কা'বা গৃহকে কিবলা নির্ধারণ করে ইবাদত করতে হবে। অবশ্য যখন আল্লাহ এ ব্যাপারে আদেশ দান করবেন। এ বিষয়ে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক এদিকে মুখ কর। যারা আহলে

www.nagorikpathagar.org

কিতাব, তারা অবশ্যই জানে, এটাই পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। (সূরা বাকারা-১৪৪)

ইঞ্জীলে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর আবির্ভাবের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিশ্রুত নবীর আরও একটি ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। হযরত ঈসা এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.) একই সময়ে ছিলেন। অবশ্য হযরত ইয়াহইয়া (আ.) হযরত ঈসা (আ.) অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কে ইহুদীদের পাঠানো লোকেরা তিনজন নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যা বাইবেলের ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ ইহুদীরা কয়েকজন ধর্মযাজক ও লিবীয়কে দিয়ে জেরুযালেম থেকে যোহন বা ইয়াহইয়ার (আ.) কাছে প্রশ্ন করে পাঠাল, আপনি কে? তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি সে খ্রীষ্ট ঈসা (আ.) নই। তারা তাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, তবে কি আপনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.)? তিনি বলেন আমি নই। আপনি কি সে নবী? তিনি উত্তর করেন না। তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি যদি সে খ্রীষ্ট (আ.) না হন, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) না হন, সে নবীও না হন, তবে বাপ্তাইজ করছেন কেন? যোহন (ইয়াহইয়া) উত্তরে তাদেরকে বলেন, তবে আমি জলে বাপ্তাইজ করছি; তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে তোমরা জান না, যিনি আমার পরে আসছেন, আমি তাঁর পাদুকার বন্ধন খুলবারও যোগ্য নই। (বাইবেল, যোহন অধ্যায়-১)

এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, তাওরাতের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী ইহুদীরা তিনজন নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল। দু'জন হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) আর তৃতীয় জনকে সে নবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী এবং খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায় এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত যে, হযরত ঈসা (আ.) এর পর এমন একজন নবী আসবেন, যাকে শুধু নবী শব্দ প্রয়োগ করলেই বুঝা যাবে। এ তৃতীয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউ নন? হযরত ঈসার (আ.) পর একমাত্র তিনিই নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং শুধু নবী নামে সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। মুসলমানরা তাঁকে নবী বা রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনি The Prophet বা সেই প্রত্যাশিত নবী নামে পরিচিত। আর হযরত ইয়াহ্ইয়ার পরে যে একজন নবী আসছেন, তাঁর সম্বন্ধে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) বলেন, 'তিনি তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তোমরা তাঁকে জান না, আমি তাঁর পাদুকার বন্ধন খুলবারও যোগ্য নই। এ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ নন।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীদের (রা.) মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর, তাওরাত অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বলেন, তাওরাতেও অবিকল তাঁর এ গুণগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে (বুখারী-২য় খণ্ড)। কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, "হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা ফাতাহ্-৮)

সাহাবীদের সময়ে কা'আব নামক জনৈক ইহুদী অভিজ্ঞ আলেম, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আতা নামক জনৈক তাবিঈ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি? তিনি উত্তর করলেন, হ্যাঁ আছে। তারপর তিনি তাওরাত হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐ গুণাবলীই পড়ে শুনালেন, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেছিলেন। বর্তমানে তাওরাতের যে সকল কপি পাওয়া যায় তার মধ্যে আশয়ীয়া নবীর কিতাবে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ আজও সে ভবিষ্যৎ বাণীগুলো দেখতে পাওয়া যায়। হযরত আশয়ীয়া (আ.) এর সে ভবিষ্যৎ বাণীতে প্রতীক্ষিত নবীর যে গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় তা এরূপ ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর মনোনীত। তাঁর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। তিনি চিৎকার করবেন না। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না এবং বাজারে কোলাহল করবেন না। তিনি গরীব, দুখী এবং দুর্বলদের উপর অত্যাচার করবেন না, তিনি সদাশয় এবং চরিত্রবান হবেন। তিনি চিরস্থায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অন্তর্ধান (মৃত্যু) হবে না। তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ আমিই আপনার সহায় হয়ে আপনাকে রক্ষা করব। তিনি পূর্ণ তাওহীদ প্রচার করবেন এবং পৌত্তলিক ও মুশরিকদেরকে পরাজিত করে পৌত্তলিকতা ধ্বংস করবেন। মরুভূমিতে, লোকালয়ে এবং কীদারের আবাদকৃত গ্রামসমূহে স্বীয় গুরুগম্ভীর আহবানে সমুচ্চ করবেন। এ ভবিষ্যৎ বাণীর প্রত্যেকটি শব্দ এবং বাক্য, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারও উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ দু'টি বিশিষ্ট গুণ রয়েছে। তিনি নিজেকে এ দু'নামেই জগতে প্রচার করেছেন। এমনকি এ দু'টি শব্দ উচ্চারণ না করা পর্যন্ত মুসলমানের কোন নামাযই পূর্ণ হয় না। প্রত্যেকেরই নামায পড়তে হয় ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আর ইসলামের তাওহীদের কলেমায় এমনটিই বলা হয়েছে।

বেদ ও পুরাণে (হিন্দু ধর্মে) আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদের বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। এসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ, রাসূল, মুহাম্মদ ইত্যাদি শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাপারটি একটু লক্ষ্য করলেই অবাক হয়ে যেতে হয়।

(১) অথর্ববেদীয় উপনিষদ-এ আছে ঃ

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
আল্লা, রাসূল, মহামদ, কং
বরস্য আল্লা আল্লম ইল্লাল্লতি ইল্লাল্লাহ ॥ ৯ ॥

(২) ভবিষৎ পুরাণ-এ আছে ঃ

এতল্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিত
মহামদ ইতি খ্যাত মিষ্যশাকাসমন্বিত ॥ ৫ ॥
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল, নিবাসিনে
ত্রিপুরা, সুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তিনে ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ ঠিক সে সময়ে মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি - যার বাস মরুস্থলে অর্থাৎ (আরব দেশে)- আপন দলবলসহ আবির্ভূত হবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগৎ গুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ দূর করার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণ তলে স্থান দাও।

(৩) অল্লোপনিষদ-এ দেখতে পাওয়া যায় ঃ

আল্লা, রাসূল, মহামদ, কং বরস্য আল্লা আল্লাম
আব্দল্লাহ, বুকমে ককম আল্লাবুক নিখাতকম

অর্থাৎ হে মানুষেরা মনোযোগ দিয়ে শোন প্রশংসিত জন, লোকদের মাঝ থেকেই আবির্ভূত হবেন। আমরা তাকে ৬০,০০০ জন শত্রুর মধ্যে পরিবেষ্টিত পাব। বলাবাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাই বলা হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ মুহাম্মদ অর্থই প্রশংসিত জন আর মক্কার অধিবাসীদের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০। উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, আর্য ঋষিগণ ধ্যানবলে হাজার হাজার বছর আগেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অবগত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থ দিঘা-নিয়ায় বর্ণিত রয়েছে, মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বৌদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম 'মৈত্রেয়' (সংস্কৃত শব্দ মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ। সিংহল থেকে পাওয়া (from Ceylonese sources) একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানেও উপরোক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। একবার আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদেরকে উপদেশ দান করবে? বুদ্ধ বললেন আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন। আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে আমরা চিনব কি করে? বুদ্ধ বললেন, তার নাম হবে মৈত্রেয়। এ মৈত্রেয় বা 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' যে মুহাম্মদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষণ, অবিকল এমনই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি 'রাহমাতুল লিলআলামিন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা ও রহমতস্বরূপ।

পার্সী ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ পার্সী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'যিন্দাবেস্তা' ও দসাতির'। যিন্দাবেস্তায়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। এমনকি 'আহমদ' নামটিও উল্লিখিত রয়েছে। মূল শ্লোক ও তার অনুবাদ এরূপ ঃ আমি ঘোষণা করছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসবেন, যার কাছ থেকে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎকার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে। (Zend-Avesta, Part-1. Translated by Muller. Page 260) 'দসাতির' ধর্ম গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে ঃ যখন পার্সীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন আরবদেশে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। যার শিষ্যরা পারস্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারসিক জাতিকে পরাজিত করবে। যারা নিজেদের মন্দিরে অগ্নি পূজা করবে না। তারা ইব্রাহীমের কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে। সে কা'বা ঘরও প্রতিমা মুক্ত হবে। সে মহাপুরুষের শিষ্যরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হবে। তারা পারস্য, মাদায়েন, তুস, বলখ্ ইত্যাদি পারস্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করবে। তাদের নবী একজন বাগ্মী পুরুষ হবেন এবং তিনি অনেক বিস্ময়কর কথা বলবেন। (Muhammad in world scriptures by A Haq Vidyarthi Page 47)

www.nagorikpathagar.org

ইহুদীদের ধর্ম গ্রন্থ তাওরাতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্র 'তাওরাত' -এ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার (মূসার) মতই একজন নবী উত্থিত করবেন। তার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে (Duet –II:18)। অন্যত্র আছে ঈশ্বর বলেছেন আমি তাদের ভ্রাতাদের মধ্য হতে তোমার (মূসার) মতই একজন নবী উত্থিত করব এবং তাঁর মুখে আমার বাণী প্রকাশ করব। তিনি তোমাদেরকে আমি যা আদেশ করব তাই শুনাবেন এবং এটা অবশ্যই ঘটবে যে, তাঁর মুখ নিঃসৃত আমার সে বাণী, যারা শুনতে চাবে না তাদেরকেও আমি শুনতে বাধ্য করব। আরও উল্লেখ আছে, ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মূসা (আ.) মরণের আগে এ বলে বনী ঈসরাইলদের জন্য দোয়া করলেন ঃ প্রভু (মূসা) সিনাই পর্বত হতে আসলেন এবং সিয়ের পর্বত হতে উঠলেন। কিন্তু তার (অর্থাৎ যিনি আসবেন) জ্যোতি ফারান পর্বত হতে বিকীর্ণ হল। তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনলেন এবং তার ডান হাত থেকে এক জীবন্ত আইন গ্রন্থ বের হল। (Duet –33:1-2)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সত্যবিকাশে আরব ভূমি ঃ এরূপে আমি আপনার উপর কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যেন আপনি মক্কাবাসী ও আশে পাশের বাসিন্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন (সূরা শূরা ঃ ৫৭)। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও হিকমতের ফয়সালা ছিল যে, মানবতার হিদায়াত ও নাজাত লাভের সূর্য তথা সমগ্র বিশ্বজগৎ বিকাশিত আলোকবর্তিকা রাহমাতুল লিল আলামিনকে জাযিরাতুল আরবের দিকচক্র থেকে উদিত করবেন। যে আরব ছিল বিশ্বের সবচেয়ে অন্ধকার ভূভাগ। যাতে এমন প্রখর আলোক রশ্মির প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রশ্ন জাগে যে, রোম, পারসিক, অথবা ভারতীয় গোষ্ঠী যাদের উন্নতি, অগ্রগতি জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সভ্যতা সংস্কৃতি ও দর্শনে ছিল বিরাট খ্যাতি; তাদের মধ্যে এ বিশ্বজনীন পয়গাম্বরের আগমন না করে উম্মি আরবীদের উপদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কেন? এ প্রসংগে সাইয়েদ আলী নদভী বলেন, আরবদের হৃদয়পট ছিল একেবারে স্বচ্ছ নির্মল। পূর্ব থেকে কোন অংকিত ছবি কিংবা চিত্র এতে ছিল না; যা মুছে ফেলা কঠিন হত। কেননা, আরবদের অন্তর ও চিন্তা ভাবনা সে মামুলী হালকা রচনার সাথে পরিচিত, যা তাদের মূর্খতা অশিক্ষা ও বেদুঈন জীবনের সাথে জড়িত ছিল। যা ধুইয়ে মুছে ফেলা এবং তদস্থলে নতুন চিত্র অংকন করা খুবই সহজ ছিল। পক্ষান্তরে ঐসব শিক্ষিত জাতির মধ্যে গর্ব অহংকারের এমন কিছু মানসিক উচ্চাশা ও চিন্তাগত জটিলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যা দূর করা সহজ ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

তখনকার শাস্ত্রীয় পরিভাষায় আরবরা অকাট্য ও নির্ভেজাল মূর্খতার শিকার ছিল। আর এটাই ছিল সে ভুল যার প্রতি বিধান হতে পারত। অপরাপর সুসভ্য ও উন্নত জাতি গোষ্ঠী ছিল মিশ্রিত ও ভেজাল মূর্খতার ভিতর লিপ্ত; যার চিকিৎসা ও সংশোধন হওয়া এবং তাদের স্মৃতিপট ধুয়ে মুছে নতুন কিছু অংকন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এক কথায় বলতে গেলে, আরবরা তাদের আপন প্রকৃতিতে ছিল সমুজ্জল, মজবুত ও লৌহসম সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। যেকোন সত্য বা হক কথা তাদের উপলব্ধিতে ধরা না পড়লে, তারা তার বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে তুলে নিতে এতটুকুও ইতস্তত করত না। আর যে সত্য বা হক কথা স্বচ্ছ সুন্দর দর্পণের ন্যায় তাদের সম্মুখে ধরা পড়ত, তারা তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে প্রানের চেয়েও অধিক ভালবাসত এবং এর জন্য প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও এতটুকুও দ্বিধা করত না। এভাবে সর্বদিক বিবেচনায়, সত্য বিকাশে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের জন্য আরব ভূমিই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত।

কর্মে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়

নবুওয়াত পাবার পূর্বে ছেলেবেলা হতেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতার জন্য আল-আমীন বা বিশ্বাসী উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সৎ ও আমানতদার ছিলেন যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরোধিরাও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট মূল্যবান সম্পদ জমা রাখত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একান্ত সাদাসিধা ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনই সম্পদ জমাতেন না, বা কামনাও করতেন না। পরিবারের সবার সাথে হাসিখুশীভাবে মিশতেন। নিজের হাতে ঘরের কাজ করতেন। নারীর অধিকার ও মর্যাদার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।" অর্থাৎ পৃথিবীর সকল পুরুষরাই যেহেতু কোন না কোন নারীর সন্তান। অতএব নারীর মর্যাদা কোথায় গেল ভেবে দেখুন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন, "সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক, যে নিজের স্ত্রীর নিকট ভাল নয়।" মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনাদর্শ এরূপ বৈচিত্রময় ছিল যে, একদিকে জিহাদের ময়দানে তিনি শ্রমিকের মত মাটি কেটেছেন। প্রয়োজনবোধে আবার সেনাপতি ও সেনানায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। একদিকে বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে স্ত্রী-কন্যা-জামাই ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি স্বীয় দয়া-মায়া বিজড়িত কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছেন এবং অপরদিকে স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়ে

www.nagorikpathagar.org

নিবিষ্ট চিত্তে হেরা গুহায় কঠোর সাধনায় মগ্ন রয়েছেন। একদিকে মহাসেনাপতির দায়িত্ব পালনে বীরের মত জিহাদ করে শত্রুকে পরাস্ত, নত, পর্যুদস্ত করেছেন, অপরদিকে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করে বক্ষে স্থান দিয়েছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসেবে সত্যদ্রোহীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের খবর রেখেছেন, অপরদিকে খেজুর পাতার পূর্ণ কুটিরে বসে শত শত মাইল দূরবর্তী শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রেখেছেন। কারো সাথে প্রয়োজনে সন্ধি করেছেন, আবার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। একদিকে সমাজের ও পরিবারের নিত্য প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে তাদের খবর রেখেছেন, অপরদিকে অসীম রহস্যালোকে প্রবেশ করে আল্লাহ তা'আলার ঐশী যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহকর্মীদের প্রতি ছিলেন পরম অমায়িক" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)। "তাদের দান করতেন যথার্থ মর্যাদা আর ভালবাসতেন গভীরভাবে" (সূরা আনফাল ঃ ৬২-৬৪)। তাদের সাথে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও গর্ব অহংকার করতেন না, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী আদর্শ মানুষ। নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) সাথীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের এমন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, তারা প্রত্যেকেই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে একান্ত নৈকট্যের সম্পর্ক অনুভব করতেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান নীতি ছিল ধৈর্য, সবর ও সহনশীলতায় গাঁথা। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আচরণ ছিল রাগ-উত্তেজনা ও বিতর্ক বহির্ভূত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল দিয়ে মন্দের জবাব দিতেন। বিরোধিতা পরিহার করে শত্রুর উপকার ও কল্যাণ করতেন। পাশাপাশি তাদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করতেন। তাদের হীন ও ঘৃণ্য আচরণের মুকাবিলায় তাঁর অস্ত্র ছিল উদারতা ও ক্ষমা।

নেতা হিসেবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসাধারণ গুণাবলী হচ্ছে ঃ মহান স্রষ্টার প্রতি পরম ভালোবাসা ও ভরসা। জীবন, সময় ও সম্পদের সীমাহীন ত্যাগ (কুরবানী), দৃঢ়তা, অটলতা, আস্থাশীলতা, দূরদৃষ্টি, অন্তরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা। বীরত্ব, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা। কথা ও কাজের অসামান্য সামঞ্জস্য। ধৈর্য, সবর ও সহনশীলতা। মহত্ত্ব, উদারতা, বিশালতা, দয়া, অনুগ্রহ, বিনয় ও মহানুভবতা। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা। স্পষ্টবাদিতা, সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতা। সর্বোপরি মানুষের

www.nagorikpathagar.org

হিদায়াত ও কামিয়াবীর জন্য চরম পেরেশানী ছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ধর্ম প্রচারে ও মানুষের সাথে আচার ব্যবহারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ। বিশ্বনবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথায় ছিল সৌন্দর্য মাধুর্য কোমলতা ও আবেদনশীলতা। বুদ্ধিমত্তা, উত্তম ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি উপদেশ দিতেন। বিতর্কে না জড়িয়ে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে হৃদয়মন ছুয়ে যাওয়া ভাষায় দাওয়াত দিতেন। চাপ প্রয়োগ, জোর-জবরদস্তি না করে সুসংবাদ দান, সতর্ককরণের নীতি অবলম্বন করতেন। ভাল কথা দিয়ে, মন্দ কথার জবাব দিতেন। কঠোরতা বর্জন করে সহজ সরল পথ দেখাতেন। উত্তেজনা বর্জন করে শান্ত ধীর মস্তিষ্কে কর্ম সাধন করতেন। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিতেন। প্রতিশোধের নীতি বর্জন করে ক্ষমার নীতি গ্রহণ করতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে যারা সমবেত হয়েছেন তাদেরকে তিনি সূফী ও দরবেশ বানিয়ে দেননি, যোগী-সন্যাসীরূপে গড়ে তোলেন নি। নির্বোধ পর্যায়ের সরলও করেননি বা নিষ্ক্রীয় পর্যায়ের দুনিয়াত্যাগীও বানাননি। তিনি তাদের এমন শিক্ষা দিয়েছেন, তারা (সাহাবীরা) ছিলেন নির্ভীক ও সাহসী, সচেতন ও প্রাজ্ঞ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ, কর্মঠ ও নিরলস এবং অগ্রগামী ও দ্রুতগামী। তাঁরা পাদ্রী ও সাধুদের মত কর্ম বিমুখ ছিলেন না বরং সদা কর্মচঞ্চল ছিলেন তথা সব রকমের সদগুণাবলী ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এভাবেই সর্বোত্তম স্বভাবের মানুষগুলো উৎকৃষ্টতম প্রশিক্ষণ পেয়ে শ্রেষ্ঠতম সাংগঠনিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এবং অন্যতম সুন্দর নেতৃত্বের অধীনে সমবেত হয়ে এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁরা সংখ্যালঘু হয়েও সমগ্র আরব জাহানসহ বিশ্ব বিজয় করেছিলেন। অধ্যাপক হিট্টি একথাই বলেছেন তার ইতিহাস গ্রন্থে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাঁর অধীনস্থদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের অপরাধ শুধু মাফই করেননি, বরং কোন দিন তাদের কৈফিয়ত তলব করেননি। তাদের প্রতি কখনও রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি সদয় নয়, আল্লাহও তার প্রতি সদয় নন” (বুখারী ও মুসলিম)। “যে সৎকর্মের পেছনে আন্তরিকতা বেশি, তার জন্য আল্লাহর কাছে সওয়াবও বেশি” এটা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ।

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী

আল কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম ও গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে তা সূরা এবং আয়াত অনুসারে বর্ণিত হল ঃ

১। মুহাম্মদ ঃ ইমরান ১৪৪, আহযাব ৪০, মুহাম্মদ-১, ফাতাহ ২৯।

২। আহমদ ঃ সফ-৬,৩।

৩। আবদুল্লাহ ঃ হাদীদ - ৯, জীন-১৯, কাহফ-১।

৪। শাহেদ ঃ ফাতাহ-৯, আহযাব-৪৬, মুযযাম্মিল-১৫।

৫। মুবাশশির ঃ আহযাব-৪৬, ফাতাহ-৯, ফুরকান-৫৬।

৬। বাশীর ঃ নিসা-১৯, আ'রাফ-১৮, হূদ-২, সাবা-২৮, ফাতির-২৪।

৭। নাযীর ঃ বাকারা-১১৯, আনকাবূত-৫০, নিসা-১৯, আরাফ-১৮৮, হূদ-২, হিজর-৮৯, ফাতির-২৩, ২৪, ৩৭, ৪২, ৪৬, ফাতাহ-৯, যারিয়াত-৫০,৫১, মূলক-৮,৯,১৭,২৬, ফুরকান-৫৬, সাবা-২৮,৪৬, ছোয়াদ-৭, আহকাফ-৫।

৮। শহীদ ঃ বাকারা-১৪৩, নিসা-৪১, নাহল-৮৯, হজ্জ-৭৮।

৯। আবদুহু ঃ ফুরকান-১, বনী ইসরাঈল-১।

১০। মুযাককির ঃ আলগাশিয়া-২১, ১১।

১১। সিরাজুম মনীর ঃ ফাতির-৪৬।

১২। দা'য়ী ইলাল্লাহ ঃ ফাতির-৪৬।

১৩। হাক্কুন ঃ ইউনুস-১০৮।

১৪। আযীযুন ঃ তাওবাহ-১২৮।

১৫। রাউফুন ঃ তাওবাহ-১২৮।

১৬। রাহীম ঃ তাওবাহ-১২৮।

১৭। আমীন ঃ দুখান-১৯।

১৮। নূর ঃ মায়েদা-১৫।

১৯। নি'মাতুন ঃ বাকারা-২৩১, নামল-৮১।

২০। হাদী ঃ রূম-৫৩।

২১। রাহমাতুন ঃ আম্বিয়া-১১৭।

www.nagorikpathagar.org

২২। তোয়াহা ঃ তোয়াহা-১।

২৩। ইয়াসীন ঃ ইয়াসীন-১।

২৪। মুযযাম্মিল ঃ মুযযাম্মিল-১।

২৫। মুদ্দাসসির ঃ মুদ্দাসসির-১।

২৬। মুনযির ঃ নামল-৯২।

২৭। খাতামুন নাবিয়্যীন ঃ আহযাব ৪০।

২৮। নবী ঃ ইমরান-১৬১, মায়েদা-৮১, আ'রাফ-১৫৭, ১৫৮, আনফাল-৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭০, তাওবা-২,৬১,৭৩, ১১৩, হুজুরাত-২, আহযাব-১,২৮,৩২,৩৮,৪৬, ফাতির-৫০, ৫২, তাহরীম-১, ৩, ৮, ৯, তালাক-১, মুমতাহিনা ১২।

২৯। রাসূল ঃ বাকারা ১৪২, ২৫০, ইমরান-২৩, ৮১, ৮৬, ১০১, ১৩২, ১৫৩, ১৭২, ১৭৯, ১৮৩, নিসা-১৪, ৫২, ৬১, ৬৪, ৬৯, ৮০, ১০০, ১১৫, ১২৬, ১৭০, মায়েদা-১৫, ৩২, ৪১, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৮২, ৯২, ৯৯, ১৪০, আ'রাফ ১৫৭, ১৫৮, আনফাল-১, ১২, ২৪, তওবা-১, ২, ৭, ১৬, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৩, ৫৪, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০৫, ১০৭, ১২৮, নাহল-১১৩, বনী ইসরাঈল-৯৩, হজ্জ-৭৮, মু'মিন-৭৮, যুখরুফ-২৯, আনকাবূত-১৮, হুজুরাত-১, ৩, ৮, ১৪, ১৫, আলফাতাহ-৯, ১২, ১৩, ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৯৬, আহযাব-৬, ২১, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪০, ফাতির-৫২, ৫৭, ৭১, দুখান-১৪, ১৯, হাদীদ-৭, ৮, ২৯, মুজাদালা-৫, ৮, ৯, ১২, ১৩, ২০, ২২, মুহাম্মদ-৩২, ৩৩, মুনাফিকুন- ১, ৭, ৮, তাগাবুন-৮, ১২, ফুরকান-৭, ২৭, ৩০, ৪১, ত্বলাক-১১, জুমাহ-২, ছফ-৯, ১১, ৬৬, হাশর-৪, ৬, ৭, ৮, মুমতাহিনা-১, জীন-২২, ২৮, হাক্বক্বাহ-৪২, নূর-৪৮, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬২, ৬৩।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা বা মি'রাজ

মি'রাজের ঘটনার ইঙ্গিত বা বর্ণনা আল কুরআনে এসেছে। মহিমান্বিত তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত (সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১)। ইসরা অর্থ রাতের ভ্রমণ। আর মি'রাজ অর্থ আরোহণের সিঁড়ি। ইসরা বা মি'রাজ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নজিরবিহীন মর্যাদা, সম্মান ও বিস্ময়কর ঘটনা; যাতে মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে মক্কার মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা এবং তথা হতে ঊর্ধ্ব জগৎ পর্যন্ত স্বশরীরে, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি দেখাবার জন্য ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন। এ বিস্ময়কর ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা

www.nagorikpathagar.org

নাজমে উল্লেখ রয়েছে এবং বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে এ ঘটনাটি হিজরতের এক বা দেড় বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। সেদিন রজব মাসের ২৭ তারিখ ছিল বলে প্রসিদ্ধ মত পাওয়া যায়। বিশ্বনবীর হাদীস ও জীবন চরিত গ্রন্থাবলীতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ফরকানী (রহ.) বলেন, মি'রাজের ঘটনাটি ৪৫ জন সাহাবায়ে কেরাম হতে নকল করা হয়েছে।

রাতের বেলা হযরত জিব্রাঈল (আ.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত 'বোরাক' এর উপর আরোহণ করিয়ে নিয়ে যান। সেখানে তিনি পূর্বের নবীদের সাথে নামায আদায় করেন। তবে কোন কোন বর্ণনা মতে ফিরে আসার সময় সেখানে নামায আদায় করেছিলেন। এরপর জিব্রাঈল (আ.), তাঁকে উর্ধ্ব জগতে নিয়ে যান এবং উর্ধ্ব জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত মহামান্য নবী রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বোচ্চ উর্ধ্বলোকে উপনীত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে উপস্থিত হন এবং এ উপস্থিতির সময় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত ছাড়াও তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের হুকুম দেয়া হয়। অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখান হতে মসজিদুল হারামে ফিরে আসেন। পরের দিন তিনি এ ঘটনার কথা লোকদের নিকট বর্ণনা করলে, মক্কার কাফেররা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। এতে কতিপয় মুসলমানের ঈমানও নড়বড়ে হতে দেখা যায়।

সূরা বনী ইসরাঈলে ইসরার ঘটনাটি মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট। পবিত্র সে মহান সত্তা, যিনি নিজের বান্দাকে রাতের এক অংশে মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত ভ্রমণ করান। যার চতুর্পাশকে আমি বরকতময় করেছি এ উদ্দেশ্যে, যেন আমার নিদর্শনাদি তাঁকে দেখিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব দেখেন ও শোনেন (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১)। আর যে দর্শনই আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবলমাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য দেখিয়েছি। (বনী ইসরাঈল)। সূরা আল নাজমের মধ্যে উর্ধ্ব জগৎ পর্যন্ত আরোহণের উল্লেখ রয়েছে। এ সূরায় বলা হয়েছে, অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, এরপর ঝুঁকে এলেন, তারপর রয়ে গেল (উভয়ের মধ্যে) দু'ধনুক; পরিমাণ বরং তার চেয়েও কম ব্যবধান। অতঃপর আল্লাহ তার বান্দার উপর ওহী নাযিল করেন- যে অহী প্রেরণ করলেন। সে বান্দা যা কিছু দেখেছেন তার অন্তর মিথ্যা বলেনি। তবে কি তোমরা এ বিষয়ে তাঁর সাথে ঝগড়া করছ? যা সত্যই ঘটেছে। নিশ্চয়ই সে তাকে আর একবার দর্শন করেছেন, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। (সূরা আন নাজম ৮-১৮)

www.nagorikpathagar.org

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত। গভীর শান্ত প্রকৃতি। ঘন অন্ধকারের কোলে মাথা রেখে আকাশও ঘুমিয়ে পড়েছে। নিথর, নির্জন চারিধার। মধ্য রাতের প্রকৃতি স্থির, নিশ্চুপ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বা চত্তরে (কারো কারো মতে উম্মে হানীর ঘরে) ঘুমে বিভোর। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন কে যেন প্রাণ উন্মাদ করা স্বরে ডাকছে, মুহাম্মদ! ডাক কানে যেতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখেন জিব্রাঈল (আ.) মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করেলেন এবং তার পবিত্র কলব জমজমের পানিতে ধুয়ে তাতে হিকমত ও ঈমান পুরে দিয়ে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এটা চতুর্থবার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা। এটা করার কারণ, যেন তিনি পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করে আলমে মালাকুতে পৌঁছাতে পারেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) সাদা বর্ণের একটি বাহন সামনে নিয়ে এলেন। এর নাম বোরাক। বোরাক খচ্চরের চেয়ে নীচু এবং গাধার চেয়ে কিছুটা উঁচু। সে পদনিক্ষেপ করতে পারে দৃষ্টির শেষ সীমানায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে সওয়ার করানো হয়েছিল এবং জিব্রাঈল (আ.) আমাকে আকাশের উপর নিয়ে গিয়েছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বোরাকের পাদানীতে কদম মুবারক রাখতে উদ্যত হলেন তখন বোরাক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বোরাককে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে বোরাক তোমার কি হয়েছে? তুমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছো কেন? সারকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ তো এর পূর্বে তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করেনি। একথা শুনে বোরাক শান্ত হয়ে গেল এবং যমীনের উপর নতজানু হল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের পিঠে তুলে নেয়ার জন্য বোরাক প্রস্তুত হল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠে চড়ে বসলেন। বোরাক বিদ্যুৎ গতিতে গন্তব্য পথে ছুটে চলল। পথে খেজুর বাগান সমৃদ্ধ এলাকায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপনীত হলেন; তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.), মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, এখানে দু'রাকাত নামায আদায় করে নিন। জায়গাটির নাম ইয়াসরীব। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় মদীনা মুনাওয়ারা।

ভ্রমণ পথে মাদায়েন এবং হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম স্থানে পৌঁছলে, সেখানেও হযরত জিব্রাঈল (আ.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'রাকাত

www.nagorikpathagar.org

নামায আদায় করতে বললেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন একপাশে এক বৃদ্ধা রমণী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা, কে?' উত্তরে জিব্রাঈল (আ.) বললেন, সামনে এগিয়ে চলুন। কিছু দূরে আসার পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন একজন লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিব্রাঈলকে (আ.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। 'ওনি কে?' জিব্রাঈল (আ.) বললেন, সামনে চলুন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে একটি জামাত দেখতে পেলেন। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম প্রদান করছিলেন। তাদের সালামের বাক্যগুলো ছিল অতি সুন্দর। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আওয়্যাল, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আখের, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাশর। জিব্রাঈল (আ.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে রাসূল আপনি এদের সালামের জবাব দিয়ে ধন্য করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের সালামের জবাব দিলেন।

এবারে জিব্রাঈল (আ.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক পূর্বে করা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, ওই বৃদ্ধা রমণী হচ্ছে দুনিয়া। তার আয়ু বেশী দিন নেই। কেননা বৃদ্ধা রমণীর আয়ু যৎসামান্যই বাকী থাকে। আর আপনাকে যে লোকটি ডাক দিল, সে হচ্ছে ইবলীস শয়তান। আপনি যদি তার ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখিরাতের উপরে প্রাধান্য দিত এবং শয়তান তাদেরকে গুনাহ্‌গার করে ফেলত। আর ঐ জামাতে যারা আপনাকে সালাম দিয়েছে তারা হচ্ছেন- হযরত জিব্রাঈল (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)। এরপর বোরাক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বায়তুল মোকদ্দাসে পৌছল এবং তিনি মসজিদের দরজার বেষ্টনিতে বোরাককে বাধঁলেন। বর্তমানে উক্ত দরজার নাম 'বাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এরপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। দু'রাকাত নামায ছিল তাহিয়াতুল মসজিদ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনে এখানে ফিরিশতাকুল একত্রিত হয়েছিলেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সমস্ত নবীদের রূহসমূহ স্বআকৃতি সম্পন্ন হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা এখানে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পেশ করলেন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পেশ করলেন। সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিলেন। এরপর আযান হল। একামতও হল। সকলেই ইমামতির জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সামনে এগিয়ে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি করলেন আর আম্বিয়া কেরাম সকলেই তাঁর পিছে জামাতে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদের বাহিরে এলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর সামনে এক পেয়ালা দুধ এবং এক পেয়ালা শরাব পেশ করলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ গ্রহণ করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, 'আপনি ফিতরত বা স্বাভাবিকতাকেই পছন্দ করলেন'।

বর্ণিত আছে এ সময় আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), এবং হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন। তাদের প্রশংসা এবং খোতবা ঐ সমস্ত ফযীলত, কারামত ও মু'জেযাসমূহের বর্ণনা সম্বলিত ছিল; যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ধন্য করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার শুকুর গুজারীর জন্য তাঁদের যবান মুবারক খুলে দিয়েছিলেন। এরপর খাতেমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আপনারা সকলেই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের শানে হামদ, ছানা পেশ করেছেন। এখন আমিও তার উদ্দেশ্যে হামদ, ছানা পেশ করছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে সমগ্র আলমের রহমতস্বরূপ, সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন। যার মধ্যে সবকিছুই সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমার উম্মতকে মধ্যম উম্মত বানানো হয়েছে। মর্যাদার দিক দিয়ে তারাই প্রথম উম্মত আর আগমনের দিক দিয়ে সর্বশেষ। যিনি আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং আমার দায়িত্বের বোঝাকে সহনীয় করে দিয়েছেন। আমার নামের আলোচনা উন্নত করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে নবুওয়াতের সিলসিলার উদ্বোধনকারী এবং সমাপ্তকারী বানিয়েছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত প্রশংসা বাণী শোনার পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) অন্যান্য আম্বিয়া কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের সকলের চেয়ে উত্তম। (মাদারেজুন নবুওয়াত, ২য় খ)। এরপর জিব্রাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাথে নিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশ পানে ছুটে চলেন। মুহূর্তের মধ্যে তারা প্রথম আসমানের প্রবেশ দ্বারে এসে উপনীত হন। বন্ধ

www.nagorikpathagar.org

দরজায় আঘাত করতেই ভেতর থেকে সাড়া মিলে! প্রশ্ন ভেসে আসে' 'কে?' জিব্রাঈল (আ.) উত্তর 'করেন, 'আমি জিব্রাঈল'। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, তোমার সাথে কে? তিনি কি আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন। জিব্রাঈল (আ.) উত্তর দেন, ইনি আল্লাহর রাসূল, মুহাম্মদ। জিব্রাঈল (আ.) এর উত্তর শোনার সাথে সাথে দরজা খুলে যায়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সাথে জিব্রাঈল (আ.)। দরজার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখিয়ে জিব্রাঈল (আ.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'ইনি আপনার আদি পিতা হযরত আদম (আ.)। এঁকে সালাম করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানের সাথে তার পূর্ব পুরুষকে সালাম জানান। হযরত আদম (আ.), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্নেহভরে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'মুবারক হো, হে আমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।'

এরপর সে স্থান ছেড়ে জিব্রাঈল (আ.) কে নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছেন। সেখানে হযরত ঈসা (আ.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে ন্যায়দর্শী ভাই আমার। খোশ আমদেদ। স্বাগতম। এমনিভাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে একে সবগুলো আসমান অতিক্রম করেন। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে আন্তরিকতার সাথে সালাম বিনিময় হয়। মিশকাত শরীফে আছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইউসুফ (আ.) এর রূপ লাবণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ.) কে দেখে মনে হল যেন সৌন্দর্যের একটা বিরাট অংশ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাঁকে দান করেছেন। তিবরানী এবং বায়হাকীতেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইউসুফ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দর'। অন্যান্য মানুষের সাথে তাঁকে তুলনা করলে বলতে হবে রাতের আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের যে সৌন্দর্য, তিনিও তেমনি সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন।

চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ.) এর সাথে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চম আসমানে দেখা হয় হযরত হারুন (আ.) এর সাথে। তিনি সালাম বিনিময়ের পর ফিরিশতারা মারহাবা, শুভাগমন বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি ৬ষ্ঠ আসমানে উপনীত হন। জিব্রাঈল (আ.) এখানেই হযরত মূসা (আ.) এর সাথে বিশ্বনবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচয় করিয়ে দেন। উভয়ের মধ্যে সালাম ও প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময়ের পর

www.nagorikpathagar.org

জিব্রাঈল (আ.), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আরও ঊর্ধ্ব আকাশে রওনা হন।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি হচ্ছে সৃষ্টজীবের কর্ম তৎপরতা এবং ইলমের সমাপ্তিস্থল। আল্লাহ তায়ালার হুকুম এখানেই নাযিল হয়। এখান থেকে যাবতীয় আহকাম গ্রহণ করার জন্য ফিরিশতারা অপেক্ষমান থাকেন। এ স্থান অতিক্রম করার অধিকার ও ক্ষমতা কারো নেই। সবকিছু এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। ফেরেশতারা নিম্নজগৎ থেকে ঊর্ধ্ব জগতে যা কিছু নিয়ে যান এবং ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে হুকুম ও বিধান সংক্রান্ত যা কিছু নিয়ে নিম্ন জগতে আবতরণ করেন, এ সবের সংযোগস্থল হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা। মাখলুকের দিক থেকে কেউই এ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি। কেবল বিশ্বনবীই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ব্যতিক্রম। এ স্থানে আসার পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) থেমে যান এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে জিজ্ঞাসা করেন , এটা কোন জায়গা এবং আপনার পৃথক হওয়ার কারণ কি? তিনি আরও বলেন, এমন স্থানে তো কোন বন্ধু, অন্য বন্ধুকে একা ফেলে যেতে পারে না। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বলেন, আমি যদি আর এক কদম সামনে অগ্রসর হই, তাহলে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাব।

সিদ্‌রাতুল মুনতাহা থেকে প্রবাহিত হয়েছে চারটি নহর বা নদী। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর হাদীস থেকে বুঝা যায়, উক্ত চারটি নহরই জান্নাতের। উক্ত নহরসমূহ জান্নাতের-একথার অর্থ জান্নাতের কল্যাণ ও পরিণাম, যা চিরস্থায়ী হবে। জান্নাতের নহর মানেই জান্নাতের অস্তিত্ব থেকে নির্গত নহর। নহরসমূহের অবস্থা বেহেস্তি বস্তুর অবস্থার মতই রহস্যময় ও সূক্ষ্ম, যা বুঝা দুঃসাধ্য। এছাড়াও জান্নাতে পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নহর প্রবহমান। কুরআন মজীদে এ রকমই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সপ্তম আকাশ পেরিয়ে একটি নহর দেখতে পেলাম। ইয়াকুত ও যমরুদ পাথরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে নহরটি। তারপাশে পড়ে থাকা পেয়ালাগুলো সোনা, রূপা, ইয়াকুত, মোতি এবং যবরযদের। তাঁর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। এটা লক্ষ্য করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আ.) কে বলেন, হে জিব্রাঈল! এটা কি? তিনি উত্তর দিলেন, এটা হাউযে কাউছার, আল্লাহ তা'আলা এটা আপনাকে দান করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে

www.nagorikpathagar.org

প্রবাহিত একটি নহর রয়েছে। যার নাম সালসাবিল। এ সালসাবিল নহর দু'টি ধারা থেকে নেমে এসেছে। একটির নাম কাউসার আর অপরটির নাম রহমত। গুনাহগার বান্দা জাহান্নামে জ্বলে পুড়ে যখন কালো হয়ে যাবে এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াতে তারা যখন জাহান্নাম থেকে বের হবে, তখন এ নহরের পানি দিয়ে তাদেরকে গোসল করানো হবে। তারপর তারা পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

সিদ্‌রাতুল মুনতাহা এমন এক স্থান, যার সংজ্ঞা নির্ণয় ও বর্ণনা প্রদান মনুষ্য জ্ঞান ও অনুমানের অতীত। এখানে আসার পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে শরাব, দুধ ও মধুর পেয়ালা পুনরায় হাজির করা হয়। এবারও তিনি দুধই পছন্দ করেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বায়তুল মামুর দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারপর আমার সামনে বায়তুল মামুর উপস্থিত করা হয়। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বায়তুল মামুরের মধ্যে হয়তো বা আরও অনেক আলম বা জগৎ বিদ্যমান ছিল এবং সে সমস্ত আলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার মত সময় ও শক্তি তাঁর ছিল না। তাই এ সকল থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হয় এবং সবকিছু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টির অধীনে নিয়ে আসা হয়। তিনি সবকিছুই ভালভাবে দেখে নেন।

বাইতুল মামুর ঐ মসজিদ যা কা'বার ঠিক বরাবর উপরে আকাশে অবস্থিত। বাইতুল মামুর যদি পৃথিবীতে পতিত হত, তবে কাবা গৃহের উপরেই পড়ত। পৃথিবীতে কা'বার যে মর্যাদা আকাশে বাইতুল মামুরের মর্যাদা ঠিক তেমনই। ফিরিশতরা ঊর্ধ্বাকাশে এ ঘরকে তওয়াফ করে এবং তার দিকে ফিরে নামায আদায় করে। যেমনভাবে দুনিয়ায় কা'বা গৃহের তওয়াফ করা হয় এবং তার দিকে ফিরে নামায আদায় করা হয়। দৈনিক সত্তর হাজার ফিরিশতা বাইতুল মামুর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসে। যিয়ারত শেষে তারা ফিরে গেলে, আর কোন দিনই তাদের যিয়ারতের সৌভাগ্য হয় না। এমনিভাবে দৈনিক নতুন ফিরিশতাদের আসা যাওয়া চলছে। বাইতুল মামুর এর সৃষ্টির সময় থেকেই এ নিয়ম জারী আছে। এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের দলিল। আল্লাহ তা'আলা এত অধিক সংখ্যক ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন যা কল্পনা করা অসম্ভব। হাদীস শরীফে এসেছে, আসমান যমীনের এমন কোন জায়গাও বাকি নেই, যেখানে ফিরিশতারা সিজদা করেননি। আর সাগর বক্ষের এমন কোন বিন্দু ও পানি নেই, যার উপর আল্লাহ তা'আলার কোন না কোনো ফিরিশতা নিয়োজিত রাখেননি।

www.nagorikpathagar.org

হাদীস শরীফে এসেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি যখন সপ্তম আকাশে আরোহণ করলাম, তখন হযরত ইব্রাহীম খলিল (আ.) কে বাইতুল মামুরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে এক বিরাট জামাত উপবিষ্ট ছিল। আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনিও তাঁর উত্তর দিলেন। সেখানে আমি দেখলাম, আমার উম্মত দু'ধরনের। একদল সাদা পোশাক পরিহিত। তাঁদের এ সাদা পোশাক কাগজের মত মিহি। অপর জামাতটি ময়লা পোশাক পরিহিত। সাদা পোশাক পরিহিত লোকগুলো বাইতুল মামুরের নিকটে আমার সঙ্গে মিলিত হল। আর ময়লা কাপড় পরিহিত লোকগুলো রইল পিছনে। আমি সাদা পোশাক পরিহিত লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাইতুল মামুরে নামায আদায় করলাম। পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতা সুন্দর আমলের ইঙ্গিতবহ। হাদীস শরীফে এসেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর কাছে এমন একদল লোক দেখতে পেলাম, যাদের দেহের বর্ণ কাগজের মত সুন্দর এবং শুভ্র। সেখানে আরেকদল লোক ছিল। যাদের দেহের বর্ণ অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণ। অতঃপর তারা একটি নহরের কাছে এল এবং সেখানে গোসল করল। তাতে তাদের কালিমা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর তারা আরেকটি নহরের কাছে এল এবং পুনরায় সেখানে গোসল করল। তাতে তাদের দেহমন পরিপূর্ণভাবে শুভ্র সুন্দর লোকদের ন্যায় হয়ে গেল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা বর্ণের লোকদের সম্পর্কে, জিব্রাইলকে (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা? আর কালো বর্ণের লোকগুলোই বা কারা? আর হেলান দিয়ে বসে আছেন যিনি, তিনি কে? নহর দু'টিই বা কিসের, যার পানিতে লোকগুলো গোসল করল? হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, সাদা বর্ণের পোশাক পরিহিত লোকগুলো আপন ঈমানকে অন্যায়ের কালিমা দ্বারা কলংকিত করেননি। কৃষ্ণবর্ণের লোকগুলো তাদের সৎ কর্মকে, অসৎ কর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলেছিল। কিন্তু পরে তারা তওবা করলে আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। আর নহরগুলো হচ্ছে- প্রথমটি নহরে রহমত, দ্বিতীয়টি নহরে নিয়ামত। আরেকটি নহর হচ্ছে, শরাবান তহুরার নহর। কুরআন পাকে এর কথা বলা হয়েছে।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারী আরও উপরে উঠল। এত উপরে উঠল যে, সেখানে কলমের আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। কলমের মাধ্যমে ফিরিশতারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর লিপিবদ্ধ করছিলেন। তকদীরে এলাহী চিরন্তন, কিন্তু তার লিখন ক্রিয়াটি অশাশ্বত। লওহে মাহফুযে সৃষ্ট

জগত সম্পর্কে সকল কথা লেখা হয়েছে; আসমান এবং যমীন সৃষ্টিরও বহু আগে। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে, কলম তা লিপিবদ্ধ করে শুকিয়ে গেছে। এ হাদীসখানা লওহে মাহফুযের লিখা সম্পর্কিত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেয়েছিলেন, সে লেখার আওয়ায। ফিরিশতারা মূল লিপি থেকে অনুলিপি করছিলেন। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়। তিনি জান্নাতকে দেখতে পেলেন আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রকাশস্থলরূপে, আর জাহান্নামকে দেখলেন আযাব ও গযবের জায়গা হিসেবে। জান্নাত উন্মুক্ত ছিল। জাহান্নাম ছিল বন্ধ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালসাবিল নামক নহরে গোসল করলেন, তাতে তিনি যাহের ও বাতেন হুদুদ বা সীমানার মলিনতা থেকে পাক সাফ হয়ে গেলেন এবং এভাবে তাঁকে পূর্বাপর সমস্ত ক্রটি ও ক্ষমার তাজ দান করা হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বড় বড় নিদর্শন দেখা শেষ করেন, তখন তাঁর জন্য নৈকট্য, বিশেষত্ব ও বজুর্গীর মুহূর্ত উপস্থিত হয়। শেষ সীমা পর্যন্ত উপনীত হতে হতে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানে এসে তিনি হন সম্পূর্ণ একা। ফিরিশতা বা মানুষ কেউ তার সাথে ছিল না। কিন্তু তখনও আল্লাহ ও নবীর মাঝে বিদ্যমান ছিল সত্তর হাজার নূরের পর্দা। পর্দাগুলো ছিল এক একটি এক এক রকমের। একেকটি পর্দার দূরত্ব ছিল পাঁচশ বছরের রাস্তার সমান। আর সে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করা ছিল কঠিন। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের সাহায্যে তিনি সে পর্দাগুলোও অতিক্রম করেন। এ মাকামে উপনীত হওয়ার পর এক বিশেষ ধরনের হয়রানী ও স্থবিরতা তাঁকে গ্রাস করে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার জালালাত ও আযমতই শুধু অনুভব করেন। আওয়ায আসে, 'হে মুহাম্মদ থামুন, আপনার প্রভু প্রতিপালক এখন সলাত প্রেরণ করছেন। শব্দ শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করেন, এটা তো আবু বকরের কণ্ঠ স্বরের মত মনে হচ্ছে। চিন্তা করেন, আবু বকরের কণ্ঠ কোত্থেকে এল। পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনে তিনি এক রকম স্বস্তি অনুভব করেন। এতে ভীতিপ্রদ অবস্থাটা দূর হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়, হে সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ, হে আহমদ, হে মুহাম্মদ, আপনি নিকটবর্তী হোন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আমার প্রভু আমাকে এত কাছে নিয়ে নিলেন এবং আমি আমার প্রভুর এমন নিকটবর্তী হয়ে গেলাম, যেমন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন এবং এত কাছে চলে এলেন যে, তাহল ধনুকের দু'মাথা বরাবর দূরত্ব অথবা এর চেয়েও কম দূরত্ব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন। কিন্তু আমার সে রকম চেতনা ছিল না যে, জবাব দেই। এরপর আমাকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবকিছুর জ্ঞান দেয়া হল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিভিন্ন ধরনের ইলেম শিক্ষা দেন। এক ধরনের ইলেম এমন যে, যা কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতিও নেয়া হয়েছে। কেননা এটি এমন একটি বিষয়, যা কোন সৃষ্টিই সহ্য করতে পারবে না। আরেক প্রকারের এলেম এমন ছিল; যা মানুষের কাছে প্রকাশ করার বা না করার ব্যাপারে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আর এক প্রকারের এলেম, যা উম্মতের প্রত্যেকটি খাস ও আম ব্যক্তির কাছে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিবেদন করেন; হে আমার প্রভু, আপনার সকাশে উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তে আমার মধ্যে অস্থিরতা এসে গিয়েছিল। এ সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, আমার প্রভু এবং প্রতিপালক সলাত প্রেরণ করছেন। যা আবু বকরের কণ্ঠ স্বরের মত মনে হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এখানে আবু বকর কেমন করে এল? আর আমার প্রভু এবং প্রতিপালক সলাত আদায় করবেন কেন? তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা এল, অন্যের জন্য সলাত আদায় করা থেকে আমি অমুখাপেক্ষী। আমি আরও ঘোষণা দিচ্ছি যে, 'আমার পবিত্রতা এবং আমার রহমত, আমার গযবের উপর অগ্রগামী। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা তিলাওয়াত করুন, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন ঐ সত্তা যিনি আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাবৃন্দও; বিশ্বাসীদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। আর তিনি মু'মিনদের ব্যাপারে বড়ই দয়ালু। এখানে সলাত বা দরূদ, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর প্রেরণ করেন। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রহমত তাঁর উপর নিরন্তর বর্ষিত হতে থাকে। মহান আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতটাই ভালবাসেন।

এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এর আওয়ায শ্রবণ প্রসংগে জবাব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা মেহেরবানী করে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর প্রিয় সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.) এর কণ্ঠ স্বরের অনুরূপ কণ্ঠ স্বর শুনিয়ে দিলেন। যাতে প্রিয় পরিচিত জনের গলার আওয়ায শুনে অপরিচিত স্থানের বিস্ময়

www.nagorikpathagar.org

ও বিহ্বলতা কাটিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্তি লাভ করতে পারেন এবং নিজ সত্তায় উজ্জীবিত হতে পারেন। ঐ সময় আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি যখন আপনার ভাই মূসা (আ.) এর সঙ্গে কালাম বা আলাপ করতে চাইলাম, তখন তার মধ্যে সাংঘাতিক ভীতি বিরাজ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? তখন মূসা (আ.) তার নিজস্ব পরিচিত জিনিসটির কথা শুনে স্তম্বিত হন। আপনার ব্যাপারেও আমি চাইলাম যে, পরিচিত জনের কণ্ঠস্বর শুনে আপনি আপনার নিজের মধ্যে ফিরে আসুন। তাই আবু বকরের (রা.) আওয়ায আপনাকে শুনিয়ে দিলাম।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর এমন এক বিশাল ব্যাপার আমার দৃষ্টিগোচর হল, যার বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। তারপর আরশ থেকে এক ফোঁটা পানি আমার নিকটবর্তী হল এবং তা আমার মুখে পতিত হল। আমি তার স্বাদ নিলাম। মনে হল, এর চেয়ে মিষ্টি কিছু কেউ কোন দিন আস্বাদন করেনি। এতে করে পূর্বাপর যাবতীয় খবর আমার জানা হয়ে গেল এবং আমার কলব উজ্জ্বলতর হল। আরশের নূর আমার চোখকে আচ্ছাদিত করল। ঐ সময় সমস্ত কিছুই অন্তরের চোখ দিয়ে দেখলাম। আর আমার পেছন দিকেও ঐ রকম দেখতে লাগলাম, যেমন সামনে দেখি।

প্রত্যেক মাখলুকের জন্যই নূর ও যুলমাতের মাকাম রয়েছে। অনুভূতির এবং মারেফাতের এক নির্দিষ্ট আকার রয়েছে। প্রত্যেক মুকার্‌রবীন ফিরিশতা, যারা আল্লাহ তা'আলার আরশের আশপাশে অবস্থান করেন, তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার কিবরিয়া, জালালত, আযমত ও হায়বতের নূর দ্বারা আচ্ছাদিত। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীই হেজাব বা পর্দা। আর ফিরিশতারা মাহজুব বা আচ্ছাদিত। এ সকল ফিরিশতাদের মর্যাদাও ভিন্ন ভিন্ন। তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট মাকাম ও পদমর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টি নেয়ামত দানকারীর নেয়ামত দর্শন দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রত্যেক হালপ্রাপ্ত লোক বিভিন্ন হালের দর্শন দ্বারা আচ্ছাদিত। সরঞ্জাম গ্রহণকারী সরঞ্জাম দর্শনের দ্বারা আচ্ছাদিত। কেউ আচ্ছাদিত বৈধ কামনা দ্বারা। কেউবা অবৈধ কামনা দ্বারা। কেউ আচ্ছাদিত গুনাহ ও অসুন্দরের পর্দা দ্বারা। কেউ আচ্ছাদিত সম্পদ, সন্তান অথবা অন্যান্য পার্থিব সরঞ্জাম দ্বারা। কেউ আচ্ছাদিত পৃথিবীর ভোগ বিলাস দ্বারা। আবার কেউ আচ্ছাদিত স্রষ্টার কুদরত দ্বারা।

মানুষের স্বভাব হচ্ছে যে, উঁচু মর্যাদায় অবস্থান করলে সে মর্যাদা সম্পর্কে যেমন

www.nagorikpathagar.org

সচেতন থাকে তেমনি আরও অধিক মর্যাদার অভিলাষী হয়। তাই দেখা যায়, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ পাকের দরবারে কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করলেন, তখন দীদারে এলাহীর বাসনা প্রকাশ করলেন। এটা এক প্রকারের আনন্দ, যাতে মানুষ আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। কেননা, নৈকট্যের মাকামে আদবের প্রতি লক্ষ্য কমই থাকে। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নৈকট্যের মাকামে পূর্ণ কৃতকার্য হলেন, তখন তাঁর যাবতীয় হক পূর্ণভাবে আদায় করলেন। যে মাকামে তিনি উন্নীত হয়েছেন, সেখানেই শান্ত এবং স্থির থেকেছেন। অতিরিক্ত কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবে একে একে মর্যাদার সকল মনযিল অতিক্রম করেছেন। এ অভিযাত্রার সবচেয়ে উঁচু মর্তবা হচ্ছে দীদারে বারী বা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। এ মাকামে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে সুস্থির রেখেছেন। এটা সর্বোচ্চ মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান, 'তিনি যা দর্শন করলেন, তাঁর অন্তর সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি। দেখা এবং উপলব্ধি করা একটি অপরটির সহায়ক হয়েছে। দর্শন যা পেয়েছে, চোখের দৃষ্টি তাকে ধারণ করেছে, আর চোখ যা দর্শন করেছে অন্তর তাকে অনুভব করেছে, বিশ্বাস করেছে। সবকিছুই সঠিকরূপে গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের উপর অগ্রাধিকার লাভ করেছেন। সে জন্যে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম (আ.) তাঁর উপর গৌরব (সৌন্দর্যমণ্ডিত ঈর্ষা) করতে লাগলেন। তিনি দুনিয়া এবং আখিরাতে সীরাতুল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে গেলেন নবী রাসূলদের শিরোমণি শ্রেষ্ঠ নবী।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজিদে কসম করে বলেন, 'হে সাইয়্যেদে আলম! প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ, নিশ্চয় আপনি পয়গাম্বরগণের মধ্যে একজন-যিনি সীরাতুল মুস্তাকিমের উপর রয়েছেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল'। এর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, অতঃপর তিনি তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন। ওহী শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যত প্রকারের ইলম, মারেফাত, হাকীকত, সুসংবাদ, ইশারা, তথ্য, তত্ত্ব, নিদর্শন, কারামাত এবং কামালত আছে সব এ ওহী শব্দটির গণ্ডিতে আবদ্ধ। উপরোল্লিখিত

www.nagorikpathagar.org

সকল বিষয়ের আধিক্য এবং বিশালতা সবই এর ভেতরে রয়েছে। কেননা, এখানে ওহী বলে সেগুলোকে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়নি। কারণ, এর অন্তর্নিহিত ভাব আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং অন্যরা ততটুকুই জানতে পারে, যতটুকু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। কেউ আবার তার পবিত্র রূহের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে বাতেনী ইলম হাসিল করতে সমর্থ হয়েছেন। আউলিয়া কেরাম (রহ.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগ্যতাকে ও আভিজাত্যকে অধিকার করে নিয়েছেন। কেবল তারাই এ ধরনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ নিগূঢ় তত্ত্ব অর্জনে সফল হয়েছেন। পূর্ণ শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে, আল্লাহ্র হুকুম ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের শতভাগ পালনের মাধ্যমে; মহামানবরা সে নূরের ও কুদরতের ছিটে ফোঁটা অর্জন করতে পেরেছেন এবং এখনো পারছেন। পরকালের মুক্তির জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় নয়। শরিয়তের পূর্ণ বাস্তবায়নই মুসলমানদের মূল্য উদ্দেশ্য।

অতঃপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরশে আযীমে পৌছেন, আরশ তখন তার জালালী বিস্তারকে সংকুচিত করে আরজ করল, আপনিই তো সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আহাদিয়াতের জালাল দর্শন করিয়েছেন এবং তার সামাদিয়াতের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে (আকারের দিক থেকে) সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক বানানোর পরও আমি চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম যে, কোন পথে কিভাবে আমি আপনার কাজে লাগতে পারি। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমার সকাশে এলে, আমি আপনার সাথে কি আচরণ করব? তা ভেবে সদা-সর্বদা হয়রান পেরেশান ছিলাম। পরওয়ারদিগার আমাকে যখন সৃষ্টি করেন, তখন আমি তাঁর হায়বত ও জালালিয়াতের প্রভাবে কম্পমান ছিলাম। এরপর যখন আমার জন্য বা উপরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লিখে দেয়া হয় তখন তাঁর ভয়ে আমি আরও কাঁপতে থাকি। পরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখা হলে আমার কম্পন থেমে যায়। অস্থিরতা দূর হয়। আপনার পবিত্র নামের বরকত আমার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। এখন আমার উপর পতিত হয়েছে আপনার শুভ দৃষ্টি। আজ কত মর্যাদার অধিকারীই না হলাম আমি।

এক পর্যায়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উম্মতের অবস্থা আল্লাহ তা'আলার কাছে পেশ করা হয়। তখন তিনি আরজ করেন, হে আমার প্রভু আপনি

www.nagorikpathagar.org

তো অনেক উম্মতকে আযাব দিয়েছেন। কাউকে পাথর বর্ষণ করেছেন, কাউকে মাটিতে প্রোথিত করেছেন, কারো চেহারা বিকৃত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তাদেরকে রহমত করব, তাদের গুনাহকে আমি নেকীতে রূপান্তরিত করে দিব, যে আমাকে ডাক দিবে, আমি তার ডাকে 'লাব্বাইক, বলব। যে প্রার্থনা করবে, তাঁকে দান করব। আমার উপর যে নির্ভর করবে, আমি তাকে অভাবহীন করে দিব। দুনিয়ায় আমি তাদের গুনাহসমূহ গোপন রাখব। আর আখিরাতে আপনাকে তাদের শাফায়াতকারী নিযুক্ত করব'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আল্লাহ তা'আলা তার একনিষ্ঠ ইবাদত ও আনুগত্য হিসেবে মু'মিনদের মি'রাজস্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রদান করেন। আর পরবর্তী সময়ে তথা মদিনায় হিজরতের পর ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে তা পরিচালনার জন্য যে নীতিমালা প্রয়োজন হবে তার প্রতি নির্দেশকরতঃ আল্লাহ নীতিমালা পেশ করেন। তা এমন যে, ঐ মৌলিক নীতিগুলোর উপর সমষ্টিগতভাবে মানবজীবনের মূল ভিত্তি গড়ে তোলাই ইসলামের আসল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-৩৭)। কুরআনের সে নীতিমালাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) এক আল্লাহরই ইবাদত ও আনুগত্য করা ঃ আল্লাহ বলেন আপনার রবের নির্দেশ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩)। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশকেই একমাত্র আদেশ এবং তার আইনকেই একমাত্র আইন বলে স্বীকার করে নেয়া প্রতিটি মানুষের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য ও ফরয। আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষের ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা ও মালিক। এ ব্যাপারে সামান্যতম শিথিলতা করলে মানুষ জান্নাতের অনুপোযুক্ত হয়ে যাবে এবং তার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে।

(২) পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা ঃ পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়জন বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দেবে না। বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদাসহকারে কথা বলবে এবং বিনয়ভাবে তাদের সম্মুখে নত হয়ে থাকবে। আর এ দোয়া করবে- হে প্রভু! তাদের প্রতি রহমত কর, যেমনি তারা স্নেহভরে বাল্যকালে আমাদের লালন পালন করছে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩, ২৪)। অর্থাৎ আল্লাহর পরে সকল মানুষের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিতামাতার অধিকার। সন্তানকে যে কোন অবস্থায় পিতামাতার অবশ্য অনুগত, সেবা শুশ্রূষাকারী এবং আদব রক্ষাকারী হতে হবে। পিতামাতার সেবায় প্রত্যেক

মানুষকে সর্বাধিক যত্নবান হতে হবে। কোন অবস্থায় এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন ইসলামে পুরোপুরি নিষেধ বা হারাম।

(৩) নিকট আত্মীয় ও অভাবীদের অধিকার দেয়া ঃ আর নিকট আত্মীয়কে তাদের অধিকার দাও, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার দাও (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)। অর্থাৎ তোমার উপার্জিত ধন সম্পদকে কেবল নিজের জন্যই সংরক্ষিত করে রাখবে না। বরং এর দ্বারা নিজের আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকারও যথাযথভাবে আদায় করবে। প্রত্যেকের উপার্জিত সম্পদে অন্যান্য সকলেরই বিধি মোতাবেক হক বা অধিকার রয়েছে। নিজের সম্পদকে কুক্ষিগত করা যাবে না। এটা নিষেধ। এর শাস্তি ভয়াবহ।

(৪) অপব্যয় থেকে বিরত থাকা ঃ তোমরা অপব্যয় অপচয় করবে না। অপব্যয়কারী লোক শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৭)। অর্থাৎ প্রয়োজনে তোমরা উপার্জিত সম্পদ নিজের কাজে ব্যয় কর। এরপর আত্মীয়স্বজন ও অভাবীদের মধ্যে তাদের অভাব মোচনের জন্য দান কর। কিন্তু বিলাসিতা ও বেহুদা কাজে অপব্যয় করবে না। কারণ, এতে তোমার নিজের কোন লাভ হবে না। আর সমাজ এবং জাতিরও কোন লাভ হবে না। বরং এ অপব্যয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে অভাবগ্রস্ত করে তুলবে এবং তা শয়তানরাই একান্তভাবে কামনা করে। অতিরিক্ত ভোগ বিলাস ও মোজমাস্তিতে খরচ করা হারাম। সম্পদকে নিজের মনে করে, যা ইচ্ছে সেভাবে অপব্যয় করা ইসলামে অমার্জনীয় অপরাধ।

(৫) দুস্থ-অভাবীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা ঃ তোমরা যদি অভাবীদের হতে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও, এ কারণে যে তোমরা তোমাদের রবের রহমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী। তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৮)। অর্থাৎ কোন আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীনদের কিছু দিতে না পারলে, তাদের সুন্দর কথা দিয়ে বিদায় দিবে। এটাও এক প্রকারের দান বিশেষ। দরিদ্র, পীড়িত ও অভাবীদের দান করার সামর্থ্য না থাকলে অথবা দান করতে না চাইলেও, কোন অবস্থাতেই ব্যবহার খারাপ করা যাবে না। দরিদ্র জনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করা বা অপমান করা গুরুতর পাপ।

(৬) অর্থ ব্যয়ে ভারসাম্যতা রক্ষা করা ঃ নিজের হাত গলায় বেধে রাখবে না আর একেবারে খোলাও ছেড়ে দিবে না। তা করলে তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)। অর্থাৎ এটি একটি রূপক কথা। গলায় হাত বাধা বলতে কার্পণ্য আর খোলা ছেড়ে দেয়া বলতে অপচয় ও বেহুদা খরচ করা বুঝানো

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। এক কথায়, তোমরা না কৃপণ হয়ে ধন সম্পদ গচ্ছিত করে রাখবে। আর না অপচয়কারী হয়ে নিজের অর্থ নৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে। বরং এ ব্যাপারে মধ্যম নীতি গ্রহণ করবে। ইসলাম সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই আল্লাহর নির্দেশ। পরিমিতভাবে দানও করতে হবে এবং পাশাপাশি নিজ পরিবারের জন্যও সম্পদ রাখতে হবে।

(৭) দারিদ্র্যতার আশংকায় সন্তান হত্যা করা যাবে না ঃ নিজের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যতার আশংকায় হত্যা করবে না। আমি তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর তোমাদেরকেও। বস্তুতঃ তাদের হত্যা করা একটি অতি বড় ভুল কাজ (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)। যুগে যুগে দেখা গেছে, আর এখনও দেখা যাচ্ছে যে, দারিদ্র্যতার ভয়ে মানুষ নিজের শিশু সন্তানকে নানাভাবে হত্যা করছে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হল যে, খাদ্য সংকটের ভয়ে লোক সংখ্যা কমানো স্রষ্টার সাথে মোকাবিলা করার নামান্তর। বরং এজন্য এমন গঠনমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; যার দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের প্রাচুর্য লাভ করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই তার অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থনৈতিক উপায় উপাদান লোকদের হস্তগত হচ্ছে। রিযিক আল্লাহর হাতে এবং আল্লাহ্ সকল সৃষ্টি জগতের জন্য রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। অতএব রিযিক এবং দারিদ্র্যতার কথা ভেবে সন্তান বা মানবকে হত্যা করা হারাম। জ্ঞানীরা বলেন, মানুষ বাড়াও জনসংখ্যা কমাও।

(৮) যেনা ব্যভিচারের নিকটেও যাওয়া যাবে না ঃ যেনার নিকটেও যেও না, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ, আর অতিব নিকৃষ্ট পথ (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)। অর্থাৎ মানুষ যে কেবল যেনা হতে বিরত থাকবে শুধু তা নয়। বরং যেনার কাজে উৎসাহক ও প্রেরণাদায়ক সংশ্লিষ্ট সকল কাজ হতেও দূরে থাকবে। আর তাহল; বেপর্দা, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, মদ্যপান, গান, বাজনা, নাচ, ছবি, মুভি, ভিডিও ইত্যাদি। এছাড়া ইন্টারনেটে, টিভিতে, টুইটারে, ফেইস বুকে, মোবাইলে এবং সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে যেকোন যৌন উদ্দীপক কিছু দেখা, শোনা বা অনুধাবন করা হারাম।

(৯) প্রাণ হত্যা না করা ঃ আর প্রাণ হত্যার অপরাধ করবে না। যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, সত্য বিধান ব্যতীত। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অলীকে আমি কিসাস দাবীর অধিকার দিয়েছি। অতএব, সে যেন এ ব্যাপারে সীমালংঘন না করে। এ ব্যাপারে অবশ্যই তাকে সাহায্য করা হবে (সূরা

বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)। অর্থাৎ মানুষের প্রাণের মালিক মানুষ নয়, আল্লাহ তা'আলা। তাই প্রাণকে ধ্বংস করার অধিকারও মানুষের নেই। তবে হ্যাঁ ইসলামী আইনে, সত্যতা যাচাই করে পাঁচটি ক্ষেত্রে হত্যা করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। (এক) ইচ্ছাপূর্বক নর হত্যাকারীকে কিসাসের মাধ্যমে। (দুই) দ্বীনের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টিকারীকে লড়াইয়ের মাধ্যমে। (তিন) ইসলামী রাষ্ট্রের উৎপাটনের চেষ্টাকারীকে বিচারের মাধ্যমে। (চার) বিবাহিত নারী ও পুরুষকে যেনার অপরাধ করলে শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে। (পাঁচ) ইসলাম ত্যাগকারীকে মৃত্যুদ ে র মাধ্যমে। এসব কারণ ছাড়া কোন ধরনের দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে বা মনের খেয়াল খুশিমত কাউকে হত্যা করা সবচেয়ে ভয়াবহ এবং অমার্জনীয় অপরাধ। এমনকি আত্মহত্যা ইসলামে অমার্জনীয় পাপ। এর কোন ক্ষমা নেই। এর পরিণাম জাহান্নামের অনন্ত মহাশাস্তি।

(১০) এতীমের ধনমাল ভক্ষণ না করা ঃ তোমরা এতীমের মালের নিকটেও যেও না, তবে হ্যাঁ তারা বুদ্ধি বিবেকে পৌঁছা পর্যন্ত উত্তম পন্থায় প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করতে পারবে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)। এতীম বা সহায়হীন দুর্বল মানুষের অর্থ, সম্পদ, মালামাল উপভোগ করা অমার্জনীয় পাপ। পরকালে এর বদলা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই এ পাপ করা যাবে না।

(১১) অঙ্গীকার বা আমানত পূর্ণ করা ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করা নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)। অর্থাৎ যেকোন ব্যাপারে কারো সাথে অঙ্গীকার বা ওয়াদা করা হলে, তা পূরণ করতে হবে। কারো আমানত খেয়ানত করা অমার্জনীয় পাপ। কথা দিলে, তা রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। মত বা সাক্ষী দিয়ে তা ভঙ্গ করা যাবে না। এ ধরনের খেয়ানত হারাম।

(১২) মাপে-ওজনে সঠিক দেয়া ঃ মাপের পাত্র দিয়ে দিলে পুরাপুরি ভর্তি করে দিবে। আর ওজনে দিলে ক্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা মেপে দিবে। এটা খুব ভালনীতি আর পরিণামও অতি উত্তম (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৫)। অর্থাৎ সঠিক পরিমাপ এবং ওজন দ্বারা পারস্পরিক আস্থা স্থাপিত হবে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা-উভয়ই নির্ভরতা লাভ করতে পারবে। এটাই ইসলামের নীতি এবং এর পরিণাম উত্তম। সকল ধরনের লেনদেন, ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময়ে সঠিক পরিমাপ (বা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সময়) এবং ওজন (কেজি, লিটার, টন, ইত্যাদি) বজায় রাখা। বস্তুগত ও অর্থনৈতিক বিনিময়েও যথাযথ ও সঠিকতা বজায় রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা হারাম ও জঘন্যতম পাপ।

(১৩) ভিত্তিহীন ধারণার পেছনে না পড়া ঃ এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগে

www.nagorikpathagar.org

যাবে না, যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয় জানবে যে, চক্ষু, কান ও অন্তর সব কিছুর জন্যই জবাব দিহি করতে হবে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)। অর্থাৎ জ্ঞানের পরিবর্তে অমূলক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করবে না। কারণ, এর ফলে মানব জীবনের অনেক মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। কোন ব্যক্তি বা দলের উপর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত দোষারোপ করা উচিত নয়। শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। সন্দেহ করে, লোকমুখে কথা শুনে বা অনুমান করে কারো সম্পর্কে মন্তব্য করা গুরুতর পাপ। মানুষ এ ধরনের অমার্জনীয় পাপ অহরহ করছে। অথচ সে জানে না, পরকালে এর শাস্তি কত ভয়াবহ হবে।

(১৪) যমীনে বাহাদুরী করে চলা যাবে না ঃ যমীনে বাহাদুরী করে চলবে না, তুমি না যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭)। এটা ব্যক্তিগত ও জাতীয় আদর্শ; উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশ এবং হিদায়াতের বদৌলতেই মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক, পরিচালক, গভর্নর ও সেনাপতিদের জীবনে অহংকার ও গর্বের নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যেত না। কোন অবস্থাতেই অর্থ, সম্পদ, জনবল, পদ, পদবী, ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, ডিগ্রী, জ্ঞান, কোন বিষয়েই অহংকার প্রদর্শন করা যাবে না। এটা অমার্জনীয় অপরাধ ও পাপ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অংশগ্রহণকৃত/নির্দেশিত সকল যুদ্ধ এবং অভিযানসমূহ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সারাবিশ্বের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী করে পাঠিয়েছেন। নবুওয়াতের পর হতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবনের কোন একটি দিন বা ওয়াক্ত দাওয়াত ও তাবলীগ হতে দূরে থাকেননি। দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আল্লাহর নির্দেশেই তাঁকে কিছু যুদ্ধে সরাসরি এবং কিছু অভিযানে সাহাবীদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীকে প্রেরণ করতে হয়েছে। যেসব যুদ্ধে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেছেন, সেগুলোর নাম মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মাগাযী বা গাযাওয়াত। আর যেসব যুদ্ধে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেননি অর্থাৎ যেসব অভিযান সাহাবাগণকে সেনাবাহিনীর প্রধান (আমীর) বানিয়ে প্রেরণ করেছেন; ইসলামের পরিভাষায় সেগুলোকে সারীয়া এবং বুয়ুস বলা হয়। ইসলামের প্রথম যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

www.nagorikpathagar.org

জন্য কাফিরদের সংগে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না। যুদ্ধ বৈধ হওয়ার নির্দেশ দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে আল কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। 'এবার সেসব লোকদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে; যাদের সাথে (কাফিরগণ) লড়াই করে থাকে। এটা এজন্য যে মুসলমানদের উপর (অতিমাত্রায়) যুলুম করা হচ্ছে। আর নিঃসন্দেহে তাদের বিজয়ী করার শক্তি আল্লাহর আছে (সূরা হজ্জ্ব-৩৯)। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা যুদ্ধ প্রসংগে নাযিল হয়েছিল এবং যেখানে ধর্মীয় যুদ্ধ বা জিহাদকে ফরয ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণকৃত গাযাওয়াত বা ধর্মীয় যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গাযাওয়াত (যুদ্ধ) এর সংখ্যা সাতাশ। এটা হল যারা আহযান এবং ওয়াদিয়ে যুলকুরার যুদ্ধকে একটি মনে করেন। আর যারা এ দুয়ের উভয়টিকে পৃথক মনে করেন তাদের হিসাব মতে এ সংখ্যা হচ্ছে আটাশ। নিচে এই আটাশটি গাযাওয়াত বা যুদ্ধের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হচ্ছে। ১ম হিজরী পর্যন্ত জিহাদ জায়েয ছিল না। কাজেই এ বছর জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধ বা সংক্ষিপ্ত অভিযান হয়নি। ২য় হিজরী হতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে যুদ্ধ/অভিযানসমূহ পরিচালিত হয়েছে

(১) দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই সফর আবওয়া অথবা ওয়াদানের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযান পরিচালনা করেন। এটা ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জিহাদ। ষাট জন মুহাজির সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে কোন আনসার সাহাবী অংশগ্রহণ করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাকে (রা.) নিজের স্থলাভিষিক্ত করে মদীনার আমীর নিয়োজিত করেন। এ সফরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এক বণিক দল; যারা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল, তাদেরকে ধাওয়া করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য কুরাইশদের কাফেলা পূর্বেই চলে গিয়েছিল। কাজেই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। তবে এ সফরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বনু জুমরার সন্ধি চুক্তি হয়েছিল।

(২) একই বছর (হিজরী দ্বিতীয়) রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী মাসে বুওয়াত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বুওয়াত জুহাইনার পাহাড়সমূহের মধ্য থেকে একটি পাহাড়ের নাম। এটি মদীনা থেকে বার মাইল দূরে ইয়াম্বুর নিকটবর্তী রেজবীর

www.nagorikpathagar.org

কাছাকাছি অবস্থিত। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মক্কার একটি বণিক দলকে ধাওয়া করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'শ মুহাজির সাহাবাকে নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান ইবনে মাজউনের (রা.) ভাই সায়িব ইবনে মাজউন (রা.) কে মদীনার প্রতিনিধি করেছিলেন। এ অভিযানেও যুদ্ধ করার সুযোগ হয়নি বা প্রয়োজন পড়েনি।

(৩) দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সাফওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা বদরে উলা নামেও পরিচিত। কিরজ ইবনে জাবির আল তফিহ্রী নাম্মী এক মুশরিক মদীনার জীবজন্তুর উপর ডাকাতি করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যায়েদ ইবনে হারিসাকে (রা.) মদীনার হাকিম নিযুক্ত করে কিরজের মুকাবিলার জন্য বেড়িয়ে যান। সে পালিয়ে যায় বিধায় যুদ্ধ করতে হয়নি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা যুদ্ধে ফিরে আসেন। কিরজ ইবনে জাবির মুশরিকদের সর্দার ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরনাইয়ীনের যুদ্ধে তাকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এটা বদরের কাছে অবস্থিত এক জায়গার নাম। কারো কারো মতে উশাইরার পরে এ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উলা বা জুমাদাল উখরা মাসে উশায়রার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদকে (রা.) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে দেড়শত অথবা দু'শত মুহাজির সাহাবীকে নিয়ে কুরাইশদের একটি বণিক দলকে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কাফেলা মক্কা থেকে সিরিয়া যাচ্ছিল। মুশরিকদের দলটি চলে গিয়েছিল, তাই যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। বনু মাদলাজ এবং বনু আমিরের সংগে সন্ধি চুক্তি করেন। অতঃপর নিরাপদে ফিরে আসেন।

(৫) দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধের দিনকে ফুরকানের দিনও বলা হয়। এটা ইসলামের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট ঘটনা। এ যুদ্ধের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কুফর এবং কাফিরদের সকল অহমিকা ভূলুণ্ঠিত করেন। বদর নামক স্থানে যেখানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা হারামাইন শরীফাইনের (মক্কা ও মদীনার) পথে মদীনা শরীফ থেকে আশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বদরের যুদ্ধ রমযানের ১৫ অথবা ১৯ অথবা ৩০ তারিখে এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ সূত্রমতে রমযানের ১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ই রমযান মদীনা

www.nagorikpathagar.org

থেকে রওনা হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মুসলমানদের উভয় জামাত অর্থাৎ মুহাজির এবং আনসার ছিলেন। বদরী সাহাবার সংখ্যা ছিল (বিখ্যাত বর্ণনা মোতাবেক) তিনশত তের জন। তন্মধ্যে আটজন সাহাবী স্বশরীরে অংশ নিতে পারেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ মোতাবেক বিশেষ কাজে তারা মদীনায় থেকে যান। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং গনীমতের মালে তাদের অংশ প্রদান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বদরের যুদ্ধে সওয়াব পাবেন বলেও ঘোষণা করেন। তিনশত তের জনের মধ্যে ২২৯ জন ছিলেন আনসার সাহাবী এবং ৮৪ জন ছিলেন মুহাজির। আনসার সাহাবীগণ সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তারা এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনাতে আবু লুবানা ইবনে আব্দুল মুনজির (রা.) আনসারীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রাওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। অপরদিকে বদর যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাদের সংগে ছিল প্রচুর পরিমাণে ঘোড়া এবং অস্ত্র। তাছাড়া তাদের দলে ছিল খ্যাতনামা বীর যোদ্ধা এবং সমর বিশেষজ্ঞ। এদিকে মুসলমানগণের সংগে অস্ত্র, রসদপত্র যুদ্ধের সামানপত্র এবং যানবাহনের খুবই দৈন্যতা ছিল। পুরো বাহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া এবং আটখানা তরবারী ছিল। তবে আল্লাহ, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের পক্ষের বাহিনীকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। কুফরী শক্তির গর্বকে খর্ব করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধে সত্তর জন কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিল এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। পর্যাপ্ত গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে এসেছিল। বদরের যুদ্ধে এ উম্মতের ফিরাউন আবু জেহেল ইবনে হিশামকে জাহান্নামে পাঠান হয়েছিল।

(৬) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এর সাতদিন পরে দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়ালের প্রথম দিকে অথবা কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৩য় হিজরীর মহাররমের মধ্যবর্তী সময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী সালীমের যুদ্ধের জন্য কদর নামক স্থানে তাশরীফ নিয়ে যান। একে কদর এর যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'শ সাহাবীকে নিয়ে যাত্রা করেন। সিবা ইবনে আরফাত্বাকে (রা.) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আবার কারো কারো মতে অন্ধ

www.nagorikpathagar.org

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতূমকে (রা.) মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়। হযরত সিবাকে মামলা, প্রশাসন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে নামাযের ইমামতির দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু সুলাইমের আবাসস্থলের নিকটবর্তী হন, তখন কাফিরদের সকলেই দ্রুত পালিয়ে যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে মদীনা তৈয়িবাহ থেকে তিন মাইল দূরে 'সিরাদ' নামক স্থানে গনীমতের মালামাল বণ্টন করেন। উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচশত উট পেয়েছিলেন। উট রাখালদের মধ্যে ইয়াসার নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খরিদ করে আজাদ করে দেন।

(৭) দ্বিতীয় হিজরীর যিলহজ্ব মাসে অযথা কারো কারো মতে দ্বিতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে সুরয়াইক যুদ্ধের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। এ যুদ্ধকে "সুরয়াইক" এ জন্য বলা হয় যে, এ যুদ্ধে মুশরিকদের অধিকাংশের খাদ্য ছিল ছাতু; যা গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধ আবু সুফিয়ান এবং তার কুরাইশ বাহিনীর সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের পরে আবু সুফিয়ান কৃসম খেয়ে ছিলেন যে, যতক্ষণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করবেন এবং বদরের যুদ্ধে নিহতদের বদলায় সাহাবীদেরকে হত্যা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘি খাবেন না এবং জানাবতের গোসল করবেন না। কাজেই আবু সুফিয়ান দুইশত সৈন্য সংগে নিয়ে আরিজ নামক স্থানে পৌছে। এ স্থানটি মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সংবাদ পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচই যিলহজ্ব রবিবার; দু'শ আরোহী নিয়ে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সাবা ইবনে আরফাত্বাকে (রা.) মদীনার আমীর নিয়োজিত করেন। মতান্তরে ইবনে উম্মে মাকতূম আবু লুবাবা ইবনে মুনযিরকে (রা.) আমির মনোনীত করেন। আবু সুফিয়ান এবং তার সংগীগণ এ সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পড়ে। তারা মক্কার দিকে ছুটে চলে যায়। বোঝা হালক করার উদ্দেশ্যে ছাতুর বস্তা ফেলতে ফেলতে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ তার ছাতুর বস্তা এবং ফেলে যাওয়া অন্যান্য সামগ্রীকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(৮) ৩য় হিজরীর মহাররম অথবা রবিউল আউয়াল মাসে গাতফানের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। আল্লামা ইবনে কাছীর তার আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া কিতাবে লিখেছেন,

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার গাতফান যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে যাত্রা করেন। গাতফান একটি গোত্রের নাম। তারা নাজদে বসবাস করত। এ যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে আনমাজ অথবা গাযওয়ায়ে যী আমরও বলা হয় অর্থাৎ এর তিনটি নাম রয়েছে। যুয়ামাতারা হচ্ছে নাজদ অঞ্চলে একটি পানির ঝর্ণার নাম। মদীনায় হযরত ওসমান (রা.) কে আমীর মনোনীত করে পাঁচশত সাথী নিয়ে মহানবী বের হয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন বার্তা শুনে পাহাড়ের চূড়া দিয়ে পালিয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন।

(৯) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল কিংবা জুমাদাল উলায় ফারার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে বুহরান যুদ্ধ বা বনী সুলাইমের যুদ্ধও বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলার ছয় তারিখ যাত্রা করেন। মদীনা শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে হাকিম (রা.) নিয়োগ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনশত সাহাবী ছিলেন। বুহরানে পৌছে মুসলীম বাহিনী দেখতে পেল যে, বনু সুলাইম এলোমেলো বা ছত্রভংগ হয়ে আছে। এমনিভাবে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। বনু সুলাইমের গোত্র সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। 'তাদের দৃষ্টান্ত ওদেরই মত, যারা তাদের কিছুকাল আগে ছিল। যারা (দুনিয়াতেও) নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।' (সূরা হাশর-১৫)।

(১০) ৩য় হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে অথবা মতান্তরে দ্বিতীয় হিজরীর সাওয়াল মাসে গাযওয়া বনু কাইনুকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইহুদীদের এক গোত্রের নাম কাইনুকা। এটা ছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের (রা.) গোত্র। ইহুদীদের মধ্যে তারাই সর্বপ্রথম চুক্তি ভংগ করেছিল। তারা যখন চুক্তিভংগ বা খেয়ানত করে; তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শনিবার দিন অভিযান পরিচালনা করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আবু লুবাবা ইবনে মুনজিরকে (রা.) নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। আবু লুবাবার অপর নাম ছিল বশির অথবা রেফায়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কাইনুকার দুর্গ বা কেল্লা ঘেরাও করেন; যা পনের দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর মুনাফিকদের মধ্য থেকে উবাদা বনু ছামিত তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন। এর প্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেশ ত্যাগের অনুমতি

www.nagorikpathagar.org

প্রদান করেন। তাদের মালামাল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের হত্যা করা থেকে রেহাই দেন।

(১১) ৩য় হিজরীতে শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি সকল যুদ্ধের তুলনায় সবচেয়ে বেশী কষ্টসাধ্য হয়েছিল। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে শাওয়ালের মধ্যবর্তী সময় শনিবার দিন এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কেউ কেউ ১১ অথবা ৮ই শাওয়াল উল্লেখ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এক হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন। পথিমধ্যেই মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তিনশত মুনাফিকদের নিয়ে ফেরত চলে যায়। এরপর সাত শত মুসলমান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে রয়ে যায়। গোটা বহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল। তন্মধ্যে একটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এবং অপরটি ছিল আবু বুরদা (রা.) এর কাছে। অন্যান্য সবাই পায়ে হেঁটে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে মুশরিকদের পক্ষে ছিল তিন হাজার সৈন্য। তন্মধ্যে সাত শত ছিল লৌহবর্ম পরিহিত। তাদের কাছে ছিল দু'শত ঘোড়া এবং তিন হাজার উট। এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা.) নিজ প্রতিনিধি করে মদীনায় রেখে যান। মদীনার পার্শ্ববর্তী বিখ্যাত পাহাড়ের নাম উহুদ। উহুদের পাদদেশেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

(১২) তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধের একদিন পরে ১৬ই শাওয়াল রবিবার, হামরাউল আসাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রা করেন। উহুদের যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান এবং কুরাইশদের কাফির দল দ্বিতীয় বার মদীনায় আক্রমণের জন্য এখানে সমবেত হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত ষাটজন সাহাবা নিয়ে ওদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, মহান আল্লাহ এ সময় আবু সুফিয়ান এবং তার বাহিনীর অন্তরে এমন ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছিলেন যে, তারা পালিয়ে যায় এবং মক্কায় পৌঁছে নিঃশ্বাস ফেলে। ফলে কোন যুদ্ধ হয়নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তিনদিন অবস্থান করে মদীনা তৈয়্যিবায় ফিরে আসেন। হামরাউল আসাদ মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত।

(১৩) ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী নযীরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল্লামা শামী তার সীরাত গ্রন্থে লিখেন যে, এ তারিখই সঠিক। মহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশদিন বা তার অধিক সময়কাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাদের ঘেরাও করে রাখেন। অতঃপর তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। এসময় মদীনা শরীফে আমীর ছিলেন হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)। বনু নযীর ছিল ইহুদীদের সবচেয়ে বৃহৎ কাবিলা বা গোত্র। তাদের বসতি, মসজিদে কুবা থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

(১৪) ৪র্থ হিজরীর শাবান মাসে এবং কারো কারো মতে ১লা যিলক্বদ তারিখে ছোট বদর যুদ্ধের জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে যান। এটাকে নির্ধারিত বদর অথবা ছোট বদর অথবা তৃতীয় বদর বা সর্বশেষ বদর যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান এবং তার বাহিনীর মুকাবিলার জন্য বের হয়েছিলেন। কারণ মক্কার মুশরিকরা উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল যে, পরবর্তী বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে বদর নামক স্থানে তাদের যুদ্ধ হবে। এ কারণে এ যুদ্ধকে বদরে ওয়াদাকৃত যুদ্ধ বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে (রা.) মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পনের শত সাহাবা নিয়ে যাত্রা করেন। এ বাহিনীর মধ্যে দশটি ঘোড়া ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অতিক্রম করে মাজান্নাহ পর্যন্ত চলে যান। মাজান্নাহ হল মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী আরবের বিখ্যাত বাজার। অপরদিকে আবু সুফিয়ান এবং মুশরিক বাহিনী, মক্কা থেকে বের হয়ে মাররুজ জাহরান পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এটা হচ্ছে মক্কা এবং আসফানের মধ্যবর্তী এক স্থানের নাম। মহান আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে ভয়ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। তাই তারা সেখান থেকেই মক্কায় ফিরে যায়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। কোন ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

(১৫) ৫ম হিজরীতে দাওমাতুল জানদাল অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। সিরিয়ার কাছে একটি শহরের নাম দাওমাতুল জানদাল। মদীনা থেকে পনের ষোল দিনের পথ। দামেস্ক থেকে পাঁচ দিনের পথ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার সৈন্য নিয়ে ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল তারিখে রওনা হন। সাবা ইবনে আরফাতাকে (রা.) মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। মুশরিক বাহিনী উট ছাগল ইত্যাদি ফেলে পালিয়ে যায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কিছুকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সাহাবীদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করে দেন। বিশ্বনবী রবিউস সানি মাসে মদীনায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি।

(১৬) ৫ম হিজরীর শাবান মাসে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। ৫ম হিজরীর ২য় শাবান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম শত শত সাহাবাকে নিয়ে যুদ্ধে রওনা হন। হযরত আয়িশা এবং উম্মে সালামা (রা.) বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে ছিলেন। মদীনায় হযরত আবু জর গিফারী (রা.) কে খলীফা মনোনীত করেন। এ যুদ্ধে মুশরিক ও ইহুদী বাহিনী পরাজিত হয়। তাদের পক্ষের দশজন নিহত হয় এবং সাত শতাধিক গ্রেফতার হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জীব-জন্তু এবং ছাগল নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। মহিলা এবং সন্তানদের বন্দী করেন। এসব বন্দীদের মধ্য থেকে হারিছ ইবনে আবু জেরার আল মুস্তালিকের কন্যা হযরত জুওয়াইরিয়াও ছিলেন। মুসলমানের পক্ষে মাত্র একজন শাহাদাত বরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ২৮ দিন পরে মদীনায় পৌছেন। অর্থাৎ ১লা রমযান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে আসেন।

(১৭) ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে মতান্তরে যিলক্বদ মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। আবার কারো কারো মতে চতুর্থ হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ হয়েছে। আল্লামা শামী বলেন পঞ্চম হিজরীতে হওয়া সর্বাধিক বিশুদ্ধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ই শাওয়াল বা যিলক্বদ মাসে খন্দকের দিকে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে মুসলমান ছিলেন তিন হাজার। মুশরিক ও ইহুদী বাহিনীর সংখ্যা ছিল দশ থেকে বার হাজার। অপর বর্ণনা মতে পনের হাজার। কুরাইশ, গাত্বফান, কুরাইযা, বনু নযীর এবং অন্যান্য সব কাবিলা থেকে শত্রুরা একত্রিত হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। এ যুদ্ধে ছয়জন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন এবং চারজন মুশরিক নিহত হয়।

(১৮) খন্দকের যুদ্ধের অতি অল্পদিন পরেই বনী কুরাইযার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারা ছিল ইহুদী। মদীনার নিকবর্তী স্থানে বসবাস করত। তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ওয়াদা খেলাফ করেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩শে যিলক্বদ বুধবার তাদের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করেন। অথচ তিনি ঐ দিনই খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিলেন। খন্দক যুদ্ধ এবং বনী কুরাইযার যুদ্ধের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এতটুকু ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র খুলে রেখে গোসল করেছেন এবং যুহরের নামায আদায় করেছেন। ইতোমধ্যে জিব্রাঈল হাজির হয়ে আরজ করেন, রাসূল! আপনি হাতিয়ার খুলে ফেলেছেন। আল্লাহর কসম! আমরা এখনও হাতিয়ার খুলিনি। আপনাকে এবং আমাদেরকে বনু কুরাইযার সংগে যুদ্ধ করার নির্দেশ এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর ঘোষককে ঘোষণা করতে বলে দেন ঃ 'সাবধান তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায আদায় না করে; তবে বনু কুরাইযায় পৌঁছার পরে।' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হন। ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা.) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করেন। সেনা দলে ৩৬ টি ঘোড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পঁচিশ দিন ধরে ইহুদীদের ঘেরাও বা অবরোধ করে রাখেন। ইহুদীরা দীর্ঘ অবরোধের ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। অবশেষে হযরত সা'দ ইবনে মায়াজের প্রস্তাবে দুর্গ হতে বের হয়ে নেমে আসতে সম্মত হয়। জাহেলিয়াতের যুগে সা'দ ইবনে মায়াজের সংগে তাদের বন্ধুত্ব এবং প্রতিরক্ষা চুক্তি ছিল। হযরত সা'দ প্রস্তাব করেন যে, তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে এবং শিশু ও মহিলাদের বন্দী করা হবে। কাজেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সৈন্যদের হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এদের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে, তবে কয়েকশত হবে। মুসলমান বাহিনী তাদের মহিলা এবং সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর সাত বা ৫ই যিলহজ্ব তারিখে মদীনায় ফিরে আসেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ধনসম্পদের এক পঞ্চমাংশ সরকারী তহবিলে রেখে বাকিটুকু মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

(১৯) ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বনু লিইহান যুদ্ধ হয়। বনু লিইহান ইবনে হুযাইল ইবনে মুদরিকা আসফানের এলাকায় বসবাস করত। এটা মক্কা ও মদীনার মধ্যখানে অবস্থিত ছিল; মক্কা থেকে দু'দিনের পথ। বনু লিইহান 'বীরে মাউনায়' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতের ৭০ জন ক্বারীকে শহীদ করেছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'শ সাহাবা নিয়ে অভিযান চালান। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) কে মদীনায় আমীর নিযুক্ত করেন। এ বাহিনীতে বিশটি ঘোড়া ছিল। বনু লিইহান সংবাদ পেয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে পলায়ন করে। ফলে মহানবী মদীনায় ফিরে আসেন। কোন প্রকার যুদ্ধ হয়নি।

(২০) হুদাইবিয়া একটি ছোট বস্তির নাম। মক্কা থেকে ১২ মাইল পশ্চিম দিকে মক্কা এবং জিদ্দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে সেখানে হুদাইবয়িা নামের একটি কূপ ছিল। সে নামেই বস্তির নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এর নাম শুমাইস কূপ। ৬ষ্ঠ হিজরীতে এ স্থানে বিশ্বখ্যাত হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(২১) হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্ব

www.nagorikpathagar.org

মাসে যীক্বিরদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাকে গাবা যুদ্ধও বলা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ প্রাপ্ত হলেন যে, ইবনে হিসন চল্লিশ জন আরোহী নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবজন্তু ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাকতূম (রা.) কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন এবং তিনশত সাহাবীকে মদীনার প্রহরীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পাঁচ থেকে সাত শত সৈন্য নিয়ে ডাকাত দলের পিছু ধাওয়া করেন। হযরত সালমান ইবনে আকওয়া (রা.) একাই পায়ে হেঁটে কাফেলার আগে ছুটে যান। তিনি মুশরিকদের উপর তীর বর্ষণ করে সকল উট উদ্ধার করেন। তাছাড়া তিনি একাই শত্রু বাহিনীর ত্রিশটি বর্শা, ত্রিশখানা চাদর এবং ত্রিশটি ঢাল ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। তদুপরী নিজে বর্শা নিক্ষেপ করে কয়েকজন কাফিরকে হত্যা করে দোযখে প্রেরণ করেন। তিনি একাকী সকল উট নিয়ে ফিরে আসছিলেন। ইতোমধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কাফেলাও পৌঁছে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালমান (রা.) কে ভূয়সী উৎসাহ দেন ও তার জন্য দোয়া করেন।

(২২) ৭ম হিজরীর মহাররম মাসে খায়বার যুদ্ধ হয়। খায়বার হচ্ছে মদীনা থেকে আট দিনের রাস্তা। সিরিয়ার দিকে একটি শহরের নাম। এখানে বেশ ক'টি দুর্গ বা কেল্লা ছিল। সেখানে ইহুদীরা বসবাস করত। সমর অভিযানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে চৌদ্দ শত পদাতিক এবং দু'শত আরোহী সৈন্য ছিল। মুসলিম জননী হযরত উম্মে সালামা (রা.) বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে ছিলেন। বিশ্বনবী সিবা ইবনে আরফাতা (রা.) কে মদীনায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দশ দিনের অধিক সময় ইহুদীদেরকে ঘেরাও করে রাখেন। অতঃপর সফর মাসে খাইবার বিজয় হয়।

(২৩) ৭ম হিজরীর সফর মাসের শেষদিকে ওয়াদিউল কু'রার যুদ্ধ হয়। এটা খাইবার এবং মদীনার মধ্যবর্তী সিরিয়া থেকে আগত হাজীদের পথে অবস্থিত এক স্থানের নাম। সেখানে ইহুদীদের নিবাস ছিল। খাইবার থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে যাওয়ার সময় এখানে পৌঁছেন। সেখানে চারদিন অবস্থান করে এটি দখল করেন। মুসলিম বাহিনী প্রচুর পরিমাণ মালামাল এবং অস্ত্র গনীমত হিসেবে লাভ করেন।

(২৪) ৭ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে জাতুর রেকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইমাম

www.nagorikpathagar.org

বুখারী (রহ.) লিখেছেন; এ যুদ্ধ খাইবারের পরে সংঘটিত হয়েছে। কারণ আবু মূসা আশয়ারী (রা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি খাইবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সে হিসেবে জাতুর রেকা যুদ্ধ সপ্তম হিজরীতে হয়েছে। এ যুদ্ধ নাজদের এলাকায় বনু মাছারিব এবং বনু ছায়লাবার সংগে ঘটেছিল। তাছাড়া এ যুদ্ধকে সালাতুল খাওফও বলা হয়। কারণ নামাযে খাওফ এ যুদ্ধেই সূচনা হয়। এ যুদ্ধকে আ'য়াজিব যুদ্ধও বলা হয়। কারণ এ যুদ্ধে আজীব অর্থাৎ আশ্চর্যজনক অনেক ঘটনা ঘটেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ই রবিউল আউয়াল শনিবার রাতে জাতুর রেকার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চারশত বা সাতশত থেকে আটশত সাহাবী ছিলেন। মদীনায় হযরত ওসমান (রা.) কে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। বনু মাহারিব এবং বনু ছায়লাবা মুকাবিলা করতে আসেনি। তারা পাহাড়ের রাস্তায় পালিয়ে যায়। তবে মুসলমানগণ শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকায় ভীত ছিলেন। কাজেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ পড়ান। আর এটা ছিল আসরের নামায।

(২৫) ৮ম হিজরীতে রমযান মাসে মক্কা বিজয় হয়। হুদাইবিয়ার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে মক্কার কাফিরদের শান্তি চুক্তি হয়েছিল। এতে বনু খুজায়া ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হালফি বা মিত্র। কিন্তু কুরাইশরা (রা.) তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তির বাইশ মাস পরে অষ্টম হিজরীর শাবান মাসে মতান্তরে এর পূর্বে মুশরিক কুরাইশবাসী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিত্র বনু খুজায়ার উপর হামলা করে শান্তি চুক্তি লংঘন করে। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজার পুণ্যবান সাহাবাকে নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) কে মদীনায় খলিফা মনোনীত করেন। এ যুদ্ধের নাম মক্কা অভিযান। এটা ছিল সে মহান বিজয় যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ চিরদিনের জন্য তার দ্বীনের বিজয় নিশান উড্ডীন করেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চরম সাফল্যে ভূষিত করেছিলেন। এ যুদ্ধের পর হিজাযের পুণ্যভূমি থেকে কুফর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ যুদ্ধ সর্বসম্মত উক্তি মতে ৮ই হিজরীর রমযান মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মদীনা থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ রমযান বুধবার আসরের নামাযের পর রওনা হয়েছিলেন। মতান্তরে ৮ম হিজরীর ২ রমযান রোজ শুক্রবার মক্কা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

(২৬) ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধকে হাওয়াজিনের যুদ্ধও বলা হয়। কারণ বনু হাওয়াজিনই এ যুদ্ধে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১০ই শাওয়াল মঙ্গলবার বিকেলে হুনাইন পৌছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে বার হাজার সৈন্য ছিলেন। দশ হাজার সৈন্য মদীনা থেকে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার মক্কা থেকে আগত নওমুসলিম সৈন্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতাব ইবনে উসাইকে (রা.) মক্কার আমীর মনোনীত করেন। হুনাইন যুদ্ধে চারজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। শত্রুপক্ষের সত্তর জন কাফির নিহত হয়। মক্কা থেকে পূর্বদিকে এগার মাইল দূরে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এক মাঠের নাম হুনাইন। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করেন। বিপুল পরিমাণ গনীমত মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

(২৭) ৮ম হিজরী শাওয়ালের শেষদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধসম্পন্ন করে গনীমতের মাল বিতরণ না করেই তায়েফের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুশরিকদের ঘেরাও করে রাখেন। সেখানে ক্রেন বা প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেন। এর আগে কোন যুদ্ধে ক্রেন বা ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের ব্যবহৃত এটি হচ্ছে সর্বপ্রথম ক্ষেপণাস্ত্র বা ক্রেন। এখান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করেন। মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের দুর্গ দখল করেন। মুসলমানদের পক্ষে দশজন শহীদ হন। তন্মধ্যে মুসলিম জননী উম্মে সালমার (রা.) ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াহও ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের বহু সংখ্যক কাফির নিহত হয়। তায়েফের এ যুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর পুত্র আব্দুল্লাহ মারাত্মক আহত হন অবশ্য পরে তিনি সুস্থ হয়ে দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। পরিশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খেলাফতের সময় পুনরায় একই জখমে আক্রান্ত হন। এবং ইন্তিকাল করেন। তায়েফ এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম জননী হযরত উম্মে সালামা এবং যয়নব বিনতে জাহশ (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে ছিলেন।

(২৮) ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা সর্বশেষ জিহাদ; যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তাবুকের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার যাত্রা করেন। তাবুক যুদ্ধ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের সময় হয়েছিল। মওসুম ছিল অত্যধিক গরমের। সকল এলাকায় দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে ছিল। খেজুর পেকে গিয়েছিল। সকলেই ছায়ার মধ্যে ফল-ফসল উত্তোলনের অপেক্ষায় ছিল। এদিকে সফরের আসবাব পত্রের স্বল্পতা, যানবাহনের অভাব, শত্রুর শক্তি ও আধিক্য, সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া এবং সিরিয়ার দিকে অবস্থিত তাবুক প্রান্তরে যাওয়া; অথচ যেখানে কোন গাছপালা কিংবা ছায়া কিংবা পানি ছিল না। এমতাবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া মুসলমানদের জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আল্লাহ তাঁর রহমতের দ্বারা মুসলমানদের অন্তরকে শক্ত করে দেন। সুতরাং যাবার মত যারাই ছিলেন সকলেই বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে রওনা হন। কেবল মাত্র মুনাফিকরা এবং তিনজন মুসলমান পেছনে থেকে যান। তবে ৭ জন মুসলমান এমন ছিলেন যাদের সামর্থ্য না থাকায় যেতে পারেননি। তাদের কাছে জিহাদে যাবার কোন শক্তি ও সামানা ছিলনা। পবিত্র কুরআনে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, 'তাঁরা এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, তাঁদের চোখে অশ্রু গড়াচ্ছিল এ চিন্তায়, হায় তাদের কাছে যুদ্ধের ব্যয় সংকুলানের কিছুই ছিল না।' (সূরা তওবা-৯২) এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগী সাথী মুজাহিদ সাহাবার সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। আর এক বর্ণনা মতে, এ সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তাবুক যুদ্ধ শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান অথবা রমযান মাসে ফিরে আসেন। মদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে এক প্রান্তরের নাম তাবুক। মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব চৌদ্দ দিনের এবং দামেস্ক থেকে এগার দিনের পথ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত সায়ারা এবং বয়ুসসমূহ

যেসব ছোট ছোট কাফেলাকে হিজরতের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন এবং যেসব যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেননি, বরং তিনি তার সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়ে পাঠাতেন; সেসব ছোট বড় যুদ্ধের বা অভিযানের নাম আরবী পরিভাষায় সারায়া এবং বয়ুস। সারায়া এমন ছোট বাহিনীকে বলা হয় যাতে কমপক্ষে পাঁচজন অথবা একশ জন সৈন্য থাকে। সর্বাধিক চারশত সৈন্য থাকতে পারে। বুয়াস হচ্ছে কোন বাহিনীর সে অংশের নাম, যারা মূলবাহিনী থেকে অন্যত্র কোন অভিযানে প্রেরিত হয়। এ দু'ধরনের সর্বোচ্চ ৭৪টি অভিযানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের পাঠিয়েছিলেন। অভিযানগুলোর সতন্ত্র নেতৃত্ব ছিল এবং নির্দিষ্ট কর্ম পরিধি ছিল। ২য় হিজরী হতে

www.nagorikpathagar.org

এসব অভিযান শুরু হয়ে একাদশ হিজরী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর ১১তম হিজরীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী হতে পরপারে স্থানান্তরিত হন। এতগুলো অভিযানের সর্বমোট হতাহতের সংখ্যা মাত্র শতাধিক। মূলত দ্বীন প্রচার তথা দাওয়াত ও তাবলীগই ছিল এসব অভিযানগুলোর অন্তর্নিহিত ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীর কুফরী শক্তির মুকাবিলায় আল্লাহর দ্বীন প্রচারই ছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল কর্মপদ্ধতি বা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় হিজরী সন থেকে সে সকল ছোট বড় অভিযানসমূহের সূচনা হয়। কারণ এর আগে জিহাদের অনুমতি ছিল না। (সূরা হজ্ব-৩৯)। অভিযানসমূহ ধারাবাহিকভাবে ও সংখ্যার ক্রমানুসারে বর্ণিত হল ঃ

(১) দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল বা রবিউস সানী অথবা রমযান মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হযরত হামযার (রা.) নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ ছিল মহানবীর নির্দেশে সর্বপ্রথম অভিযান। ইসলামের ইতিহাসে হযরত হামযাই (রা.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি সেনাপ্রধান হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। অভিশপ্ত আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশ কাফিরদের একটি দল সিরিয়া থেকে মক্কা যাচ্ছিল। সে দলকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশ জন মুহাজির সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করেন। এ দলের নেতৃত্ব হযরত হামযার (রা.) হাতে ন্যস্ত করা হয়। আয়েস অঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা দিয়ে কুরাইশ কাফেলা যাচ্ছিল। হযরত হামযা (রা.) সাদা পতাকা হাতে নিয়ে অগ্রসর হন। ইসলামের ইতিহাসে এটি ছিল সর্বপ্রথম পতাকা। এ অভিযানে যুদ্ধ হয়নি। তিনি নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(২) ২য় হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা শাওয়াল মাসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওবায়দাকে (রা.) ষাট অথবা আশিজন মুহাজিরসহ রাবেগের দিকে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের এক কাফেলাকে প্রতিরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। উক্ত কাফেলায় আবু সুফিয়ান নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং ইকরামা ইবনে আবু জাহলও তাঁর সংগে ছিল। মুসলমানদের এ বাহিনী মুকাবিলা ছাড়াই মদীনায় ফিরে আসে। তবে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) একটি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন; যা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত তীর।

(৩) একই বছর যিলক্বদ মাসে বদর যুদ্ধের পর খাতারার দিকে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। খাতারা হচ্ছে জুহফার নিকট হেজাজের একটি ময়দানের নাম। হযরত সা'দ (রা.) এর সংগে মুহাজিরদের বিশটি অথবা আটটি আরোহী ছিল। কুরাইশের এক বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। পরে জানা যায় যে,

www.nagorikpathagar.org

কাফেলা আগের দিনই চলে গেছে। তাই মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

(৪) একই বছর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমার (রা.) নেতৃত্বে সাহাবীদের বাহিনী কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর এলাকার দিকে প্রেরণ করা হয়। বনী নযীরের বংশদ্ভূত এ নরাধম ছিল কুচক্রি কবি। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের সম্পর্কে অত্যন্ত কটূক্তি করত। সে কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিত। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রা.), তাঁর চার জন বন্ধু নিয়ে তার কাছে চলে যান। সাথীদেরকে বস্তির একদিকে নির্জন স্থানে বসিয়ে রাখেন। তিনি একাই তার দুর্গে প্রবেশ করেন। সে তখন তার শয্যা কক্ষে সুখের বিছানায় বিশ্রামরত ছিল। এ অবস্থাতে তাকে হত্যা করেন। রবিউল আউয়ালের ১৪ তারিখ পূর্ণিমার রাতেই মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রা.) তাকে হত্যা করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এ মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজের জন্য সাহাবীকে অনেক প্রশংসা ও তাঁর জন্য দোয়া করেন।

(৫) একই বছর জুমাদাল উখরার প্রথম দিকে যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনী ক্বারদার দিকে প্রেরণ করা হয়। নাজদের এক কূপের নাম হচ্ছে ক্বারদা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদকে একশত আরোহীর বাহিনী সংগে নিয়ে কুরাইশদের এক কাফেলাকে প্রতিরোধ করতে প্রেরণ করেন। কাফেলার উপর বিজয় সূচিত হয়। প্রচুর পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত হয়। সব মাল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করা হলে মহানবী যথারীতি তা বিতরণ করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই প্রথম গনীমত।

(৬) দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উখরার শেষ দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের (রা.) বাহিনী প্রেরণ করা হয়। সাহাবী আব্দুল্লাহ ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফু উম্মাইয়ার ছেলে এবং মুসলিম জননী যয়নাব বিনতে জাহশের ভাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আট অথবা বারজন মুহাজিরসহ বতনে নাখলায় প্রেরণ করেন। বতনে নাখলা হল মক্কা থেকে একদিনের পথ। মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী এক স্থানের নাম। সেখানে কাফিরদের সংগে মুসলমানগণের মুকাবিলা হয়। যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়। গনীমতস্বরূপ কাফিরদের বিপুল মালামাল অর্জিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রা.) গনীমতের এক পঞ্চমাংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আলাদা করে অবশিষ্টটুকু সাথীদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বের করার এ নিয়ম প্রথম

www.nagorikpathagar.org

চালু হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত এক পঞ্চমাংশ বের করার হুকুম আসেনি। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের (রা.) আমল অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম নাযিল হয়। অপর বর্ণনা মতে তিনি সমস্ত গণিমতের মাল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নখলা বাসীর মালামাল ভাগ বন্টন করা স্থগিত রাখেন। পরে বদরের গনীমতের সংগে মিলিয়ে তা যথাযথ ভাগ করেন।

(৭) বদরের যুদ্ধের পরে ২য় হিজরীর ২২শে রমযান হযরত ওমায়র ইবনে আদি (রা.) কে আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। সে ছিল এজিদ ইবনে যায়েদের স্ত্রী এবং বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের বংশভুত। এ কুচক্রী নারী সদা সর্বদা অকথ্য ভাষায় গাল মন্দ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। সে কবিতা লিখে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে কাফিরদের উস্কানি দিত। বিস্ময়করভাবে অন্ধ সাহাবী হয়েও হযরত ওমায়র (রা.) সুযোগ মত তাকে হত্যা করেন। এর বিনিময়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বছীর (চক্ষুবিশিষ্ট) উপাধি দিয়েছিলেন।

(৮) ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত ছালিম ইবনে ওমায়ের (রা.) কে ১২০ বছর বয়স্ক এক ইহুদী কুচক্রী বৃদ্ধকে হত্যার জন্য পাঠান। তার নাম ছিল আবু আস। সে জঘন্য কবিতা লিখে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অমার্জনীয় কটূক্তি করত। ছালিম (রা.) তাকে গোপনে হত্যা করে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(৯) ৩য় হিজরীর মহররমের শুরুতে আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ আল মাখজুমী (রা.) এর বাহিনীকে 'ক্বাতান' প্রেরণ করা হয়। এটি হচ্ছে বনু আসাদের একটি পাহাড় বা কূপের নাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একশত পঞ্চাশ জন সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে প্রচুর গনীমত হস্তগত হয়। হযরত আবু সালামা (রা.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পছন্দ মত সামগ্রী এবং এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট মাল সাথীদের মধ্যে ভাগ করে দেন। প্রত্যেকের অংশে ৭টি করে উট এবং ততোধিক ছাগল বন্টন হয়েছিল।

(১০) ৩য় হিজরীর মহররম মাসে পুনরায় আব্দুল্লাহ ইবনে আনিস আসলামী (রা.) কে একাকী কুচক্রী সুফিয়ান ইবনে খালিদ এবং তার সংগীদের মুকাবিলার জন্য 'বতনে উরানায়' প্রেরণ করেন। বতনে উরানা আরাফাতের কাছে একটি ময়দানের নাম। তিনি তৃতীয় হিজরীর ৫ই মহররম অভিযানে বের হন। সুফিয়ান ইবনে

www.nagorikpathagar.org

খালিদকে হত্যা করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত তার মস্তক এনে হাজির করেন। ২২ মহররম শনিবার তিনি ফিরে আসেন।

(১১) তৃতীয় হিজরীর সফর মাসে 'রাজী' এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসিম ইবনে ছাবিত ইবনে আবু আফলাহকে দশজন সাহাবীর বাহিনী দিয়ে আজল এবং কারার দিকে প্রেরণ করেন। তারা ছিল ইলিয়াস ইবনে মুজরের আওলাদের দু'টি কাবিলা। সাহাবাগণ যখন 'রাজী' নামক স্থানে পৌছেন তখন দুশত তীরান্দাজ বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। আটজন মুসলিম সেনা ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান এবং কাফিররা তিনজনকে গ্রেফতার করে মক্কায় নিয়ে যায়। এ তিনজন হলেন, (১) যায়েদ ইবনুদ্দাসিলা (রা.) (২) খুবাইব ইবনে আদী (রা.) (৩) আব্দুল্লাহ ইবনে তারিক (রা.)। গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পথে তারা যখন মররুজ জাহরান স্থানে পৌছেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে তারিক (রা.) সামনে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করেন। সুতরাং তাকে শহীদ করা হয়। খুবাইব এবং যায়েদকে (রা.) মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়া হয়। তারা অনেক দিন পর্যন্ত মক্কায় বন্দী জীবন কাঁটান। মহররম শেষ হওয়া মাত্র সফর মাসে উভয়কে একই দিনে শহীদ করা হয়।

(১২) ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে হামরাউল আসাদের যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মুনযির ইবনে আমর এর যুদ্ধা বাহিনীকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য বি'রে মাউনায় প্রেরণ করা হয়। এ অভিযানকে ক্বারার এর অভিযান বলা হয়। আসহাবে সুফফার সত্তর জনের এ দলটি ছিল কুরআনের ক্বারী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রা'আল কাজওয়ান ওসাইয়া এবং বনু লাহিয়ান এর নিকট ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কাফিরগণ এসব সাহাবাকে শহীদ করে ফেলে। মাত্র একজন সাহাবী পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তার নাম আমর ইবনে উমাইয়া (রা.)। তিনি ফিরে এসে সকল সাথীর শাহাদাতের সংবাদ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) ঐসব সাহাবা যেদিন শহীদ হয়েছিলেন, সেদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সংবাদ দিয়েছিলেন। সংবাদ শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব কাফিরদের উপর যারপর নাই রাগান্বিত হন। একটানা এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পাঠ করে তাদের বদদোয়া করেন। পরিশেষে এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়। 'এ ব্যাপারে আপনার কোন ইখতিয়ার নেই। (আপনি ধৈর্যধারণ করুন) যাতে আল্লাহ তাদের দিকে মনযোগী হন অথবা শাস্তি দেন, কারণ তারা যে যালিম।' (আলে ইমরান-১২৮)। এ আয়াত

www.nagorikpathagar.org

নাযিল হওয়ার পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনূতে নাযেলা বন্ধ করে দেন। বি'রে মাউনা মক্কা এবং আসফানের মধ্যবর্তী বনু হোজাইলের এক স্থানের নাম।

(১৩) পঞ্চম হিজরীতে দাওমাতুল জুন্দাল, বনীল মুস্তালিক, খন্দক এবং বনী কুরাইযার যুদ্ধ হয়েছিল। ফলে এ বছর কোন সারায়া বা ছোট অভিযান হয়নি। অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে। তবে জুরকানী শরহে মাওয়াহিবে, হাফিয ইবনে হাজার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ বছর জুমাদাল উখরায় হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। যা নজদের ইদকে একশত আরোহী নিয়ে করা হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর মহররম মাসে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে ত্রিশজন আরোহীসহ ক্বিরতার দিকে প্রেরণ করা হয়। তারা ১৫০টি উট এবং তিন হাজার ছাগল গনীমতস্বরূপ লাভ করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রা.) বলেন, 'আমি এ অভিযানের উদ্দেশ্যে ১০ই মহররম রওনা হই। ১৯ দিন সফরে থাকি। অতঃপর মহররমের একদিন বাকী থাকতে মদীনায় ফিরে আসি।' এ অভিযানে সাহাবায়ে কেরামরা, ছামামা ইবনে আছাল হাসাদীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন ইয়ামামাবাসীর সর্দার। অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(১৪) একই বছর রবিউল আউয়াল মাসে ওক্বাশা ইবনে মিহসান (রা.) কে চল্লিশ অশ্বারোহী বাহিনীসহ ওমর মারজুক্বের মুকাবিলায় পাঠান হয়। তারা বিজয়ী হয়ে দু'শত উট নিয়ে ফিরে আসেন। কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। কোন সাহাবী শহীদও হননি। সবাই নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(১৫) ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে কিংবা রবিউস সানীতে, হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে (রা.) দশজন সৈন্যসহ বনু মা'বিয়ার দিকে প্রেরণ করা হয়। তারা যুলকিসসা নামক স্থানে বাস করত। এ যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের বিজয় হয় এবং মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সাথী শাহাদাতবরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে তাদের সাহায্যের জন্য হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) কে প্রেরণ করেন। তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

(১৬) একই বছর রবিউস সানীর শেষ দিকে হযরত আবু ওবাইদা ইবনে জারারাহ (রা.) এর বাহিনীকে যাতুল কিসসা পাঠান হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সংবাদ পেলেন যে, কাফিররা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়ে গেছে এবং অধিকাংশই শাহাদাত বরণ করেছে। তখনই মহানবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাহিনীকে পাঠিয়ে ছিলেন। ২৮ শে রবিউস সানী রোজ শনিবার দিন, এ বাহিনীকে পাঠান হয়। তারা শত্রুকে পরাজিত করে বিপুল সংখ্যক জীব-জন্তু গনীমত হিসেবে হস্তগত করেন।

(১৭) একই বছর রবিউস সানীর শেষ তারিখে এবং কারো কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনী, বনী সুলাইমের উদ্দেশ্যে জামুম পাঠান হয়। এটা হচ্ছে মদীনা থেকে বার মাইল দূরে নাখলার কাছে একটি স্থানের নাম। এ বাহিনী শত্রু পক্ষের কিছু লোকদের বন্দী করে এবং তাদের জীব-জন্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(১৮) একই বছর জুমাদাল উখরা মাসে মতান্তরে জুমাদল উলা মাসে যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনী বনু সালাবা ইবনে সাদ এর উদ্দেশ্যে 'তারাফ' নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। পনের জন সাথীর এ বাহিনী যথাসময়ে সেখানে পৌছে। কোন যুদ্ধ হয়নি। মুসলমান বাহিনী বিশটি উট গনীমতস্বরূপ নিয়ে আসেন।

(১৯) ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনী বনু জুযামের উদ্দেশ্যে ওয়াদিউল কুরার পথে হিসমার ভূখণ্ডে প্রেরণ করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঁচশত আরোহীসহ প্রেরণ করেন। তারা গনীমতস্বরূপ এক হাজার উট, পাঁচ হাজার ছাগল নিয়ে আসেন। তাছাড়া একশত মহিলা এবং শিশুদের বন্দী করে নিয়ে আসেন। উক্ত কাবিলার সর্দার রেফায়া ইবনে য়ায়েদ আল জুযামী নিজ বাহিনীর দশজন সদস্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হন এবং তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকল বন্দী এবং জীব-জন্তু ফেরৎ দিয়ে দেন।

(২০) একই বছর জুমাদাল উখরা অথবা রজব মাসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাহিনী বনী ফাজরার দিকে ওয়াদিউল কুরা পাঠান হয়। এ অভিযান, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) অভিযানের আগে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাহিনীতে একশত সৈন্য ছিলেন। বেশ ক'জন কাফির অভিযানে নিহত হয় এবং অনেকেই গ্রেফতার হয়।

(২১) এ বছর রজব মাসে জায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনী বনু ফাজারার উদ্দেশ্যে ওয়াদিউল কুরা পাঠান হয়। কোন যুদ্ধ হয়নি।

(২২) একই বছর শা'বান মাসে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এর

www.nagorikpathagar.org

বাহিনীকে দাওমাতুল জানদাল এর দিকে অভিযানে পাঠান হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) কে ডেকে নিজের পার্শ্বে বসান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ী পরান। অতঃপর শত শত বাহিনীর কাফেলা সংগে নিয়ে তাকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য পাঠান। তারা দাওমাতুর জান্দাল পৌছে এলাকার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। অধিকাংশ লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেনি। অথচ তারা জিযিয়া ট্যাক্স বা কর দিতে সম্মত হয়।

(২৩) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনীকে মাদায়েন প্রেরণ করা হয়। তার সংগে হযরত আলীর গোলাম জমিরাও (রা.) ছিলেন। এ যুদ্ধে কিছু বন্দী হস্তগত হয়। মাদায়েন হযরত সোয়াইব (আ.) এর গোত্রের শহরের নাম। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে তাবুকের বিপরীত দিকে এটি অবস্থিত।

(২৪) একই বছর শা'বান মাসে হযরত আলী (রা.) এর বাহিনীকে একশত সৈন্য নিয়ে বনু সাদ ইবনে বকর এর উদ্দেশ্যে ফাদাক পাঠান হয়। আলী (রা.) সেখান থেকে গণিমতস্বরূপ পাঁচশত উট এবং দু'হাজার ছাগল নিয়ে আসেন।

(২৫) ৬ষ্ঠ হিজরীতে পুনরায় রমযান মাসে যায়েদ ইবনে হারিসার (রা.) বাহিনীকে দ্বিতীয় বারের মত বনু ফাজারার উদ্দেশ্যে ওয়াদিউল কুরা পাঠান হয়। তিনি সেখানে গিয়ে কিছু কাফিরকে হত্যা করেন এবং কিছু কাফিরকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। বন্দীদের মধ্যে উম্মে কিরফা নামক এক মহিলাও ছিল। তার আসল নাম ফাতিমা বিনতে রবিয়া ইবনে বদর। সে তার কাবিলার অত্যধিক বরণীয় হিসেবে বিবেচিত ছিল। তার মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল প্রবাদের মত। সে নিজ ঘরে সবসময় পঞ্চাশটি তরবারী লটকে রাখত। এসব তরবারীর পরিচালক ছিল তার এমন আত্মীয়-স্বজন যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ নয়। বার জন ছিল তার নিজের ছেলে। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) এ মহিলাকে হত্যা করে, তার দুনিয়াবী প্রতিপত্তিকে ভূলণ্ঠিত করেন।

(২৬) ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে আরেকটি অভিযানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক আনসারীর বাহিনীকে আবু রাফে ইহুদীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। পাঁচ অথবা সাতজন সাহাবী এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবু রাফে ইহুদী, হেজায ভূমির খাইবার এর কাছে একটি দুর্গে বাস করত। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অমার্জনীয় কটূক্তি করত। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে উস্কানী দিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

আতিক (রা.) রাতের আঁধারে তাকে হত্যা করে, দুনিয়াবী শয়তানী থেকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

(২৭) ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) কে উসায়ের ইবনে রেযাম ইহুদীর প্রতি খায়বারে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীকে ত্রিশজন সৈন্য ছিল। বাহিনীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক আনসারী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)ও ছিলেন। তারা উক্ত ইহুদীর কাছে গিয়ে পৌছেন এবং বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন যাতে তুমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে হাজির হও। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে পুরস্কারে ভূষিত করবেন এবং তোমাকে খাইবারের শাসক নিযুক্ত করবেন। লোভী উসাইর সেই লালসায় ত্রিশজন ইহুদীকে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। রাস্তায় উসায়ের ও তার দল মুসলিম বাহিনীর সাথে বিরোধিতা এবং বিদ্রোহ করে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) তাকে হত্যা করেন। তার সাথীগণ যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যায়। ফলে মুসলমান বাহিনী শত্রুদের সবাইকে হত্যা করেন। মাত্র একজন পলায়ন করতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি।

(২৮) ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত কিরজ ইবনে জাবির আলকুরশীর (রা.) বাহিনী 'আকল এবং উরাইনার' দিকে পাঠান হয়। তারা ছিলেন সে আট ব্যক্তি, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনাতে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেখানকার আবহাওয়া অনুকূল মনে না হওয়ায়, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি নিয়ে জংগলে চলে যান। সেখানে যাকাতের উট ময়দানে চরতে ছিল। তারা সেখানে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাখাল ইয়াসারকে হত্যা করে এবং উট নিয়ে চলে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কিরজ ইবনে জাবির (রা.) এর নেতৃত্বে বিশজন আরোহী সৈন্যকে এ বিশ্বাসঘাতকদের ধাওয়া করার জন্য পাঠান। অতঃপর তাদেরকে গ্রেপ্তার করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির করা হয়। এদের সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়। 'যারা আল্লাহর সংগে এবং তার রাসূলের সংগে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে (অর্থাৎ যারা ছিনতাই এবং দস্যুবৃত্তি করে) তাদের শাস্তি হচ্ছে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত এবং পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা ভূমি থেকে বের করে দেয়া হবে।' সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত-পা কেটে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সেভাবেই তাদেরকে হত্যা করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

(২৯) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জমিরী (রা.) কে কুচক্রী আবু সুফিয়ানকে আকস্মিক হত্যা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পাঠান হয়। কারণ কেননা আবু সুফিয়ান এক নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র করেছিল। সে একজন লোককে মদীনায় পাঠিয়েছিল। যেন সে, কোন সুযোগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে। এরপর হযরত আমর মক্কায় আসেন। কিন্তু তিনি আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার কোন সুযোগ করতে পারেননি। তবে তিনি মক্কার বাইরে দু'জন কাফিরকে হত্যা করতে সক্ষম হন। এরা হল, আমর ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে মালিক এবং বনু বুদাইলের এক ব্যক্তি। অতঃপর অপর দু'ব্যক্তির সংগে তার সাক্ষাৎ হয়, যাদেরকে কুরাইশবাসী গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে মদীনায় পাঠিয়ে ছিল। হযরত আমর (রা.) উক্ত দু'জনের একজনকে হত্যা করেন এবং অপরজনকে বন্দী করে নিয়ে আসেন মদীনায়।

(৩০) ৭ম হিজরীতে মহররম মাসে হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা.) এর যোদ্ধা বাহিনীকে নজদের দিকে প্রেরণ করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কয়েকজন সাহাবীসহ নিজে খায়বারের যুদ্ধের জন্য তাশরীফ নেবার পূর্বেই মদীনা থেকে পাঠিয়ে দেন। ঐ বাহিনীটি অনেক বিলম্বে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেদমতে খাইবার গিয়ে পৌছেন। এসময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ শেষ করেছেন। সুতরাং তারা খাইবারের গনীমতের অংশ থেকে বঞ্চিত থাকেন। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দানস্বরূপ সামান্য দিয়েছিলেন। তাদের ফিরে আসার সময় হযরত আবু হুরাইরা (রা.) দুস কাবিলার সাথে ইয়ামান থেকে এসেছিলেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে ঐ সময় গিয়ে পৌছি, যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারে অবস্থান করছিলেন। আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে দিবেন না।' আমি বললাম 'এ হচ্ছে নো'মান ইবনে কাওকাল (রা.) আনসারীর হত্যাকারী। তাকে উহুদের যুদ্ধে আবান শহীদ করেছিলেন। তিনি তখন মক্কার কাফির সৈন্যদের পক্ষে ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।' এটা শুনে আবান বলেন, 'কেমন আশ্চর্য কথা! এক বিড়াল 'জান' নামক পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আমাদের কাছে এসেছে। সে আমার উপর এমন একজন মুসলমান হত্যার দোষারোপ করছে যাকে মহান আল্লাহ আমার হাতে শাহাদাতের মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাকে তাঁর হাতে লাঞ্ছিত করেননি।' ব্যাপারটি যদি উল্টা ঘটে যেত অর্থাৎ আমি যদি কুফরী অবস্থায়

তার হাতে নিহত হতাম, তবে লজ্জিত হয়ে জাহান্নামে যেতে হত। আল্লাহ্ আমাকে এই লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেছেন। কি জ্ঞানগর্ভ কথা।

(৩১) ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে আমিরুল মু'মেনীন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর বাহিনীকে তুরবা নামক স্থানে পাঠান হয়। তুরবা মক্কা থেকে দু'দিনের পথ, এক ময়দানের নাম। বনু হাওয়াজিনের অবশিষ্ট কাফিরগণ এখানে বাস করত। হযরত ওমর (রা.) ত্রিশটি সওয়ারী নিয়ে রওনা হন। কাফিরগণ এ সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে। যুদ্ধ হয়নি। হযরত ওমর (রা.) নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(৩২) শাবান মাসে আমিরুল মুমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বাহিনী, বনু কেলাব গোত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা নজদে, ওয়াদিউল কুরার কাছে বসবাস করত। যুদ্ধে শত্রু পক্ষের কতিপয় নিহত এবং কিছু সংখ্যক বন্দী হয়। তিনি নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(৩৩) শাবান মাসে হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.) এর বাহিনীকে বনু মাতারার উদ্দেশ্যে ফাদাক পাঠান হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ত্রিশজন আরোহী সৈন্যের আমীর বানিয়ে পাঠান। তাঁদের মধ্যে উসামা ইবনে যায়েদ, আবু মাসউদ আবদরী এবং কাব ইবনে ওজরাও (রা.) শরিক ছিলেন। সেখানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়; তথাপি তারা কয়েকটি উট এবং ছাগল গনীমতস্বরূপ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে হযরত বশীরের (রা.) অনেক সাথী শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মদীনায় আসেন। একই হিজরীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার তাদের সাহায্যের জন্য সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাত প্রেরণ করেন। তাঁরা গিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং গনীমত ছিনিয়ে আনেন।

(৩৪) ৭ম হিজরীর রমযানুল মোবারকে হযরত গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল লাইছি (রা.) এর বাহিনী বনু উয়াল এবং বনু আব্দ ইবনে ছালাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নজদ এলাকা মদীনা থেকে ৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত। মীফা নামক এলাকার দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একত্রিশ জনের বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদও (রা.) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিজয় হয় মুসলমানদের। তারা বহুসংখ্যক উট এবং ছাগল গনীমতস্বরূপ নিয়ে আসেন। কাউকে বন্দী করেননি।

(৩৫) ৭ম হিজরীতে হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রা.) এর বাহিনী ইয়ামান এবং জাবার দিকে প্রেরণ করা হয়। ইয়ামান এবং জাবার দু'টি স্থানের নাম; যা খাইবার

www.nagorikpathagar.org

এবং ওয়াদিউল কুরার কাছেই অবস্থিত। সেখানে বনু গাতফান গোত্র বসবাস করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তিনশত সৈন্যের বাহিনীসহ প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল নিয়ে আসেন। এ ছাড়া দু'ব্যক্তিকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন। পরে এ দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(৩৬) একই বছর যিলহজ্ব মাসে হযরত আখরাম ইবনে আব্দুল আওজা আস সালমী (রা.) এর বাহিনীকে বনু সুলাইম এর উদ্দেশ্যে পাঠান হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পঞ্চাশ সদস্যসহ প্রেরণ করেন। সেখানে কাফিরদের সংগে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। হযরত আখরাম (রা.) ছাড়া তার সকল সাথী শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ১লা সফর ৭ম হিজরী তারিখে মদীনায় নিসঙ্গ ফিরে আসেন।

(৩৭) ৮ম হিজরীর সফর মাসে হযরত গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ আল লাইছী (রা.) এর বাহিনী বনু মুলাওয়াহ এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর হয়। তারা কাদীদে বসবাস করত। এটি মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চৌদ্দ বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত গালিব (রা.) এবং তার বাহিনী যুদ্ধে জয় লাভ করেন। মুসলমান সৈন্যগণ কাফিরদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করেন। কাফিরদের মহিলা এবং শিশুদের বন্দী করেন। তাদের সকল জীব-জন্তু মদীনায় নিয়ে আসেন।

(৩৮) একই বছর সফর মাসে অপর একটি বাহিনী মো'সাব এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা ফাদাকে বসবাস করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু'শত সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করেন। মুশরিকদের সংগে মুকাবিলা হয়। তাদের উট এবং ছাগলসমূহকে গনীমত হিসেবে নিয়ে আসা হয়। মহিলা এবং শিশুদের বন্দী করা হয়। মাথাপিছু গনীমত হয় দশ উট অথবা এর সমান ছাগল। দশটি ছাগল এক উটের সমান ধরা হয়েছিল।

(৩৯) ৮ম হিজরীর রবিউল আউয়ালে হযরত শুজা ইবনে ওহাব (রা.) এর অভিযান বনু হাওয়াজিন এর এক শাখা বুন আমিরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তারা ছায়ী নামক স্থানে বাস করত। এটি ইরাকের কাছাকাছি অবস্থিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চব্বিশজন সাথীসহ প্রেরণ করেন। বিপুল সংখ্যক উট এবং ছাগল তাদের হস্তগত হয়। বাহিনী এগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন মদীনায়। গনীমত হিসেবে মাথাপিছু পনেরটি করে উট তাদের অংশে আসে। এক উট সমান বিশটি ছাগল ধরা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

(৪০) একই বছর রবিউল আউয়ালে হযরত কাব ইবনে ওমায়র আনসারীকে (রা.) যাতে আতলা নামক স্থানে পাঠান হয়। এ যুদ্ধে কাফির সৈন্য বিজয়ী হয়। সকল মুসলমান সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। মাত্র একজন জীবিত ছিলেন। তিনি এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেন। যাতে আতাল' সিরিয়ার এক জায়গার নাম।

(৪১) ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলায় মুতার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি তথাপি বিপুল সংখ্যক মুসলমান তাতে অংশ নিয়েছিলেন। এজন্য এ যুদ্ধকে গাযওয়ায়ে মুতাও বলা হয়। মুতা সিরিয়ার একটি বিখ্যাত শহরের নাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) কে আমীর মনোনীত করেন এবং বলেছিলেন যদি যায়েদ (রা.) শহীদ হয়ে যায় তবে জাফর বিন আবু তালিব (রা.) আমীর হবে। জাফর (রা.) শহীদ হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.) আমীর হবে। তিনি শহীদ হলে মুসলমানদের মধ্যে পরামর্শক্রমে একজন আমীর নিযুক্ত করে নিবে। রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস আড়াই লক্ষ সৈন্য নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুকাবিলার জন্য বালকা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। এ তিন জন জেনারেলের শাহাদাত বরণের পর মুসলমানগণ পরামর্শক্রমে আল্লাহর তরবারী (সাইফুল্লাহ) হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) কে আমীর নির্বাচন করেন। তিনি ঝা া হাতে নিয়ে মুসলমানদের নতুন করে সাজান এবং কাফির সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আল্লাহর সাহায্যে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে যায়। কাফিরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এবং পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদকে আল্লাহর তরবারী উপাধি দেন। এ যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) হতে নয়টি তরবারী ভেঙ্গে যায়। তিনি বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র জেনারেল যিনি যুদ্ধের ময়দানে সৈনিক হতে জেনারেল নির্বাচিত হন এবং জীবনে কখনই কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। তিনি কাফির ও মুসলিম উভয় অবস্থায় জয়ী হয়েছেন। খালিদের (রা.) সৈন্য পরিচালনা, কৌশল, ক্ষিপ্রতা সবই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'খালিদ আল্লাহর তরবারীর মধ্যে একটি তরবারী।' এ যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র বার জন সৈন্য শহীদ হন। পক্ষান্তরে কাফির সৈন্যেদের লাশের স্তূপ জমা হয়েছিল। নিহতদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন। কাফিরদের অনেক জেনারেল নিহত হয়। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং সরঞ্জামাদী গনীমতস্বরূপ হস্তগত হয়। এ বিজয় ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীর

www.nagorikpathagar.org

কারণে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহরই! নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুকৌশলী। এ যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিরাশিগুণ। বিশ্বের ইতিহাসে এমন অসম কোন যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি। তদুপরি সে যুদ্ধে মুসলমানরাই জয়ী হয়েছিলেন। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

(৪২) ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলায় হযরত আমর বিন আস (রা.) এর বাহিনীকে যাতুস সালাসিল পাঠান হয়। তিন শত বীর মুহাজির এবং আনসার সাহাবীর মুসলিম বাহিনীর আমীর করে তাকে মুশরিকদের কাজয়া, আমেলা, লখম এবং জুযাম গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম দলে তিনটি ঘোড়া ছিল। সালাসিল নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। পরিশেষে যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী এবং গনীমতের অধিকারী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। আসসালাসিল মদীনার দশ মাইল দূরে একটি কূপের নাম। এ যুদ্ধ যেহেতু ঐ কূপের কাছে সংঘটিত হয়েছিল, তাই একে যাতুস সালাসিল যুদ্ধও বলা হয়। হযরত আমর ইবনুল আসকে (রা.) তার ইসলাম গ্রহণের চার মাস পরে এ অভিযানে পাঠান হয়েছিল।

(৪৩) ৮ম হিজরীর রজব মাসে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) এর বাহিনী কুরাইশের এক কাফেলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তার সংগে ছিলেন তিন শত সৈন্যের একটি দল। কুরাইশদের দলের অবস্থান ছিল মদীনা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে বনু জানাইনাহ এলাকায়। এ যুদ্ধকে সাইফুল বাহার অথবা খাবত এর যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে। যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে গেলে তারা গাছের পাতা চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের খাদ্যের জন্য পাহাড়ের মত একটি মাছ (আম্বর বা তিমি মাছ) সাগরের তীরে উঠে আসে। সাহাবীরা এক মাস পর্যন্ত এ মাছ ভক্ষণ করেন এবং এর তেল শরীরে মালিশ করেন। ফলে তাদের স্বাস্থ্য মোটা তাজা হয়ে যায়। সাহাবাগণ উক্ত মাছের অংশ মদীনাতে নিয়ে আসেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ মাছ খেয়েছিলেন। এখানে মুখোমুখি কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) নীলতিমি বা আম্বর মাছের কাটা দাড়া করেন এবং সবচেয়ে উঁচু সাহাবী হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদাকে (রা.) এর নীচ দিয়ে উটে চড়ে অতিক্রম করার নির্দেশ দেন। তিনি অতি সহজেই নিজ উট নিয়ে মাছের কাটার নিচ দিয়ে অতিক্রম করেন। অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা (রা.) ঐ মাছের চোখের গর্তের ভেতর বসার নির্দেশ দিলে, তাতে তেরজন সাহাবী অনায়াসে বসে পড়েন। মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং সাহায্য সত্যই বিস্ময়কর।

(৪৪) মক্কা বিজয়ের পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর

ইবনে মুতারাহ আলজাহনী (রা.) কে আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যিনি তখনও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরম শত্রু ছিলেন। হযরত আমর (রা.) জুহাইনা এবং মুজিনা গোত্রের কতিপয় সাথী নিয়ে তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আল্লাহ তায়ালা আবু সুফিয়ান এবং তার দল বলকে পরাজিত করেন। তার অনেক সাথী ময়দানে নিহত হয়। অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

(৪৫) ৮ম হিজরীর শাবান মাসে হযরত আবু কাতাদা, ইবনুল হারিস আল রবয়ী আল আনসারী আসসালামী (রা.) এর বাহিনী বনু মুহারিবের উদ্দেশ্যে গাতফান এলাকায় প্রেরণ করা হয়। তারা 'খাজরা' নামক স্থানে বাস করত। এটি ছিল নজদ অঞ্চলে বনু মুহারিবের ভূমির নাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ষোল জন সংগীসহ প্রেরণ করেন। তারা যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। কাফিরদের বহু সৈন্য গ্রেফতার হয়। দু'শত উট এবং দু'হাজার ছাগল গনীমতস্বরূপ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়।

(৪৬) ৮ম হিজরীর রমযানের শুরুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর আগে আবু কাতাদার (রা.) একটি বাহিনী বতনে ইজম প্রেরণ করা হয়। এটি মদীনার একটি ময়দান বা পাহাড়ের নাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আট জন সংগীসহ প্রেরণ করেন। কোন যুদ্ধ হয়নি। তারা সকলেই নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

(৪৭) ৮ম হিজরীর রমযান মাসে হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করা হয় যুদ্ধে ওসামা (রা.) এর এক প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটেছিল। সামনাসামনি সমর যুদ্ধের সময় একজন কাফির সৈন্য তার সামনে আসে। তিনি তাকে হত্যা করার জন্য তরবারী উঠান। সে তখন কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে। তথাপি হযরত উসামা তাকে হত্যা করে ফেলেন। মদীনায় ফিরে আসার পরে, যখন মহানবী ঘটনা জানতে পান, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে ওসামা, 'তুমি কিয়ামতের দিনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ব্যাপারে কি করবে? অর্থাৎ তোমার উপর যখন একজন মুসলমান হত্যার মামলা হবে তখন তুমি কি জবাব দিবে? হযরত উসামা আরজ করেন, 'আমি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হই, সে তখন ভীত হয়ে কালিমা পাঠ করেছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি তার বুক চিরে দেখলে না কেন?' অর্থাৎ সে কি অন্তর দিয়ে পাঠ করেছে না মৃত্যুর ভয়ে! এ কলেমা এতটাই দামী।

www.nagorikpathagar.org

(৪৮) ৮ম হিজরীতে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় শেষ করেন, তখন রমযান মাসের ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে অর্থাৎ ২৪ রমযান 'মানাত' নামক প্রতিমা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সাদ ইবনে যায়েদ আল আশ হালীর (রা.) বাহিনী প্রেরণ করেন। এটা ছিল আওছ এবং খাজরাজের দেবতা। তিনি বিশজন সৈন্য নিয়ে সেখানে যান এবং প্রতীমা ধ্বংস করে সফলভাবে মক্কায় ফিরে আসেন।

(৪৯) মক্কা বিজয় শেষে ওজ্জা নামক মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওলীদের (রা.) বাহিনী প্রেরণ করেন। মক্কার পূর্ব দিকে নাখলা নামক স্থানে এটি স্থাপিত ছিল। হযরত খালেদ (রা.) ত্রিশজন সাহাবী নিয়ে মূর্তিটি ভেংগে ফেলেন।

(৫০) মক্কা বিজয়ের পরে রমযান মাসেই সোয়া নামক মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আসের (রা.) বাহিনী প্রেরণ করেন। এ মূর্তি রুহাত নামক স্থানে সাগরের পাড়ে মক্কা থেকে কিছু দূরে একটি গ্রামে অবস্থিত ছিল। হযরত আমর ইবনে আস (রা.) সেখানে গিয়ে মূর্তি ধ্বংস করে সফলভাবে ফিরে আসেন।

(৫১) মক্কা বিজয়ের পরে এবং হুনাইন যুদ্ধের পূর্বে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এর বাহিনীকে বনী জুমাইমার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এটি হচ্ছে বনু কানানার একটি শাখা। ইয়ালামলামের কাছে মক্কা থেকে একদিনের পথে তাদের আবাস ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত পঞ্চাশ জন আনসার ও মুহাজিরকে এ অভিযানে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে কিছু কাফির নিহত এবং বন্দী হয়। এ যুদ্ধে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটেছিল। হযরত খালিদ (রা.) যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী পরিচালনা শুরু করেন, তখন কতিপয় মুশরিক (নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে) আমরা আমাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছি (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছি) বলে উঠে। অথচ লোকেরা "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" এমন সুস্পষ্ট ভাষায় তা বলতে পারেনি। সুতরাং হযরত খালিদ (রা.) তাদের ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলেন। এ সংবাদ পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ (রা.)-কে দোষারোপ করেন এবং হাত তুলে তিন বার বলেন, 'হে আল্লাহ! খালিদ যা কিছু করেছে আমি সে সম্পর্কে জড়িত না থাকার কথা ঘোষণা করছি।' অবশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকের জান ও মালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

(৫২) ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইন এবং তায়েফ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে

আবু আমির ওবায়দ ইবনে ছালিম বিন হেজার আল আশয়ারী (রা.) (হযরত আবু মূসা আশয়ারীর চাচা) এর বাহিনীকে আওতাসে পাঠান হয়। হুনাইন যুদ্ধের পরে ঐসব কাফিরদের মুকাবিলার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঠিয়েছিলেন; যারা হুনাইন থেকে পলায়ন করেছিল। আবু দুরাইদ ইবনে আম্মারের সংগে তাঁর যুদ্ধ হয়। আবু দুরাইদ নিহত হয়, তার সাথীরা পরাজিত হয়। বিপুল পরিমাণ মালামাল এবং বন্দী গনীমতস্বরূপ হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবু আমির (রা.) শাহাদাতবরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আমিরের জন্য দোয়া করেন, 'আয় আল্লাহ! আবু আমির ওবায়দের মাগফিরাত করুন। তাকে আপনার সৃষ্টির বহু লোকের উপর মর্যাদা দান করুন।' এ যুদ্ধে হযরত আবু মূসা আশয়ারী, আবু আমিরের (রা.) হত্যাকারীকে হত্যা করেন।

(৫৩) শাওয়াল মাসে হুনাইন এবং তায়েফ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত তুফায়েল ইবনে দোয়াইলী (রা.) এর বাহিনী যুলকাফফাইনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। যুল কাফফাইন বনু দুস কাবিলার মূর্তির নাম। এটা ছিল কাঠের তৈরী। মুসলিম বাহিনী মূর্তি ভেংগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ পৌছার চারদিন পরে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন।

(৫৪) ৮ম হিজরীর যিলকদ মাসে জিয়িয়ারানা থেকে ফিরে আসার পথে কয়েস ইবনে আসাদ ইবনে ওবাদা (রা.) এর বাহিনী চার শত সৈন্যসহ মদার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ হচ্ছে আরবের একটি গোত্র যারা ইয়ামানের দিকে বাস করত। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৫৫) ৮ম হিজরীর যিলকদ মাসে তায়েফ থেকে ফেরার পথে এবং জিয়িয়ারানার গনীমতের মাল বণ্টনের পরে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের (রা.) বাহিনী ইয়ামানের হামাদন কাবিলার দিকে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা.) সেখানে পৌছে তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। ছ'মাস পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তারা ইসলাম কবুল করেনি। হযরত খালিদ তাদের কিছু লোকদের বন্দী করেন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে সেখানে পাঠান। তিনি সেখানে পৌছার পর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আনুগত্য স্বীকার করেন। এ যুদ্ধে একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়। হযরত আলী (রা.) সেখানে একটি দাসী, নিজের জন্য বেছে

www.nagorikpathagar.org

দেন, সে ছিল সবচেয়ে ভাল। তিনি তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে মদীনায় নিয়ে আসেন। হযরত বুরাইদা ইবনে হাসির আসলামীর (রা.) খেয়াল হল যে, হযরত আলী (রা.) গনীমতের মালে খেয়ানত করেছেন। কাজেই তিনি তার সংগে হিংসা পোষণ করতে থাকেন। মদীনায় ফিরে আসার পরে এ বিষয়টি আলোচনা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বুরাইদা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, 'বুরাইদা! তুমি আলীর সংগে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। কারণ আলী আমার এবং আমি আলীর।' আলীর (রা.) সংগে যদি তোমার ভালবাসা থাকে তবে সে ভালবাসা আরও বৃদ্ধি কর। হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, 'এ কথার পরে আমার নিকট আলীর (রা.) চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র আর কেউ ছিল না।'

(৫৬) ৯ম হিজরীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উইহায়না ইবনে হিসন আল ফেজারীর বাহিনীকে বনু তামীম গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে কোন মুহাজির বা আনসার ছিলেন না। যুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কাফির পক্ষের এগারজন পুরুষ, একশ জন মহিলা এবং ত্রিশজন শিশু বন্দী হয়।

(৫৭) ৯ম হিজরীর সফরে আব্দুল্লাহ ইবনে আওসাজা (রা.) এর বাহিনী ইসলামের দাওয়াতের জন্য বনু হারিছা ইবনে আমর এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদ দোয়া করেন। তাদের বিবেক বিলুপ্ত হয়। কাজেই তাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং নির্বোধ হওয়ার সে রোগ এখনও অব্যাহত আছে। তাদের কথা বার্তা পাগলের প্রলাপের মত হয়ে থাকে।

(৫৮) একই বছর সফর মাসে হযরত কুতবা ইবনে আমির আল আনসারী আল খাযরাজী আল বদরী (রা.) এর বহিনী বনু খাছয়াম এর প্রতি প্রেরিত হয়। এটি ইয়ামান দেশের একটি দুর্গ ঘেরা শহর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশজন সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ জয়ী হয়ে কাফিরদের উট, ছাগল এবং মহিলাদের গনীমতস্বরূপ অধিকারী হন।

(৫৯) ৯ম হিজরীর সফর মাসে মতান্তরে রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী মাসে হযরত জেহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীর (রা.) বাহিনীকে 'ক্বারাতা' নামক এলাকায় প্রেরণ করা হয়। এটি বনু ওকায়েদ ইবনে কোরের একটি শাখা। হযরত জেহাক (রা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। যুদ্ধ সংঘটিত হলে কাফির বাহিনী পরাজিত হয়। হযরত জেহাক (রা.) নিরাপদে গনীমতসহ ফিরে আসেন। আলকামা ইবনে মুজাজাজ মুদলাজী (রা.) এর

www.nagorikpathagar.org

বাহিনীকে জিদ্দার সাগরের তীর ঘেষে মূলত দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য প্রেরণ করা হয়। সেখানে আবিসিনিয়া থেকে কিছু লোক এসে একত্রিত হয়ে বাস করছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনশত সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। মুসলিম সৈন্য সেখানে পৌঁছা মাত্র তারা যুদ্ধ না করে পলায়নের পথ বেছে নেয়।

(৬০) এ বছর রবিউল আখের মাসে হযরত আলী (রা.) এর বাহিনীকে ফুলমনাক মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বনু তাই কাবিলার দিকে প্রেরণ করা হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দলে দু'শত অশ্বারোহী বাহিনীসহ পাঠিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) এর বাহিনী ঐ মূর্তিকে ধ্বংস করে। মুসলমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। বিপুল পরিমাণ উট, ছাগল এবং যুদ্ধবন্দী হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে দু'টি তরবারী হস্তগত হয়। একটির নাম মিখজাস, অপরটির নাম আতারাসুব। আলী (রা.) তরবারীদ্বয় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেশ করেন। পরবর্তী অধিকাংশ যুদ্ধেই এ তরবারী দু'টি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে থাকত। এ যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে বিখ্যাত দানবীর হাতীম তাইয়ের কন্যা এবং আদী ইবনে হাতিমের বোন সাফফানা ইসলাম গ্রহণ করেন। তার অনুরোধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দিয়ে দেন। বন্দীদের সংখ্যা ছিল নয় শত। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ভাই আদি ইবনে হাতিমকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। দশ হিজরীতে আদি ইবনে হাতিম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৬১) একই বছর রবিউস সানী মাসে হযরত ওক্কাসা ইবনে মিহসান (রা.) এর বাহিনী হেবাবে পাঠান হয়। যুদ্ধবিহীন মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

(৬২) একই বছর রজব মাসে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে অবস্থান করছিলেন, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের (রা.) বাহিনীকে উকাইদার ইবনে আকদ ইবনে আব্দুল মালিক নাসরানীর (খ্রীস্টান নেতা) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। উকাইদার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশের মতে সে কুফরী অবস্থায় নিহত হয়। সে ছিল রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে দাওমাতুল জুনদালের গভর্নর। উকাইদার মুসলিম সেনাবাহিনীর সংগে দু'হাজার উট, আটশত ঘোড়া, চারশ বল্লম এবং চারশ নেজার বিনিময়ে চুক্তির প্রস্তাব দেয়। মুসলিম বাহিনী তা গ্রহণ করেন। উকাউদার দাওমাতুল জানদালের গভর্নর তথা বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে চারশ

বিশজন আরোহীসহ তার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) উকাইদার এবং তার ভাই মুসাদিকে বন্দী করে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা প্রদান করেন। সসম্মানে তাদেরকে ফেরত দেন। লিখিত চুক্তিনামাও প্রদান করেন।

(৬৩) ৯ম হিজরীর শেষের দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) কে 'লাত' নামক মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তায়েফের দিকে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে গিয়ে মূর্তিটি ভেংগে চুরমার করে দেয়। সেখানে মজুদ যাবতীয় মালামাল অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, অলংকার, বস্ত্র, সুগন্ধি ইত্যাদি নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মালামাল বিতরণ করে দেন।

(৬৪) নবম হিজরীর মতান্তরে দশম হিজরীর রবিউস সানীর শেষদিকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু মূসা আশয়ারী এবং হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রা.) কে ইয়ামানে গভর্নর করে পাঠান। ইয়ামানের দু'টি অঞ্চল ছিল। উঁচু এলাকায় হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.)কে গভর্নর করে পাঠান। মহানবী তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'নম্র ব্যবহার করবে কঠোর হবে না। সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা জন্মাবে না।'

(৬৫) দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস ছানী মাসে মতান্তরে জুমাদাল উলা মাসে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) এর বাহিনী বনু আবদে মাদান এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। এটি হচ্ছে বনু হারিছ ইবনে কাব এর একটি শাখা। তারা ইয়ামানে বসবাস করত। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় এবং ইরশাদ ফরমান তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণ কবুল করে নিবে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে, তবে যুদ্ধ করবে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। হযরত খালিদ (রা.) তাতে সম্মত হয়ে তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন।

(৬৬) একই হিজরীতে হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের (রা.) অভিযান আরবের কতিপয় লোকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। হযরত মিকদাদ (রা.) যখন তাদের কাছে পৌঁছেন তারা পালিয়ে চলে যায়। মাত্র একজন লোক থেকে যায়। তার কাছে বিপুল পরিমাণ মালামাল ছিল। সে কালিমা পাঠ করে এবং

মুসলমানদের সালাম করে। হযরত মিকদাদ (রা.) মনে করেন বিপদ দেখে কালিমা পড়া এবং ইসলাম গ্রহণ সঠিক নয়। তাই তিনি তাকে হত্যা করেন। সংবাদ পেয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত মিকদাদ (রা.) কে ডেকে পাঠান এবং খুবই দোষারোপ করেন এবং ইরশাদ ফরমান, 'মিকদাদ! তুমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, যে বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। কিয়ামতের দিন তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে কি করে দায় মুক্ত হবে।' উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হও (সফর কর), তখন যাচাই করে নিও। আর যে কেউ তোমাদেরকে সালাম করে তাকে তোমরা মুসলমান নয় এরূপ বলবে না।'

(৬৭) দশম হিজরীর রমযান মাসে হযরত আলী (রা.) এর বাহিনীকে দ্বিতীয়বার ইয়ামান প্রেরণ করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনশত আরোহী যোদ্ধাসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের সংগে যুদ্ধ হয় এবং বিশজন কাফির নিহত হয়। তিনি ঐসব লোকদের আবার ইসলামের দাওয়াত দেন। এবার তারা সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা.) সেখানে অবস্থান করে তাদের কুরআন শরীফ এবং শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেন। অতঃপর আলী (রা.) বিদায় হজ্বের সময় এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাক্ষাৎ করেন।

(৬৮) দশম হিজরীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আবদের নয় সদস্য বিশিষ্ট এক বাহিনীকে কুরাইশদের একটি কাফেলাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কোন সংঘর্ষ হয়নি।

(৬৯) একই বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী রি'য়াই সুহাইমীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রি'য়াই এর কাছে মুসলিম বাহিনী পৌঁছে, তাদের পরিবারবর্গ, মালামালসহ গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। কোন একটি জিনিসও অবশিষ্ট রাখেননি। এরপর রি'য়াইবাসীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এসে হাজির হন অথচ তাদের যাবতীয় মালামাল পূর্বেই ভাগ বণ্টন হয়ে গেছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত ধরে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পরিবারবর্গ এবং সকল মালামাল ফিরত দিয়ে দেন।

(৭০) এ বছর হযরত আবু উমামা বাহিনীকে প্রেরণ করা হয় 'মুদাইয়াবিন নাজলীন' এর উদ্দেশ্যে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজ গোত্র বনু বাহেলার নিকট ইসলামের দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি নিজ গোত্রের

www.nagorikpathagar.org

দিকে যান। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

(৭১) দশম হিজরীতে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আলবজলীর (রা.) অভিযান যুল খালাসাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পাঠান হয়। যুল খালাসা একটি জায়গার নাম, যেখানে খাসয়াম কাবিলা এবং হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালীর গোত্রের 'বনু বুহাইলাহ' নামক মূর্তি স্থাপিত ছিল। কা'বা শরীফের সংগে শত্রুতার বশীভূত হয়ে ঐ জায়গাটি নির্মাণ করা ছিল। যাতে জনগণের দৃষ্টি কা'বা শরীফ থেকে ফিরে যুল লামার দিকে নিবদ্ধ হয়। তারা এটাকে 'কা'বায়ে শামিয়া' নামে অভিহিত করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আহমান গোত্রের একশত পঞ্চাশ আরোহী বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে হযরত আবু আরতাতও শামিল ছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে তথাকথিত শামিয়া কা'বা ধ্বংস করে। তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। সেখানে উপস্থিত কাফিরদের হত্যা করে। অতঃপর হযরত আবু আরতাদ (রা.) কে সুসংবাদ দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পাঠান। তিনি এসে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাকে রোগাক্রান্ত উটের মত করে দিয়েছি।' এ সংবাদ শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমানের আরোহী এবং পদাতিক বাহিনীর জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করেন। এরপর হযরত জারীর (রা.) আপন সাথীদের নিয়ে ফিরে আসেন। তারা রাস্তায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনতে পান।

(৭২) দশম হিজরীতে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং হযরত খালিদ ইবনে সায়ীদের (রা.) বাহিনী ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করেন এবং ইরশাদ করেন, 'তোমরা যদি একত্রে থাকো তবে তোমাদের আমীর হবে আলী (রা.)। আর যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয় তবে উভয়েই নিজ নিজ দলের আমীর হবে।' তাঁরা ইয়ামান গিয়ে কতিপয় কাফিরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন।

(৭৩) এ বছর খালিদ ইবনে ওলীদের (রা.) বাহিনী ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা.) সেখানে পৌছার পর তারা ভয়ে এবং আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। হযরত খালিদ তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে নাখোশ হন এবং তাদের অর্ধেক ক্ষতিপূরণ দান করেন।

(৭৪) দশম হিজরীর সফর মাসের শেষ দিকে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)

www.nagorikpathagar.org

এর অভিযান 'উবনার' দিকে প্রেরণ করেন। এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেরিত সর্বশেষ অভিযান। উবনা সিরিয়ার একটি স্থানের নাম। ২৬ শে সফর শনিবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের বাহিনীর সংগে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। রোমানরা সিরিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। পরের দিন ২৭ সফর রবিবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে (রা.) এ জামায়াতের আমীর মনোনীত করেন। সফরের ত্রিশ তারিখে জ্বর আর মাথা ব্যথার মধ্য দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ রোগের উদ্রেক হয়। ১লা রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাতে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের (রা.) জন্য ঝা া তৈরী করেন এবং তাঁকে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আবু ওবাদা ইবনে জাররাহ, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত সায়িদ ইবনে যায়েদ, হযরত কাতাদা ইবনে নোমান, হযরত সালামা ইবনে আসলাম প্রমুখ শীর্ষ আনসার এবং মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে সংগে করে পাঠান। হযরত উসামা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিদায় নিয়ে জুরুফ নামক স্থানে তাঁবু পরিবেশন করেন। যাতে সকল সৈন্য সেখানে সমবেত হতে পারে। এ জায়গাটি উহুদ পাহাড়ের পিছনে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সাহাবীরা যখন জানতে পেলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ মারাত্মক হয়ে পড়েছে, তখন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর , হযরত ওসমান এবং হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) এবং কতিপয় সাহাবা মদীনায় ফিরে আসেন। ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত উসামা (রা.) জিহাদের সফর শুরু করতে যাচ্ছিলেন। আকস্মিক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সংবাদ এসে পৌছে। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' সুতরাং তিনি সকল সাথী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। অতঃপর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলিফা হলেন তখন সর্বপ্রথম হযরত উসামার বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত উসামা (রা.) তিন হাজার সৈন্য নিয়ে জুরুফ নামক স্থান থেকে ১লা রবিউস সানী ১১ হিজরী রওনা করেন। সৈন্যদের মধ্যে সাতশত কুরাইশ সৈন্য ছিলেন। এক হাজার ঘোড়া ছিল। এ বাহিনী ধীরে ধীরে উবনা পৌছে। সেখানে মুশরিকদের সংগে যুদ্ধ হয়। যারা মোকাবেলা করতে আসে তাদেরকে হত্যা করা হয়। তাদের স্ত্রী সন্তানদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের ঘরবাড়ি, শস্য ক্ষেত এবং বাগান ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ যুদ্ধে কোন মুসলমানের ক্ষতি হয়নি। হযরত উসামা (রা.)

www.nagorikpathagar.org

নিরাপদে এবং বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। ১১তম হিজরীর এটাই শেষ অভিযান। যা বিশ্বনবীর জীবন দশায় শুরু হয়ে আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের সময় পূর্ণতা পায় ও শেষ হয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সকল যুদ্ধ ও অভিযানে মুসলমানদের সর্বমোট শহীদের সংখ্যা ২৫৯ জন, আহত ১২৭ জন এবং বন্দী মাত্র একজন। অপরদিকে কাফির এবং বিধর্মীদের নিহতের সংখ্যা ৭৫৯ জন বা এক হাজার আহত সহস্রাধিক এবং বন্দী ৬৫৬৪ জন (সীরাত ইবনে হিশাম)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬৩ বছর বয়সে ১২ই রবিউল আওয়াল ১১ হিজরী বা ৭ই জুন ৬৩২ খ্রীঃ রোজ সোমবার ইন্তিকাল করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোট জীবনকাল ছিল ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টার মত। মুসলমানদের এতোগুলো যুদ্ধ বা অভিযানে হতাহতের সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে নগণ্য। এর বিপরীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা তিন কোটি এবং আহতের সংখ্যা তিন কোটি এবং এ দুটো যুদ্ধের নায়ক বা কারণ অমুসলিমরা। অতএব যারা মুসলমানদের যুদ্ধবাজ জাতি বলে; তারাই এই পরিসংখ্যানগুলো দেখলেই জবাব পেয়ে যাবেন। বরং এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং বিশ্বনবী শান্তির দূত।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমরনীতি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সামরিক নীতি রেখে গেছেন তা পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সংক্ষেপে তাঁর সমর নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। সৈন্যদের প্রতি ধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ ছিল। মদ্যপান, ব্যভিচার ও লুটতরাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

২। যুদ্ধক্ষেত্রে নামায ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাদ দেয়া যাবে না।

৩। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমত) এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য। এগুলো জাতীয় সম্পদরূপে গরীবদের জন্য রক্ষিত থাকবে।

৪। যুদ্ধে প্রথম আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল অর্থাৎ অন্যায়কে প্রতিহত করার এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত ইসলামে কোন যুদ্ধ ছিল না।

৫। মুসলমানদের যুদ্ধ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মাত্র। তাই তাকবীর ছাড়া যেকোন রণহুংকার নিষেধ ছিল। এ সংগ্রামকেই জিহাদ বলা হয়েছে।

৬। যুদ্ধে স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, রুগ্ন, সকল অসহায় এবং অসামরিক ব্যক্তিকে আঘাত

www.nagorikpathagar.org

করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। জীব জন্তু, পশু পাখি, শস্যক্ষেত্র, বাড়ি ঘর ইত্যাদির উপর হস্তক্ষেপ বা ক্ষয়ক্ষতি করাকে পাপ বলে ঘোষিত হয়েছিল।

৭। রাজদূতকে হত্যা বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

৮। শত্রু হোক, সৈন্য হোক, আশ্রয় প্রার্থনা করলে সংগে সংগে আশ্রয় দেয়ার বিধান করা হয়েছিল।

৯। যুদ্ধাবস্থায় অথবা যুদ্ধের পূর্বে বা পরে শত্রুরা শান্তির প্রস্তাব দিলে, সংগে সংগে তা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১০। যুদ্ধ বন্দিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই শুধুমাত্র ঘোষণা ছিল না, তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর দক্ষতা ও কৌশল

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে যে কেউ একথা স্বীকার করতে নৈতিকভাবে বাধ্য হবে যে, তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল সামরিক কমাণ্ডার। পরিবেশ, পরিস্থিতি, পটভূমি, প্রাসঙ্গিক লক্ষণসমূহ এবং পরিণতি ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় মেধার অধিকারী। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা ছিল নির্ভুল এবং বিবেকের সচেতনতা ছিল গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। নবুওয়াত ও রিসালাতের গুণে তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন বা প্রেরিত সকল নবী রাসূলের নেতা। অন্যদিকে সামরিক নেতৃত্বের গুণবৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ। যে সকল যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সব ক্ষেত্রেই তিনি কার্যকারণ ও পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সঠিক কৌশল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দক্ষতা, সমর কৌশলতা, সাহসিকতা, কৌশল ও নেতৃত্ব ছিল অনন্য। সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন, অবস্থান নির্ণয়; ইত্যাদিতে তাঁকে কেউ ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর সমর কৌশলতায় প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বের সেরা যুদ্ধবিশারদের চেয়েও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনায় পরাজয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ওহুদ এবং হুনাইনের যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিকল্পনার ত্রুটি নয়। বরং কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের ব্যক্তিগত দুর্বলতাই এর জন্যে দায়ী ছিল। আর ওহুদের যুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করার পরিণতি তো সবারই জানা।

উভয় যুদ্ধেই মুসলমানরা পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সময় তিনি

www.nagorikpathagar.org

যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার উদাহরণ ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শত্রু বেষ্টনীতেও ছিলেন অটল অবিচল। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি তুলনাহীন সমর কৌশলতায় ও বীরত্বে শত্রুদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এ ছাড়া হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর সমর কৌশলতায় মুসলমানদের পরাজয় অবশেষে চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হয়। অথচ ওহুদের মত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং হুনাইনের মত ভয়কাতরতা ও অস্থিরতা যে কোনো সেনানায়কের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিকে লোপ করে দেয়ার কথা। এসব ক্ষেত্রে সেনা কমাণ্ডারদের স্নায়ুর উপর এত বেশী চাপ সৃষ্টি হয়, যাতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। অথচ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়ে ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন।

এসব হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সামরিক দিক। আরেকটি দিক আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল যুদ্ধের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। ফেতনা ফাসাদের আগুন নিভিয়ে দেন। ইসলাম ও পৌত্তলিকতার সংঘর্ষে শত্রুর শক্তি-সামর্থ্য এবং অহংকার নস্যাৎ করে দেন। ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের পথকে স্বাধীন নির্বিঘ্ন করে দিতে পৌত্তলিকদের সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেন। এছাড়া এসব যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রু মিত্র, প্রকৃত মুসলমান এবং মুনাফিকদের পার্থক্য নির্ণীত হয়।

সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সেনানায়কদের এক অপরাজেয় দল গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্ট সেনাদল ইরাক, সিরিয়া, পারস্য ও রোমের যুদ্ধে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কৌশল গ্রহণে বড় বড় যুদ্ধবাজদের হার মানিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, শত্রুদের তাদের ভূখণ্ড, ধন-সম্পদ, খেত-খামার, বাগান, পানির আধার, সম্মানজনক অবস্থান এবং বিলাসী জীবনোপকরণ থেকেও বহিষ্কার করেন। এসব যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জন্যে বাসস্থান, ক্ষেত-খামার এবং কর্মসংস্থানের মত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করেন। বাস্তুভিটাহীন উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান করেন। অস্ত্র, গোলা, সামরিক সরঞ্জামের বহুবিধ উপকরণের ব্যবস্থা করেন। অথচ প্রতিপক্ষের উপর কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি না করেই তিনি এসব করেছিলেন।

জাহেলিয়াতের যুগে যেসব কারণে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠত, রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব কারণও পরিবর্তন করেন। জাহেলিয়াতের যুগে যুদ্ধ মানে লুটতরাজ, হত্যা, ধ্বংস, যুলুম-অত্যাচার, অবিশ্বাস্য রকমের বাড়াবাড়ি, প্রতিশোধ গ্রহণ, দুর্বলের উপর অত্যাচার, জনপদ বিরাণ করা, বাড়িঘর অট্টালিকা ভেঙ্গে ফেলা, নারীদের সম্মান নষ্ট করা, শিশু ও বৃদ্ধদের সাথে নিষ্ঠুর নৃশংস ব্যবহার করা, ক্ষেত-খামারের ফসল নষ্ট করা এবং পশুপাল হত্যা করা। মোটকথা, সর্বাত্মক ক্ষতি ও ধ্বংসই ছিল সেসব যুদ্ধের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম যুক্তিসঙ্গত কারণে যুদ্ধ শুরু করে এবং তার ফলাফল ছিল সর্বকালের মানুষের জন্যে কল্যাণকর। পরবর্তী সকল সময়েই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এসব সংগ্রাম বা জিহাদের পরে মানুষ বুঝতে পেরেছে, জিহাদ হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, যুলুম-অত্যাচার নির্যাতন থেকে বের করে; ন্যায় ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার সশস্ত্র প্রচেষ্টা অর্থাৎ এমন একটা ব্যবস্থা করা যাতে শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে না পারে। বরং স্বৈরাচারী অত্যাচারীদের দুর্বল করে উৎপীড়িত ও দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী যুদ্ধ ও জিহাদের অর্থ হচ্ছে, সেসব দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুকে রক্ষা করা, যারা এ বলে দোয়া করে, হে প্রতিপালক, তুমি আমাদের এ জনপদ থেকে বের কর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী। তুমি তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ কর, তার মাধ্যমে আমাদের সাহায্য কর অর্থাৎ ইসলামী যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর যমীনকে খেয়ানত, যুলুম-অত্যাচার, পাপাচার থেকে মুক্ত করে তার স্থলে শান্তি, নিরাপত্তা, দয়াশীলতা ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্যে উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। মুসলিম সৈন্য এবং সেনাপতিদের সে নীতিমালার বাইরে যেতে দেননি। হযরত সোলায়মান ইবনে বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তিকে সেনাপতির দায়িত্ব দিতেন তখন তাকে তাকওয়া, পরহেযগারী এবং মুসলমান সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। খেয়ানত কর না। অঙ্গীকার লংঘন বা বিশ্বাসঘাতকতা কর না। কারো নাক, কান ইত্যাদি কেটে দিও না। কোন শিশুকে হত্যা কর না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতিদেরকে এভাবে উপদেশ দিতেন ঃ সহজ সরল ব্যবহার করবে, কঠোরতার আশ্রয় নেবে না। মানুষকে শান্তি দেবে, কাউকে ঘৃণা করবে না। রাত্রিকালে কোন শত্রু এলাকায় পৌঁছলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম সকাল হওয়ার আগে হামলা করতেন না। তাছাড়া তিনি অগ্নিসংযোগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কাউকে বেঁধে হত্যা করতে, শিশু মহিলাদের প্রহার এবং হত্যা করতে, লুটতরাজ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, লুটের মাল মৃত জন্তুর চেয়ে বেশী হালাল নয়। অনুরূপ তিনি ক্ষেত-খামার ধ্বংস ও চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করতে এবং গাছপালা কেটে ফেলতে নিষেধ করেন। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কোন আহত ব্যক্তির উপর হামলা করবে না। কোন পলায়নকারী ব্যক্তিকে ধাওয়া করবে না। কোন বন্দীকে হত্যা করবে না। তিনি এ রীতিও প্রবর্তন করেন যে, কোন দূতকে হত্যা করা যাবে না। তিনি একথা বলেছেন যে, কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করা যাবে না। এমনকি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে বিনা কারণে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুগন্ধ তা চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। এসব কারণে এবং উন্নততর রীতিনীতির ফলে ইসলামের যুদ্ধ, জাহেলিয়াত যুগের নোংরামি থেকে পূত পবিত্র হয়ে জিহাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য অসাধারণ কার্যাবলীর উপর কিছু আলোকপাত হওয়া দরকার। এসব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই তিনি সকল নবী-রাসূলের মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর মাথায় সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নেতৃত্বের অনন্য মর্যাদার মুকুট স্থাপন করেছেন। আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত'। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, ওঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর আল্লাহর বড়ত্ব-মহত্ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের কথা বল।।' এরপর কি হল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওঠলেন, নিজ কাঁধে বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় আমানতের বোঝা তুলে নিলেন। একাধারে দাঁড়িয়েই রইলেন। সমগ্র মানবতার বোঝা, সকল আকীদা বিশ্বাসের বোঝা এবং বিভিন্ন ময়দানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার বোঝা, যুদ্ধ জিহাদ ও দৌড় ঝাঁপের বোঝা, সবই ছিল তাঁর কাঁধে। আমৃত্যু তিনি মহান স্রষ্টার বাণী প্রচার করে গেলেন। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে জীবন উৎসর্গ করলেন।

তিনি মানুষের বিবেকের ময়দানে যুদ্ধ জিহাদ এবং দৌড়ঝাঁপ, চেষ্টা প্রচেষ্টার

দায়িত্ব এমন এক সময়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, যখন সকল বিবেক জাহেলিয়াত যুগের নানাবিধ উদ্ভট অমূলক কল্পনা এবং ধারণায় নিমজ্জিত ছিল। তিনি এমন এক সময় দাওয়াতের কাজ এবং শ্রম সাধনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন, যখন মানুষের বিবেক যুগের নানাবিধ উদ্ভট-অমূলক কল্পনায়, বিলাসিতা এবং ভোগে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মানব বিবেককে তাঁর কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর আদলে জাহেলিয়াত এবং জাগতিক জীবনের ভার বোঝা থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি অন্য এক ময়দানে আলাদা যুদ্ধ তথা একটির পর আরেকটি সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর দাওয়াত এবং সে দাওয়াতের উপর ঈমান আনায়নকারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশে শয়তানের দোসররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দাওয়াতের পবিত্র চারাগাছকে মাটির নিচে শেকড় বিস্তার এবং শূন্যে শাখা প্রশাখা বিস্তার তথা ফুলে ফলে সুশোভিত হবার আগেই, যারা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিল, সে সকল ভয়াবহ শত্রুর সাথে তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তিনি জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠতে না ওঠতেই রোম সাম্রাজ্য এ নয়া জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশে তার সীমান্তে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছিল।

এ সকল কর্মতৎপরতার মাঝে তখনো বিবেকের সংগ্রাম সংঘাত শেষ হয়নি, কারণ সেটি হচ্ছে চিরস্থায়ী সংঘাত, এতে শয়তানের সাথে মুকাবিলা করতে হয়। শয়তান মানব মনের গভীরে প্রবেশ করে তার তৎপরতা অব্যাহত রাখে। মুহূর্তের জন্যেও তা শিথিল হয় না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন ময়দানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুনিয়া তাঁর চরণে এসে লুটিয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনো তিনি দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলেন। অথচ ঈমানদাররা তাঁর চারপাশে শান্তি নিরাপত্তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ দারিদ্র্যতাপূর্ণ জীবনের পথে সাধনা অব্যাহত রাখেন। যে কোনো অবস্থায় দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি অভিযোগশূন্য ধৈর্যধারণ করেছিলেন। রাত্রিকালে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন। তাঁর রবের ইবাদাত এবং ধীরে ধীরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সমগ্র বিশ্ব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠতেন। অবশ্য আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে এরকম করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। এমনিভাবে সুদীর্ঘ বাইশ বছরের বেশী সময় যাবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। এ সময় তিনি এক কাজে আত্মনিয়োগ করে অন্য কাজ ভুলে থাকেননি। পরিশেষে ইসলামী দাওয়াত

www.nagorikpathagar.org

ও তাবলীগে এমন ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন, যাতে সবাইকে অবাক হতে হয়। সমগ্র জাযিরাতুল আরব তাঁর অনুগত হয়ে পড়ে। আরবের দিগন্ত থেকে জাহেলিয়াতের মেঘ কেটে যায়। অসুস্থ বিবেকসমূহ সুস্থ হয়ে ওঠে। এমনকি তারা মূর্তিসমূহকে শুধু ছেড়েই দিল না; বরং ভেঙ্গে ফেলল। তাওহীদের বলিষ্ঠ আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠল। ঈমানের তেজে নতুন জীবনীশক্তি লাভ করে মরু বিবেকগুলো আযানের সুমধুর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকল। দিক দিগন্তে আল্লাহু আকবার ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ক্বারীরা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম কায়েম করতে করতে উত্তর দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ল। আরবের আশে পাশে ইসলামের আলো বিকশিত হতে লাগল।

বিচ্ছিন্ন জাতি ও গোত্রসমূহ একত্রিত হয়ে, মানুষ মানুষের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করল। এরপর আর কেউ শোষক শাসক নয়, কেউ শোষিত শাসিত নয়, কারো রক্তচক্ষু কাউকে আর ভীতসন্ত্রস্ত করল না। কেউ যালেম নয়, কেউ মযলুম নয়, কেউ মালিক নয়, কেউ গোলাম নয়। বরং সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পরে ভাই ভাই। তারা একে অন্যকে ভালোবাসে। আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব, অহংকার এবং পিতা পিতামহের নামে আত্মগরিমার অবসান ঘটান। অনারবদের উপর আরবদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শ্বেতাংগদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকল না। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধারিত হল তাকওয়ার ভিত্তিতে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম হচ্ছেন মাটির তৈরী। দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে সমগ্র আরবে আন্তরিক ও মানবীয় ঐক্য এবং সামাজিক ন্যায়নীতি ও সুবিচার অস্তিত্ব লাভ করল। মানব জাতি দুনিয়ার বিভিন্ন সমস্যা তথা আখিরাতের সত্যিকারের মুক্তির ও সৌভাগ্যের পথের সন্ধান পেল। অন্য কথায় যুগের ধারাই পাল্টে গেল। দাওয়াত ও তাবলীগের আগে পৃথিবীতে জাহেলিয়াতের জয়-জয়কার রব উঠেছিল। মানুষের বিবেক পঁচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে গিয়েছিল। ভোগবাদীদের আত্মা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। অত্যাচার এবং দাসত্বের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাপাচারপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধ্বসাত্মক বঞ্চনার ঢেউ বিশ্বকে ওলট পালট করে দিয়েছিল। তদুপরি কুফরী এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকারের মোটা পর্দা পড়ে গিয়েছিল। অথচ সে সময়ও আসমানী মাযহাব (ধর্ম বিশ্বাস) এবং দ্বীনসমূহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানুষ সেসব বিকৃত করে রেখেছিল। ফলে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

পেয়েছিল। দ্বীন ধর্মের বন্ধন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম ছিল প্রাণহীন দেহের মত কিছু দুর্বল আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব বিষয়।

ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের কর্ম পদ্ধতি যখন মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন মানবাত্মা, অলীক ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির দাসত্ব, নোংরামি, ভণ্ডামি অন্যায় অত্যাচার, নৈরাজ্য স্বেচ্ছাচারিতা এবং অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ করে। মানব সমাজকে যুলুম, অত্যাচার, হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য, ধ্বংস, শ্রেণী বৈষম্য, শাসকদের অত্যাচার, জ্যোতিষীদের অবমাননাকর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি দান করে। বিশ্ব তখন দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা, আবিষ্কার, নির্মাণ, স্বাধীনতা, সংস্কার, মারেফাত, ঈমান, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, তাকওয়া, ইখলাস, আখলাক এবং আমলের ভিত্তিতে জীবনের উন্নতি অগ্রগতি ও হকদারের ন্যায্য হক লাভের নিশ্চয়তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এসকল পরিবর্তনের সুবাদে সমগ্র আরব এমন এক জগতের আংগিনায় উপনীত হয় এবং প্রত্যক্ষ করে, যার উদাহরণ মানব অস্তিত্বের কোনো যুগে অথবা কোন দেশে দেখা যায়নি। সমগ্র আরব তার ইতিহাসে এমন জৌলুসপূর্ণ এবং ঝলমলে হয়ে ওঠে যে, এর আগে কখনই কোথাও এরকম দেখা যায়নি। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ইসলাম, মুসলমান ও তাদের মহান নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে। বিশ্ব মানব বুঝতে পারে, এটিই মুক্তির নয়া ঠিকানা এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির একমাত্র উপায়; সকলের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট উন্মুক্ত হয়ে যায়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক সৌন্দর্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অনুপম শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। যার বিবরণ লেখনিতে সম্ভব নয়। এসব কারণেই তাঁর প্রতি সাহাবীদের মন আপনা থেকে নিবেদিত হয়ে যেত। ফলে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মর্যাদা বিধানে মানুষ এমন নিবেদিত চিত্ততার পরিচয় দিত, যার উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কখনই ঘটেনি। তাঁর বন্ধু ও সহচররা তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তারা চাইতেন, যদি প্রয়োজন হয় তবে নিজের মাথাও তরবারীর সামনে পেতে দিবেন, তবু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকে একটি আঁচড়ও যেন লাগতে না পারে। এ ধরনের ভালোবাসার কারণ ও যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ তার মধ্যে সর্বদা বিরাজমান ছিল। স্বভাবসম্মত যেসব গুণের প্রতি মন প্রাণ উজাড় করে দেয়ার

www.nagorikpathagar.org

মানুষের ইচ্ছা জাগে, সেসব গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে এত বেশী ছিল যে, অন্য কারো মধ্যেই সে রকম থাকা অসম্ভব। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য দৈহিক গড়নের ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠন প্রকৃতি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, তাকে এক পলক দেখলেই মহামানব বলে মনে হত।

হিজরতের সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে মাবাদ এর তাঁবুতে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর মদীনার পথে রওনা হয়ে যান। তাঁর চলে যাওয়ার পর উম্মে মাবাদ, স্বামীর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ অবয়বের যে চিত্র তুলে ধরেন তা ছিল অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত। চমকানো রং। উজ্জ্বল চেহারা। সুন্দর গঠন। সটান সোজাও নয়, আবার ঝুঁকে পড়ার মতও নয়; এমন দেহ বল্লম। অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষণ দৈহিক গঠন। সুরমারাঙ্গা চোখ। লম্বা পলক। ঋজু কণ্ঠস্বর। লম্বা ঘাড়। সাদা কালো চোখ। সুরমা কালো পলক। সূক্ষ্ম এবং পরস্পর সম্পৃক্ত চোখের ভ্রু। চমকানো কালো চুল। চুপচাপ থাকার সময় গম্ভীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কথা বলার সময় আকর্ষণীয়। দূর থেকে দেখে মনে হত সবার চেয়ে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যপূর্ণ। কাছে থেকে সুদর্শন মিষ্টি মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। প্রকাশভঙ্গি সুস্পষ্ট। কথা খুব সংক্ষিপ্তও নয় আবার দীর্ঘায়িতও নয়; স্পষ্ট ও পরিমিত বলতেন। কথা বলার সময় মনে হত যেন মুক্তা ঝরছে। মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন। বেঁটেও নয়, লম্বাও নয়। কিছুটা লম্বার দিকেই; মধ্যম উচ্চতা। সহচররা তাঁকে ঘিরে যদি কিছু বলত, তবে তিনি সেকথা গভীর মনোযোগের সাথে শোনতেন। তিনি কোনো আদেশ করলে তারা ছুটে গিয়ে সে আদেশ পালন করতেন। সহচররা তাঁর অত্যন্ত অনুগত এবং তাঁর প্রতি গভীর সম্মান শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। কেউ উদ্ধত দুর্বিনীত ছিল না। কেউ বাহুল্য কথাও বলতেন না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেই, শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসত।

হযরত আলী (রা.), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৈহিক সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্বনবী অস্বাভাবিক লম্বাও ছিলেন না; আবার বেঁটেও ছিলেন না। ছিলেন মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন। তাঁর চুল খুব বেশী কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে খাড়াও ছিল না, ছিল উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের। তাঁর কপোল মাংসলও ছিল না, আবার শুকনোও ছিল না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের ছিল। তাঁর কপাল ছিল প্রশস্ত। গায়ের রং ছিল গোলাপী ও গৌর রংয়ের মিশ্র রূপ। চোখ সুরমারাঙ্গা লালচে, ঘন পল্লববিশিষ্ট। বুকের উপর

www.nagorikpathagar.org

নাভি থেকে হালকা চুলের রেখা ছিল। দেহের অন্য অংশ লোমশূন্য, হাত পা মাংসল। তিনি চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা তুলতেন। তাঁকে হেঁটে যেতে দেখলে মনে হত তিনি যেন উপর থেকে নীচের দিকে যাচ্ছেন। তিনি কোনো দিকে লক্ষ্য করলে পুরোপুরি লক্ষ্য করতেন। উভয় কাঁধের মাঝখানে তাঁর মোহরে নবুওয়াত ছিল। তিনি ছিলেন সকল নবীর শেষনবী। তিনি ছিলেন সর্বাধিক দানশীল, সর্বাধিক সাহসী, সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বাধিক অঙ্গীকার পালনকারী, সর্বাধিক কোমলপ্রাণ এবং সর্বাধিক আভিজাত্যসম্পন্ন। হঠাৎ করে কেউ তাঁকে দেখলে ভীত-বিহবল হয়ে পড়ত। পরিচিত কেউ তাঁর সামনে গেলে ভালোবাসায় ব্যাকুল হত। তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে বর্ণনাকারীকে অবশ্যই বলতে হত; আমি এর আগে তাঁর মত অন্য কাউকে দেখিনি।

হযরত আলীর (রা.) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, বিশ্বনবীর মাথা ছিল বড়, জোড়ার হাড় ছিল ভারি। বুকের মাঝখানে লোমের হালকা রেখা ছিল। তিনি চলার সময় এমনভাবে চলতেন, মনে হতো কেউ যেন উঁচু থেকে নীচুতে অবতরণ করছেন। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেশী ছিল চওড়া, চোখ ছিল লালচে। পায়ের গোড়ালি ছিল সরু ধরনের। হযরত আবু তোফায়েল (রা.) বলেন, তিনি ছিলেন গৌড় রংয়ের, চেহারা ছিল মোলায়েম। তাঁর উচ্চতা ছিল মাঝামাঝি ধরনের। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের তালু ছিল প্রশস্ত, রং ছিল চমকদার। একেবারে সাদাও ছিলেন না, একবারে গমের-রংও ছিল না। ওফাতের সময় পর্যন্ত তাঁর মাথা এবং চেহারার বিশটি চুলও সাদা হয়নি। শুধু কানপট্টির কয়েকটি এবং মাথার কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল। হযরত আবু জোহায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীচের ঠোঁট সংলগ্ন দাড়ি সাদা দেখেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বোসর (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীচের ঠোঁট সংলগ্ন দাড়ির কয়েকটি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

হযরত বারা (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন। উভয় কাঁধের মাঝখানে দূরত্ব ছিল। মাথার চুল ছিল উভয় কানের লতিকা পর্যন্ত। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। কখনো কোন জিনিস তাঁর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যসম্পন্ন দেখিনি। তিনি প্রথমে আহলে কিতাবদের মত চুল আঁচড়াতে পছন্দ করতেন। এ কারণে চুল আঁচড়ালে সিঁথি করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে সিঁথি করতেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)

www.nagorikpathagar.org

বলেন, তাঁর চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা কি তলোয়ারের মত চোখা ছিল? তিনি বলেন, না; বরং তাঁর চেহারা ছিল চাঁদের মত। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা ছিল গোলাকার। রবী বিনতে মোয়াওয়েয (রা.) বলেন, তোমারা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে, তবে মনে হত যে উদীয়মান সূর্য দেখছ। হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রা.) বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছিলাম। সে সময় তাঁর পরিধানে ছিল লাল পোশাক। আমি একবার তাঁর প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, তিনি চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো মানুষ আমি দেখিনি। মনে হত যেন তাঁর চেহারায় সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আমি তাঁর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি হাঁটতে শুরু করলে যমীন যেন তাঁর পায়ে সংকুচিত হয়ে আসত। তাঁর সাথে হাঁটার সময় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, কিন্তু তিনি থাকতেন নির্বিকার।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশী হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠত। দেখে মনে হত, যেন এক টুকরো উজ্জ্বল চাঁদ। একবার তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এর কাছে অবস্থান করছিলেন। ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠার পর তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছিল। তিনি যখন ক্রোধান্বিত হতেন, তখন চেহারা লাল হয়ে যেত, মনে হতো যেন উভয় কপালে আংগুরের দানা নিংড়ে দেয়া হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাসতেন মৃদু হাসতেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হত যেন, সুরমা লাগান, অথচ তাতে সুরমা লাগানো ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনের দুটি দাঁত সামান্য পৃথক ছিল। কথা বলার সময় উভয় দাঁতের মধ্য থেকে আলোকআভা বিচ্ছুরিত হত। তাঁর গ্রীবা ছিল রৌপ্যের নির্মিত পাত্রের মত পরিচ্ছন্ন। চোখের পলক ছিল দীর্ঘ। দাড়ি ছিল ঘন। ললাট ছিল প্রশস্ত। ভ্রু পৃথক। নাসিকা উন্নত। নাভি থেকে বক্ষ পর্যন্ত হালকা লোমের রেখা। বাহুতে কিছু লোম ছিল। পেট এবং বুক ছিল সমান্ত

www.nagorikpathagar.org

রাল। বুক প্রশস্ত। হাতের তালু প্রশস্ত। পথ চলার সময় তিনি কিছুটা ঝুঁকে মধ্যম গতিতে চলতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এমন কোনো রেশম দেখিনি, যা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের তালুর চেয়ে বেশী নরম। এমন কোনো মিশকে আম্বর শুকিনি, যা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুবাসিত ছিল।

হযরত আবু জোহায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাত আমার চেহারার ওপর রেখেছিলাম। সে সময় আমি অনুভব করলাম সে হাত বরফের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা এবং মিশকের চেয়ে বেশী খোশবুদার। কিশোর সাহাবী হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কপোলে হাত রেখেছিলেন, এতে আমি এমন শীতলতা ও সুবাস অনুভব করলাম, মনে হল, তিনি তাঁর পবিত্র হাত আতর বিক্রেতার আতরদান থেকে বের করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাম ছিল মুক্তার মত। হযরত উম্মে সোলায়ম (রা.) বলেন, এ ঘামই ছিল সবচেয়ে উত্তম খোশবু। হযরত জাবের (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো রাস্তা দিয়ে পথ চলার পর; অন্য কেউ সে পথ দিয়ে গেলে বুঝতে পারত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পথে গমন করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল মোহরে নবুওয়াত। কবুতরের ডিমের মত দেখতে এ মোহরে নবুওয়াতের রং ছিল তাঁর দেহ বর্ণের মত। এটি বাম কাঁধের নরম হাড়ের পাশে অবস্থিত ছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাঞ্জল ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় কথা বলতেন। তাঁকে মানসিক অসংকোচ, যথার্থ শব্দ চয়ন, সুন্দর বাক্য গঠন, অর্থের বিশুদ্ধতা, সংকোচ থেকে দূরে অবস্থিতির সাথে সাথে অল্প কথায় বেশী অর্থ বুঝানো গুণে ভূষিত করা হত। তাঁকে দুর্লভ প্রজ্ঞা, কর্মকৌশল এবং আরবের সকল ভাষার জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সাথে সে গোত্রের ভাষায় এবং তাদের বাকরীতিতে কথা বলতেন। বেদুঈনদের মত দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাকভঙ্গি, সম্বোধন প্রকৃতি এবং পাশাপাশি শহরের নাগরিক জীবনের বিশুদ্ধ ভাষা ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন। উপরন্তু তাঁর ছিল ওহীভিত্তিক আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা ও আকর্ষণীয় গুণবৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সাধারণত সকল ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণুতার অধিকারী মানুষের মধ্যেই কোন না কোন ত্রুটির কথা জানা যায়। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন উন্নত ও সুন্দর ছিল যে, তাঁকে যত কষ্ট দেয়া হত; এবং তাঁর উপর দুর্বৃত্তদের উত্ত্যক্ত ও বাড়াবাড়ি যত বৃদ্ধি পেত, তাঁর ধৈর্যও তত বেড়ে যেত।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি কাজের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হলে তিনি সহজ কাজটিই বেছে নিতেন, যদি না সেটা গুনাহের কাজ হত। তিনি কখনো নিজের জন্যে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সম্মান ক্ষুণ্ন করা হলে আল্লাহর জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। তিনি হিংসা ও ক্রোধ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে ছিলেন। সকলের প্রতি সহজেই তিনি রাযি হয়ে যেতেন। তাঁর দান ও দয়াশীলতা পরিমাপ করা ছিল অসম্ভব। দারিদ্র্যের আশংকা থেকে মুক্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি দান খয়রাত করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবার চেয়ে বেশী দানশীল। তাঁর দানশীলতা রমযান মাসে [হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাতের পর] অধিক বেড়ে যেত। রমযান মাসে প্রতি রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। তিনি কল্যাণ ও দানশীলতায় প্রবাহিত বাতাসের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বদাই দান করতেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, কখনোই এমন হয়নি যে, কেউ তাঁর কাছে কিছু চেয়েছে অথচ তিনি দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন।

বীরত্ব বাহাদুরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্থান ছিল সবার উপরে। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদেরও যখন পদস্থলন হয়ে যেত, সে সময়ও তিনি অটল অবিচল থাকতেন। তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় কোনরূপ বিচলিত ভাব আসত না। অনেক বড় বড় বীর বাহাদুরও কখনো কখনো পলায়ন করেছেন, পিছপা হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মাঝে এটা কখনো পাওয়া যায়নি। হযরত আলী (রা.) বলেন, যে সময় যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হত, সে সময় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। কেউ তাঁর চেয়ে বেশী শত্রুর কাছাকাছি হত না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, একরাতে মদীনাবাসীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সবাই এক বিকট শব্দের কারণে দিক বেদিক ছুটতে শুরু করে। পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দেখা হয়। তিনি সবার আগে বিকট শব্দের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি হযরত আবু তালহার (রা.) একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর গলায় তরবারি

ঝুলান ছিল। তিনি লোকদের অভয় দিয়ে বলছিলেন, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক লাজুক প্রকৃতির এবং নিম্ন দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পর্দানশীল কুমারী মেয়ের চেয়ে অধিক লজ্জাশীল। কোন কিছু তাঁর পছন্দ না হলে তাঁর চেহারা দেখেই বুঝা যেত। কারো চেহারার প্রতি তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন না। দৃষ্টি নিচু রাখতেন এবং আসমানের চেয়ে যমীনের দিকেই তার দৃষ্টি বেশী সময় নিবদ্ধ থাকত। সাধারণত তাকানোর সময় নীচু দৃষ্টিতে তাকাতেন। লজ্জাশীলতা ও আত্মসম্মানবোধ এত প্রবল ছিল যে, কারো মুখের উপর সরাসরি অপ্রিয় কথা বলতেন না। কারো ব্যাপারে কোন অপ্রিয় কথা তাঁর কাছে পৌঁছলে, সে লোকের নাম উল্লেখ করে তাকে বিব্রত করতেন না। বরং এভাবে বলতেন, কিছু লোক এভাবে বলাবলি করছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ন্যায়পরায়ণ, পাক পবিত্র, সত্যবাদী এবং একনিষ্ঠ আমানতদার। বন্ধু শত্রু সকলেই এটা স্বীকার করতেন। নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে 'আল আমিন' উপাধি দেয়া হয়েছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতে তাঁর কাছে বিচার-ফয়সালার জন্যে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই হাযির হত। তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত; একবার আবু জাহল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করি। একথার পর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন; 'তারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এ সীমালংঘনকারী যালেমরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে। (সূরা আল আনআম ঃ ৩৩)। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে (তখনও তিনি বিশ্বনবীর শত্রু ছিলেন) জিজ্ঞেস করেছিল, সে নবী যেসব কথা বলেন, সে সব কথা বলার আগে তোমরা তাঁকে মিথ্যা অভিযুক্ত করতে কি না? আবু সুফিয়ান বলেছিলেন না'। তিনি কখনই মিথ্যা বলেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অতি বিনয়ী নিরহংকার। বাদশাদের সম্মানে তাদের সেবক পার্শ্বসহচর যে রকম বিনয়াবনত ভংগিতে দাঁড়িয়ে থাকে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানে সাহাবীদের সেভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি গরীব মিসকিনদের অসুস্থতার খোঁজ নিতেন। গরীবদের সাথে ওঠা বসা করতেন। ক্রীতদাসদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সাধারণ মানুষের মতই বসতেন।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, তিনি নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন।

নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। তিনি নিজ হাতে তেমনি কাজকর্ম করতেন যেমন তোমাদের কেউ ঘরের সাধারণ কাজকর্ম করে। তিনি ছিলেন অন্য সব সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ। নিজের ব্যবহৃত কাপড়ে উকুন, পোকা বা ময়লা থাকলে তিনি নিজে তা বের করতেন। নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংগীকার পালনে ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি খুব বেশী খেয়াল রাখতেন। সবার চেয়ে বেশী সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সাথে নিজেকে উত্থাপন করতেন। বিনীত জীবন যাপনে এবং সৌজন্য শালীনতায় ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি সবার চেয়ে উদার স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অসচ্চরিত্রতা তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয় ছিল। এ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। স্বভাবগতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবেও তিনি কখনো অশালীন কথা বলতেন না। কাউকে কখনই অভিশাপ দিতেন না। বাজারে উচ্চৈঃস্বরে চিল্লাচিল্লি করতেন না।

মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিতেন না। বরং তিনি মন্দের বিনিময়ে ক্ষমার রীতি অবলম্বন করতেন। কেউ তাঁর পিছনে আসতে শুরু করলে তাকে পিছনে ফেলে চলে যেতেন না। পানাহারে দাসীবাঁদীদের চেয়ে উচ্চমান অবলম্বন করতেন না। তিনি তাঁর খাদেমের কাজও করে দিতেন। কোন কাজ করা বা না করা প্রসংগে কখনো খাদেমের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তিনি গরীব মিসকিনদের ভালোবাসতেন। তাদের সাথে ওঠাবসা করতেন এবং তাদের জানাযায় হাযির হতেন। কোনো গরীবকে তার দারিদ্র্যের কারণে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন না। একবার তিনি সফরে ছিলেন। সেসময় একটি বকরী যবাই করার পরামর্শ হয়। একজন বললেন, যবাই করার দায়িত্ব আমার। অন্যজন বললেন, চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার। তৃতীয় জন বললেন, রান্নার দায়িত্ব আমি পালন করব। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবাই বলল, আমরা আপনার কাজ করে দিব। তিনি বললেন, আমি জানি, তোমরা আমার কাজ করে দিবে। কিন্তু আমি তোমাদের চাইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে চাই না। কেননা বান্দা যখন তার আচরণে বন্ধু বান্ধবের মাঝে নিজেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মনে করবে, আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করবেন না। এরপর তিনি উঠে সবচেয়ে কঠিন কাজ অর্থাৎ লাকড়ি সংগ্রহ করতে লেগে যান।

হিন্দ ইবনে আবু হালাল (রা.) তার যবানীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম সর্বদা গভীর চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন। সব সময় চিন্তা-ভাবনা করতেন। আরাম আয়েশের চিন্তা করতেন না। অপ্রয়োজনে কথা বলতেন না। দীর্ঘ সময় যাবত নীরব থাকতেন। কথার শুরুতে ও শেষে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। অস্পষ্ট উচ্চারণে কোনো কথা বলতেন না। অর্থবহ দ্ব্যর্থহীন কথা বলতেন। তাঁর কথায় কোন বাহুল্য থাকত না। তিনি ছিলেন নরম মেজাযের। মামুলি নেয়ামত হলেও তার অমর্যাদা করতেন না। কোন কিছুর নিন্দা সমালোচনা করতেন না। পানাহারে খাদ্য দ্রব্যের সমালোচনা করতেন না। কারো থেকে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোনো আচরণ প্রকাশিত হলে; তার প্রতি তিনি বিরক্ত হতেন। সে লোকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিবৃত্ত হতেন না। তবে তাঁর মন ছিল উদার। নিজের জন্যে কারো উপর ক্রুদ্ধ হতেন না। কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কারো প্রতি ইশারা করতে অঙ্গুলির পরিবর্তে হাতের তালু ব্যবহার করতেন। বিস্ময়ের সময় হাত ওল্টাতেন। ক্রুদ্ধ হলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। খুশী হলে দৃষ্টি নীচু করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় মৃদু হাসতেন। মৃদু হাসির সময় দাঁতের কিয়দংশ মুক্তার মত ঝকমক করত।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থহীন কথা বলতেন না। সাথীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতেন। তাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করতেন না। সকল সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোকদের সম্মান করতেন। সম্মানিত লোককেই নেতা নিযুক্ত করতেন। মানুষের অনিষ্ট, দুষ্কৃতি থেকে সাবধান থাকতেন এবং তাদের থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এ জন্যে কারো থেকে মুখ গোমরা করে রাখতেন না। সাহাবীদের খবরাখবর নিতেন। তাদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন। ভালো বিষয়ের প্রশংসা এবং খারাপ বিষয়ের সমালোচনা করতেন। সব বিষয়েই মধ্যপন্থা পছন্দ করতেন। কোনো বিষয়ে অমনোযোগী থাকা তাঁর অপছন্দ ছিল। লোকজন যেন গাফেল, অমনোযোগী মানসিকতায় ভারাক্রান্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য করতেন। যে কোনো অবস্থার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। সত্য ও ন্যায় থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতেন না। অসত্য থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর কাছে যারা থাকতেন, তারা সকলেই ছিলেন উত্তম মানুষ। তাদের মধ্যেও তারাই ছিলেন তাঁর অতি নিকটের বা কাছের, যারা অধিক উত্তম এবং যারা ছিলেন কল্যাণকামী, পরোপকারী। তাঁর কাছে সে ব্যক্তির মর্যাদাই অধিক ছিল, যে অন্যের দুঃখে সমবেদনা, সহমর্মিতা প্রকাশকারী এবং সাহায্যকারী ছিল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওঠতে বসতে সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তাঁর বসার জন্যে নির্ধারিত কোন জায়গা ছিল না। কোন জনসমাবেশে

www.nagorikpathagar.org

গেলে যেখানে জায়গা খালি পেতেন সেখানেই বসতেন। অন্যদেরও এ রকম করার নির্দেশ দিতেন। উপস্থিত সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। কারো মনে কখনই একথা জাগত না, অমুককে আমার চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। কেউ কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে বসলে বা দাঁড়ালে সে লোকের প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন; যতোক্ষণ না সে আনন্দ চিত্তে ফিরে যেত। এতে তাঁর ধৈর্যের কোন বিচ্যুতি দেখা যেত না। কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে তিনি অকাতরে দান করতেন। প্রার্থিত বস্তু প্রদান অথবা ভাল কথা বলে তাকে খুশী না করা পর্যন্ত বিদায় করতেন না। তিনি নিজের উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যে এবং হাসিমুখ দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করতেন। তিনি ছিলেন সকলের জন্যে পিতৃতুল্য। তাঁর দৃষ্টিতে সবাই ছিল সমান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কারো শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার আধিক্য নির্ণীত হত তাকওয়ার ভিত্তিতে। সকলেই সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করত। বয়োজ্যেষ্ঠকে সবাই সম্মান এবং ছোটকে স্নেহ করত। কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করা হত। অপরিচিত লোককে অবজ্ঞা, উপেক্ষা করা হত না। বরং তার সাথে পরিচিত হয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করা হত।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় সবসময় শান্তি ও স্মিতভাব বিরাজ করত। রুক্ষতা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি বেশী জোরে কথা বলতেন না। অশালীন কোন কথা তাঁর মুখে উচ্চারিত হত না। কার প্রতি রুষ্ট হলেও তাকে ধমক দিয়ে কথা বলতেন না। কার প্রশংসা করার সময় অতি মাত্রায় প্রশংসা করতেন না। যে জিনিসের প্রতি আগ্রহী না হতেন, সেটা সহজেই ভুলে থাকতেন। কোনো ব্যাপারেই কেউ তাঁর কাছে হতাশ হত না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতেন। তা হচ্ছে- ১) অহংকার, ২) কোন জিনিসের বাহুল্যতা এবং ৩) অর্থহীন কথা। আর তিনটি বিষয় থেকে লোকদের নিরাপদ রাখতেন। সেগুলো হচ্ছে- ১) পরের নিন্দা, ২) কাউকে লজ্জা দেয়া এবং ৩) অন্যের দোষ প্রকাশ করা। তিনি ছিলেন চরম পরোপকারী এবং পরম বন্ধুবৎসল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথাই মুখে আনতেন যে কথায় সওয়াব লাভের আশা থাকত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর সাহাবীরা এমনভাবে মাথা নিচু করে বসতেন, দেখে মনে হত তাদের মাথার উপর চড়ুই পাখী বসে আছে। তিনি কথা শেষ করে নীরব হলে সাহাবীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। কোন সাহাবী, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন বাহুল্য কথা বলতেন না। কোন সাহাবী তাঁর কাছে কোন কথা বলতে শুরু করলে,

উপস্থিত অন্য সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরবতা বজায় থাকত। যে কথায় সাহাবীরা হাসতেন, সে কথায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাসতেন। যে কথা শুনে সাহাবীরা অবাক হতেন, সে কথা শুনে তিনিও অবাক হতেন। অপরিচিত লোক কথা বলায় অসংযমী হলে তিনি ধৈর্য হারাতেন না। তিনি বলতেন, কাউকে পরমুখাপেক্ষী দেখলে তার প্রয়োজন পূরণ করে দাও। ইহসানের বিনিময় ছাড়া কোন ব্যাপারেই অন্যের প্রশংসা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। বেহুদা প্রশংসা, চাটুকারিতা ও মুসাহেবী তিনি খুব অপছন্দ করতেন।

হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মজলিসে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ছিলেন। পোশাক পরিধানে তিনি ছিলেন শালীন। অধিকাংশ সময় নীরবতা পালন করতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। যে ব্যক্তি অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলত, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তিনি যখন হাসতেন, মৃদু হাসতেন। সুস্পষ্টভাবে কথা বলতেন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। সাহাবীরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন না। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর উপস্থিতিতে হাসি সংযত রাখতেন এবং মৃদু হাসতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতুলনীয় ও সর্বমহান গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন পূর্ণাংগ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে পরম আকর্ষণীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর নবীর প্রশংসায় বলেন, নিসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এজন্যই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের ভেতরেই সত্যিকারের মানবতার বিকাশ ও সফলতা রয়েছে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ

বিদায় হজ্জের দিন আরাফাতের পূর্বদিকে নামিরা নামক স্থানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবু খাঁটানো হয়েছিল। ১০ যিলহজ্জ, দশম হিজরী; ঠিক দুপুরের পরই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটে চেপে উপত্যকার মাঝামাঝি স্থানে এসে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর প্রতিটি বাক্যই রাবিয়া বিন উমাইয়া বিন খালফ (রা.) কর্তৃক পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। নামায শেষে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শুরু করেন।

www.nagorikpathagar.org

<u>পরকাল সম্পর্কে বলেন ঃ</u>

১। "হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শ্রবণ কর, কেননা আমি এ বছরের পর এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে পুনরায় নাও মিলতে পারি।"

২। "হে মানবমণ্ডলী, (আগত, অনাগতকালের) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত না হচ্ছো, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ এদিন ও এ মাসের মতই পবিত্র।"

৩। "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে, যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি তোমাদের তাঁর সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি।"

<u>সামজিক কর্তব্য সম্পর্কে বলেন ঃ</u>

৪। "যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের অভিভাবক বা আমানতদার, তার উচিত মালিককে তার মালপত্র ফিরিয়ে দেয়া।"

৫। "সুদের উপর নেয়া-দেয়া হারাম ও বাতিল। তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। কারও প্রতি অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না।।"

৬। আল্লাহর সিদ্ধান্ত মতে, সুদ বাতিল এবং আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের জন্য যে সমস্ত সুদ পাওনা আছে সবই বাতিল করা হল।

৭। অজ্ঞাত যুগের খুনের ক্ষতিপূরণ সবই বাতিল হল।

৮। হে মানবমণ্ডলী, শয়তান এদেশে পূজিত হওয়ার আশা ত্যাগ করেছে। সে অন্য দেশে মান্য হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান) সম্পর্কে সতর্ক থাকবে, যেন তোমাদের ভাল কাজ অন্য লোকের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায়।

৯। হে মানবমণ্ডলী, পবিত্র মাসের রহিতকরণ অন্ধকার যুগেরই ধারা। যারা অবিশ্বাস্য পছন্দ করে, তারা বিভ্রান্ত। তারা বলে-এক বছরের পবিত্র মাস, পরের বছর অপবিত্র। তারা আল্লাহ কর্তৃক পবিত্র মাসের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য পবিত্র মাসকে অপবিত্র বলে। সময় ঘুরছে, যে দিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক মাসের সংখ্যা ১২, তাদের মধ্যে ৪টা পবিত্র, ৩টা পরপর এবং জামাদি ও শাবানের মধ্যবর্তী বছর।

<u>স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বলেন ঃ</u>

১০। হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি অধিকার আছে। ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ।

www.nagorikpathagar.org

এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য, তাদের সতীত্ব রক্ষা করা এবং অশ্লীলতা ত্যাগ করা। যদি তারা দোষী হয় তবে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস (সঙ্গম) করো না। তোমরা তাদের সংশোধনার্থে প্রহার কর। কিন্তু যেন ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। যদি তারা অনুতপ্ত হয়, তবে তাদের খেতে দাও, পরতে দাও, তাদের সঙ্গে তখন ভাল ব্যবহার কর। তোমরা একে অন্যকে উপদেশ দিও- তোমাদের স্ত্রী-জাতির প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে। কেননা তারা তোমাদেরই অংশ বা অন্তর্ভুক্ত। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানতরূপে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাক্য দ্বারাই তাদের তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেন ঃ

১১। "হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অনুধাবন কর, যার জন্য আমি আমার কথাগুলো তোমাদের নিকট রেখে গেলাম। যদি তোমরা এটা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর তাহলে তোমরা কোনদিনই বিপথগামী হবে না। বিশেষ করে আল্লাহর কুরআন ও আমার হাদিস (তাঁর দূতের ধর্মীয় নীতি ও জীবন ধারা)।"

১২। "হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অনুধাবন কর, নিশ্চিত করে বুঝে নাও। তোমরা শিক্ষা পেয়েছ প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানদের ভাই। সকল মুসলমানই এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এটা কোন মানুষের জন্যই অবৈধ নয় অনুমতি ব্যতীত অন্যের জিনিস গ্রহণ করবে না। সুতরাং কেউ কারও প্রতি অবিচার করো না।

দণ্ডবিধি সম্পর্কে বলেন ঃ

১৩। একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেয়া যাবে না। অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।

১৪। যদি কোন নাক কাটা হাবসী ক্রীতদাসকেও তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমীর বা নেতা করে দেয়া হয়, তোমরা সর্বতোভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে। তার আদেশ মান্য করবে।

ধর্ম সম্পর্কে বলেন ঃ

১৫। সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এর অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহুজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৬। তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াতে ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ ও জাতি সম্পর্কে বলেন ঃ

১৭। এক দেশের মানুষের উপর অন্য দেশের মানুষের প্রাধান্যের কোন কারণ নেই। সমস্ত মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে উৎপন্ন। মানুষের প্রাধান্য মানুষের যোগ্যতার জন্য এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

১৮। জেনে রেখো। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাই সমগ্র বিশ্বে মুসলমানরা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।

শেষনবী বিষয়ে বলেন ঃ

১৯। হে লোক সকল! শ্রবণ কর, আমার পর কোন নবী নেই। তোমাদের পর আর কোন উম্মত (জাতি) নেই। এ বছরের পর তোমরা হয়তো আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। ইলমে ওহী (ঐশী জ্ঞান) উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট থেকে শিখে নাও।

২০। চারটি কথা স্মরণ রেখো; শিরক (আল্লাহর অংশী) করো না। অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না। চুরি করো না। ব্যভিচার করো না।

দাস-দাসী সম্পর্কে বলেন ঃ

২১। হে মানববৃন্দ! কোন দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করো না। গরিবের উপর অত্যাচার করো না। সাবধান, কারও অসম্মতিতে কোন জিনিস গ্রহণ করো না। সাবধান, মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরী মিটিয়ে দিও। তোমরা যা খাবে ও পরবে, তা তোমাদের দাস-দাসীদের খেতে ও পরতে দিও। যে মানুষ দাস-দাসীদের ক্ষমা করে ও ভালবাসে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন ও ভালবাসেন।

২২। যে ব্যক্তি নিজ বংশের পরিবর্তে নিজেকে অন্য বংশের বলে প্রচার করে। তার উপর আল্লাহর, ফেরেশতাগণের ও মানব জাতির অভিসম্পাত।

প্রকৃত মুসলমান সম্পর্কে বলেন ঃ

২৩। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্যরা নিরাপদ থাকে। ঈমানদার বিশ্বাসী ওই ব্যক্তি, যার হাতে সকল মানুষের ধন ও প্রাণ নিরাপদ থাকে। ওই ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন হতে পারে না– যে দু'বেলা উদর পূর্ণ করে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না-যখন সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করে না।

একতা সম্পর্কে বলেন ঃ

২৪। আমার উম্মতের মধ্যে যে ঝগড়া ও বিবাদ করতে বের হয়, তার বুকে

www.nagorikpathagar.org

আঘাত কর। একত্রে খাওয়া-দাওয়া কর। আলাদা আলাদাভাবে আহার করো না। কেননা একত্রে খাওয়াতে বরকত আছে। যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তার স্থান জাহান্নামে। আমি তোমাদের পাঁচটি আদেশ করছি ঃ একতা রক্ষা কর, জনতার অনুগত থাক, প্রয়োজনে হিজরত কর, উপদেশ শ্রবণ কর এবং আল্লাহর পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

ঘুষ সম্পর্কে বলেন ঃ

২৫। যাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি। আমরা তার ভরণ-পোষণ করি। এরপরও যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাসভঙ্গ বা ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং ঘুষ গ্রহণ মহাপাপ।

হিংসা সম্পর্কে বলেন ঃ

২৬। তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ ত্যাগ কর। কেননা আগুন যেমন জ্বালানি কাঠকে ভস্মীভূত করে, হিংসা তেমনি মানুষের সৎগুণকে ধ্বংস করে।

পরিশ্রমী ও ভিক্ষুক সম্পর্কে বলেন ঃ

২৭। যে ব্যক্তি নিজ হাতের কাজ দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে, তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে যদি এক গাছি দড়ি নিয়ে, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে বিক্রি করে, আল্লাহ তার মুখ রক্ষা করেন। এটাই তার জন্য উত্তম।

আমলনামা সম্পর্কে বলেন ঃ

২৮। তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং আপন আপন ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশ (আমলনামা) পাঠ করতে হবে। তোমরা সাবধান। তখন কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

জ্ঞান সম্পর্কে বলেন ঃ

২৯। তোমরা জেনে রেখো-বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা মূল্যবান। যে জ্ঞানের পথে পরিভ্রমণ করে, আল্লাহ তাকে স্বর্গের পথে পথ দেখান। জ্ঞান অনুসন্ধান কর, জ্ঞানার্জন (বিদ্যাশিক্ষা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয অর্থাৎ অবশ্যই কর্তব্য।

ব্যবহার সম্পর্কে বলেন ঃ

৩০। সমাজে তোমার আচরণ ঐরূপ হবে, যেমন আচরণ তুমি অন্য থেকে কামনা কর। সমাজে তোমার ব্যবহার ঐরূপ হবে, যেরূপ ব্যবহার তুমি নিজে পেলে খুশি হও।

www.nagorikpathagar.org

পিতামাতা সম্পর্কে বলেন ঃ

৩১। হে মানববৃন্দ! তোমরা জেনে রেখো। তোমাদের মাতা-পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি। মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তোমাদের স্বর্গ তোমাদের মায়ের পায়ের তলে অবস্থিত।

শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে বলেন ঃ

৩২। হে মানব সন্তান! তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের উপকার করে।

দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে বলেন ঃ

৩৩। যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিতদের নিকটে আমার এ পয়গাম পৌছিয়ে দেবে। হয়তো উপস্থিতদের কিছু লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কিছু লোক বেশি উপকৃত হবে।

জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানবের সর্বশ্রেষ্ঠতম সাধকের, শ্রেষ্ঠতম রাসূলের ভাষণ যথাযথভাবে অনুবাদ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই এখানে শুধু তাঁর অমূল্য সংবাদটি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে উপস্থিত বিশাল জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন এটা কোন দিন? তারা উত্তর দিলেন, এটা পবিত্র হজ্বের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন আল্লাহ আপনাদের জীবন-মাল সকল কিছু পবিত্র করেছেন, যতক্ষণ আপনারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন? তারা উত্তর দিলেন-হ্যাঁ। এইভাবে তিনি বাক্যের পর বাক্যগুলো বলতে থাকলেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন স্বর্গের সপ্তদ্বার খোলা আকাশের দিকে মুখমণ্ডল উত্তোলন করে বলে উঠলেন- "হে আল্লাহ, আমি কি তোমার রিসালতের গুরুভার ও নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে পেরেছি? হে আল্লাহ, আমি কি আমার কর্তব্য পালন করেছি?" সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন-হ্যাঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়। তখন বিশ্বনবী বলে উঠলেন- "হে আল্লাহ, তুমি আমার সাক্ষী থাক।"

এরপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভাষণ শেষ করলেন। তারপর উট থেকে নেমে 'যুহর' ও 'আসর' নামায পড়লেন। তিনি যে সমাপ্তি ভাষণ দিলেন-আল্লাহ তা সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন করলেন। এরপর আল কুরআনের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আয়াত নাযিল হল। "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য ইসলাম (শান্তি) ধর্ম মনোনীত করে দিলাম।" (সূরা মায়েদা-৩)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত ত্যাগ করলেন। মুযদালিফাতে রাত্রি যাপন করলেন। সকলের সঙ্গে জামাতে মাগরেব (সন্ধ্যা) ও এশার (রাত্রির) নামায সমাপন করলেন।

সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশারিল হারামে অবতরণ করলেন এবং মিনার দিকে যাত্রা করলেন। পথে জামারাত (পাথর নিক্ষিপ্তের স্থান) অতিক্রম করলেন। এরপর হযরত তাঁর ৬৩ বছর বয়সের সাথে মিলিয়ে ৬৩টি উট কুরবানী করলেন। আলী (রা.) বাকি ৩৭টি উট কুরবানী করলেন। এরপর মহানবী তাঁর মস্তক মু ন করলেন। এভাবেই পবিত্র হজ্ব সমাপন হয়। এ হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয়। কেননা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এটাই ছিল শেষ হজ্জ। এ হজ্জকে ভাষণ হজ্জও বলা হয়। কেননা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হজ্জে মানবম লীর প্রতি সাধারণ ও ব্যাপক ভাষণ দান করেছিলেন। সকলকে নির্দেশও দিয়েছিলেন-যাতে তাঁরা তাঁর কথাগুলোকে যারা উপস্থিত থাকতে পারেনি, যারা আসার চেষ্টা করেও আসতে পারেনি, এমনকি যারা তখন পর্যন্ত জন্মায়নি তাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়। যাতে করে তাঁর বাণী কালস্রোতে সর্বদাই বয়ে চলে। একে ইসলামের হজ্জ বলা হয়, কেননা এ হজ্জের দিনে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে চিরদিনের জন্য। আল্লাহপাক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন সম্পর্কে বলেন, "তিনি নিরক্ষরদের একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াত আবৃত্তি করে তাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। ইতোপূর্বে এরাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল। যারা এখনও তাদের দলভুক্ত হয়নি। তাদের জন্যও সে প্রেরিত হয়েছে, আল্লাহ বিজ্ঞানময়।" (৬২ ঃ ২-৩)। "বল-আল্লাহ, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, এ কুরআন আমার নিকট পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের ও যার নিকট পৌঁছাবে তাদের সতর্ক করি।" (৬ ঃ ১৯)

ধীর-স্থির ও বিচক্ষণ হযরত আবু বকর যখন এ আয়াত (মায়েদা ঃ ৩) শুনলেন যে, ইসলাম পূর্ণতা লাভ করল, তখন তিনি আনন্দের পরিবর্তে কেঁদে ফেললেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যে মহান গৌরবজনক গুরুদায়িত্ব এসেছিল আজ তার সম্মানজনক সমাধানের স্বীকৃতিও এসে গেল। সুতরাং মহামানব আর হয়তো বেশিদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন না। তিনি অচিরেই আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবেন। সে কথার ইঙ্গিত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণের

www.nagorikpathagar.org

প্রথমেই দিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই সকল মানুষ তাঁর এ কথার মর্ম অনুধাবন করলেন, তখন তাদের মর্মবেদনার কোন সীমা-পরিসীমা রইল না। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার কোন সান্ত্বনা ছিল না। অবশ্য পূর্বেই আল কুরআনে এসেছে সে মহাসত্য। "আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল, বিধান তাঁরই। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (২৮ ঃ ৮৮)। যমীনের উপর যা কিছু আছে, তা সবই একদিন বিলীন হয়ে যাবে, বাকী থাকবে শুধু তোমার প্রভুর সত্তা - যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব। (৫৫ ঃ ২৬-২৭)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের দুঃখ কষ্ট

১। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন।

২। মাত্র ৬ বছর বয়সে বিনা নোটিসে মাতা ইনতিকাল করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুকালে মাতার নিকট মাত্র কয়েক মাস ছিলেন।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন, তখন তাঁর অভিভাবক ও দাদা আবদুল মুত্তালিব ইনতিকাল করেন।

৪। নবুওয়াতের ১০তম বছরে রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব ইনতিকাল করেন।

৫। একই বছর (নবুওয়াতের ১০তম বছর) প্রিয়তম স্ত্রী খাদীজা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

৬। তিন কন্যার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রুকাইয়া (রা.) ২য় হিজরীতে, যয়নব (রা.) ৮ম হিজরীতে ও উম্মে কুলসুম (রা.) ৯ম হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ৪র্থ কন্যা ফাতিমা (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের ছয় মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

৭। তাঁর প্রথম শিশু পুত্র কাসেম ২ বছর বয়সে এবং ২য় পুত্র আবদুল্লাহ অতি শৈশবে মৃত্যুবরণ করে। সর্বশেষ এবং ৩য় শিশু পুত্র ইব্রাহীম মাত্র ১৬ মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিল ৬১ বছর। বিশ্বনবীর সকল পুত্রসন্তানই অতি শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন।

ইসলামের প্রারম্ভিক রাষ্ট্রের নীতি বা মদীনা সনদ

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মদীনায় গমনের পর নতুন একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যে নীতিমালা ও শাসন তন্ত্রের উপর ভিত্তি করে তা পরিচালনা করেন ইতিহাসে তা মদীনা সনদ নামে বিশ্ব খ্যাতি লাভ করে। নিম্নে তাঁর কয়েকটি ধারা উদ্ধৃত হল ঃ

www.nagorikpathagar.org

১। মদীনার মুশরিক, ইহুদী ও মুসলমান সবাই এক দলভুক্ত হয়ে ঐক্যমতে থাকবে।

২। গোষ্ঠী ও জাতিসমূহ সকলেই ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে। কেউ কারোর ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না।

৩। এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে।

৪। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্র জাতিসমূহের স্বত্বাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৫। মদীনা আক্রান্ত হলে সকলে মিলে যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধ ব্যয় বহন করবে।

৬। উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে হবে।

৭। মদীনায় রক্তপাত করা আজ হতে হারাম বলে গণ্য হবে।

৮। দিয়ত বা খুনের বিনিময়স্বরূপ অর্থ দ আগের মতই বহাল থাকবে।

৯। কোন সম্প্রদায় বাহিরের কোন শত্রুর সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

১০। নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে অথবা শত্রুর সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে, তাঁর সমুচিত শাস্তি বিধান করা হবে। সে যদি তাঁর সন্তানও হয় তবু তাকে ক্ষমা করা হবে না।

১১। কোন সম্প্রদায় মক্কার কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার গোপন সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে না।

১২। অমুসলমানদের মধ্যে কেউ অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোষ্ঠীর প্রধান নির্বাহী হবেন। যেসকল বিষয়ের মীমাংসা সাধারণভাবে না হয় সেগুলোর মীমাংসা তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করবেন।

১৪। এ চুক্তি ভংগ কারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। এ চুক্তিপত্রে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই দস্তখত করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পৌত্তলিক বা মুশরিক, মুনাফিক এবং ইহুদীরা এ চুক্তি ভংগ করে আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছিল।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা

১। হযরত খাদীজা (রা.)

২। হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)

৩। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)

www.nagorikpathagar.org

৪। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

৫। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)

৬। হযরত যুবায়ের (রা.)

৭। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)

৮। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)

৯। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)

১০। হযরত আবু সালামা (রা.)

১১। হযরত আরকাম বিন আবু আরকাম (রা.)

১২। হযরত উসমান বিন মাজুন (রা.)

১৩। হযরত কুদামা বিন মাজুম (রা.)

১৪। হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিস (রা.)

১৫। হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.)

১৬। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)

১৭। হযরত আমির বিন রাবিয়া (রা.)

১৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রা.)

১৯। হযরত আবু আহমদ বিন জাহশ (রা.)

২০। হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.)

২১। হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)

২২। হযরত হাতিব বিন হারিস (রা.)

২৩। হযরত ফাতিমা বিনতে মুজাল্লি (রা.)

২৪। হযরত হাত্তাব বিন হারিস (রা.)

২৫। হযরত ফুকায়হা বিনতে ইয়াসর (রা.)

২৬। হযরত আমর বিন হারিস (রা.)

২৭। হযরত সাইদ বিন হারি উসমান ইবনে মাজুন (রা.)

২৮। হযরত মুত্তালিব বিন আজহার (রা.)

২৯। হযরত রমলা বিনতে আবু আউফ (রা.)

৩০। হযরত আন্নাহাম বিন আবদুল্লাহ (রা.)

www.nagorikpathagar.org

৩১। হযরত আমির বিন যুহায়রা (রা.)

৩২। হযরত খালিদ বিন সাইদ (রা.)

৩৩। হযরত উমায়না (খালিদের স্ত্রী) (রা.)

৩৪। হযরত আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)

৩৫। হযরত খাববাব (রা.)

৩৬। হযরত উমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.)

৩৭। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.)

৩৮। হযরত মাসুম বিন কারী (রা.)

৩৯। হযরত সালিত বিন আমর (রা.)

৪০। হযরত আইয়াশ বিন রাবিয়া (রা.)

৪১। হযরত আসমা বিনতে সালামা (রা.)

৪২। হযরত খুনায়েস (রা.)

৪৩। হযরত হাতিব বিন আমর (রা.)

৪৪। হযরত আবু হুজায়ফা (রা.)

৪৫। হযরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ (রা.)

৪৬। হযরত খালিদ বুকায়ের (রা.)

৪৭। হযরত আকিদ বিন বুকায়ের (রা.)

৪৮। হযরত আয়াস বিন বুকায়ের (রা.)

৪৯। হযরত আমির বিন বুকায়ের (রা.)

৫০। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)

৫১। হযরত সুহায়ের বিন সিনান (রা.)

৫২। হযরত ফাতিমা (রা.) বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৫৩। হযরত রুকাইয়া (রা.) বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৫৪। হযরত যয়নব (রা.) বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৫৫। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উল্লেখ ঃ নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরের মধ্যে এসব সম্মানিত সাহাবীরা ঈমান আনেন। এরপর হযরত ওমর ফারুক (রা.) মুসলমান হলে প্রকাশ্যে ইসলামের

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াত শুরু হয়। একই সময় হযরত হামযা ইবনে মুত্তালিব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। (ইবনে ইসহাক)

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ভয়াবহ নির্যাতন ভোগকারী কয়েকজন সাহাবা

১। উসমান বিন আফফান (রা.) ঃ উমাইয়া গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৩৮ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর চাচা হাকাম বিন আবিল আস তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করেন। তিনি নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন। উসমান (রা.) পরে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

২। যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) ঃ বনু আসাদ গোত্রের একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি ইসলামের গোড়ার দিকে রাসূলুল্লাহ (রা.) এর নিকট দ্বীনের দীক্ষা গ্রহন করেন। তাঁর চাচা তাঁর সমস্ত শরীরে কম্বল দ্বারা জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে শাস্তি দিত। যাতে তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন। যুবায়ের (রা.) সমস্ত অত্যাচার হাসি মুখে সহ্য করে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন।

৩। সাইদ বিন যায়েদ (রা.) ঃ বনু আদি গোত্রের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং হযরত ওমর (রা.) এর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন শুনে, ওমর (রা.) (তখনও তিনি মুসলমান হননি) তাকে বেদম প্রহার করেছিলেন। প্রহারে বাধা দিলে এক পর্যায়ে ওমর (রা.) নিজের বোনকে রক্তাক্ত করে ফেলেন। বোনের রক্ত দেখে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়। বোনের নিকট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি ঐশী চেতনায় আপ্লুত হন। দৌড়ে গিয়ে তখনই মহানবীর (রা.) নিকট বাইয়াত হন।

৪। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ঃ তিনি হুদাইল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কা'বা গৃহের সামনে তিনি একদিন গণপ্রহারে আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়।

৫। আবু যর গিফারী (রা.) ঃ সিরিয়ার নিকটবর্তী গিফার বংশের একজন জেদী প তি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করায় মক্কার প্রান্তরে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব তাকে উদ্ধার না করলে হয়ত সেদিন তিনি শহীদ হয়ে যেতেন।

৬। বিল্লাল বিন রাবাহ (রা.) ঃ উমায়ের ইবনে খালফের ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে তিনি যে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং কেবল 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ করেছেন; তা বিশ্ববিধৃত। তাঁর সুমধুর ও উচ্চ

www.nagorikpathagar.org

কণ্ঠস্বরের জন্য তাকে মসজিদে নববীতে মুয়ায্যিন নিযুক্ত করা হয়। তাকে আরবের তপ্ত মরুর বালিতে খালি গায়ে টানা হেচড়া করা হত।

৭। আবু ফাকিহ (রা.) ঃ তিনি ছিলেন সফ্ওয়ান বিন উমাইয়ার ক্রীতদাস। আবু ফাকিহ (রা.) হযরত বিল্লালের মতই অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাকে বেদম প্রহার করা হত। প্রতিদিনই রুটিন করে মারপিট করা হত। তবুও তিনি ইসলামে অটল থেকেছেন।

৮। আমির ইবন ফুহাইর (রা.) ঃ তিনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তাকেও অন্যান্য ক্রীত দাসের মত অজস্র দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে খরিদ করে আজাদ করে দেন। পরে তিনি আবু বকর (রা.) এর বকরী চরাতেন। তাকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হত। বনের পশু পাখিও এ ধরনের নির্দয় ব্যবহার পায়নি।

৯। লাবিনা (রা.) ঃ তিনি ছিলেন বনু আদি গোত্রের একজন ক্রীতদাসী। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে লাবিনাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছেন। প্রহার করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রহার করতেন। কিন্তু এত প্রহারের পরও কোন ফল হয়নি। লাবিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা থেকে এক মুহূর্তও বিরত হননি। ওমর (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর লাবিনা (রা.) তাকে বলেছিলেন, আপনি আমার সাথে যে নির্দয় ব্যবহার করেছেন, আপনি মুসলমান না হলে আল্লাহ আপনাকে কখনও ক্ষমা করতেন না।

১০। জুনায়ের (রা.) ঃ তিনি ছিলেন বনু মাখজুম গোত্রের একজন ক্রীতদাসী। আবু জাহল তাকে মারতে মারতে তার দু'চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল।

১১। সুহায়েব বিন সিনান রুমী (রা.) ঃ তাকে কুরাইশদের লোকেরা প্রায়ই মারতে মারতে বেহুশ করে ফেলত। সুহায়েব (রা.) এর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল। তাঁর কুরআন পড়া শুনে লোকেরা মুগ্ধ হয়ে যেত।

১২। খাববাব বিন আরাত (রা.) ঃ তিনি কামারের কাজ করতেন। অত্যাচারের এক পর্যায়ে তারই কামারশালায় জ্বলন্ত অংগার তার পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনার কয়েক বছর পর, তিনি হযরত ওমর (রা.) এর নিকট এর বর্ননা করেন, তাঁর পিঠের সাদা গর্তগুলো তাকে দেখান। খাববারের (রা.) পিঠের গলিত চর্বিতে অংগার নিভে যেত। এমন নির্মম অত্যাচার কোন মানুষকে কখনো করা হয়নি।

১৩। আম্মার (রা.) ঃ তাঁকে আবু জাহল বহুবার বেদম প্রহার করে। একসময় আবু জাহল মনে করেছিল, তিনি মারা গেছেন। আল্লাহর অপূর্ব মহিমায় তিনি বেঁচে যান।

www.nagorikpathagar.org

১৪। ইয়াসির এবং সুমাইয়া (রা.) ঃ আম্মারের (রা.) বাবা ইয়াসির ও তার জননী সুমাইয়া (রা.) আবু জাহলের নির্যাতনে যথাক্রমে আহত ও প্রাণ ত্যাগ করেন। মহিলা সাহাবী সুমাইয়াকে (রা.) নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। এটাই ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাহাদতের ঘটনা। সুমাইয়া (রা.) এর লজ্জাস্থানে আবু জাহল বর্শা নিক্ষেপ করে। ফলশ্রুতিতে এ মহিলা সাহাবী করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে ইসলামের প্রথম হিজরত ও প্রথম আকাবা

ইসলামে হিজরত (অর্থাৎ নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় শুধুমাত্র দ্বীনের খাতিরে যাওয়া) একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। আমরা সবাই জানি যে, প্রতিটি মানুষের কাছে তার জন্মভূমি, ধন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজন সবচেয়ে প্রিয় এবং এসব মূল্যবান পুঁজির উপরই মানুষের পার্থিব জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভরশীল। কিন্তু উন্নত ও আদর্শ জীবনের জন্য, এসব উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বেও আরো বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে মহান আল্লাহর মারিফত অর্থাৎ সান্নিধ্য বা পরিচয় লাভ করা। আর এ পরিচয় লাভ করার নামই দ্বীন। মানুষ যখন এর প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন প্রশস্ততা ও উচ্চতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, দুনিয়ার সকল মহামূল্যবান বিষয়, নিজের দেহ-মন, ধন-সম্পদ, এমনকি পরিবার-পরিজনকেও ত্যাগ করে, অমূল্য রত্ন ঈমানের গায়ে সামান্য আঁচ পর্যন্ত লাগতে দেয় না। এমনি এক বিশেষ অবস্থাকে ইসলামের পরিভাষায় হিজরত বলা হয়। এ কারণেই একজন খাঁটি মু'মিন এবং একজন কাফির বা মুনাফিক ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য হিজরত একটি সর্বোত্তম কষ্টিপাথর ও মাপকাঠি। রূহানী জগতের তাপমাত্রা জানার জন্য জিহাদ ও হিজরত এমন দু'টি থার্মোমিটার বা তাপমাপার যন্ত্র, যার দ্বারা মু'মিনের ঈমানের 'উত্তাপ' এর সঠিক অনুমান করা যায়। খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষে হিজরত করা সম্ভব নয়। দ্বীনের জন্য সকল নবীকেই হিজরত করতে হয়েছে। হিজরতে হিদায়াত লাভ হয়। হিজরত ও জিহাদ মু'মিনের সর্বোচ্চ ও কঠিনতম পরীক্ষা।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং দ্বীনের হিফাযতের উদ্দেশ্যে ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ সাহাবায়ে কেরামকে জন্মভূমি ত্যাগ করার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আল্লাহ বলেন- হে আমার ঈমানদার বান্দারা! আমার পৃথিবী বিশাল বিস্তীর্ণ। অতএব, তোমরা আমারই বন্দেগী গ্রহণ কর (সূরা আনকাবূত ঃ ৫৬)। অর্থাৎ মক্কায় যদি আল্লাহর বন্দেগী কঠিন হয়ে গিয়ে থাকে,

www.nagorikpathagar.org

তবে দেশ ত্যাগ করে চলে যাও। আল্লাহর যমীন সামান্য বা সংকীর্ণ নয়। যেখানে আল্লাহর বান্দা হয়ে বসবাস করতে পার সেখানেই চলে যাও। দেশ ও জাতির বন্দেগী করা তো তোমাদের কাজ নয়। নবুওয়াতের ৫ম বছর কুরাইশ সরদার ও নেতারা যখন ইসলামী দাওয়াতী কাজকে হাসি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন ও মিথ্যা অভিযোগ প্রভৃতি দ্বারা দমন করতে ব্যর্থ হল, তখন অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, মারপিট এবং অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার ব্যবহার করতে লাগল। এ অবস্থাটি বিশেষভাবে দরিদ্র ও ক্রীতদাসদের মর্মান্তিকভাবে নিষ্পেষিত করতে থাকে। যার করুণ চিত্র ইতিহাসের পাতায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এ অবস্থা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী সাথীদের বললেন, তোমরা যদি হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যাও, তবে খুব ভাল হয়। কেননা, সেখানে এমন একজন বাদশাহ আছে যার রাজত্বে কারো উপর যুলুম করা হয় না। তা কল্যাণের দেশ। যতদিন আল্লাহ তোমাদের জন্য এ বিপদ হতে মুক্তি লাভের কোন ব্যবস্থা করে না দেন, তত দিন তোমরা সেখানেই অবস্থান করতে থাক। হাবশার তৎকালীন শাসনকর্তা আসহামা নাজ্জাশী একজন ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবীকে অনুমতি দিলেন যে, তারা যেন সোজাসুজি হাবশার দিকে হিজরত করে চলে যান। একথা শুনে প্রথমে ১১জন পুরুষ ও ৪জন মহিলা হাবশার পথে রওনা হয়ে যায়। কুরাইশ লোকেরা সাগরের তীর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তারা যথা সময়ে বন্দরে গিয়ে জাহাজে উঠে পড়েন। ফলে তারা কাফির মুশরিকদের হাত হতে বা গ্রেফতার থেকে রক্ষা পান। অতঃপর কয়েক মাসের মধ্যে আরো কিছু লোক হিজরত করে সেখানে চলে যান। এভাবে সেখানে ৮২জন পুরুষ ও ১১জন মহিলা এবং ৭জন অকুরাইশী মুসলমান (মোট ১০০ জন) তথায় একত্রিত হন। আর মক্কায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রইল মাত্র ৪০ জন মুসলমান।

হিজরতের কারণে মক্কার ঘরে ঘরে রোল পড়ে যায়। কেননা, কুরাইশ বংশের কোন ঘর বা পরিবার এমন ছিল না, যার কোন না কোন সন্তান এ হিজরতে শামিল ছিল না। কারো পুত্র, কারো জামাতা, কারো কন্যা, কারো ভাই, আবার কারো বোন এতে অংশগ্রহণ করেছিল। কেউ কেউ এ কারণে ইসলামের শত্রুতায় আরো কঠোর ও নির্মম হয়ে পড়ল। আবার অনেকের মনে তার প্রতিক্রিয়া এমন দেখা

www.nagorikpathagar.org

দিল যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমান না হয়ে আর থাকতে পারল না। তখন কুরাইশ সমাজপতিরা গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে বসে গেল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, কয়েকজন লোকের এক প্রতিনিধি দল বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ হাবশা বা আবিসিনিয়ায় পাঠান উচিত। আর যে কোনভাবে বাদশাহ্ নাজ্জাশীকে বাধ্য করে এ মুহাজিরদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই কুরাইশ বংশের দু'জন ঝানু ও দক্ষ কূটনীতিবিদ পাঠান হয়। তারা সরাসরি নাজ্জাশীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন দিয়ে বলল, আমাদের শহরের কতিপয় অর্বাচীন লোক পালিয়ে আপনার দেশে এসে পৌঁছেছে। আমাদের সমাজপতিরা আপনার দরবারে তাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দরখাস্ত পেশ করার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। এ অবুঝ বালকেরা আমাদের দ্বীন ত্যাগ করেছে, কিন্তু আপনার দ্বীনও তারা কবুল করেনি। বরং তারা এক নতুন অভিনব 'দ্বীন' বের করেছে।

কুরাইশ প্রতিনিধিদের কথা শুনে দরবারের সকলেই বলে উঠলো, এদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। এদের কি দোষ তা তাদের জাতির লোকেরাই ভাল জানে, সে জন্য আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাশী তাদের মন্তব্যে বিরক্ত স্বরে বললেন, এভাবে তো আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে সপে দিতে পারি না। যেসব লোক আপন দেশ ত্যাগ করে আমার দেশের উপর ভরসা করে আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, আমি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। প্রথমে আমি তদন্ত করে দেখব, এরা যা বলে তা কতখানি সত্য। এ বলে নাজ্জাশী মুহাজির মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। খবর শুনে মুহাজির মুসলমানরা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা দিয়েছেন কোনরূপ কম বেশী না করে, তাই নাজ্জাশীর দরবারে পেশ করবেন। নাজ্জাশী তাদেরকে তার দেশে থাকতে দিন আর না'ই দিন, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করার দরকার নেই। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর নাজ্জাশীর নিকট কথা বলার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিবকে ঠিক করা হয়। এরপর নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে হযরত জাফর (রা.) ইসলাম ও তার বাহকের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যগুলো তার ভাষণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। সে ভাষণে তিনি প্রথমে আরবের জাহেলিয়াত যুগের নৈতিক ও সামাজিক দোষ ত্রুটিগুলো উল্লেখ করেন। অতঃপর প্রিয় নবীর আগমনে এবং আল্লাহর নিকট হতে আনীত কালামের আলোকে তিনি যে শিক্ষা দেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করার কারণে ঈমানদারদের

www.nagorikpathagar.org

উপর কুরাইশরা যেসব অত্যাচার যুলুম চালিয়েছে তারও বিবরণ পেশ করেন। শেষ পর্যায়ে তিনি এদেশে আশ্রয় গ্রহণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমরা আপনার দেশে এ আশায় এসেছি যে, আমাদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না।

নাজ্জাশী হযরত জাফরের (রা.) সম্পূর্ণ ভাষণ শুনে বললেন, খোদার নিকট হতে তোমাদের নবীর প্রতি যে, কালাম নাযিল হয়েছে বলে তোমরা দাবী কর, খানিকটা আমাকে শোনাও। হযরত জাফর (রা.) সূরা মরিয়মের প্রথম থেকে পাঠ করে শুনালেন। যাতে হযরত ইয়াইয়াহ (আ.) ও হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। নাজ্জাশী তা মনোযোগ সহকারে শুনেন। শুনতে শুনতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে যায়। নাজ্জাশীর সে অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শুনে তখন আপনি দেখবেন যে, তাদের চক্ষু অশ্রু সজল। তা এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর (সূরা মায়েদা-৮৩)। হযরত জাফর (রা.) যখন কুরআন পাঠ শেষ করলেন, তখন নাজ্জাশী বলে উঠলেন, এ কালাম এবং হযরত ঈসার নিয়ে আসা কালাম, যে একই মূল উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে কিছুতেই এদের হাতে সঁপে দেব না।

পরদিন আবার কুরাইশ প্রতিনিধি দল নাজ্জাশীর নিকট অভিযোগ তুলল যে, এরা মরিয়ম পুত্র ঈসা সম্পর্কে খুব বড় একটা কথা বলে। তখন নাজ্জাশী সাহাবীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জাফর দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাঁর নিকট হতে আসা রূহ, একটি বাণী, আল্লাহ তাকে কুমারী কন্যা মরিয়মের গর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন। এ কথা শুনে নাজ্জাশী মাটি হতে এক তৃণ খণ্ড তুলে নেন আর বলেন, আল্লাহর শপথ, তুমি যা বলছ ঈসা (আ.) তদপেক্ষা এ তৃণ খণ্ডের বিন্দু মাত্র অধিক ছিলেন না। অতঃপর তিনি কুরাইশদের সব হাদিয়া-তোহফা ফেরত দিয়ে বলেন, আমি ঘুষ খাই না। আর মুহাজিরদের বলেন, তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে বসবাস কর। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন যে, নবুওয়াতের ৫ম বছর রজব মাসে সাহাবাদের ছোট একটি দল হাবশায় হিজরত করেছিল। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের জনসমাবেশে সূরা 'নাজম' পাঠ করে শোনান এবং এতে কাফির ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। হাবশার মুহাজিরদের কাছে এ

www.nagorikpathagar.org

কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফিররা মুসলমান হয়ে গেছে। তখন তাদের কিছু লোক শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসে। এসে তারা জানতে পারে যে, যুলুম নির্যাতন আগের মতই চলছে। ফলে হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে প্রথম বারের তুলনায় অনেক বেশি লোক মক্কা ছেড়ে চলে যান (ইবনে হিশাম)। হাবশার এ হিজরত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, যেসব লোক যুলুম সহ্য করার পর আল্লাহ্র খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়ায় উত্তম ঠিকানা এবং জায়গা দান করব। আর আখিরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়। হায়, তারা যদি জানতে পারত যে, কত ভাল পরিণামই না তাদের অপেক্ষায় রয়েছে।

নবুওয়াতের একাদশ সালে হজ্জের মৌসুমে 'হেরা' ও 'মিনার' মধ্যবর্তী আকাবা নামক স্থানে সর্বপ্রথম ইয়াসরাব (মদীনা) হতে আগত কতিপয় লোক (৬ জন বা ৮ জন) রাতের নির্জন স্থানে প্রিয়নবীর হিদায়াতের আলো পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর ওদের সাথে আরো কতিপয় লোক মিলে মোট ১২ জন আনসার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। হযরত ওবাদা বিন সামেত (রা.) বলেন, আমরা আকাবার এ প্রথম সম্মেলনে নিম্নোক্ত শর্তসমূহের উপর ইসলামের বাইয়াত করলাম-(১) আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বানাব না (২) চুরি করব না (৩) যেনা বা ব্যভিচার করব না (৪) নিজের সন্তানদের হত্যা করব না (৫) কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেব না এবং (৬) কোন ভাল কাজে আপনার (নবীর) নাফরমানী করব না। বাইয়াত গ্রহণের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন, যদি এসব শর্ত পালন কর, তবে তোমাদের জন্য এর বিনিময় জান্নাত লাভের সুসংবাদ রইল। আর যদি এসব গর্হিত কাজ হতে কোন একটি অবলম্বন কর। তবে তোমাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন।

উপরোক্ত ঘটনার ফলে মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের আওয়ায পৌঁছতে থাকে। অবশেষে এমন হল যে, ত্রয়োদশ বছর হজ্জের মৌসুমে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা 'আকাবা' নামক স্থানে একত্রিত হয়ে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বাইয়াত কালে প্রিয়নবী তাদের সম্মুখে এক প্রাণস্পর্শী আলোচনা রাখেন, যার ফলে তাদের অন্তর ইসলামের নূরে আলোকিত হয়ে উঠে। অতঃপর সে বৈঠকে এ আবেগও প্রকাশ পায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মদীনায় পদার্পণ করেন, তবে ইসলামের প্রচার কাজে খুব লাভ হবে এবং আমরা হুজুরের

www.nagorikpathagar.org

ফয়েয বা সঙ্গ লাভের যথেষ্ট সুযোগ পাব অর্থাৎ তারা প্রিয় নবীকে মদীনায় গমনের আহ্বান জানালেন এবং সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবেন বলে পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন। অতঃপর তাদের হতে ১২ জনকে মনোনীত করে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য প্রিয়নবী নিজের নকীব বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দেন। ইয়াসরাবে (মদীনায়) ইসলাম প্রচার কার্য যখন এরূপ দৈনন্দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর মাধ্যমে মক্কার নিপীড়িত মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ বলেন, যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি হিজরতের উদ্দেশ্যে; অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর নিকট অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (নিসা ঃ ১০০)

এভাবে মুসলমানদের জন্য হিজরতকে ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। দ্বীন, ঈমান এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয় কাজ। হিজরতে হিদায়াত মিলে। মহান প্রতিপালকের অতি পছন্দনীয় বান্দারাই হিজরতের মত মহান ইবাদত বা কাজের সুযোগ পায়। হিজরত সকল নবীর খাস বা বিশেষ সুন্নাত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে মদীনায় গিয়ে হিজরতকে পূর্ণতা দেন। এমনকি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান, সেদিন থেকে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। ইসলামে হিজরতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এতটাই উন্নত এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

ইসলামের প্রথম হিজরতকারী সাহাবা

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষের দিকে কুরাইশদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা যখন চরমে উপনীত হয়, তখন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে এগারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হিজরতকারীদের মধ্যে যারা সুপরিচিত তারা হলেন ঃ

১। হযরত ওসমান বিন আফফান (রা.) ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া (রা.) বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

২। হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.)

৩। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)

৪। হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)

www.nagorikpathagar.org

৫। হযরত আবু হুযাইফা বিন উতবা (রা.) ও তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল (রা.)

৬। হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)

৭। হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.)

৮। হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.) ও তাঁর স্ত্রী সালামা বিনতে আবু উমাইয়া (রা.)

৯। হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা.) ও তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমা (রা.)

১০। হযরত সুহাইল বিন বাইদা (রা.)

১১। হযরত আবু সাবরা বিন আবু রুহম (রা.)

ইবনে হিশামের মতে উসমান বিন মাযউন (রা.) ছিলেন দলনেতা। প্রসিদ্ধ মতে ওসমান বিন আফফান (রা.) ছিলেন দলের আমীর। আবিসিনিয়ায় নাজ্জাশীর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাঁর জানাযা আদায় করেন। সাইদ বিন মুসয়াবের (রা.) মতে মদীনা নগরীর পশ্চিম দিকে মোসাল্লামে ঈদ নামক মসজিদে এ জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামের প্রথম আকাবার বাইয়াতকারী সাহাবা

নবুওয়াতের দশম বছর মদীনা হতে ৬ জনের মুমিনের একটি দল এসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে মক্কায় সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমান হন। এ দলের মাধ্যমেই পরের বছর আকাবায় বাইয়াত অনুষ্ঠানের পথ সুগম হয়। মদীনা হতে আগত ৬ জন হলেন ঃ

১। হযরত আবু যর গিফারী (রা.)

২। হযরত সা'দ বিন সামিত (রা.)

৩। হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.)

৪। হযরত আবুল হাইছাম বিন তায়্যিহান (রা.)

৫। হযরত আসআদ বিন যুরারা (রা.)

৬। হযরত আজাদ বিন মুদা (রা.)

আকাবার প্রথম বাইয়াত গ্রহণকারী বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবার নাম ঃ

১। হযরত আবু উমামা বিন জারাহ (রা.)

২। হযরত রাফে বিন মালিক (রা.)

৩। হযরত আওফ বিন হারিস (রা.)

www.nagorikpathagar.org

৪। হযরত কুতায়বা বিন আমির বিন হুযাইফা (রা.)

৫। হযরত উকবা বিন আমির বিন নাবি (রা.)

৬। হযরত সদর বিন রাবি (রা.)

ইসলামের প্রথম (অর্থাৎ বদরের) যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সাহাবা

১। হযরত উবায়দা ইবনুল হারিস (রা.) - মুহাজির

২। হযরত উমাইর বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) - মুহাজির

৩। হযরত যুশ শিমালাইন (রা.) - মুহাজির

৪। হযরত আকিল বিন সালিহ (রা.) -মুহাজির

৫। হযরত মাহজা বিন সালিহ (রা.) - মুহাজির

৬। হযরত সাফওয়ান বিন বাইদা (রা.) -মুহাজির

৭। হযরত সা'দ বিন খায়ছামা (রা.) - আনছার

৮। হযরত মুবাশ্বির বিন আব্দুল মুনযির (রা.) - আনছার

৯। হযরত উমায়র ইবনুল হুমাম (রা.) - আনছার

১০। হযরত ইয়াযীদ বিন হারিস (রা.) - আনছার

১১। হযরত রাফি বিন মুআল্লা (রা.) - আনছার

১২। হযরত হারিসা বিন সুরাকা (রা.) - আনছার

১৩। হযরত আওফ বিন হারিস (রা.) - আনছার

১৪। হযরত মুআওবিয বিন হারিস (রা.) - আনছার

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবা

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের সর্বপ্রথম স্ত্রী। বিধবা (৪০ বছর) খাদীজার (রা.) সাথে তরুণ নবী (২৫ বছর) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

ইসলামের প্রথমাবস্থায়, খাদীজা (রা.) তার বিপুল ধন-সম্পদ পুরোপুরি ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছেন। খাদীজা (রা.) একদিকে সহধর্মিণী হিসেবে যুবক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসায় সিক্ত করেছেন। অন্য দিকে মাতৃসুলভ স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন, অভিভাবকত্বের বন্ধনে এতীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগলে রেখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

খাদীজার (রা.) দীর্ঘ ২৫ বছরের বিবাহিত জীবনের (অর্থাৎ ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) মাঝে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন ২য় বিবাহ করেননি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী জীবনেও সর্বক্ষেত্রেই খাদীজা (রা.)-কে স্মরণ করেছেন। স্ত্রী হিসেবে তিনিই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী রমণীদের মাঝে হযরত মরিয়ম (আ.) এবং খাদীজাই (রা.) মর্যাদাশীল ও শ্রেষ্ঠ।

খাদীজা (রা.) মহাবিশ্বের নর-নারীর মাঝে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীন ইসলামকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক আনীত কুরআন নাযিলের ঘটনায় নবীর বিচলিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সাহস যোগানসহ হেরা গুহায় দিনরাত সাধনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে খাদীজা (রা.) অনন্যা হয়ে আছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল জীবিত সন্তানরা এবং পরবর্তীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ চালু রয়েছে খাদীজার (রা.) সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমেই। বিশ্বনবীর বংশ চালু থাকবে খাদীজার (রা.) মাধ্যমেই।

খাদীজা (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ও শ্রেষ্ঠ রমণীর মা অর্থাৎ ফাতিমা (রা.) খাদীজারই (রা.) সন্তান। ফাতিমা (রা.) বেহেশতে সকল রমণীর নেত্রী হবেন এবং তার স্বামী হযরত আলী (রা.) সকল পুরুষের মাঝে মর্যাদাবান।। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় নাতি এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইমামদ্বয় হাসান ও হোসাইন (রা.), ফাতিমারই (রা.) পুত্র সন্তান। হাসান ও হোসাইন (রা.) বেহেশতে যুবকদের নেতা হবেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম স্ত্রী আয়িশা (রা.) বলেন, আহা আমি যদি খাদীজার (রা.) মত ভাগ্য নিয়ে জন্ম লাভ করতাম; তবেই আমার জীবন ধন্য হত। আয়িশা (রা.) আরও বলেন, আহা আমি যদি ফাতিমার (রা.) একগাছি চুল হতাম। এ দু'টো মন্তব্যে বুঝা যায় খাদীজার (রা.) মর্যাদা কিরূপ ছিল।

খাদীজা (রা.) সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্য হল– খাদীজার (রা.) চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি লাভ করিনি। যখন দুনিয়ার সকল লোক কাফির মুশরিক ছিল, তখন খাদীজাই (রা.) আমার কথায় ঈমান এনেছিল। যখন সারা বিশ্ব আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন খাদীজাই (রা.) আমাকে বিশ্বাস করেছিল। এমনকি তার সকল ধন-সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

তিনি পৃথিবীর একমাত্র মহিলা যিনি পৃথিবীতে থেকে জিব্রাঈল (আ.) এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহপাক কতটুকু সন্তুষ্ট থাকলে পৃথিবীর একজন মানুষকে সালাম পেশ করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। অতএব খাদীজা (রা.) পৃথিবীর সার্থকতম এবং শ্রেষ্ঠ রমণী।

নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)

ফাতিমা (রা.) বেহেশতে সকল রমণীর নেত্রী হবেন। তার স্বামী হযরত আলী (রা.) বেহেশতে মর্যাদাবান পুরুষদের মাঝে অন্যতম।

ফাতিমা (রা.) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইমামদ্বয় যথাক্রমে হাসান ও হোসাইন (রা.) এর মা। আল্লাহ পাক তাদের মাধ্যমেই বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশকে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তার করবেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফাতিমার (রা.) বিভিন্ন দিক দিয়ে অপূর্ব মিল ছিল। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, কথাবার্তা, চলাফেরা, উঠাবসা ও চারিত্রিক দিক দিয়ে হযরত ফাতিমার (রা.) তুলনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্য কাউকে দেখিনি।

হযরত ফাতিমা (রা.) যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন, তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে যেতেন এবং খুশি অনুভব করতেন; চুমু দিয়ে তাকে নিজের সামনে বসাতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফাতিমা (রা.) আমার শরীরের অংশ; যে তার মনে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। যে তাকে অসন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকেই অসন্তুষ্ট করল।

বিশ্বনবী জান্নাতে রমণীদের মর্যাদার ক্রমধারা বর্ণনা করেন এভাবে ঃ জান্নাতে রমণীদের নেত্রী হবে ঈসার (আ.) মা মরিয়ম (আ.), তারপর ফাতিমা (রা.), তারপর খাদীজা (রা.), তারপর ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া (আ.)। এ চারজন নারীই বেহেশতে সকল নারীর নেত্রী হবেন। তাদের মর্যাদা ও সম্মান সর্বাধিক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে (রা.) বলতেন, হে মা ফাতিমা (রা.)! তোমার সন্তুষ্টিতে স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর তোমার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহপাক ক্রুদ্ধ হন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব। এরপর ঘোষণা করা হবে, উপস্থিত সকল আদম সন্তান তোমরা চোখ বন্ধ কর, নবীর শ্রেষ্ঠ কন্যা ফাতিমা (রা.)

www.nagorikpathagar.org

পুলসিরাত পার হবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর বেহেশতে প্রবেশ করবেন ফাতিমা (রা.)।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে পৃথিবীর মানুষদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, আদর ও স্নেহ করতেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন সফর, যুদ্ধ বা বাহিরে থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এরপর ফাতিমার (রা.) বাড়িতে যেতেন। এরপর নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। একবার গৃহের কাজ করতে গিয়ে ফাতিমা (রা.) ঘুমিয়ে পড়লে, তিনজন ফিরিশতা কর্তৃক যথাক্রমে গমের যাতা ঘুরানো, হোসাইনের (রা.) দোলনা দোলানো এবং ফাতিমার পর্দা রক্ষা ও তসবী পাঠ অব্যাহত রাখা হয়েছিল। মহান আল্লাহ ফাতিমার (রা.) উপর এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ফাতিমা (রা.) শেরে-এ-খোদা আলীর (রা.) সম্মানিত স্ত্রী এবং বেহেশতের যুবকদের সর্দার হাসান ও হোসাইনের (রা.) মা। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাসান ও হোসাইনকে (রা.) নিজের কলিজার টুকরা বলেছেন। এ দু'বেহেশতি মহামানব, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে চড়তেন এবং তাদের নানা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া সাজতেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ফাতিমা, আলী, হাসান ও হোসাইন (রা.) কে নিজের চাদরের নিচে টেনে নেন এবং বলেন, আল্লাহপাক তোমাদেরকে অপবিত্রতা দূর করে পবিত্র করণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। হযরত ফাতিমার (রা.) গৃহে ফেরেশতা মারফত বেহেশত থেকে খানা পরিবেশন করা হয়েছে এবং সে খানা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়েছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)

জিব্রাঈল (আ.) রেশমি কাপড়ে আয়িশার (রা.) ছবি নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিয়ের পূর্বেই আগমন করেন এবং বিয়ের পয়গাম পেশ করেন। হযরত আয়িশা (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র কুমারী স্ত্রী। বাকী সবাই বিধবা বা পূর্বে বিবাহিত ছিলেন।

তিনি সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর দ্বারা সহস্রাধিক হাদীস উম্মতে মুহাম্মদীর নিকট পেশ হয়েছে।

তিনি পূত পবিত্র ছিলেন। বছরের পর বছর রোযা রাখতেন। রাতভর ইবাদত করতেন এবং দান খয়রাত করতে করতে রিক্তহস্ত হতেন। এমনভাবে দান করতেন যে, ইফতারের জন্য সামান্য খানা পর্যন্ত রাখতেন না। পবিত্র কুরআনে

www.nagorikpathagar.org

তার পবিত্রতার স্বপক্ষে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তার নামে অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং তিনি অসীম দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। আল্লাহ, একটি কচি শিশুকে বাক শক্তি দিয়ে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে আয়িশাকে (রা.) দোষ মুক্ত করেন।

তার কারণেই উম্মতে মুহাম্মদী তায়াম্মুমের মত পবিত্র হওয়ার সহজ নিয়ম তথা নির্দেশনা লাভ করেছে।

বড় বড় সাহাবী এবং খলিফাগণ ধর্মীয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে তার কাছ থেকে নির্দেশ, সমাধান এবং উপদেশ গ্রহণ করতেন। তিনি আশির উপরে হায়াতে জিন্দেগীতে থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর এ মহান সেবা করে গেছেন। অথচ তিনি মাত্র তেইশ বছর বয়সে বিশ্বনবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারিয়ে বিশাল পরীক্ষার মধ্যে জীবন কাটিয়ে ছিলেন। তিনি এ উম্মতের অন্যতম মুফতী ও ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন। তাঁর কোলেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়। তাঁর গৃহেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমাধি রচিত হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশার (রা.) সাথে একই লেপের নিচে শায়িত অবস্থায় অহী নাযিল হয়েছে। তিনি (রা.) এতটাই পবিত্র ছিলেন। আয়িশা (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা এবং শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) কন্যা এবং সিদ্দিকা ছিলেন।

আয়িশা (রা.) শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পরামর্শদাত্রী, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেবা পরিচালনাকারিণী, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়িত্রী, রাতভর নফল ইবাদতকারিণী এবং বছর ধরে রোযা পালনকারিণী ছিলেন। তিনি পবিত্র, শ্রেষ্ঠ নারী সাহাবী এবং মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। আয়িশা (রা.) সমগ্র নারী জাতির অহংকার।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

পূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাজ কি? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন, হে আবু বকর আমার যে কাজ, তোমারও উচিত সে কাজের অনুসরণ করা অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো। তিনি সে মুহূর্ত থেকে দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করেন এবং প্রথম দিনেই ছয় মতান্তরে চার জন বিখ্যাত সাহাবীকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আবু বকরের আমলের পাল্লা, সারা উম্মতে মুহাম্মদীর আমলের পাল্লার চেয়েও ওজনদার। কেননা, তিনি ইসলামের প্রথম দিন থেকে শুরু করে সবচেয়ে সফলভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ

করেন। এমনকি পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় দশ সাহাবী, যারা বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছেন; তাদের ছয়জনই আবু বকরের (রা.) অর্জন। তিনি ছিলেন দাওয়াত ও তাবলীগের মহীরুহ (বটবৃক্ষ)।

আবু বকর (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অহী নাযিলের ঘটনা শোনামাত্র চিৎকার করে কলেমা পাঠ করেন- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বালক আলীর (রা.) পর তিনিই প্রথম পুরুষ, যিনি বিনাবাক্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকর (রা.) ছিলেন আরবের খ্যাতনামা ব্যক্তি। বন্ধুমহলে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ও গ্রহণ যোগ্যতা ছিল। তাই আবু বকর (রা.) বন্ধু মহলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে সফল হন। ওসমান, সায়াদ ইবনে ওয়াক্কাস, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা, জুবায়ের (রা.) এর মত মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ প্রধানগণ আবু বকরের দাওয়াত ও তাবলীগের ফসল।

আবু বকর (রা.) শতসহস্র দাস-দাসীর মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগ করেন এবং সফল হন। তিনি শত শত দাস-দাসীকে যুলুম থেকে উদ্ধার করেন। এদের মাঝে জগৎ বিখ্যাত সাহাবী বিলাল, খাব্বাব, আমর ইবনে ইয়াসের (রা.) প্রমুখ রয়েছেন। যাদেরকে উচ্চমূল্যে তাঁদের নিষ্ঠুর মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন কোমল প্রাণের অধিকারী আবু বকর (রা.)।

তাবুক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ভয়াবহ অর্থকষ্ট ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে আহবান জানালেন। ওসমান এবং ওমর (রা.) তাঁদের সম্পদের অর্ধেক পেশ করলেন। আর আবু বকর তাঁর পুরো সম্পদ দান করে বললেন, আমি ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। তখন ওমর (রা.) বলেছিলেন, ইসলামের সেবায় কেউ আবু বকরকে (রা.) অতিক্রম করতে পারবে না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজের ঘটনা মক্কাবাসীর মাঝে ব্যক্ত করলেন, তখন সকলেই তাঁকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু করল। এ ঘটনায় কেউ হতবাক হলেন, কেউ বিস্মিত হলেন, কেউ দ্বিধান্বিত হলেন, কেউ চিন্তিত হলেন। আর কাফিররা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল বলতে লাগল (নাউযু বিল্লাহ)। সবাই আবু বকরের (রা.) কাছে গেল। তিনি মি'রাজের ঘটনা শুনে বললেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা সত্য। আবু বকর (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এতটুকু নিশ্চিত হলেন যে, তিঁনি ঐ কথা বলেছেন কিনা? এরপর উচ্চৈঃস্বরে আবু বকর (রা.) কলেমা পাঠ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল যা বলেন সবই সত্য। বিশ্বনবী

www.nagorikpathagar.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বললেন, তিনি সিদ্দিক (সত্যবাদী ও বিশ্বাসী)। এরপর থেকেই আবু বকরের (রা.) নাম সিদ্দিক হয়ে যায়।

মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয়সাথী আবু বকরকে নিয়ে মদীনার পথে হিজরত করেন। পথিমধ্যে গুহার মাঝে তিনদিন অবস্থান করেন। গুহায় বিষধর সর্পের দংশনে আবু বকর (রা.) কাতর হয়ে যান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখের লালা দংশিত স্থানে লাগান এবং আবু বকর (রা.) সুস্থ হয়ে উঠেন। আবু বকর গুহায় চিন্তিত হলে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ বলে আশ্বাস দেন যে, তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এ ব্যাপারে আবু বকর (রা.) ও বিশ্বনবীকে নিয়ে আল-কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। (তওবা ঃ ৪০)

আবু বকর (রা.) কে স্বয়ং আল্লাহপাক সালাম পেশ করেছেন। জিব্রাঈল (আ.) সে সালাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। মসজিদে নববীতে আবু বকরের (রা.) দরজা সব সময় খোলা ছিল ও থাকবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আমি প্রেম ও ভক্তিতে আবু বকরকেই (রা.) শ্রেষ্ঠ মনে করি। এ মসজিদের সমস্ত দরজা বন্ধ থাকবে, কেবল মাত্র খোলা থাকবে আবু বকরের (রা.) দরজা।

ওহুদের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তে পড়ে গেলে, আবু বকর (রা.) তাকে টেনে তোলেন। যুদ্ধে আবুবকর (রা.) তাঁর ছেলেকে (তখনও সে মুসলমান হয়নি) হত্যা করতে উদ্ধত হন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বারণ করেন। ইসলামের সেবায় আবু বকর এতটাই দৃঢ়চেতা ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধে আবু বকর নিজের জামায় বেঁধে মাটি উত্তোলন করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়, সকল সাহাবারা যখন মন কষ্টে চুপ করে থাকেন। তখনও একমাত্র আবুবকর (রা.) বিশ্বনবীকে অনুসরণ করেন। সকলকে বুঝাতে থাকেন ও বুঝাতে সক্ষম হন যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইঙ্গিতেই এ সন্ধিতে সম্মতি দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের দিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উটে বসেছিলেন আবুবকর (রা.), ঠিক যেভাবে একই উটে বসে মক্কা থেকে মদিনার পথে হিজরত করেছিলেন। এভাবে সুখে দুখে সবসময়ই আবু বকর (রা.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকেছেন।

বিশ্বনবীর জীবদ্দশাতেই মসজিদে নববীতে ১৭ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন আবু বকর (রা.)। এমনকি তিনি স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতির সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লাম তখন জীবন সায়াহ্নে। জুমার নামাযে ইমামতি করছেন আবু বকর (রা.)। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামাগুড়ি দিয়ে, সাহাবাদের কাঁধে ভর দিয়ে পিছনে নামায পড়তে এলেন। আবু বকর (রা.) ইমামতির স্থান ত্যাগ করতে চাইলে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামায পরিচালনার নির্দেশ দেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে বসে নামায আদায় করেন। এভাবেই সেদিন আবু বকর (রা.) পূর্ণ মানবের পরিপূর্ণ প্রতিনিধি হয়ে ইসলামের দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়ে যান। তিনি ইসলামের অদ্বিতীয় ইমাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় বলেন, আমি যদি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে নিজের অবর্তমানে আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করে যান।

কথিত আছে একবার জিব্রাইল (আ.) আবু বকরের কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে প্রশ্ন করেন, হে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আপনি কি বলতে পারবেন, এ মুহূর্তে জিব্রাঈল (আ.) কোথায়? আবু বকর (রা.) চোখ বন্ধ করলেন এবং তাকালেন। বললেন, আমি আকাশ ও যমীনে কোথাও জিব্রাঈল (আ.) কে খুঁজে পেলাম না। আর আমি যেহেতু আবু বকর; অতএব আপনিই ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.)। আল্লাহপাক আবু বকর (রা.) কে এতটাই যোগ্যতা দিয়েছিলেন। ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) আবু বকরের এমন আধ্যাতিক যোগ্যতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। দাওয়াতের ময়দানে কুরবানী করতে করতে আর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবসময় জুড়ে থাকার কারণে আবু বকরের (রা.) ভিতর তাকওয়া, দ্বীনকে মানা এবং ঈমানের এমন এক যোগ্যতা অর্জিত হয়েছিল, যা অন্য কোন মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, মহাবিশ্ব তাকে মর্যাদা করে এবং দুনিয়া তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। এটাই জগতের নিয়ম। আবু বকর (রা.) এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

এক বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মানুষ নিজেদের ঘামে সাঁতার কাটতে থাকবে। সবাই বলতে থাকবে আমার কি হবে? আমার কি হবে (ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!)। সূর্য মাথার কাছাকাছি চলে আসবে। ঘিলু বা ব্রেইন টগবগ করে ফুটতে থাকবে। আল্লাহপাক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করবেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কাহহার; কঠিন হিসাব গ্রহণকারী; যথার্থ প্রতিদানকারী। কে আছ? কাকে আমার সামনে পেশ করবে? কে বিচারের জন্য

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তুত? নবী রাসূলরা দিশেহারা হয়ে যাবেন। সকল নবী রাসূলরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হবেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সামনে যাবেন এবং বিচারের জন্য আবু বকরকে আল্লাহর কাছে পেশ করবেন। ফলশ্রুতিতে সেদিন কঠিন ও ভয়ঙ্কর মেজাযের আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর কাহহার মূর্তি হতে অতি শীতল হয়ে যাবেন। আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি কাকে আমার কাছে পেশ করলে? আমি আবু বকরের প্রতি এত বেশী রাজিখুশী যে, তাঁর বিচার করতে লজ্জাবোধ করছি। যে আবু বকর দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য; ইসলামের জন্য; নিজের জান, মাল, সময় দিল, দিমাক ও হিকমতকে শতভাগ কুরবানী করে দিয়েছে। সে আবু বকরের কি বিচার করব আমি? মহান আল্লাহপাকের এ উক্তিতে বিশ্বের সকল নবী রাসূলরা অভিভূত ও লজ্জিত হয়ে যাবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা এবং কুরবানী আল্লাহপাকের কাছে কতটাই পছন্দনীয়। আর এ আবু বকরের (রা.) পিছে লক্ষ কোটি মুসলমান- যারা তার দ্বারা হিদায়াত পেয়েছে এবং পরবর্তীতে এ সিলসিলা চালু রেখেছে; সকলেই বিশাল কাফেলার আকারে বেহেশতে প্রবেশ করবে। অন্যান্য নবী রাসূলরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন। ভাববেন এ আবার কোন নবী? তার তো কোন নাম শুনিনি। হযরত আবু বকর দাওয়াত ও তাবলীগের কুরবানীর বিনিময়ে এতটাই মর্যাদা লাভ করেছেন এবং হাশরের ময়দানে পুনরায় মর্যাদার চূড়ায় অবস্থান করবেন।

আবু বকর (রা.) মৃত্যুর সময় কন্যা আয়িশাকে (রা.) বলেন, আমার গায়ে দু'টুকরা কাপড় আছে, আরেক টুকরা যোগাড় করে কাফন দিও (তিন টুকরাতে কাফন হবে)। তিনি সোমবার দিন অতি দ্বীনহীনভাবে আয়িশার (রা.) কোলে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার সম্পদ হিসেবে ছিল, একজন হাবশী গোলাম, একখণ্ড বস্ত্র ও একটি উট। তিনি মাত্র দু'বছর খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ১৩ হিজরী বা ৬৩৪ খ্রীঃ মাগরিব ও এশার নামাযের মাঝামাঝি সময় রোজ সোমবার ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সমগ্র মুসলিম জগতে স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া যেকোন সংকটময় মুহূর্তে, যে কোন সমস্যার সমাধান কল্পে, পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি প্রয়োগে আবু বকরের (রা.) মত এত পারদর্শী কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারক, শ্রেষ্ঠ মুফতী এবং অন্যতম সংস্কারক।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত (ইন্তিকালের) পর

www.nagorikpathagar.org

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাহাবাদের মাঝে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। এমনকি ওমর (রা.) খোলা তরবারী নিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। যে বলবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেই; তাকে আমি কতল করে ফেলব। ঠিক তখন আবু বকর (রা.) শক্ত হাতে দৃঢ় মনোবলের সাথে সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেন। আবু বকর (রা.) বলেন, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করে; সে জানুক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় ইন্তিকাল করেছেন এবং তোমাদের মাঝে যে, আল্লাহর ইবাদত করে, সে জানুক আল্লাহ চিরজীবিত; তিনি কখনও মরেন না। তিনি আল-কুরআনের দু'টি আয়াত পাঠ করেন। "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নবী ব্যতীত কিছু নন; তাঁর পূর্বেও বহু নবী গত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা বিমুখ হবে? যারা বিমুখ হবে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ সত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিদান দেন।" "হে মুহাম্মদ; তোমাকে এবং তাদের সকলকেই মরতে হবে।" এরপর সবকিছু নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সবাই একে একে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া করেন। আবু বকর (রা.) তার মেধা, দৃঢ়তা ও ঈমানী শক্তি দিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের পর তিনিই প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন এবং সফলভাবে দ্বীনের কাজ করেন। তার দাওয়াতের কর্মকাণ্ডে ও শাসনামলে বিধর্মীরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষা লাভ করে। আবু বকরই ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সেবক, শ্রেষ্ঠ খলিফা, শ্রেষ্ঠ নবী প্রেমিক, শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ সিদ্দিক বা বিশ্বাসী এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমান। তিনি উম্মে মুহাম্মদীর সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)

তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। আবু বকরের (রা.) ইন্তিকালের সময়, মুসলিমদের খেলাফতের জন্য একজন দাবীদার ছিলেন। ইনি হলেন হযরত তালহা (রা.)। তিনি সম্পর্কে আবু বকরের (রা.) আত্মীয় ছিলেন। তিনি যোগ্যও ছিলেন বটে। তিনি আবু বকরের নিকট গিয়ে বললেন, খলিফা, আপনি ওমর (রা.) কে ২য় খলিফা হিসেবে মনোনীত করতে যাচ্ছেন। আপনি কি জানেন না, ওমর কত রূঢ়। তার ব্যবহার কত কঠিন? আপনি এব্যাপারে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন? তালহার (রা.) এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) উত্তেজিত হয়ে জবাব

www.nagorikpathagar.org

দিলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাতে এসেছ? আমি আল্লাহর নামে শপথ করেই বলছি, আমি আল্লাহকে গিয়ে বলব একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে এসেছি। এই হচ্ছে ওমর (রা.)। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সনদ দিচ্ছেন, বিশ্বের আরেক শ্রেষ্ঠ মনীষী আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমিই শেষনবী। এরপর যদি নবী থাকতো, তবে ওমর (রা.) হত সে নবী। দাওয়াতের ময়দানে কাজ করতে করতে তিনি এত বড় যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, শ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠ ইসলাম প্রচারক তথা ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্প্রসারণকারী হলেন ওমর (রা.)। আরব দেশে একটি প্রবাদ বাক্য খুবই প্রচলিত ছিল, সব লম্বা লোকই বোকা একমাত্র ওমর ব্যতীত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর (রা.) যেমন জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি বীর ও শক্তিশালী ছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকল নবীর দু'জন করে আসমানী ও যমিনী উজির বা উপদেষ্টা থাকে। আমার দু'জন আসমানী উপদেষ্টা হলেন জিব্রাঈল ও মিকাইল (আ.) এবং যমিনী উপদেষ্টা হলেন আবু বকর ও ওমর ফারুক (রা.)।

আরবের বীর ও সাহসী যুবক ওমর (রা.) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন প্রথম মুসলমানরা দলগতভাবে কা'বা তাওয়াফ করে সেখানে নামায আদায় করেন। মুসলমানরা প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপার ঘোষণা করতে থাকেন। সেদিন থেকেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে স্বমহিমায় ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। মক্কায় এতে স্পষ্ট পার্থক্য ফুটে উঠে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্যে ওমর (রা.) কে 'ফারুক' বা পার্থক্যকারী উপাধিতে ভূষিত করেন অর্থাৎ ওমরের (রা.) ইসলামে যোগদান করায় মুসলমানদের কাজে-কর্মে ও দ্বীন প্রচারে নতুন জোয়ার আসে।

ওমরের (রা.) দশ বছরের শাসনামলে পবিত্র মক্কার উত্তর দিকে ১৩৬ মাইল এবং পূর্বের পুরাটাই বিজিত হয়। প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকায় ইসলাম কয়েম হয়। তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধি, দূরদর্শী, বীর যোদ্ধা ও আল্লাহপাকের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন।

ওমর (রা.) বিশ্বনবীর সাথে ২৩টি যুদ্ধ ও অভিযানের সবগুলোতেই অংশগ্রহণ করে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যখন ভয়াবহ শোচনীয়

www.nagorikpathagar.org

অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ (তিনি তখনও মুসলমান হননি) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের উপর অতর্কিত হামলা করেন। এ সময় কয়েকজন আনসারকে নিয়ে ওমর (রা.) প্রতিহত করে, খালিদকে তাড়িয়ে দেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

ওহুদ ও হুদাইবিয়ার সন্ধিসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওমর (রা.) বিশ্বনবীর মতের বিপরীতে মত পোষণ করেন। আল্লাহপাক প্রায় সকল ক্ষেত্রে ওমরের (রা.) দৃঢ়তার এবং বিচক্ষণ পরামর্শের ব্যাপারে একমত পোষণ করে আয়াত নাযিল করেছেন। এতে ওমরের (রা.) দূরদর্শী, বিচক্ষণতা, দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন ফুটে উঠে। তাবুকের যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ থাকা সত্যেও ওমর (রা.) তার সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন।

ওমরের (রা.) মহানুভবতা, ঈমানী জোশ, কঠোর পরিশ্রম, কঠিন সংযম, চরম ন্যায় বিচার এবং অতি সাধারণ জীবন যাপনের ফলে তাঁর দশ বৎসরের শাসনামলে বহু রাজ্য জয় হয় এবং ইসলামের আওতায় আসতে বাধ্য হয়। ওমর (রা.) শাসন ও কর্মকর্তা নিয়োগের সময় এ শপথ বাক্য পাঠ করাতেন ঃ আমি কোনদিন মিহি কাপড়ের পোশাক পরব না; মিহি আটার রুটি খাব না; দরজায় দারোয়ান নিযুক্ত করব না; জনসাধারণের জন্য দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রাখব; তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হব না (অর্থাৎ দামী যানবাহন ব্যবহার করব না)। কতটুকু সৎ ও জনদরদী হলে, কোন বাদশা এমনটি করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়।

বর্ণিত আছে, একবার মদীনার কোথাও আগুন লাগলে ওমর (রা.) আগুনকে চিরকুট লিখে দেন- হে আগুন আল্লাহর হুকুমে নিভে যাও এবং সত্যি সত্যিই আগুন নিভে যায়। ইতিহাসে বর্ণিত আছে মিশরের নীল নদে প্রতিবছর একজন করে যুবতীকে হত্যা করে রক্তে রঞ্জিত করা হত, যেন নীল নদ বহমান থাকে। অন্যথায় নীলনদ শুকিয়ে যেত। এরপর মিশর যখন ওমরের (রা.) শাসনের অন্ত র্ভুক্ত হয় তখন মিশরের গভর্নরের কাছে ওমর (রা.) একটি চিঠি লিখে পাঠান। যেখানে নির্দেশ ছিল ঃ ওমরের (রা.) লেখা নীলনদকে নির্দেশ দেয়া চিঠি নীলনদে ফেলতে হবে। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ এটা মুসলিম জাহানের খলিফার কাছ থেকে লেখা চিঠি। এখন থেকে আল্লাহর হুকুমে হে নীলনদ, তুমি প্রবাহিত হতে থাকবে। এরপর লক্ষ জনতার সামনে ওমরের (রা.) সে চিঠি নীলনদে নিক্ষেপ করা হলে, নীলনদ ফুসে উঠে বইতে থাকে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত বইতে থাকবে। আল্লাহর সাথে কি ধরনের সম্পর্ক থাকলে এ কাজ সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়। এ হচ্ছে মুসলিম জগতের ২য় খলিফা ওমর ফারুক (রা.)।

www.nagorikpathagar.org

ওমর (রা.) ৬৪৪ খ্রীঃ রোজ বুধবার ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় দশ বছর ছয়মাস ইসলামের খলিফা ছিলেন। তার চরিত্রে খোদাভীতি ও তাকওয়া ছিল পরিপূর্ণ। তিনি সমাজের মধ্যে পদ-পদবী ও ছোট বড়র মাঝে সাম্যের নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রোম ও পারস্য সম্রাটের দূতরা মদিনায় এসে খলিফা ও সাধারণ লোকের মাঝে পার্থক্য করতে পারত না। বর্ণিত আছে ওমর (রা.) গাছের নিচে ইট মাথায় দিয়ে ঘুমাতেন। রাতের গভীরে প্রজাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখতে একাকী বের হতেন। এত কম ও অতিসাধারণ খাদ্য খেতেন যে, তার গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, ওমরের রাজ্যে যদি একটা কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে হাশরের ময়দানে ওমরকে জবাবদিহি করতে হবে। এমন ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি (রা.)

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) মক্কার গোত্রপতি, নেতা, ধনী এবং বংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। তার চরিত্র এত মহৎ ছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকলে ওসমানের নিকট বিবাহ দিতাম। উল্লেখ্য ওসমান (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'কন্যাকে পর পর (একজনের মৃত্যুর পর অপরজনকে) বিয়ে করেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'কন্যাই রাসূলের জীবদ্দশায় মারা যান। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের মন্তব্য করেছিলেন।

ওসমান (রা.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সফরকারী বা হিজরতকারী দলের প্রধান ছিলেন। মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুসলমানদের প্রথম দল যখন আবিসিনিয়ায় হিজরত করে, তখন সে দলের অন্যতম সঙ্গী হন ওসমান (রা.) এবং তার স্ত্রী নবীকন্যা রুকাইয়া (রা.)। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী এবং দ্বীন রক্ষার জন্য হিজরতকারী হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে এটিই মুসলমানদের প্রথম কাফেলা।

ওসমান গনি (রা.) সর্বপ্রথম কুরআনকে পূর্ণ পুস্তক আকারে পেশ ও সংরক্ষণ করেন। জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় তিনি চুপ হয়ে যেতেন। আর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, তার দাড়ি মোবারক ভিজে যেত। তিনি আরবের নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন। আরবে তার চেয়ে বড় ও ধনী ব্যবসায়ী কেউ ছিল না। অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার কারনে তাকে গনি বলা হত। তিনি প্রায় সকল সম্পদ ইসলামের খেদমতে পেশ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় তিনি শহীদ হন। তার রক্তে আল-কুরআনের যে আয়াতটি রঞ্জিত হয়েছিল তা হল ঃ আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট; তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞাত। বিদ্রোহীরা ওসমানকে (রা.) তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে। তাকে খাবার পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এরপর তার গৃহে প্রবেশ করে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ওসমানের (রা.) ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই বলে গেছেন, একটি ফিৎনায় তাকে নিরপরাধভাবে হত্যা করা হবে (তিরমিযী) এবং তাই হয়েছিল। এ সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

ওসমান (রা.) যেমনি ধনী এবং দানবীর ছিলেন, তেমনি মিতব্যয়ী ছিলেন। একবার জনৈক লোক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে কিছু সাহায্য চাইলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে, ওসমানের (রা.) কাছে পাঠালেন। লোকটি ওসমানের (রা.) বাড়িতে এসে দেখেন, তিনি পিঁপড়ার মুখ থেকে সামান্য শস্য দানা সংগ্রহ করছেন। লোকটি ওসমানকে (রা.) কৃপণ ভেবে পুনরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে পুনরায় ওসমানের (রা.) কাছে প্রেরণ করেন। লোকটি এবার ওসমানের (রা.) কাছে সাহায্য চাইলেন (সওয়াল করলেন)। এসময় ওসমানের (রা.) কাফেলা আসছিল। ওসমান (রা.) শস্যভর্তি উটের কাফেলার প্রথম উটটিকে দান করে দিলেন। লোকটি বিস্ময় এবং খুশীতে উট নিয়ে রওনা হলেন। কিন্তু দেখা গেল কাফেলার সমস্ত উট প্রথম উটের পিছে রওনা হয়েছে। দানবীর ওসমান (রা.) হেসে বললেন, ওহে বিদেশী, ঐ সমুদয় উটের কাফেলাই তোমার। লোকটি ওসমানের (রা.) এতবড় হৃদয় এবং দানশীলতা দেখে অভিভূত হয়ে তখনই দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান।

একবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওহুদ! শান্ত হও! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দু'জন শহীদ রয়েছে। এসময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু বকর (রা.); ওমর (রা.) এবং ওসমান (রা.) ছিলেন। পরবর্তীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বাস্তবে পরিণত হয়। ওমর (রা.) কাফির গোলামের হাতে এবং ওসমান (রা.) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। (বুখারী)

www.nagorikpathagar.org

ওসমান (রা.) উন্নত শাসন ব্যবস্থা ও কর প্রবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ওসমান (রা.) কোমল প্রকৃতির ও সুন্দর ব্যবহারের মানুষ ছিলেন। তার সে সরলতা ও কোমলতার সুযোগে অনেকেই তার খিলাফতের সময় নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করত। তার মধ্যে কোন কঠোরতা ছিল না। তিনি সবাইকে সহজে বিশ্বাস করতেন এবং সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন।

ওসমান (রা.), বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সকল সামরিক যুদ্ধে ও অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসব যুদ্ধ ও অভিযানে, বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ দান করেন। তাবুকের অভিযানে তার মত আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী লোক নিজস্ব সকল সম্পদের অর্ধেক সম্পদ দান করে ছিলেন।

ওসমান (রা.) মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আরবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আরবদের কাছে তার একটা প্রতিষ্ঠিত গ্রহণযোগ্যতা ছিল। হুদাইবিয়ার অভিযানেও তিনি কুরাইশদের সাথে মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলেন এবং বন্দী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তার সাহস, বীরত্ব ও বলিষ্ঠতার প্রকাশ অনুসরণযোগ্য। কেননা শত্রুদের কাছে এভাবে একাকী যাওয়াটা বীরত্বেরই বহিঃপ্রকাশ বটে।

তিনি খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। অপরদিকে প্রায়ই তিনি সারারাত জাগতেন এবং একই রাকাতে সমগ্র কুরআন মাজীদ খতমে তিলাওয়াত করতেন। প্রায়ই রোযা রাখতেন। কখনও কখনও মাসের পর মাস রোযা রাখতেন। তিনি খুব সামান্যই আহার করতেন। অথচ তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। প্রতিবছরই হজ্জ পালন করতেন এবং হজ্জের জামাতের আমীর হতেন। দাওয়াত ও তাবলীগে গভীর মনোনিবেশ করতেন। তিনি অনেক গোলাম, দাস-দাসীকে মুক্ত করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে অনেক নামকরা আরব ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

তিনি জনহিতকর কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। রাস্তাঘাট, মসজিদ নির্মাণ, পানির ব্যবস্থা করা, কূপ, খাল-নদী খনন ইত্যাদিতে প্রচুর ব্যয় করতেন। বন্ধু ও গরীব আত্মীয় স্বজন নিয়ে আহার করতেন। পোশাক-আশাকে অতি সাধারণ ছিলেন। কখনই দামি ও মিহি কাপড় পড়েননি। আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হয়েও অতি সাধারন জীবন যাপন করে, একজন পূর্ণ ও সফল মুসলমান হিসেবে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন ওসমান গনি (রা.)

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের চতুর্থ খলিফা মহাবীর হযরত আলী (রা.)

তরুণ/বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের জৈষ্ঠ পুত্র এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবসময়ের সঙ্গী ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। ছোট (বালক) বয়স থেকেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসবাস করা তথা কাছে থেকে দেখার সুবাদে তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গভীরভাবে জেনেছেন।

আলী (রা.) সারাটি জীবন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ও সহচর্যে থেকে নিজেকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি জ্ঞানের শহর হই, তবে আলী (রা.) তার দরজা। আলী (রা.) ইসলামের তত্ত্বজ্ঞান তথা আল্লাহপাকের গভীর মারিফাত হাসিল করেছিলেন।

তিনি অত্যন্ত সাহসী ও সমরবিদ ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, সাহসী বীর ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। বদর যুদ্ধের প্রারম্ভে সামনাসামনি সমরযুদ্ধে শত্রুদের বীর সেনাকে তরবারীর এক আঘাতে ভূলুণ্ঠিত করেছিলেন। খায়বারের বিজয় সূচিত হয় তার হাতে। সে যুদ্ধে খায়বার দুর্গের লোহার দরজাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন আলী (রা.)। যুদ্ধের পর তার ব্যবহৃত ঢাল, সাতজন শক্তিমান পুরুষও সম্মিলিতভাবে তুলতে সক্ষম হননি। তবে যুদ্ধে আলী (রা.) এটি কিভাবে ব্যবহার করেছেন, মহান আল্লাহই তা ভাল জানেন।

যুদ্ধের ময়দানে, তার বীরত্বে, হুংকারে, বাহুবলে, সাহসিকতায় ও কৌশলে যেকোন শত্রু সহজেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হত। সাহসে, বীরত্বে, শৌর্যে, বীর্যে ও সমরের শক্তিমত্তায় তাকে আল্লাহর সিংহ (শেরে খোদা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

ইসলামের ক্ষতি দেখলেই তিনি বজ্রের হুংকার দিতেন। শত্রুদের উপড় বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পাশাপাশি তিনি সরল ও উদারতায় মহৎ প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানে-ত্যাগে-মহত্ত্বে-ইবাদতে-বীরত্বে সর্বত্রই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার মহাসাগর। তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন। রাসূলের জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলোতেই আলী (রা.) বীর দর্পে অংশগ্রহণ করেন ও বিজয়ে ভূমিকা রাখেন। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি আবির্ভূত হতেন সিংহের মত। মুহূর্তেই শত্রুকে ধরাশয়ী করতেন।

www.nagorikpathagar.org

পুরুষদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। অথচ তখন তিনি বালক। তিনি বালক অবস্থায় বিশ্বনবী ও মা খাদীজা (রা.) কে নামায পড়তে দেখতেন এবং এক সময় তিনিও তাদের পাশে এসে নামায পড়া শুরু করেন। অথচ মনে মনে এর পূর্বেই ইসলামের কলেমা পড়ে নেন। পিতা আবু তালিব তাকে ধর্ম বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি অকপটে ইসলাম ধর্মে দীক্ষার কথা স্বীকার করেন এবং বাকী জীবন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। অথচ সে সময় তার শিশু মনে কতটকুই বা বুঝ ছিল? আবু তালিব পুত্রের দৃঢ়তায় মুগ্ধ হন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে রেখে যান।

যেদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিররা হত্যা করার জন্য মনস্থির করে তাঁর ঘরের চারদিকে ঘিরে রেখেছিল; সেদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আলী (রা.) তাঁর বিছানায় নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন কাফিরদের প্রশ্নের কাট কাট জবাব দেন। এতে তার সাহস এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীর বিশ্বাসের যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি এতটাই অকুতোভয় ও সাহসী ছিলেন।

আলী (রা.) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা এবং বেহেশতের নারীদের নেত্রী ফাতিমার (রা.) স্বামী ছিলেন। তার দু'পুত্র ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম, নেতা এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হোসাইন (রা.) কে তাঁর কলিজার টুকরা বলেছেন। তার এ পুত্রদ্বয় (রা.) ইসলামের তথা দাওয়াত ও তাবলীগের তরে শহীদ হয়েছেন।

বদরের প্রান্তরে সামনাসামনি মল্লযুদ্ধে তাঁর হাতে বীর কাফির সেনা ওলীদ ও সায়বা নিহত হন। এছাড়া মুসলিমদের ক্ষুদ্র বাহিনীর বিজয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ওহুদ প্রান্তরে মল্লযুদ্ধে আলীর হাতে তালহা নিহত হন। খন্দকের যুদ্ধে বীর কাফির সর্দার আমর তার হাতে নিহত হন। এভাবে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের শুরুতে, প্রতিবারই বিজয় দিয়ে আলী (রা.) মুসলিম বাহিনীকে উজ্জীবিত করেছেন। হুনাইনের যুদ্ধেও মুসলমানরা প্রথম দিকে হারতে বসেছিল। এখানেও আলী (রা.) অবিচল থেকে মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে যুদ্ধ করে যান এবং শেষে মুসলমানরা জয়ী হয়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওসমানের (রা.) শাহাদাতের পর মুসলমানদের মাঝে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সময় আলীর (রা.) উপর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব আসে। সূচনা থেকেই খিলাফত তার জন্য ছিল কন্টক শয্যার মত। ঘরে ও বাহিরে (মদীনা ও অন্যান্য রাজ্যে) ছিল অসন্তোষ ও হাঙ্গামা। নানারকম দল, উপদলে এবং দাবি ও বিদ্রোহে মদীনা প্রকম্পিত। আয়িশা, যুবায়ের ও তালহার (রা.) মত জ্ঞানী সাহাবীরাও আলীকে (রা.) ভুল বুঝেছিল। জঙ্গে জামালে হাজার হাজার সাহাবা শহীদ হন। আলী (রা.) পুরো ব্যাপারটিই খুবই বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর খারিজীদের বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুয়াবিয়া (রা.) নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। এটাও বুদ্ধিমত্তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেন আলী (রা.)।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আলী (রা.) শহীদ হবে এবং নিরপরাধে তাকে হত্যা করা হবে। আর হয়েছেও তাই। এক খারেজী গোলাম (আব্দুর রহমান) তাকে ১৭ই রমযানে, ফজরের নামাযে ইমামতি করার সময় পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে। তিনি জায়নামাযে লুটিয়ে পড়েন। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর তিনি খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর।

হযরত আলী (রা.) পৃথিবীতে থেকে জান্নাতের ঘোষণা শুনেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শহীদ হওয়া এবং জান্নাত লাভের কথা পূর্বেই শুনিয়েছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা.) সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন যে, হে আলী তোমার অবস্থা ঈসার (রা.) মত হবে। ইহুদীরা তার শত্রুতা করে তাঁর মাতা সম্পর্কে কুৎসা রটায়। অপরদিকে নাসারারা (খ্রীষ্টানরা) তাকে এমন মর্যাদায় উঠায় যে, তাকে আল্লাহর পুত্র বলে। অথচ সেটার অধিকারী তিনি ছিলেন না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বাস্তবেও রূপ নিয়েছিল। খারেজী ও নাছেবীয়রা আলীর (রা.) নামে দুর্নাম রটিয়েছে। অপরদিকে রাওয়াফের ও শিয়ারা তাকে এতটা উপরে তুলেছে যে, একেবারে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে (নাউযু বিল্লাহ)। অর্থাৎ একপক্ষ তাঁর শত্রুতা করে ধ্বংস হয়েছে এবং অপর পক্ষ মিত্রতার সীমালঙ্ঘন করে কুফরী করেছে। উভয় দলই ধ্বংস এবং মহাপাপ করেছে।

নামাযে আলীর (রা.) একাগ্রচিত্ততার বিস্ময়কর নজির রয়েছে। যুদ্ধে আলীর (রা.) পায়ে তীর বিদ্ধ হলে, কোনভাবেই তা বের করা যাচ্ছিল না। এমন সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আলী (রা.) নামাযে দাঁড়ান। আর তিনি

মহান আল্লাহর সাথে গভীর মিরাজে হারিয়ে যান। এসময়, আলীর (রা.) পায়ে অস্ত্রপচার করে বিদ্ধ তীর বের করা হয়। তিনি (রা.) টু শব্দটি পর্যন্ত করেননি। ইবাদতে এমন একাগ্রচিত্তের উদাহরণ বিরল।

মহাবীর আলী (রা.) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই যুদ্ধ করেছেন। একবার যুদ্ধক্ষেত্রে এক বীর কাফিরকে ধরাশয়ী করে হত্যা করতে অস্ত্র উত্তোলন করেন। এমন সময় কাফির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলীর (রা.) মুখে থুথু মারে। আলী (রা.) ধরাশয়ী কাফিরকে হত্যা না করে উঠে পড়লেন। পরাজিত কাফির সেনা বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে আলীকে (রা.) জিজ্ঞেস করে, ভাই তুমি আমাকে হাতের নাগালে পেয়েও, হত্যা না করে ছেড়ে দিলে কেন? আলী (রা.) বলেন, হে পরাজিত সৈনিক! আমি যুদ্ধ করি মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য। নিজের বীরত্ব জাহিরের জন্য নয়। নিজের খায়েশাতের জন্য নয়। তুমি যখন আমাকে থুথু মারলে তখন আমার তোমার প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে অবস্থায় যদি, আমি তোমাকে হত্যা করতাম, তবে তা হত ব্যক্তিগত ক্ষোভ চরিতার্থের শামিল। আমি তো নিজের জন্য তোমাকে হত্যা করব না। তাই আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি। কাফির সেনা ইসলামের মহত্ত্বে এবং আলীর (রা.) ঈমানী শক্তির কাছে লুটিয়ে পড়ে। সাথে সাথে চিৎকার করে ঘোষণা করে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ভাই আলী আমাকে ক্ষমা কর! আমাকে পবিত্র কর! আর আমাকে মহান ইসলামের শান্তির কাছে আশ্রয় দাও। এ হচ্ছে মহাবীর আলীর (রা.) মহানুভবতা ঈমানী জোর আর তাকওয়ার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, খিলাফতের শাসন আমল হবে ৩০ বছর। এরপর নিছক রাজ্য শাসন শুরু হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। আবু বকর (রা.) দু'বছর; ওমর (রা.) সাড়ে দশ বছর, ওসমান (রা.) বার বছর এবং আলী (রা.) মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। বাস্তবেও সর্বমোট ৩০ বছর খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায়নীতির ও ইসলামের শাসন কায়েম ছিল। এরপর শুরু হয়েছিল সাধারণ রাজ্য শাসন। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল ছিল ইসলামী আদর্শের বাস্তব রূপ এবং অনুসরণীয় কর্মপন্থা। ওটাই আমাদের জন্য মডেল এবং অনুকরণীয় যোগ্য আদর্শ।

মক্কার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা

মক্কার ইতিহাস

মক্কার অনেক ফযীলত রয়েছে। নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আদী বিন হামরা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.nagorikpathagar.org

ওয়াসাল্লামকে মক্কায় সওয়ারীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় মক্কাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর শপথ, তুমি আল্লাহর যমীনের মধ্যে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ। যদি আমাকে তোমার কাছ থেকে বের করে দেয়া না হত, তাহলে আমি কিছুতেই বের হতাম না।" ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান বা উত্তম বলেছেন। নাসায়ী গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযওয়ারা নামক বাজারে বলেছেন, 'হে মক্কা, আল্লাহর শপথ, তুমি আল্লাহর উত্তম যমীন এবং আল্লাহর প্রিয় শহর; যদি তোমার কওম, আমাকে তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত না করত, তাহলে আমি কখনও অন্যত্র বাস করতাম না। ইবনে আসীর বলেছেন, হাযওয়ারা মক্কার একটি জায়গার নাম। এ জায়গাটি বাবে ইবরাহীমের পশ্চিমে। এটি বর্তমানে মসজিদে হারামের নতুন সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'তুমি মক্কা, কতইনা ভাল এবং আমার নিকট কতইনা প্রিয়! যদি তোমার লোকেরা আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমার থেকে দূরে অন্য কোথাও বাস করতাম না।' বর্ণিত হাদীসসমূহের দ্বারা মক্কার সম্মান ও মর্যাদা বুঝা যায়। তবে এ নিরাপদ নগরীর সবচাইতে বড় মর্যাদা মসজিদে হারামের অস্তিত্বের কারণেই হয়েছে।

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ কা'বাকে সম্মানিত ঘর এবং মানুষের টিকে থাকার কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।' বাইতুল হারামের এ সম্মানিত এলাকা বলতে হারাম সীমান্তের ভিতরের সকল এলাকাকে বুঝায়। হারাম এলাকার চারদিকের সীমান্তের মধ্যে স্তম্ভ নির্মাণ করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ গোটা হারাম এলাকার মর্যাদা অনুরূপ করে দিয়েছেন। এতে করে কাবার সম্মান বাড়ানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য। শরীয়তের বিধি-নিষেধ উভয় জায়গার জন্যই সমান করে দেয়া হয়েছে। ইমাম যুহরী বলেছেন, হারাম এলাকার সীমানা সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই নির্ধারণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এর নির্দেশক্রমেই তিনি সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করেন। তারপর কুসাই বিন কিলাব তা পুনঃনির্ধারণ করেন। এরপর মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামীম বিন উসাইদ আল খোযায়িকে তা পুনঃনির্ধারণ এর জন্য পাঠান। তিনি সেগুলোর পুনঃসংস্কার করেন। এভাবেই শত শত বছর ধরে হারাম শরীফের সীমানার হিফাযত করা হচ্ছে।

আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ.) কে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠান। তাঁরা দুনিয়ার

www.nagorikpathagar.org

কোন জায়গায় অবতরণ করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে জারীর আততাবারী লিখেছেন, আদম (আ.) কে ভারতবর্ষে অবতরণ করানো হয়। বেহেশত থেকে ভারত ভূখণ্ডে অবতরণের কারণে ভারতের গাছপালা বেহেশতী সুঘ্রাণে মোহিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর মতে, আদম (আ.) কে ভারতে এবং হাওয়া (আ.) কে জেদ্দায় অবতরণ করানো হয়। দুনিয়াতে একাকী অবতরণ করার পর পরই আদম (আ.) তাঁর সঙ্গিণী হাওয়াকে খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে আদম (আ.) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হন এবং সেখানে হাওয়া (আ.) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হাওয়া (আ.) মুযদালিফায় আদম (আ.) এর সাথে মিলিত হন। অভিধানে আরাফাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচয় বা জানাশুনা এবং মুযদালিফা শব্দের অর্থ হচ্ছে মিলিত হওয়া। আল্লাহর ইচ্ছায় এ সকল ঘটনা সবই সম্ভব। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আদম (আ.) সরন্দ্বীপ (বর্তমান শ্রীলংকার) চুজ নামক পাহাড়ে (Adam Hill) এবং হাওয়া (আ.) জেদ্দায় অবতরণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ উলঙ্গ আদম ও হাওয়ার সতর ঢাকার উদ্দেশ্যে বেহেশত থেকে একটি দুম্বা পাঠিয়ে তা যবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁরা উভয়ে দুম্বার পশম দিয়ে নিজেদের কাপড় তৈরী করেন। আদম (আ.) নিজের জন্য একটা জুব্বা এবং হাওয়া নিজের জন্য একটি লম্বা জামা ও ওড়না তৈরি করেন। তাঁরা বেহেশতে থাকা অবস্থায় পোশাক পরেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কারণে তাদের বেহেশতী পোশাক খসে পড়ে। তাই তাঁরা বেহেশতের পাতা দিয়ে সতর ঢাকার চেষ্টা করেন। দুনিয়াতে অবতরণের পর তাঁদের সেই বেহেশতী অভ্যাস বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁদের পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন। তাই যে সকল ঐতিহাসিক মানব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়কে পুরাতন ও নতুন পাথর যুগ এই দুই ভাগে ভাগ করে বলেন, প্রাথমিক যুগের মানুষ অসভ্য ছিল, তারা পোশাক না পরে উলঙ্গ থাকত-তা নিতান্ত আন্দাজ-অনুমান ও ভিত্তিহীন বক্তব্য। আদম (আ.) নবী ছিলেন। তাই প্রথম আদিম মানুষটি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্য। কেননা, সভ্যতার জ্ঞানদানকারী স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতেই তিনি দুনিয়ায় মানব জীবন ও সভ্যতা সূচনা করেন।

ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ, আদম (আ.) এর কাছে ওহী পাঠিয়ে বলেন, আমার আরশ বরাবর নীচে একটি হারাম বা সম্মানিত জায়গা আছে। তুমি সেখানে গিয়ে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরি কর এবং আমার আরশের চারপাশে তওয়াফকারী ফেরেশতাদের মত তুমিও এর তওয়াফ কর। সেখানে

www.nagorikpathagar.org

আমি তোমার ও তোমার সন্তানদের দোয়া কবুল করব। হযরত আদম (আ.) জবাবে বলেন, হে আল্লাহ! সে জায়গাটি তো আমি চিনি না। তারপর একজন ফিরিশতা তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। তিনি পাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়ে মক্কায় আল্লাহর ঘর কা'বা তৈরি করেন। পাহাড়গুলো হচ্ছে, ১) তুরে সিনাই, ২) তুরে যাইতুন বা যাইতা, ৩) লুবনান পাহাড়, ৪) যুদী পাহাড় ও ৫) হেরা পাহাড়। তিনি প্রথমোক্ত ৪টি পাহাড়ের পাথর দিয়ে কাবার দেয়াল এবং হেরা পাহাড়ের পাথর দিয়ে এর ভিত্তি নির্মাণ করেন। তারপর ফিরিশতা তাঁকে আরাফাতে নিয়ে যান এবং হজ্জের সকল নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন। তিনি এক সপ্তাহ যাবত আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করেন। ইবনে জারীর আততাবারী আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ করেন, আরাফাতে ফিরিশতারা আদম (আ.) কে বলেন ঃ হে আদম! আমরা আপনার হাজার হাজার বছর আগে এ ঘরে হজ্জ আদায় করেছি। আদম (আ.) বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসার সময় সাথে করে হাজারে আসওয়াদ নিয়ে আসেন। এটি তখন ধবধবে সাদা ছিল। তিনি তা কা'বায় লাগান। ইবনে জারীর আত-তাবারী এবং আযরাকী আবদুর রহমান বিন সাবেত সহ অন্যান্য তাবেঈদের বরাত দিয়ে এক হাদীসের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে, মসজিদে হারামে নূহ (আ.) এর কবর অবস্থিত। এ মতটিই বেশী শক্তিশালী। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত হূদ (আ.)ও মক্কায় এসেছেন এবং হজ্জ পালন করেছেন। হযরত আলী থেকে ইয়েমেনে হযরত হূদের কবরের অবস্থার বর্ণনা উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায় হজ্জকালীন সময়ে বর্ণিত হাদীসে হযরত সালেহ (আ.) এর মক্কায় আগমন ও হজ্জ করার কথা উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমে মক্কায় আসেন, কা'বা ঘর নির্মাণ করেন এর তওয়াফ করেন ও হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধর কাবিলসহ অনেকেই আরব ভূখণ্ডে বাস করেন। হযরত নূহ (আ.), হূদ (আ.) ও সামুদ (আ.) আরব ভূখণ্ডেই বাস করেছেন এবং সকলে মক্কায় আগমন করেছেন। তাই মক্কার ইতিহাসের সাথে সবাই সম্পৃক্ত। এরপর মক্কার ইতিহাসের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী জড়িত হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। মক্কায় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর আগমনের পূর্বে আমালি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করত বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, ইসমাঈল (আ.) এর মা হাজেরার অনুমতিক্রমে জোরহাম গোত্র মক্কায় বসবাস শুরু করে এবং মক্কায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারাই আমালিক সম্প্রদায়ের লোকদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করে এবং মক্কায় তাদের একচ্ছত্র অধিকার

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর ঘরের স্থানটি একটি লাল পাহাড়ের মত উঁচু ছিল। তখন মক্কা উপত্যকায় কেউ বাস করত না। তারপর থেকেই সেখানে অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা শুরু হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকেই মক্কা নগরীর মূল ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। এর আগে ফিরিশতা, জীন, হযরত আদম (আ.) এবং আমালিক সম্প্রদায়ের লোকেরাসহ অন্যরা মক্কায়,পবিত্র কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে আল্লাহর ইবাদত করেছেন। সত্যিকার অর্থে, ঐ উপত্যকায় মানুষের বসবাস শুরু হয় হযরত ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজেরার আগমনের পর থেকেই। তারপর, ক্রমান্বয়ে তা মানব সভ্যতার লীলাভূমিতে পরিণত হয় এবং মক্কা গড়ে ওঠে একটি নগররাষ্ট্র হিসেবে।

কিভাবে পবিত্র মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন হয় এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বুখারী শরীফের 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে একটি লম্বা হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সে হাদিসের শেষাংশে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "একদিন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী সারা, (মিসরে) এক যালেম শাসকের (ফিরআউনের) এলাকায় এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে জানানো হল যে, এ এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছেন এবং তাঁর সাথে রয়েছে এক শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম (আ.) এর কাছে লোক পাঠায় এবং তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; এ মহিলাটি কে? ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, সে আমার (দ্বীন) বোন। তারপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, আমি এবং তুমি ছাড়া, যমীনের উপর আর কোন মুমিন নেই। এ রাজা আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাকে বলেছি, তুমি আমার (দ্বীন) বোন। সুতরাং, তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। রাজা সারাকে তার কাছে আনার জন্য লোক পাঠালো। সারা যখন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়াল এবং সাথে সাথে আল্লাহর গযবে আটকা পড়ল। যালেম রাজা (অবস্থা বেগতিক দেখে) সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। যালেম আবারও তাঁর প্রতি হাত বাড়াল এবং এবারও আগের মত কিংবা আরো ভয়াবহ গযবে পতিত হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। সারা আবারও দোয়া করলেন এবং রাজা আবারও মুক্তি পেল। পরে

www.nagorikpathagar.org

রাজা কোন একজন দারোয়ানকে ডাকলো এবং বলল, তোমরা আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, এনেছ একজন শয়তানকে। রাজা সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' নামক এক মহিলাকে দান করল। এরপর সারা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর কাছে আসলেন। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন এবং হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঘটেছে? সারা বলল, 'আল্লাহ যালেম কাফিরের চক্রান্ত তারই বুকে পাল্টা নিক্ষেপ করেছেন (অর্থাৎ অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছেন) এবং সে 'হাজেরা'-কে আমার খেদমতের জন্য দান করেছেন।' এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, "হে আকাশের পানির সন্তানরা! এ 'হাজেরা'-ই তোমাদের আদি মাতা।" এ হাদীস থেকে আমরা মক্কার ইতিহাসের অন্যতম উৎস হচ্ছে, হযরত ইসমাঈল (আ.) এর মা 'হাজেরা' সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা করতে পারি। শিশু ইসমাঈল ও তাঁর মা 'হাজেরা' মক্কায় বসবাস শুরু করার পর এ শহরের সূচনা হয়।

ইসমাঈলের মার নাম হচ্ছে 'হাজেরা'। 'সোহায়লী বলেছেন, "মহিলাদের মধ্যে হযরত 'হাজেরা'ই সর্বপ্রথম কান ছিদ্র করেছিলেন এবং পরনের কাপড়ের আঁচল পেঁচিয়েছেন। কেননা, হযরত সারা তাঁর উপর রাগ করেছিলেন এবং তার শরীরের তিনটি অঙ্গ কেটে ফেলার শপথ করেছিলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) 'হাজেরা'-কে হযরত সারার শপথ পূরণ করার উদ্দেশ্যে নিজের কান ছিদ্র করার নির্দেশ দেন। তখন থেকেই, এ কাজ মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। মাতাপিতাহারা 'হাজেরা' মিসরের বাদশাহ ফিরআউনের কাছে ছিলেন। বাদশাহ সারার উদ্দেশ্যে 'হাজেরা'-কে উপহার দেয়। অপরদিকে, সারা ছিলেন ইবরাহীম (আ.) এর চাচাতো কিংবা ফুফাতো বোন। পরে সারা 'হাজেরা'-কে ইবরাহীম (আ.) এর নিকট উপহার দেন। প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। ইবরাহীম (আ.) দুগ্ধপোষ্য শিশু (১/২ বছর) ইসমাঈলসহ সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি মক্কায় আল্লাহর ঘর কা'বার স্থান সম্পর্কে নির্দেশ পান। নির্দেশ দেয়া হয়, আপনি সে স্থানকে পাক-সাফ করে তওয়াফ ও নামায দ্বারা আবাদ করবেন। ঐ আদেশের প্রেক্ষিতে জিব্রাঈল (আ.) বোরাক নিয়ে আসেন এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল ও হাজেরাকে নিয়ে রওনা হন। পথে কোন জনপদ দেখলেই ইব্রাহীম (আ.) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ আমাদেরকে কি এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? জিব্রাঈল বলতেন ঃ না আপনার গন্তব্যস্থান আরও সামনে। অবশেষে তাঁরা মক্কা আসলেন। এখানে কাঁটাযুক্ত বন-জঙ্গল বাবলা গাছ ছাড়া কিছুই ছিল না। এ ভূখণ্ডের আশেপাশে কিছু জনবসতি ছিল। তাঁরা ছিল

www.nagorikpathagar.org

আমালিক সম্প্রদায়ের লোক। আল্লাহ্‌র ঘরটি তখন টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। এখানে পৌঁছে ইবরাহীম (আ.) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কি এখানেই বাস করতে হবে? জিব্রাঈল বলেন ঃ হ্যাঁ। ইবরাহীম (আ.) শিশুপুত্র ও 'হাজেরা'সহ এখানে অবতরণ করেন। কা'বা গৃহের কাছে একটি কুড়েঘর তৈরী করে তাতে ইসমাঈল ও 'হাজেরা'-কে রেখে যান। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যই, ইবরাহীম (আ.) হাজেরা ও ইসমাঈল (আ.) কে মক্কায় রেখে যান। তিনি তাদের উপর যুলুম করেননি এবং কোন কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রর্দশন করেননি। শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন। এ বিষয়ে বুখারী শরীফের 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নারী জাতি সর্বপ্রথম হযরত ইসমাঈল (আ.) এর মা (হাজেরা) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে নিজ নিদর্শনাবলী (গর্ভধারণের) গোপন করার উদ্দেশ্যে কোমরবন্ধ বা কোমরে রশি বাঁধতেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসিন দেয়ার উদ্দেশ্যে) বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ.) তাঁদের উভয়কে নিয়ে কা'বা ঘরের কাছে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদে হারামের উঁচু দিকে যমযম কূপের উপর এক বড় গাছের নিচে তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় কোন লোকজন ছিল না এবং পানিও ছিল না। তিনি তাঁদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে অল্প পানি দিয়ে গেলেন। এরপর ইবরাহীম (আ.) নিজ অবস্থানের দিকে ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মা (হাজেরা) তার পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বার বার তা বলতে লাগলেন কিন্তু ইবরাহীম (আ.) সেদিকে ফিরে তাকালেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে এ (নির্বাসনের) নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। জবাব শুনে হাজেরা বললেন, তাহলে (ঠিক আছে) আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) (পিছনে না তাকিয়ে) সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন এবং স্ত্রী-পুত্র আর তাকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেন ঃ "হে আমাদের রব, তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এমন এক উপত্যকায় আমার সন্তান ও পরিবারের বসতি স্থাপন করেছি যা কৃষির অনুপযোগী। হে রব, উদ্দেশ্য

www.nagorikpathagar.org

এই, তারা নামায কায়েম করবে; অতএব তুমি অন্যান্য লোকের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা (তোমার নিয়ামতের) শুকরিয়া আদায় করতে পারে।"

এরপরই ইসমাঈলের মা, ইসমাঈলকে (নিজের বুকের) দুধ পান করাতেন আর নিজে একটা মশক থেকে পানি পান করতেন। (ঐ পানি পান করার সাথে সাথে শিশু পুত্রের জন্য তাঁর দুধে জোয়ার আসতো)। শেষ পর্যন্ত মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও পিপাসায় কাতর হলেন এবং (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু-পুত্রটিও পিপাসায় ছটফট করতে থাকে। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন যে পিপাসায় শিশুর বুক ধড়ফড় করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার দিকে তাকানো তাঁর জন্য অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং সাফা পাহাড়কেই একমাত্র নিকটতম পাহাড় হিসেবে পেলেন। তারপর তিনি এর উপর উঠলেন এবং ময়দানের দিকে মুখ করলেন। এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু না, তিনি কাউকে দেখলেন না। তখন তাড়াতাড়ি সাফা পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নিচে ময়দানে নামলেন তখন আপন জামা এদিকে তুলে একজন ক্লান্ত ব্যক্তির মত দৌড়ে চললেন। তারপর উপত্যকা অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ে আসলেন এবং উপরে উঠলেন। তারপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা? তিনি (পাহাড় দু'টির মধ্যে) এভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ জন্যই (হজ্জের সময়) মানুষ এ পাহাড় দু'টির মধ্যে ৭ বার সায়ী করে (জোরে হাটে) এবং এটা হজ্জের একটি অংগ। তারপর তিনি যখন (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজে নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর; (মনোযোগ দিয়ে শুনি) তিনি মনোযোগের সাথে ঐ আওয়াজের দিকে কান দিলেন। আবারও আওয়াজ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজতো শুনিয়েছ। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে, তাহলে আমাকে সাহায্য কর। হঠাৎ তিনি যমযমের জায়গায় একজন ফিরিশতা দেখতে পেলেন। সে ফিরিশতা আপন পায়ের গোঁড়ালী দ্বারা আঘাত করলেন কিংবা আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগলো। হযরত হাজেরা পানির উৎসের চারপার্শ্বে আপন হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে কূপের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলী ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হযরত হাজেরার অঞ্জলী ভরার পরে পানি উথলে উঠতে লাগল। হযরত

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মাকে রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলী ভরে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবাহমান ঝর্ণাধারায় পরিণত হত এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে যেত।

এরপর হযরত হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকে দুধ পান করালেন। তখন ফিরিশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন ভয় করবেন না। কেননা, এখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে; এ শিশু তার পিতার সাথে এ ঘরটি পুনঃনির্মাণ করবেন। আল্লাহ্ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। তখন আল্লাহর ঘরের ভিটিটি যমীন থেকে বেশ উঁচু ছিল। বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট বন্যায় এর ডানে-বায়ে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। হযরত হাজেরা এভাবেই দিন অতিবাহিত করছিলেন। শেষে একদিন ইয়েমেনের জোরহাম গোত্রের কিছু লোক কাবার পথে এসেছিলেন। তারা মক্কার দিকে অবতরণ করলেন। তারা দেখলেন যে, কতগুলো পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তাঁরা ভাবলেন, নিশ্চয়ই এ পাখিগুলো পানির উপরেই ঘুরছে। অথচ তারা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছে, কিন্তু কোন পানি সেখানে ছিল না। এরপর তারা এক বা দু'জন লোককে সেখানে পাঠালেন। তারা গিয়ে পানি দেখতে পেলেন। তাঁরা ফিরে এসে অপেক্ষমান সবাইকে পানির খবর দিলেন। খবর শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলেন। ইসমাঈলের মা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা সবাই 'হ্যাঁ' বলে প্রস্তাবে রাজী হলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচার্য কামনা করছিলেন। তারপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল; তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি প্রজন্ম অবস্থান করল। ইসমাঈলও আস্তে আস্তে বড় হলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাদের ভাষা আরবী শিখলেন। যুবক হওয়ার পর তিনি তাদের কাছে অধিকতর প্রিয়পাত্রে পরিণত হলেন। তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁরা তাদেরই এক মেয়েকে তাঁর কাছে বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর ইসমাঈলের মা হাজেরা ইন্তিকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসমাঈলের বিয়ের পর ইব্রাহীম (আ.) তাঁর নির্বাসিত পরিবারকে দেখার জন্য মক্কায় আসেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। ফলে পুত্রবধূর কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বললেন, তিনি আমাদের খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম (আ.) পুত্রবধূকে তাদের সংসার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধূ হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর কাছে তাঁদের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তিনি পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী ঘরে ফিরে আসলে তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠটি বদলিয়ে ফেলে। ইসমাঈল (আ.) যখন ঘরে ফিরলেন, তখন তিনি যেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আগমন সম্পর্কে কিছু একটা আভাষ পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ এসেছিলেন কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এমন আকৃতির একজন বুড়ো লোক এসেছিলেন এবং আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর জানিয়েছি। তিনি আবার আমাকে আমাদের সংসার জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমরা দুঃখ-কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ওসীয়ত করে গেছেন? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন আমি যেন আপনাকে তার সালাম পৌছাই এবং আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে নেন। ইসমাঈল (আ.) বললেন, উনি আমার আব্বা। ঐ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন; যেন তোমাকে আমি পৃথক করে দেই অর্থাৎ তালাক দেই। সুতরাং তুমি তোমার বাপের বাড়িতে আপন লোকের কাছে চলে যাও। এ বলে হযরত ইসমাঈল (আ.) স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ বংশের অপর একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। তারপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, ইবরাহীম (আ.) ততদিন তাদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার এদেরকে দেখতে আসলেন কিন্তু ইসমাঈল (আ.) কে পেলেন না। তিনি নতুন পুত্রবধূর ঘরে ঢুকলেন এবং ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? পুত্রবধূ জবাব দিলেন, আমরা ভাল আছি ও সুখে আছি এবং পুত্রবধূ আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাবার কি? পুত্রবধূ জবাবে বললেন, 'গোশত।' তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পানীয় কি? তিনি জবাব দিলেন, 'পানি।' ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর।'

www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত না। যদি হত হযরত ইবরাহীম (আ.) সে ব্যাপারেও তাদের জন্য দোয়া করতেন। কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন যাপন করতে পারে না। কারণ, শুধু গোশত ও পানি সবসময় মেজাযের অনুকূল হতে পারে না। ইবরাহীম (আ.) আলাপ শেষে পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম জানাবে এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে। এরপর ইসমাঈল (আ.) যখন বাড়ি আসলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে কেউ কি এসেছিলেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বুড়ো লোক এসেছিলেন। স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন ও বললেন, আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা সুখে-শান্তিতে আছি। ইসমাঈল জানতে চাইলেন তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে সালাম করে, এ নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আ.) বললেন, উনিই আমার বাবা। আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

ইবরাহীম (আ.) আবারও কিছুদিন তাদের কাছ থেকে দূরে রইলেন এরপর আবার তাদের কাছে আসলেন। এসে দেখলেন, ইসমাঈল (আ.) যমযমের কাছে একটি গাছের নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। বাবাকে আসতে দেখে পুত্র দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। ইব্রাহীম (আ.) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম করেছেন। ইসমাঈল (আ.) জবাব দিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে যা আদেশ করেছেন, আপনি তা করে ফেলুন। ইব্রাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে, এর চারপাশে ঘেরাও করে একটি ঘর তৈরী করতে নির্দেশ দিয়েছেন; এ বলে তিনি উঁচু পাহাড়টির দিকে ইশারা করে তাঁকে স্থানটি দেখালেন। তারপর তাঁরা কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে শুরু করলেন। ইসমাঈল (আ.) পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আ.) গাঁথুনী করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ.) 'মাকামে ইব্রাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইব্রাহীম (আ.) এর জন্য তা রাখলেন। ইব্রাহীম (আ.) এর উপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরী করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। তাঁরা উভয়েই এ দোয়া করলেন, "হে আমদের প্রতিপালক, আমাদের কাছ থেকে এটি কবুল করুন! নিশ্চয়ই আপনি বেশী শোনেন এবং বেশী জানেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসমাঈল (আ.) এর মা হাজেরা ছিলেন সারার উপহারপ্রাপ্ত একজন যুবতী কন্যা। সারার কোন সন্তান না থাকায় তিনি তাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে বিয়ে দেন। পরে সারার সাথে হাজেরার সতীনসুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরপর হাজেরা গর্ভবতী হন। কিন্তু সারা তা সহ্য করতে পারেননি। তাই সারা সর্বক্ষণ হাজেরার পেটের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। কেননা বার্ধক্য পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও সারার ঘরে কোন সন্তান না হওয়ায় হঠাৎ করে সারার মনে প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়। অবশ্য ইসমাঈলের জন্মের অনেক পরে সারার ঘরে হযরত ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করে। হাজেরা নিজ পেটের নিদর্শন গোপন করার জন্য কোমরবন্ধ কষে পরতেন; যেন পেট বড় না দেখা যায়। অতপর হযরত ইসমাঈল (আ.) হাজেরার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) হাজেরা (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) কে মক্কার নির্বাসন দেয়ার পর ফিরে যান। ইতোমধ্যে ৯০ বছর বয়সে হাজেরা মারা যান। তিনি কুরবানীর ঘটনা, কা'বা নির্মাণ এবং নির্বাসিত পরিবারের খোঁজ নেয়ার জন্য পরবর্তীতে চারবার মক্কায় আসেন। দু'বার ইসমাঈল (আ.) কে না পেয়ে তাঁর দুই স্ত্রীর সাথে আলাপ করে তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নেন। ইসমাঈল (আ.) জোরহাম গোত্রে বিয়ে করার পর তাদের সাথেই তার সামাজিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা গড়ে ওটে। এইভাবে, ইসমাঈল (আ.) কে কেন্দ্র করে মক্কায় মানুষের পূর্ণাঙ্গ আবাদ শুরু হয় এবং যমযম কূপের পানিই তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অবলম্বন হয়। যমযম কূপ না হলে জোরহাম গোত্রের মক্কায় বসবাস করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, যমযমের পানির কারণেই তারা এখানে বাস করতে আকৃষ্ট হয় এবং এর ফলে মক্কায় বসতি গড়ে উঠে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ৪র্থ বার মক্কা সফরে এসে হযরত ইসমাঈল (আ.) কে নিয়ে কা'বা শরীফ তৈরী করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ ছেলে ইসমাঈল (আ.) কে নিয়ে কাবা শরীফ তৈরীর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৫ম পূর্বপুরুষ কুসাই বিন কিলাবের হাতে মক্কার শাসনভার আসার আগ পর্যন্ত, মসজিদে হারাম বলতে শুধু কা'বা শরীফকেই বুঝানো হত। কিন্তু কুসাই-এর হাতে ক্ষমতা আসার পর তিনি কা'বা শরীফের চারপাশে প্রশস্ত কিছু জায়গা খালি রাখেন। সে খালি জায়গাটুকুকেই মসজিদে হারাম বলা হত। তখন কা'বার চারপাশে বৃহদাকারের ঘর-বাড়ি ছিল না এবং মসজিদে হারামের চার দিকেও সীমানা চিহ্নিতকারী কোন দেয়াল ছিল না। ইতোপূর্বে আমালিকা সম্প্রদায়, জোরহোম, খোযাআ' ও কুরাইশ গোত্রের লোকেরা মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝে ঢালু পাদদেশে বাস করত। কাবার

www.nagorikpathagar.org

সম্মানে তারা কা'বার পাশে কোন ঘর ও দেয়াল নির্মাণ করার সাহস করেনি। কুরাইশরা কা'বার চারপাশে ঘর তৈরী করে এবং কা'বামুখী দরজা লাগায়। তওয়াফকারীদের তওয়াফের জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়। প্রতি দুই ঘরের মাঝে রাস্তা নির্মাণ করা হয় এবং মাতাফে আসার জন্য একটি দরজা রাখা হল। প্রত্যেক ঘর গোলাকৃতির ছিল, কোনাটাই চার কোণবিশিষ্ট ছিল না। যাতে করে চতুর্ভুজ বিশিষ্ট কা'বার সাথে তাদের ঘরের কোন সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয়। তবে তারা কা'বার উচ্চতার চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু করে ঘর তৈরি করে। কা'বার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নীচু করে ঘর করায়, মক্কার প্রায় সকল দিক থেকে কা'বা শরীফ নজরে পড়ত। কা'বার পাশে যারা ঘর তৈরী করেছে তাদেরকে 'অভ্যন্তরীণ কুরাইশ' বলা হত। কুরাইশদের বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের বাড়ি-ঘরও বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহর যুগে, মক্কার দুই পাহাড়ের ঢালু পাদদেশ পর্যন্ত তাদের ঘর-বাড়ি সম্প্রসারিত হয়। আযরাকী, ফার্সী, কুতুবুদ্দিন হানাফী এবং মক্কার অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ আইয়ামে জাহেলিয়াতে মসজিদে হারামের উপরোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহেলিয়াতের সময় মসজিদে হারামের কোন উল্লেখ ছিল না। কেননা, তখন নামায পড়ার বিধান ছিল না বলে তাদের মসজিদেরও দরকার হত না। জাহেলিয়াতের যুগে শুধু তাওয়াফের প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে তারা সকাল সন্ধ্যায় কাবার পার্শ্বে আসর জমাতো এবং কা'বার ছায়ায় বসত। এ সকল আসরে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাধারণ আলোচনা করত। ছায়া সরে গেলে কুরাইশরাও সরে যেত। মসজিদে হারাম তথা তওয়াফের স্থানটি তাদের জনসাধারণের জন্য কাউন্সিলের মত ব্যবহার হত এবং এতে পরস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ আলোচনা হত।

ইসলামের প্রথমদিকে মক্কার নওমুসলিমগণ মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের ঘরে গোপনে নামায আদায় করত। এ অবস্থা দীর্ঘ তের বছর অর্থাৎ হিজরতের আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে খুবই নগণ্য সংখ্যক মুসলমান কাবার পার্শ্বে গিয়ে নামায পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) সহ গুটিকতক লোক সেখানে নামায পড়েছেন। নামায পড়ার কারণে তাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করা হতো। কুরাইশদের অত্যাচারে, অনেকে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা মদীনায় হিজরত করেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিজরত করেন। তখন দুর্বল মুসলমানরা ব্যতীত কেউ মক্কায় ছিলেন না এবং মক্কা প্রায় মুসলমানশূন্য হয়ে গিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

হিজরী ৮ সালে, মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মুসলমানরা মসজিদে হারামে নামায পড়ার সুযোগ পায়নি। মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে মুসলমানদের হিজরত বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন থেকে তারা মসজিদে হারামে প্রকাশ্যে নামায পড়া শুরু করে। মক্কার মুসলমানরা ইসলামী সেনাবাহিনীতে যোগদান করে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করায় এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এলাকার বাইরে অবস্থান করায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় এবং স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর খিলাফত আমলে মক্কায় তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। সেজন্য তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামাযের সংকুলান হয়ে যেত। তাই তখন মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকরের আমলেও তওয়াফের জন্য নির্ধারিত স্থানকেই মসজিদে হারাম বলা হত। পবিত্র কুরআন মজীদের ১৫ জায়গায় ঐ স্থানটুকুকেই মসজিদে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরী ১৭ সালে, হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পর থেকে হযরত উমর (রা.) এর আগ পর্যন্ত আর কেউ মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করেননি।

এরপর একবার মক্কার উচ্চভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে মসজিদে হারামের নিম্নভূমিতে 'উম্মে নহশল' নামক এক ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি হয় এবং বন্যার পানি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে মাকামে ইবরাহীমকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং পানি শুকানোর পর তা মক্কার নিম্নভূমিতে পাওয়া যায়। পরে তা সেখান থেকে এনে কা'বা শরীফের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়। এ বন্যায় মাকামে ইবরাহীম স্থানচ্যুত হওয়ার খবর খলীফা উমরের কাছে পৌঁছার পর তিনি এটাকে ভয়াবহ সমস্যা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি ১৭ হিজরীর রমযান মাসে উমরাহর নিয়তে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মসজিদে হারামে ঢুকে মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহর কসম দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তির কাছে মাকামে ইব্রাহীমের স্থানের সঠিক জ্ঞান আছে সে যেন তা প্রকাশ করে। তখন আবদুল মুত্তালিব বিন আবি ওয়াদা' আস-সাহমী (রা.) বলেন, 'হে আমীরুল মুমেনিন! এ বিষয়ে আমি সঠিক ওয়াকিবহাল। আমার একবার এরকম আশংকা হয়েছিল যে, কোন সময় যদি এরকম দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার সঠিক পরিমাণ হেফাযত করা দরকার হবে, আমি মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান থেকে বাবুল কাবা এবং যমযমের দূরত্ব একটি রশি দ্বারা মেপে রেখেছি। সে রশিটি আমার ঘরে মওজুদ আছে।' হযরত উমর বলেন, তুমি আমার কাছে বস এবং

একজনকে রশিটি আনার জন্য পাঠিয়ে দাও। তিনি বসলেন এবং একজনকে পাঠিয়ে রশি আনালেন। পরে রশি দিয়ে মেপে তা পূর্বের যথার্থ স্থানে রাখলেন। আজকে আমরা যেখানে তা দেখছি এটিই সে স্থান। পরে মাকামে ইব্রাহীমকে মজবুতভাবে সেখানে বসানো হয়। আযরাকী এবং মাওয়ারদীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিকরা এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। হযরত সুয়ূতী তাঁর 'আওয়ায়েল কিতাবে' লিখেন যে, মাকামে ইবরাহীমকে পুনর্বহাল করার পর এর পিছনে সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা.) নামায পড়েন।

মাকামে ইব্রাহীমের পুনর্বহাল কাজ শেষ করার পর হযরত উমর (রা) মসজিদে হারাম তথা তওয়াফের নির্দিষ্ট স্থানে মুসল্লীদের প্রচ ভিড় লক্ষ্য করেন। তাই তিনি মসজিদে হারামের নিকটবর্তী ঘরগুলো কিনে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলেন এবং সে সকল জায়গাকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে, মসজিদে হারাম পূর্বের চেয়ে বড় ও সম্প্রসারিত হয়। কিছু সংখ্যক ঘরের মালিক ঘর বিক্রি করতে এবং মূল্য নিতে অস্বীকার করায় হযরত উমর (রা.) সে সকল ঘরের মূল্য নির্ধারণ করে সে অর্থ কাবার অর্থভা ারে রেখে দেন এবং বলেন, "তোমরা কাবার আঙ্গিনায় এসেছ এবং ঘর বেঁধেছ, তোমরা এর মালিক নও; কিন্তু কাবা তোমাদের আঙ্গিনায় আসেনি।" তারা হযরত উমরের দৃঢ় সংকল্প দেখে পরে মূল্য গ্রহণ করে। এরপর হযরত উমর (রা.) মসজিদে হারামের চার পার্শ্বে মাথা থেকে নীচু দেয়াল নির্মাণ করেন এবং পূর্বের ঘরগুলোর কা'বামুখী দরজাসমূহ বরাবর দেয়ালের দরজা রাখেন। ঐ দেয়ালের উপর বাতি জ্বালানো হত। হযরত উমর ফারুক (রা.) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করেন। মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের পর হযরত উমর ফারুক (রা.) মসজিদে হারামের উপর দিয়ে প্রবাহিত সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম হাতে নেন। তিনি কাবা শরীফ থেকে আধা মাইল দূরে 'মোদ্দাআ' নামক স্থানে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। ফলে মসজিদে হারাম বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বড় বড় পাথর ও হাড় দিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয় এবং এর উপর মাটি ফেলা হয়। পরে বন্যায় কোন সময় এ বাঁধের ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। তবে ২০২ হিজরীর বিরাট বন্যা সে বাঁধের কিছু বড় বড় পাথর খসিয়ে ফেলে। এটি ছিল মক্কার বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রথম বাঁধ।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মসজিদে হারামের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একমাত্র সূরা বাকারার ৬ জায়গাতেই মসজিদে হারামের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কুরআনে সূরা মায়েদায়, আনফালে, তওবার তিন জায়গায়, বনী ইসরাঈলে, হজ্জে, আল-ফাতহের দু'জায়গায় মসজিদে হারামের উল্লেখ রয়েছে। মাওয়ারদী

www.nagorikpathagar.org

তাঁর আল-হাওরী কিতাবের 'জিযইয়া' অধ্যায়ে লিখেছেন, এক জায়গা ব্যতীত কুরআনে উল্লিখিত সকল জায়গায় 'মসজিদে হারাম' বলতে 'হারাম এলাকাকে' বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে শুধু মসজিদে হারাম বলতে কা'বা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটির অর্থ হচ্ছে ঃ "তোমরা মুখম লকে মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও।" ইবনে আবিস সাইফ আল-ইয়ামানী কুরআনের পনের জায়গার কথা উল্লেখ করে বলেন, এসকল আয়াতের কোনটিতে 'মসজিদে হারাম' বলতে 'কা'বা' শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমন উপরোক্ত আয়াত। কোন আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলতে 'মক্কা'কে বুঝানো হয়েছে। যেমন, "সে আল্লাহর জন্য পবিত্রতা যিনি তাঁর বান্দাহকে রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মি'রাজে নিয়ে গেছেন।" আবার কোন আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলতে গোটা 'হারাম এলাকা'-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন, 'মুশরিকরা অপবিত্র, তারা যেন (মসজিদে) হারামের নিকটে না যায়।' 'আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। বিশ্বনবী বলেন, আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য মসজিদ অপেক্ষা ১ হাজার গুণ উত্তম।' (মুসলিম)। যে তিন মসজিদ যিয়ারতের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে তার মধ্যে মসজিদে হারাম হচ্ছে প্রথম। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন মসজিদ ব্যতীত অতিরিক্ত সওয়াবের উদ্দেশ্যে আর কোথাও সফর করা যায় না। সেগুলো হল, মসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ (নববী) এবং মসজিদে আকসা।' (মুসলিম) ইবনে মাজা'র এক রেওয়ায়াতে এসেছে, মক্কায় নামাযের ফযীলত ১ লাখ গুণ বেশী। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মক্কার সকল মসজিদ ঐ ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বর্ণিত 'মসজিদে হারাম' শব্দের ভেতর কা'বা, মক্কা এবং পুরো হারাম এলাকা, এই সব কটি অর্থই অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে সাধারণভাবে, মসজিদে হারাম বলতে সে মসজিদকেই বুঝায়, যার তওয়াফ করা হয়।

বাইতুল্লাহর প্রতি দৃষ্টির ফযীলত

বাইতুল্লাহর প্রতি নজর করা একটি ইবাদত। যাঁরা বাইতুল্লাহকে দেখে এবং এর প্রতি নজর দেয় তাঁরা সওয়াব পান। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কা'বা শরীফ দেখা একটি ইবাদত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ ঘরের বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহর রহমতের যে বণ্টনের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে আল্লাহর ঘরের প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের জন্য ২০টি রহমত নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ কাবা ঘরের উপর প্রত্যেক দিন ও রাতে

www.nagorikpathagar.org

১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে তওয়াফকারীদের জন্য ৬০টি, মসজিদে হারামে এতেকাফকারীদের জন্য ৪০টি এবং কা'বার প্রতি দৃষ্টিদানকারীদের জন্য ২০টি রহমত নাযিল হয়। অন্য এক বর্ণনায় নামাযীদের জন্য ৪০টি রহমত নাযিলের কথা এসেছে। ঐ রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ, মক্কার মসজিদের লোকদের জন্য ১২০টি রহমত নাযিল করেন। সাখাওয়ী তাঁর মাকাসেদ হাসানা গ্রন্থে, তাবারানী তাঁর মায়াযেম গ্রন্থে, আজরাকী, বায়হাকী এবং হারেস তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। ঐ রহমত নাযিলের দু'টো ব্যাখ্যা আছে ঃ প্রথমটি হচ্ছে, ঐ রহমত বর্ণিত তিন দলের প্রত্যেকের উপর সমানভাবে নাযিল হবে, তা তাদের কম বা বেশী আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ আলোকে প্রত্যেক তওয়াফকারী ৬০টি, প্রত্যেক কাবা দর্শনকারী ২০টি এবং প্রত্যেক নামাযী ৪০টি রহমত পাবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ রহমত আমলের পরিমাপ, (কম-বেশী আমল) এবং আমলের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে নাযিল হবে। এ ব্যাখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধ। এ ব্যাখ্যার আলোকে, সকল তওয়াফকারী ৬০টি, সকল কাবা দর্শনকারী ২০টি এবং সকল মুসল্লী ৪০টি রহমত পাবে। এতে করে উপরোল্লিখিত তিনদলের প্রত্যেক দলের বহুসংখ্যক লোক আল্লাহর ঐ রহমতের সুশীতল ছায়া পাবে এবং প্রতিটি লোক বহুসংখ্যক রহমতের অধিকারী হবে।

আল-কোরা কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কা'বা শরীফ দেখা ইবাদত' এর সমর্থনে হযরত আয়িশার বর্ণিত হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য। আমাদের অতীতের বুজুর্গদের অনেকেই এই ইবাদতটির ফযীলতের ব্যাপারে নিজেদের রুচি, জ্ঞান এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলেছেন। আযরাকী এ বিষয়ের ৪টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন ঃ কা'বার দিকে নজর করা খালেস ঈমানের পরিচয়। মুজাহিদ বলেছেন, কা'বার দিকে নজর করা ইবাদত। ২. সাইদ বিন মুসাইয়েব বলেছেন, যে ঈমান ও সত্য বিশ্বাসের সাথে কা'বা শরীফের দিকে তাকায়, সে গুনাহ থেকে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। ৩. আতা বলেছেন, কাবার দিকে নজর করা এক বছরের নামায তথা কিয়াম, রুকু ও সিজদা থেকে উত্তম। ৪. ইবনুস সায়েব আল-মাদানী বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সত্য বিশ্বাসসহকারে কাবার দিকে তাকায়, গাছ থেকে যেমন পাতা ঝরে পড়ে, তেমনি তাঁর গুনাহও ঝরে পড়ে। (মুসীরুল গারাম) কা'বার দিকে নজর করা ইবাদত। কা'বার প্রতি নজরকারী ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে, সার্বক্ষণিক রোযাদার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদের সমান।

www.nagorikpathagar.org

বাইতুল্লাহর তওয়াফের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি হিসাব করে, এক সপ্তাহব্যাপী কাবা শরীফ তওয়াফ করে সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও বলতে শুনেছি, "সে ব্যক্তির প্রতি কদমে আল্লাহ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেন এবং নেক লেখা হয়।" তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কা'বার তওয়াফ করবে এবং দু'রাকাত নামায পড়বে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।' নাসায়ী শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 'যে সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করবে সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে মক্কায় আসার পর সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করা। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে তার গুনাহ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।' এক রেওয়ায়াতে এসেছে, কোন ব্যক্তি তওয়াফের নিয়তে ঘর থেকে বের হলে সে আল্লাহর রহমত পাওয়ার নিকটবর্তী হয়। সে যখন তওয়াফে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। তারপর প্রতি কদমের উঠা-নামার সাথে সাথে আল্লাহ তার জন্য পাঁচশ' নেকী লিখেন, পাঁচশ পাপ মোচন করেন এবং পাঁচশ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়লে সে সদ্যপ্রসূত নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়, আওলাদে ইসমাঈলের ১০টি গোলাম আযাদ করার বিনিময় পায় এবং হাজরে আসওয়াদের একজন ফিরিশতা তাকে স্বাগত জানায় এবং বলে ঃ যে কাজে তোমাকে স্বাগত জানানো হয়, সে কাজ পুনরায় কর; তবে যা করেছ তা অতীতের গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট এবং তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করা হবে।' এক রেওয়াতে এসেছে, 'যে ভাল করে অজু করে হাজারে আসওয়াদে চুমু দেয়ার উদ্দেশ্যে আসবে সে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করল। তারপর যখন চুমু দিল এবং দোয়া পড়ল তখন রহমত তাকে ঢেকে ফেলল। তারপর বাইতুল্লাহর তওয়াফ করলে, তার প্রতি

www.nagorikpathagar.org

কদমে আল্লাহ সত্তর হাজার নেক লিখবেন, সত্তর হাজার গুনাহ্ মাফ করবেন, সত্তর হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার বংশের সত্তর হাজার লোকের জন্য সুপারিশ করবেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে দু'রাকাত নামায পড়লে আল্লাহ্ তার জন্য আওলাদে ইসমাঈলের ১৪ জন গোলাম আযাদ করার সওয়াব লিখবেন এবং সদ্যপ্রসূত নিষ্পাপ শিশুর মত গোনাহমুক্ত করবেন। অন্য এক রেওয়াতে এসেছে যে, 'একজন ফিরিশতা এসে বলবে, তুমি তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমল কর, যা করেছ তা অতীতের অপরাধের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট।'

হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ফিরিশতাদের নিকট তওয়াফকারীদের ব্যাপারে গর্ব করে থাকেন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ৫০ বার বাইতুল্লাহর তওয়াফ করে সে সদ্য ভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ শিশুর মত পাপমুক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি দিন ও রাতে, বাইতুল্লাহর প্রতি ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এর মধ্যে ৬০টি হচ্ছে তওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি হচ্ছে এ ঘরের নামাযীদের জন্য এবং ২০টি হচ্ছে এ ঘরের প্রতি নজরকারীদের জন্য। হযরত আদম (আ.) সাত সপ্তাহ্ রাতে এবং পাঁচ সপ্তাহ যাবত দিনে তওয়াফ করেছেন। তিনি তওয়াফের সময় এ দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে এ ঘরের আবাদকারী লোক তৈরী কর। তখন আল্লাহ্ তাঁর কাছে ওহী পাঠান এবং বলেন, 'আমি তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে এ ঘরের আবাদকারী একজন নবী পাঠাবো; তাঁর নাম হবে ইব্রাহীম। তাঁর হাতে আমি এ ঘর নির্মাণ করাবো, এর পানি পান করানোর সব আঞ্জাম দেব, তাঁকে এর হারাম ও হালাল এলাকা এবং এ ঘরের যথার্থ স্থান দেখাব; তাঁকে এখানকার পবিত্র স্থানসমূহ এবং এর বিধি বিধান শিখিয়ে দেব।' এক রেওয়াতে এসেছে, আল্লাহ দুনিয়াতে কোন কাজের জন্য কোন ফিরিশতা পাঠাতে চাইলে, সে ফিরিশতা আল্লাহ্র কাছে প্রথমে বাইতুল্লাহর তওয়াফের অনুমতি চায়। পরে সে ফিরিশতা নেমে আসে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) উল্লেখ করেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ ঘর থেকে উপকৃত হও, এ ঘর দু'বার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তৃতীয়বারে তা তুলে নেয়া হবে।' (ইবনে হিব্বান) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ ঘর উঠিয়ে নেয়ার আগে এবং এ ঘরের অবস্থান সম্পর্কে মানুষের ভুলে যাওয়ার পূর্বে, তোমরা এ

www.nagorikpathagar.org

ঘরের বেশী যিয়ারত কর; কুরআন উঠিয়ে নেয়ার আগে বেশী করে কুরআন তিলাওয়াত কর। তাঁকে লোকেরা প্রশ্ন করল, কাগজে লিখিত কুরআন তুলে নেয়া সম্ভব হলেও মানুষের মন থেকে কিভাবে তা তুলে নেয়া হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মানুষ রাতে অন্তরে কুরআনসহকারে থাকবে সকাল বেলায় তাদের অন্তর থেকে কুরআন মুছে যাবে, এমনকি তারা তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কালেমাটিও ভুলে যাবে। তখন মানুষ আবার যাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাবে এবং বিভিন্ন জাহেলী জিনিসের অনুসরণ করবে। (আযরাকী) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেছেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ করে তিনি থেমে গেলেন এবং মৃদু হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি প্রথমে থেমে গেলেন এবং মৃদু হাসলেন! তখন রাসূলুল্লাহ (রা.) বললেন, আমার সাথে ঈসা বিন মরিয়মের দেখা হল, তিনি তওয়াফ করছেন এবং তাঁর সাথে দু'জন ফিরিশতা রয়েছে। তিনি আমাকে সালাম দিলেন এবং আমি সালামের জবাব দিলাম।' এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কা'বার তওয়াফের জন্য সবাই আগ্রহী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বাইতুল্লাহর তওয়াফ নামাযের সমতুল্য। সাবধান! এতে ব্যতিক্রম হচ্ছে, এতে আল্লাহ কথা বলা জায়েয করেছেন, কেউ কথা বললে সে যেন ভাল কথা ছাড়া খারাপ কথা না বলে।' হাজ্জাজ বিন আবি রোকাইয়া বলেন, আমি কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলাম। তখন আমি ইবনে উমর (রা.) কে দেখি। ইবনে উমর বলেন, হে ইবনে আবি রোকাইয়া, বেশী বেশী করে তওয়াফ কর, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে এ ঘরের তওয়াফ করতে করতে পা ব্যথা করে ফেলেছে, বেহেশতে তার পা'কে আরাম দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। ফকেহী কা'আব থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনশত রাসূল বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন তাদের সর্বশেষ রাসূল। এ ছাড়াও ১২ হাজার বুজুর্গ লোক এ ঘরের তওয়াফ করেছেন; মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ার আগে তারা হিজরে ইসমাঈলের নামায পড়েছেন। তাঁদের কেউ তওয়াফে আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন কথা-বার্তা বলেননি। তাওয়াফে, তাঁদের কেউ আসরের নামাযের পর এবং মাগরিবের আগে নামায পড়েননি। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর যিকর কায়েমের জন্যই বাইতুল্লাহর তওয়াফের বিধান চালু করা হয়েছে।।' হযরত আলী

www.nagorikpathagar.org

(রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফকারী মানুষের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে মানুষেরা! আল্লাহর হামদ ও তাকবীর বল। তওয়াফকারীরা ঐ কথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ-গান করলেন। (ফাকিহী) আ'তা বিন আবী রেহাব বলেছেন যে, জীবিত ও মৃত লোকের পক্ষ থেকে তওয়াফ করা যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'কাসওয়া' নামক উটের উপর সওয়ার ছিলেন এবং একটি কালো চাদর পরা ছিলেন। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তওয়াফের সময় সে লাঠি দিয়ে তিনি হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীর উপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভিড়ের ভিতর যেন তিনি সবাইকে দেখেন এবং লোকেরা যেন তাঁকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারে। (ফাকেহী) আল্লাহর ঘর-বাইতুল্লাহ তথা কা'বা শরীফ যমীনের উপর আল্লাহর বিরাট নিদর্শন। এটি একটি বরকতপূর্ণ স্থান। এ স্থানের মর্যাদা ও পবিত্রতার জন্যই আল্লাহ এখানে এতো ফযীলতের ব্যবস্থা রেখেছেন।

বাইতুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ ক'টি বৈশিষ্ট্য

১. পেশাব-পায়খানা করার সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে বসা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের কেউ যদি পেশাব পায়খানার জন্য উন্মুক্ত মাঠে যায়, সে যেন আল্লাহর কিবলার সম্মান করে এবং কিবলামুখি হয়ে না বসে।'

২. কা'বা শরীফে সিল্কের পর্দা বা গেলাফ ব্যবহার করা জায়েয। ইমাম গাযালী (রাহ.) তাঁর ফতোয়ায় বলেছেন, কুরআন শরীফকে সোনা দিয়ে এবং কা'বা শরীফকে সিল্ক দিয়ে সাজানো জায়েয আছে। কা'বা ব্যতিত অন্য কিছুতে তা জায়েয নেই। পুরুষের জন্য সিল্ক ব্যবহার নিষিদ্ধ। কা'বা সাজানো উত্তম। আল্লাহ বলেছেন, 'বল আল্লাহর সৌন্দর্যকে হারাম করেছে? বিশেষ করে অহংকার ও গর্ব প্রকাশের জন্য না হলে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশের বেলায় তা অবশ্যই জায়েয।

৩. হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমার নিকট কা'বা শরীফে সোনা রূপা উপহার দেয়ার চেয়ে কা'বা শরীফে সুগন্ধি লাগানো অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তম। তিনি বলেছেন, তোমরা কা'বা শরীফে সুগন্ধি লাগাও, এটি কা'বাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার অন্তর্ভুক্ত। এ বলে তিনি কুরআনের একটি নির্দেশের দিকে ইঙ্গিত

www.nagorikpathagar.org

দেন। সেটি হচ্ছে ঃ 'আমার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর'। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রা.) কা'বা শরীফের ভিতরের সকল অংশে সুগন্ধি মেখেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন যুগে কা'বার বাইরে তওয়াফের ও ভিতরে সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া দেয়ার প্রথা চালু ছিল। ভিতরেও সুঘ্রাণযুক্ত ধোয়া দেয়া হত। এতে করে তওয়াফের লোকেদের ভাল হত। দেহ ও মনের খুশি সঞ্চার হত।

৪. আল্লাহ কা'বাকে কুচক্রী ও ধ্বংসাত্মক লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং কা'বা ধ্বংসকারীদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। সূরা ফীলে আবরাহা বাদশাহর হস্তীবাহিনীকে তিনি ধ্বংস করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা এ ঘরের ক্ষতি করতে চাইবে আল্লাহ তাদেরকে উন্মুক্ত ময়দানে ধ্বংস করে দিবেন।'

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা শুনে আসছিলাম যে, আসাফ ও নায়েলা জোরহাম গোত্রের দু'জন নারী ও পুরুষ ছিল। তারা কা'বার অঙ্গনে অন্যায় কাজ করায় আল্লাহ তাদেরকে দুটো পাথরে পরিণত করে দিয়েছেন। জাহেলিয়াতের যুগে একজন মেয়েলোক কা'বায় এসে স্বামীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছিল। এক ব্যক্তি তার দিকে খারাপ নিয়তে হাত বাড়ালে, তাঁর হাত অবশ হয়ে যায়। আয্যাওয়ী বলেছেন, সে ব্যক্তিটি ছিল হুয়াইতাব। আমি তাকে ইসলামী যুগেও অবশ দেখেছি। কেননা, সে কা'বার সম্মান রক্ষা করেনি।

এক ব্যক্তি কা'বার তওয়াফ করছিল। তখন তওয়াফে এক সুন্দরী রমণীর খোলা হাত বিদ্যুতের মত চমকাতে দেখে তার হাতের উপর নিজের হাত রেখে যৌনাকর্ষণ উপভোগ করতে লাগলো। এতে দু'জনের হাত এমনভাবে লেগে গেল যে আর খোলা যাচ্ছিল না। ঐ দু'জন অন্য এক নেককার ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাদের হাত খোলার জন্য দোয়ার অনুরোধ জানালো। তিনি দু'জনকে তাদের হাত আটকে যাওয়ার ঘটনাটি জিজ্ঞেস করায় তারা তা খুলে বলল। তিনি দু'জনকে উপদেশ দিলেন, তোমরা যে জায়গায় ঐ পাপ কাজটি করেছ সে জায়গায় ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও অঙ্গীকার কর যে, তোমরা আর কখনও অনুরূপ কাজ করবে না। তারা ঐ রকম তওবা করায়, শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিল।

আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে, ইয়েমেনের বাদশাহ তুব্ব'র ঘটনা। তাঁর আসল নাম ছিল আসআদ। তিনি প্রাচ্যের কোন দেশে গিয়েছিলেন। মক্কা ও মদীনার পথে স্বদেশে রওনা হন। মদীনা থেকে বিরাট সেনাবাহিনীসহকারে মক্কার দিকে রওনা

www.nagorikpathagar.org

হলে পথে হোজাইল গোত্রের একটি দলের সাথে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা তাকে মক্কার কাবা ধ্বংস করে, এর পরিবর্তে ইয়েমেনে অনুরূপ একটি কাবা তৈরির জন্য উৎসাহিত করে এবং বলে যে, এখন থেকে যদি ইয়েমেনে হজ্জের ব্যবস্থা করা হয়, এতে বাদশাহর আয় ও মর্যাদা বাড়বে এবং তাঁর দেশ পূর্ণ আবাদ হবে। একথা শুনে, বাদশাহ রাজী হন এবং কা'বা শরীফ ভাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তার কাফেলার একটি পশুও চলল না। ঘোর অন্ধকার নেমে আসল এবং প্রচ ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বাদশাহ বিভিন্ন রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তীব্র মাথা ব্যথা শুরু হল। বাদশার দু'চোখ থেকে পানি বের হল এবং গালের উপর দিয়ে বইতে শুরু করল। তাঁর মাথায় এমন এক বীভৎস রোগ শুরু হল যে, তা থেকে পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হতে লাগল। দুর্গন্ধের কারণে তার কাছে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাঁর সাথে যে সকল পাদ্রী ও ডাক্তার ছিল, তারা বাদশাহর রোগ ও বীভৎস দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মৃত গাধার পঁচা দুর্গন্ধের মতই বাদশার মাথা থেকে পুঁজের দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি বাইতুল্লাহর ব্যাপারে কোন খারাপ পরিকল্পনার চিন্তা করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারপর তিনি তাঁর পরিকল্পনা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন এবং হোজাইল গোত্রের একদল লোকের পরামর্শ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন। এসব শুনে তাঁরা বলল, হোজাইল গোত্র আপনাকে, আপনার সেনাবানীকে এবং আপনার সাথে আরো যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছেন। এটি হচ্ছে আল্লাহর ঘর। কেউ এ ঘরের ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেই ছাড়েন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন এখন উপায় কি? তারা জবাবে বলল, এখন আপনি এ ঘরের কল্যাণ কামনা করুন, এর সম্মান করুন, এতে গিলাফ পরান, এ ঘরের কাছে কুরবানী করুন এবং এ ঘরের অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। বাদশাহ তাই করলেন। ফলে অন্ধকার চলে গেল, ঝড় বন্ধ হয়ে গেল, সওয়ারী পশুগুলো চলা শুরু করল, রাজার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো, তার মাথা সুস্থ হয়ে উঠলো। বাদশাহ খারাপ নিয়ত থেকে তওবা করলেন এবং সেনাবাহিনীকে ইয়েমেনের দিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে মক্কায় কিছুদিন থাকলেন এবং প্রত্যেক দিন একশত উট কুরবানী করে মক্কার বাসিন্দাদেরকে খাওয়ালেন। তিনি কা'বা শরীফে গিলাফ পরালেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সাতশত বছর আগে এ ঘটনা ঘটেছিল। আল্লাহ তাঁর ঘরকে যে কোন যালিমের হাত থেকে রক্ষা এবং একে সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত রাখেন। এজন্য এ ঘরের অপর নাম হচ্ছে 'আতীক'। কেউ এ

ঘর ধ্বংস করতে চাইলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন, 'কেউ অন্যায়ভাবে এতে কুফরী করলে, আমি তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব'।

৫. যে ব্যক্তি কাবা শরীফকে স্বপ্নে দেখবে, তার সে স্বপ্ন সঠিক, (তাবারানী)। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা শয়তান আমার এবং কা'বার ছবি ধারণ করতে পারে না অর্থাৎ শয়তান এ দুটো জিনিসের রূপ ধারণ করতে পারে না।

৬. কা'বা শরীফ একটি আবাদকৃত ঘর। মানুষ তওয়াফের মাধ্যমে সর্বদা একে আবাদ করে। মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন জাফর কিবলার দিকে মুখ করে বলতেন, 'আমার রব এর একটি মাত্র ঘর, কি সুন্দর, তিনি মনোরম! আল্লাহর শপথ, এটি আবাদকৃত ঘর'। কেউ কেউ বলেছেন, বাইতুল মা'মুর হচ্ছে সে ঘর যা হযরত আদম (আ.) প্রথমেই দুনিয়ায় এসে নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আ.) এর প্লাবনের সময় সে ঘরটিকে আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং দৈনিক ৭০ হাজার ফিরিশতা এর তওয়াফ করে। আরবীতে, (ফিরিশতা) শব্দের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে দূরে অবস্থানকারী। ফিরিশতাদের তওয়াফের ঘর যমীন থেকে আসমানে সরিয়ে দেয়ার কারণে, ফিরিশতারাই যেন দূরে সরে গেল। তাই ' তাদেরকে দূরে অবস্থানকারী' বলা হয়। আবু তোফায়েল (রা.) বলেন, হযরত আলীকে (রা.) 'বাইতুল মামুর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, সেটাতো কা'বা শরীফ বরাবর দূরে অবস্থিত। এতে দৈনিক ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে এবং তাঁরা এতে কিয়ামত পর্যন্ত ২য় বার আর প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না। 'বাইতুল মামুর' কোন আসমানে অবস্থিত তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, প্রথম আসমানে, কারো মতে, ৪র্থ আসমানে, কারো মতে, ৬ষ্ঠ আসমানে, কারো মতে, ৭ম আসমানে এবং কেউ কেউ অন্যমত পোষণ করেন। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি বাইতুল মা'মুরে ৭০ হাজার ফিরিশতাকে প্রবেশ করতে দেখেছেন এবং তাঁরা এতে আর ২য় বার ফিরে আসবে না।' এইভাবে প্রত্যেকদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা এ ঘরে আসে।

৭. ইবনে হিশাম তাঁর সীরাতুন্নবী বইতে লিখেছেন, হযরত নূহ (আ.) এর সময়ের বন্যার পানিতে কা'বা শরীফের আশ-পাশ পানিতে ডুবে গেলে, কা'বা শরীফ আসমানের নীচে বাতাসের মাঝে শূন্যে বিরাজ করতে থাকে। তখন হযরত নূহ

(আ.) এর নৌকা কা'বা শরীফের চার দিকে তওয়াফ করতে থাকে। নূহ (আ.) নৌকার যাত্রীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা আল্লাহর হারামে এবং আল্লাহর ঘরের পার্শ্বে আছ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য ইহরাম কর এবং কেউ যেন কোন মেয়েলোক স্পর্শ না করে। তিনি পুরুষ ও মেয়েলোকের মাঝখানে পর্দা করে দিলেন।

৮. হাশরের দিন কা'বা শরীফকে বিবাহিতা সুসজ্জিতা কনের মত উঠানো হবে। যত লোক হজ্জ করেছে তাঁরা এর গিলাফ ধরে থাকবে এবং এর চতুষ্পার্শ্বে চলতে থাকবে যে পর্যন্ত না কা'বা শরীফ জান্নাতে প্রবেশ করে। তখন তারা সবাই একই সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ইমাম গাযালী এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে এ হাদীসটিকে 'বাইতুল্লাহ ও মক্কার ফযীলত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

৯. এ ঘর সৃষ্টির পর থেকে এর ইবাদত এবং তওয়াফ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নেই। মানুষ, জীন কিংবা ফিরিশতাদের অনেকেই সর্বদা এর তওয়াফ করেই যাচ্ছে।

হিজরে ইসমাঈলের/হাতীমের মর্যাদা

বিশুদ্ধ ও মশহুর রেওয়াতে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা অর্থাভাবে কা'বা নির্মাণের সময় উত্তর পার্শ্বে সাড়ে ছয় হাত কা'বার অংশ ছেড়ে দেয় এবং সে অংশটুকু হিজরে ইসমাঈলের সাথে যোগ করে দেয়। হিজরে ইসমাঈলের অপর নাম হচ্ছে হাতীমে কা'বা। হাতীম শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাঙ্গা বা ভগ্নাংশ। হাতীমে কা'বার অর্থ হচ্ছে কা'বার ভগ্নাংশ তথা কাবার বাইরের অবশিষ্টাংশ। আযরাকী বর্ণনা করেছেন যে, হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহীম এবং যমযম কূপের মধ্যবর্তী স্থানকে হাতীম বলা হয়। এখানে দোয়া কবুল হয় বলে লোকেরা বেশী ভিড় করে। অনেক আলেম উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) কে হিজরে ইসমাঈলে দাফন করা হয়েছে। তিনি ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর মা হাজেরাকেও একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। হিজরে ইসমাঈলে হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং হযরত হাজেরার কবর সম্পর্কে, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর তাবারী এবং ইবনে কাসীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার বাইতুল্লাহর ভেতর ঢুকে নামায পড়তে চেয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে ইসমাঈলে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং বলেন, "এখানেই নামায পড়, যদি তুমি কা'বার ভেতর নামায পড়তে চাও; কেননা, এটি

www.nagorikpathagar.org

কা'বারই অংশ বিশেষ।" হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হিজরে ইসমাঈলের এক দরজায় একজন ফিরিশতা দাঁড়িয়ে এতে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায আদায়কারী লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, 'তোমার অতীতের সব গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে গেছে; এখন থেকে নতুনভাবে আ'মল কর।' এর অন্য দরজায় দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের সময় ঐ ঘর উঠিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত দণ্ডায়মান আরেকজন ফিরিশতা, নামায শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, সকল মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তুমি উম্মতে মুহাম্মদের সত্যিকার অনুসারী হও, তাহলে তুমি রহমতপ্রাপ্ত।

যমযম কূপের ইতিহাস

যমযম কূপ হলেও তার সেবা ও পানি একটি নদীর সমান। নদীর অসীম পানির মতই যমযমের পানি গোটা দুনিয়ায় পান করা হচ্ছে এবং হাজীরা দূর থেকে দুরান্তে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে হজ্জ মওসুমে প্রতিদিন ১৯ লাখ লিটার যমযমের পানি সেবন করা হয়। দুনিয়ার অন্য যে কোন কূপ থেকে এর উৎপাদন ও সরবরাহ অপন্দনীয় ও বহুগুনে বেশী। ফাকেহী উল্লেখ করেন যে, যমযম কূপ আবিষ্কারের পর হযরত ইবরাহীম (আ.) তা খনন করে একে প্রশস্ত করে কূপের রূপ দান করেন। তখন তাঁর সাথে জুলকারনাইনের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। জুলকারনাইন কূপটির দখল নিয়ে নেন। এরপর ঘটনার বর্ণনাকরী উসমান বলেন, সম্ভবতঃ জুলকারনাইন, ইব্রাহীম (আ.) এর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। ইব্রাহীম (আ.) বলেন, এটা কিভাবে হয়? তোমরা আমার কূপটি নষ্ট করেছ। জুলকারনাইন বলেন, সেটা আমার হুকুমে হয়নি। এরপর দু'জনের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইব্রাহীম (আ.) জুলকারনাইনকে ৭টি ভেড়াসহ কয়েকটি গরু উপহার দেন। জুলকারনাইন জিজ্ঞেস করেন, হে ইব্রাহীম! ভেড়াগুলো কেন উপহার দিচ্ছেন? তখন হযরত ইব্রাহীম জবাব দেন, এগুলো কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে যে এটি হচ্ছে ইব্রাহীমের কূপ। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) খৃষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের বছরই ইব্রাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.) এবং হাজেরাকে (আ.) মক্কায় নির্বাসনে রেখে যান। সে বছরেই যমযম কূপের আবির্ভাব হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের ২৫৭২ বছর পূর্বে যমযম কূপের আবির্ভাব ঘটে। এ হিসাব অনুযায়ী এখন থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে যমযম কূপের উৎপত্তি হয়। এ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যমযম কূপের ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে এবং যমযমের পানি সরবরাহের ব্যাপারে বহু পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মক্কায় যমযম কূপের অস্তিত্বের কারণে, ইয়েমেন ও জোরহোম গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক হযরত হাজেরার অনুমতিক্রমে এবং যমযম কূপের উপর তাঁর মালিকানার স্বীকৃতির শর্তে মক্কায় বসবাস শুরু করে। পরে ইসমাঈল (আ.) বড় হন এবং জোরহোম গোত্রে বিয়ে করেন। তারপর থেকে জোরহোম গোত্র 'যমযম' কূপসহ মক্কার শাসনভার পরিচালনা করেন। দীর্ঘদিন যাবত তথা যমযম কূপের সূচনালগ্ন থেকেই তারা যমযম কূপের পানি পান করতে থাকেন। এক পর্যায়ে যমযম কূপ শুকিয়ে যায় ও মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় এবং এর সকল চিহ্ন বা নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যায়। কুরাইশ গোত্রের মধ্যে ১৫টি দায়িত্বপূর্ণ পদ ছিল। ঐ সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কুরাইশরা নিজেদের এবং হাজীদের সেবা করত। এর মধ্যে 'কা'বার সেবক' এ পদটি সবচাইতে বেশী সম্মানিত ছিল। কা'বার সেবকের কাছে কা'বার দরজার চাবি থাকত। তিনি লোকদের জন্য কা'বার দরজা খুলতেন এবং বন্ধ করতেন। ২য় গুরুত্বপূর্ণ পদটি ছিল পানি 'পান করানো'। হাজীদের পানি পান করানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। কেননা, মক্কার পানি স্বল্পতার কারণে, এ দায়িত্ব পালনকারী বনি হাশেম বিন আবদে মন্নাফ গোত্রকে কা'বার পার্শ্বে চামড়ার মশকে পানি জমা করতে হত এবং ঐ সকল পানি মক্কার বাইরে থেকে উটের পিঠে বহন করে আনতে হত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের উপর অর্পিত হাজীদের পানি 'পান করানো' দায়িত্ব তিনি এতো যোগ্যতার সাথে পালন করেন, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এর ফলে তাঁর সম্মান ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন পর্যন্ত যমযম কূপ অনাবিষ্কৃত থাকে। কিন্তু পরে তিনি স্বপ্নে যমযমের অবস্থান সংক্রান্ত লক্ষণের উপর ভিত্তি করে তা খুঁড়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এতে করে তাঁর সুনাম ও যোগ্যতা আরো অনেক বৃদ্ধি পায়। আযরাকী আবদুল মুত্তালিবের যমযম কূপ সংক্রান্ত স্বপ্নটি বর্ণনা করে বলেন, আবদুল মুত্তালিবের বড় ছেলে হারেস বড় হওয়ার পর আবদুল মুত্তালিব রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, কেউ তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'কা'বার সামনে অবস্থিত মূর্তি বরাবর পিঁপড়ার বসতিতে ময়লা ও রক্তের মাঝে কাকের ঠোকরে সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্যে খনন করে যমযম কূপ আবিষ্কার হবে।' তিনি মসজিদে হারামে যান এবং স্বপ্নের লক্ষণগুলো দেখার জন্য সেখানে অপেক্ষা করেন। তখন মসজিদে হারামের বাইরে হাযওয়ারা নামক স্থানে একটি গাভী যবেহ করা হয়। গাভীটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে কসাই-এর কাছ থেকে ছুটে যমযমের স্থানে এসে পড়তে সক্ষম হয়। পরে কসাই সেখানেই গাভীটির যবেহ কাজ সমাপ্ত করে এবং গোশত

বহন করে নিয়ে যায়। তখন একটি কাক এসে গাভীর ময়লার উপর বসে এবং পিঁপড়ার বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

এ সকল লক্ষণ দেখার পর আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খনন শুরু করেন। খনন কাজ দেখে কুরাইশরা আবদুল মুত্তালিবের কাছে ছুটে আসে এবং বলে, আমরা তো আপনাকে মূর্খ মনে করি না; কিন্তু আপনি কেন আমাদের মসজিদে হারামের কাছে খনন কাজ করে মসজিদটিকে নষ্ট করছেন? আবদুল মুত্তালিব জবাব দেন, আমি একাজ অব্যাহত রাখবো এবং কেউ আমাকে বাধা দিলে তার মুকাবিলা করবো। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে হারেসকে নিয়ে খনন কাজ অব্যাহত রাখায় কুরাইশরা তাঁর সাথে ঝগড়া শুরু করে। কিছু সংখ্যক কুরাইশ তাঁর যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও বংশের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে বিরোধীদেরকে বিরত রাখে। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপটি খনন করতে সক্ষম হন। কূপটি খনন করার সময়কার বাধা-বিপত্তি এবং কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি তা সহজ করার জন্য আল্লাহর কাছে মান্নত করেন যে, যদি তার ১০টি ছেলে সন্তান হয় তাহলে তিনি একটিকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কয়েকটি বিয়ে করেন এবং ১০টি ছেলে-সন্তান লাভ করেন। তিনি আল্লাহর কাছে বলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার উদ্দেশ্যে কুরবানী করার মান্নত করেছিলাম। এখন আমি তাদের মধ্যে লটারী দিয়ে ঠিক করবো যে, কাকে কুরবানী করবো। তুমি তোমার পছন্দ অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রহণ কর। লটারীতে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সন্তান আবদুল্লাহর নাম উঠে। তারপর আবদুল মুত্তালিব বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আবদুল্লাহ এবং একশত উটের মধ্যে যেটাকে পছন্দ কর সেটাকে গ্রহণ কর। তারপর এর মধ্যে লটারীতে পর্যায়ক্রমে একশত উট উঠায় আবদুল মুত্তালিব ১০০ উট কুরবানী করেন। এভাবে আল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মদাতা পিতাকে হিফাযত করেন এবং তার ঔরসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মকে সুনিশ্চিত করেন। আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে পরবর্তীতে যমযম কূপের সংস্কার করেছিলেন।

যমযমের পানির বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

ওহাব বিন মোনাব্বিহ (রাহ) যমযম সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কিতাবে লিখিত আছে এটি উত্তম, কল্যাণকর, নেককারদের পানীয়, ক্ষুধা নিবৃত্তকারী এবং রোগের চিকিৎসা। ইবনে খায়সাম বর্ণনা করেছেন, একবার ওহাব বিন মোনাব্বিহ (রা.) আমাদের কাছে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিল

www.nagorikpathagar.org

কিছু যমযমের পানি। আমরা বললাম, আপনি কিছু মিষ্টি পানি (স্বাভাবিক পানি) কেন পান করছেন না? যমযমের পানি তো বেশ লবণাক্ত। তখন তিনি জবাব দেন, আমার অসুখ ভালো হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি অন্য কোন পানি পান করবো না। যার হাতে ওহাবের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহর কিতাবে এটি যমযম হিসেবে লিখিত; এটি কখনও শুকাবে না এবং ক্ষতিকর হবে না; এটি আল্লাহর কিতাবে উপকারী এবং নেককার লোকদের পানি হিসেবে লিখিত আছে এটি আল্লাহর কিতাবে উত্তম বলে বিবেচিত; ক্ষুধা নিবারণ এবং রোগের চিকিৎসা হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। ওহাবের প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, কেউ যদি পেট ভর্তি করে এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ত করে তা পান করে, অবশ্যই তাঁর রোগের চিকিৎসা হবে এবং সে রোগমুক্ত হবে। মুজাহিদ (রা.) বলেন, যমযমের পানি যে যে নিয়তে পান করবে তাঁর সে নিয়ত পূরণ হবে; তুমি যদি রোগমুক্তির জন্য তা পান কর তাহলে, আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। যদি তুমি পিপাসা মিটাবার জন্য পান কর, তাহলে আল্লাহ তোমার পিপাসা পূরণ করবেন। যদি তুমি ক্ষুধা দূর করার উদ্দেশ্যে পান কর, তাহলে আল্লাহ তোমার ক্ষুধা দূর করে তৃপ্তি দান করবেন। এটি জিব্রাঈলের পায়ের গোঁড়ালীর আঘাতে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর পানীয় হিসেবে তৈরী হয়েছে।

ইবনে আবী হুসাইন বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোহাইল বিন আমরের কাছে যমযমের পানি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। ইকরামা বিন খালিদ বলেন, একদিন গভীর রাতে আমি যমযমের পার্শ্বে বসা ছিলাম। তখন একদল সাদা কাপড় পরিহিত লোক কা'বার তওয়াফ করছিলেন। এমন ধবধবে সাদা কাপড় আমি আর কখনও দেখিনি। তওয়াফ শেষে তাঁরা আমার কাছে নামায পড়লেন এবং একজন তাঁর অন্য সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, চল আমরা নেক লোকের পানীয় পান করি। তাঁরা যমযমে প্রবেশ করলেন। আমি ভাবলাম, আমি তো তাঁদেরকে তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। তারপর আমি তাদের কাছে গেলাম, দেখলাম সেখানে কোন মানুষের নাম গন্ধও নেই (আযরাকী)। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের সময় লোকেরা একবার ভীষণ অভাবের সম্মুখীন হয়। ফলে খাবার সংগ্রহ তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন লোকেরা যমযমের পানির জন্য ছুটে আসে, পরিবারসমূহ শিশুদেরকে নিয়ে ভোরে যমযমে হাজির হত। তখন শিশুদের বাঁচানোর জন্য যমযমকে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা

করা হত। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যমযমের পানি যে, যে নিয়তে পান করবে তার সে নিয়ত পূরণ হবে।' (ইবনে মাজাহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যমযমের পানি যে, যে মকসুদে পান করবে, তার সে মকসুদ পূরণ হবে; যদি তুমি এ পানি রোগমুক্তির জন্য পান কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন; যদি তুমি পিপাসা মিটাবার জন্য এ পানি পান কর তাহলে আল্লাহ তোমার পিপাসা দূর করবেন; এটি জিবাঈলের পায়ের আঘাতে ইসমাঈলের পানীয় হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পেট ভর্তি করে যমযমের পানি পান করা মুনাফিকী থেকে মুক্তির কারণ।'

হযরত আবু জর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের খবর জানতে পেরে তাঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে নিজ গোত্র থেকে মক্কায় রওনা হন। মক্কায় এসে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে কাফিররা তাঁকে পাথর মেরে বেহুশ করে ফেলে এবং তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি যমযমের কাছে গিয়ে পানি দিয়ে রক্ত ধুয়ে ফেললাম এবং যমযমের পানি পান করলাম। আমি সেখানে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষায় ৩০ দিন (অন্য রেওয়ায়েতে ১৪ দিন) অবস্থান করি। কিন্তু সেখানে যমযম ছাড়া আমার অন্য কোন খাবার ছিল না। অথচ, আমি মোটাসোটা হয়ে গেলাম এবং পেটের চামড়া ভাজ পড়ে গেল। এমনকি আমি পেটে সামান্য ক্ষুধাও অনুভব করতাম না। দীর্ঘ একমাস কা'বার পার্শ্বে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতোদিন এখানে কি খেয়েছিলে? তিনি জবাব দিলেন, আমি যমযমের পানি পান করা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। এতে আমি মোটা হয়ে গেছি এবং আমার পেটের চামড়ার উপরে ভাঁজ পড়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটি ক্ষুধার সময় খাবারের কাজ করে।' সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ 'যমীনের উপর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি।'

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বুক চিরে হৃদয় বা হৃৎপি বের করে এনে

সোনার প্লেটে রাখেন। সেখান থেকে একটি রক্তের চাকা ফেলে দিয়ে বলেন, এটি তোমার মধ্যে শয়তানের একটি অংশ ছিল। তারপর যমযমের পানি দিয়ে হৃৎপিণ্ড ধুয়ে তিনি তা যথাস্থানে রেখে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঠে তাঁর অন্য সাথীদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। হাফেয ইরাকী বলেছেন, যমযমের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষদেশ ধোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি যেন আসমান-যমীন এবং বেহেশত-দোযখ দেখার মত শক্তি লাভ করেন। কেননা, যমযমের পানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অন্তরকে শক্তিশালী ও ভয় মুক্ত করে। যমযমের পানির আরেক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে যমযমের পানি দ্বারা জ্বর দূর হয়েছে। নাসাঈ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। দাহ্হাক বিন মোযাহেম বলেন, মাথা-ব্যথার সময় যমযমের পানি পান করলে মাথা-ব্যথা দূর হয় এবং যমযমের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

ইবনে বদরুদ্দিন বিন সাহেব মিশরী বলেছেন, শরীয়াহ এবং চিকিৎসার দৃষ্টিতে, যমযমের পানি পৃথিবীর যে কোন পানির চাইতে উত্তম। তিনি বলেন, আমি যমযমের পানি এবং মক্কার অন্য কূপের সমপরিমাণ পানি ওজন করে দেখেছি, যমযমের পানির ওজন বেশী। কথিত আছে যে, শাবান মাসের রাতে যমযমের পানি মিষ্টি হয়ে যায় এবং তা নেককার লোক ছাড়া অন্য কেউ টের পায় না। ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে হযরত জাবের (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযম কূপের পানি পান করবে, তাঁর গুনাহ যত বেশী হোক না কেন তা মাফ হয়ে যাবে। যমযমের উৎপত্তি হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ছেলে ইসমাঈলের (আ.) সাহায্যের জন্য। আজও যদি কেউ ইখলাসের সাথে সে পানি ব্যবহার করে তাহলে সেও আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। হাকীম, তিরমিযী বলেন, যমযমের পানি থেকে উপকার পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে নিয়তের গভীরতা ও পরিপক্কতার উপর। খালেস নিয়তে এ পানি ব্যবহার করলে তাঁর উপকার অবশ্যম্ভাবী।

যমযমের পানির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচিত হচ্ছে ঃ

১. আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এ উষর মরুভূমিতে আল্লাহর হুকুমে জিব্রাঈল (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) এর জন্য এ কূপটি বের করেন।

www.nagorikpathagar.org

২. এটি কা'বা এবং মহান নিদর্শন সাফা-মারওয়ার দিক থেকে উৎসারিত।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর মক্কা থেকে যমযমের পানি মদীনায় পাঠানোর জন্য বলেন।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পানি উদর ভর্তি করে পান করার জন্য উৎসাহিত করেন।

৫. যমযমের পানি খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা এবং অন্য যে কোন নিয়তে পান করা হবে, তা পূরণ হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

৬. হযরত জিব্রাঈল (আ.) যমযমের পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বুক চিরে হৃৎপিণ্ড/হৃদয় ধুয়েছেন।

৭. বহু সংখ্যক নবী, নেক বান্দাহ, আলেম, ইমাম ও বুজুর্গানে দ্বীন এ পানি পান করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত মানুষ এ পানি পান করবেন। যমযমের পানির রং অন্য পানির রং এর মত হওয়া সত্ত্বেও এর পানি অন্য যে কোন পানির চাইতে ভিন্ন। এর রয়েছে অগণিত কল্যাণ ও উপকার। প্রশ্ন হচ্ছে, রোগ জীবাণু কি এ যুগেই প্রবেশ করেছে, না আগেও ছিল? অতীতে যমযমের পানি পান করার কারণে লোক অসুস্থ হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। বরং অতীতে, লোকেরা চিকিৎসাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনকে সামনে রেখে যমযমের পানি পান করে উপকার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগেও যারা অনুরূপ নিয়ত করে যমযমের পানি পান করছে তারাও সমান উপকার পাচ্ছে। এখনও যে কোন লোক তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। অথচ অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যমযমের পানি পান করার কারণে ক্ষতি হওয়ার কোন রেকর্ড নেই। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, বন্যা বা বৃষ্টির পানিতে এতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করেছে, তথাপি সেটা আল্লাহর কুদরতী কূপে তারই ইশারায় নষ্ট হয়ে যায়। এতে যমযমের পানির উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়েনি এবং পড়বেও না।

৮. ইতিহাসে উল্লেখ বেদুঈনরা তাদের যেসব পশুকে নিয়ে যমযমের পানি পান করাতো; সেই সকল পশুর গায়ে কোন মারাত্মক রোগ ছিল না। কিন্তু তার পরও যমযমের পানি দূষিত হয়নি বরং তা সবার জন্য উপকারীই প্রমাণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে আগের যুগের কথা, যখন যমযম কূপের পরিচ্ছন্নতার মজবুত ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্যই বর্তমান যুগে এর সুষ্ঠু পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যমযমের পানি পান করার আদব

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফে এফাদা শেষে এক বালতি যমযমের পানি তোলার আদেশ দেন। তিনি সে পানি দিয়ে অযু করেন এবং বলেন, হে বনি আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি তোল, তোমরা পানি না তুললে অন্যরা তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বঞ্চিত করবে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বালতি যমযমের পানি তুলতে এবং তাঁকে তা দাঁড়িয়ে পান করতে দেখিছি। হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে বালতি ধরেন এবং অনেকক্ষণ যাবত পানি পান করেন। তারপর মাথার উপরের দিকে তুলে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেন। এভাবে তিনি তিনবার পানি পান করেন। ২য় বার আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময় এবং ৩য় বার আরো কম সময় ধরে তিনি যমযমের পানি পান করেন। উলামায়ে কেরামের মতে, যমযমের পানি ডান হাতে গ্লাস নিয়ে কিবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ বলে দাঁড়িয়ে পান করতে হবে। এ পানি তিনশ্বাসে পান করবে। পান শেষে আল্লাহর হামদ প্রকাশ করবে এবং পেট ভরে পানি পান করবে। যার বিন হোবাইস বলেন, আমি হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবকে মসজিদে হারামে, যমযমের চারপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, আমি যমযমের পানিকে গোসলের জন্য জায়েয মনে করি না; এ পানি দ্বারা অযু করা যাবে এবং তা পান করা যাবে। মালেকী মাযহাবে যমযমের পানি দিয়ে অযু করাকে উত্তম বলা হয়েছে। শাফেঈ মাজহাবে, এ পানি দিয়ে অযু গোসল দুটোই জায়েয আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এক রেওয়াতে এ পানি দিয়ে অজু করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে। ইমাম ফার্সী বলেন, ৪ মাজহাবের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী যমযমের পানি অন্য স্থান বা দেশে নেয়া জায়েয আছে। যমযমের পানি স্থানান্তরের ব্যাপারে তিরমিযীর হাদীসটিই প্রধান ভিত্তি। হযরত (রা.) আয়িশা বোতলে করে যমযমের পানি বয়ে নিয়ে গেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসী এবং চামড়ার মশকে করে যমযমের পানি নিয়ে গেছেন, রোগীদেরকে তা পান করিয়েছেন এবং রোগীদের উপর উক্ত পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোহাইল বিন আমরকে যমযমের পানি উপহার দিয়েছিলেন। বিনিময়ে সোহাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দুটো ভারবাহী পশু উপহার পাঠিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

মদীনার বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা

১. বর্ণিত আছে, বিশ্বনবী (সাঃ), আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) সহ মদীনায় দাফনকৃত অধিকাংশ সাহাবীকে মদীনার মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার অর্থাৎ কা'বার মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের আহ্বানে প্রথমে কা'বার মাটিই সাড়া দিয়েছিল এবং কা'বা থেকেই যমীনের বিস্তার হয়েছে।

২. মদীনা অন্যান্য সকল স্থান থেকে উত্তম। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. উম্মাহর শ্রেষ্ঠ লোকদের সেখানে (মদীনায়) দাফন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন।

৪. মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজ প্রাণ উৎসর্গকারী উত্তম শহীদানের কবর রয়েছে। তাদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিবেন।

৫. আল্লাহ মদীনাকে সৃষ্টির সেরা ও সম্মানিত নবীর বাসস্থান বানিয়েছেন।

৬. আল্লাহ মদীনাবাসীদেরকে সাহায্য ও আশ্রয়দানের জন্য পছন্দ করেছেন।

৭. অন্যান্য সকল শহর যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। একমাত্র মদীনা কুরআন দ্বারা বিজিত হয়েছে।

৮. আল্লাহ মদীনা থেকেই অন্যান্য শহরগুলো বিজিত করেছেন। এমনকি মক্কাও। তিনি মদীনাকে দ্বীন প্রচার ও প্রদর্শনীর কেন্দ্র বানিয়েছেন।

৯. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করা ওয়াজিব ছিল এবং মুহাজিরদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করা আনসারদের উপর ফরয ছিল। যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করেছেন তাদের জন্য হজ্জ ও উমরাহ শেষে মক্কায় মাত্র তিন দিন থাকার অনুমতি ছিল।

১০. কিয়ামতের দিন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মদীনা থেকেই উঠবেন।

১১. মদীনার নাম হচ্ছে, মুমিনাহ-মুসলিমাহ অর্থাৎ বিশ্বাসিণী ও আনুগত্যকারিণী। আল্লাহ একমাত্র এ শহরকে এ বৈশিষ্ট্যসহ সৃষ্টি করেছেন।

১২. আল্লাহ কুরআনে মদীনাকে 'আরদুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর যমীন বলে উল্লেখ করেছেন। (সূরা নিসা ঃ ৯৭)

১৩. আল্লাহ মদীনাকে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ করে বলেছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনাকে আপনার ঘর (মদীনা) থেকে সত্যসহকারে বের করে এনেছেন।

১৪. এক বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ আল কুরআনের আয়াতে মদীনার শপথ করে কথা বলেছেন, আমি এই শহরের (মদীনার) শপথ করে বলছি।

১৫. আল্লাহ আল কুরআনের আয়াতে মদীনার কথা আগে উল্লেখ করেছন, হে আল্লাহ আমাকে সত্যের পথে প্রবেশ করাও এবং সত্যের নির্গমন পথ থেকে নির্গমন করাও। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮০)

১৬. আল্লাহ তাওরাতে এ শহরের নাম মারহুমাহ (রহমতপ্রাপ্ত) উল্লেখ করেছেন।

১৭. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শহরকে মক্কা কিংবা এর চাইতেও বেশি প্রিয় বানিয়ে দেয়ার দোয়া করেছেন এবং এজন্য এর নাম হচ্ছে হাবীবাহ বা 'প্রিয়া'।

১৮. মদীনায় পৌঁছার আগে এর দেয়াল দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীকে দ্রুত তাড়া করতেন। মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছার পথে তিনি আসায়াহ নামক স্থানে কাঁধ থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন ঃ 'আমি মদীনার সুঘ্রাণ পাচ্ছি।

১৯. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার বরকতের জন্য দোয়া করেছেন।

২০. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাকে 'হারাম' (সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন।

২১. তিনি নিজ হাতে সেখানে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরাম তাতে অংশ নেন।

২২. সেখানে এমন মসজিদ রয়েছে যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে কুবা মসজিদ। আল্লাহ বলেন, 'যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত'। (সূরা তওবা : ১০৮)

২৩. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুজরাহ ও মিম্বারের মাঝখানে বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান রয়েছে। এ মসজিদের এ অংশটুকু ছাড়া গোটা যমীনের বেহেশতের আর কোন অংশের অস্তিত্বের কথা বর্ণিত নেই।

২৪. তাঁর মিম্বার মুবারক বেহেশতের সিঁড়ির উপর অবস্থিত। আরেক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, 'আমার মিম্বার আমার হাউজের (কাউসার) উপর'।

www.nagorikpathagar.org

২৫. মসজিদে নববীতে ইবাদতে এক হাজার গুন বেশী সওয়াব হয়।

২৬. তাবারানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমার এ মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়বে, তাকে দোযখ ও আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং সে মুনাফিকী থেকেও মুক্তি পাবে।'

২৭. মসজিদে নববীতে নামাযের উদ্দেশ্যে পবিত্রতাসহকারে আগমনকারী ব্যক্তি হজ্জের সওয়াব পাবে এবং ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে আসার পথে প্রতি কদমে একটি সওয়াব ও একটি গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে।

২৮. হাদীসে রয়েছে, ঘর থেকে ওযু করে মসজিদে কুবায় গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়লে একটি উমরার সওয়াব পাওয়া যায়।

২৯. হাদীসে রয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনায় রমযান মাসের রোযা অন্য জায়গার এক হাজার রোযার চাইতে উত্তম এবং মদীনার জুমআর নামায অন্য জায়গার ১ হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।' অন্যান্য নেক কাজগুলোর সওয়াবও অনুরূপ। তবে মদীনায় যে সকল ইবাদাতের হুকুম নাযিল হয়েছে সেগুলো মক্কা অপেক্ষা মদীনায় আদায় করা উত্তম বলে কেউ কেউ মনে করেন।

৩০. হাদীসে রয়েছে, মসজিদে নববী থেকে আযান শুনার পর বিনা প্রয়োজনে বের হওয়া এবং পুনরায় ফিরে না আসা মুনাফিকী।

৩১. মদীনার মসজিদে নববীতে দাওয়াত ও তা'লীম অর্থাৎ দ্বীন শিক্ষা-দীক্ষা কার্যকর ছিল এবং থাকবে।

৩২. মসজিদে নববীতে অধিকতর আদব-কায়দা প্রদর্শন ও নিম্নস্বরে কথা বলতে হয়। কেননা, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত আছেন।

৩৩. মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহরাব (নামায পড়ার স্থান) সুনির্দিষ্ট আছে।

৩৪. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বার ও মসজিদের মুসাল্লার মাঝে বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান অবস্থিত।

৩৫. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওহুদ পাহাড় বেহেশতের সিঁড়িসমূহের একটি' এবং 'ওহোদ আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও ওহুদকে ভালবাসি।'

www.nagorikpathagar.org

৩৬. হাদীসে বর্ণিত আছে, মদীনার বুতহাস উপত্যকা বেহেশতের সিঁড়িসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

৩৭. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীক উপত্যকাকে 'মুবারক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে রয়েছে 'আমরা আকীককে ভালবাসি, আকীকও আমাদেরকে ভালবাসে।'

৩৮. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসবাস করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৩৯. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মৃত্যুর ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের জন্য সাক্ষ্য ও সুপারিশের ওয়াদা করেছেন।

৪০. মদীনায় মৃত্যুর ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

৪১. মদীনার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম সুপারিশ লাভ করবেন এবং তাদের জন্য সম্মান ও অধিকতর সুপারিশের নিশ্চয়তা রয়েছে।

৪২. হাশরের দিন মদীনার মুর্দাগণের নিরাপদ পুনরুত্থান হবে।

৪৩. জান্নাতুল বাকী গোরস্থান থেকে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ৭০ হাজারের অধিক লোককে পুনরুত্থিত করে বিনা হিসাবে বেহেশতে পাঠানো হবে। অনুরূপভাবে, বনী সালামাহ গোরস্তান থেকেও লোকদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

৪৪. অন্যান্য সকল লোকের আগে মদীনাবাসীদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে।

৪৫. মদীনার গরম ও তাপ সহ্যকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ কিংবা সাক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

৪৬. মসজিদে নববী যিয়ারতকারীর জন্য তাঁর সুপারিশ ওয়াজিব হবে। বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

৪৭. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের পার্শ্বে দোয়া কবুল হয়। এ ছাড়াও তাঁর মিম্বারের কাছে মসজিদে ফাতাহ, মসজিদে এজাবাহ ও মসজিদে সুকিয়ায় দোয়া কবুল হয়।

৪৮. মদীনা অপবিত্র লোকদেরকে দূর করে দেয়।

৪৯. আগুন যেমন লোহর মরিচা দূর করে, মদীনাও তেমনি গুনাহ দূর করে।

৫০. মদীনাবাসীদের উপর যুলুম ও ভীতি প্রদর্শনকারীর কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৫১. হাদীসে রয়েছে : যে মদীনাবাসীদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করবে। লবণ যেমন পানিতে মিশে যায়, ঠিক আল্লাহও তাকে ওমনি করে গলিয়ে দিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।'

৫২. যে ব্যক্তি মদীনায় কোন দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা কোন দুর্ঘটনাকারীকে আশ্রয় দেয়, তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুমকি রয়েছে।

৫৩. মদীনাবাসীদেরকে সম্মান না করলে শাস্তি হবে। উম্মাহর উপর তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব।

৫৪. হাদীসে রয়েছে : 'যে মদীনাবাসীদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করে, সে যেন আমার দুই পার্শ্বে ভীতি প্রদর্শন করল।'

৫৫. কেউ মদীনা থেকে অনাগ্রহী হয়ে বাইরে না গেলে তার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তার উত্তম কল্যাণ দেবেন (মুসলিম)। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বাইরে গেলে এবং মদীনাকে অপছন্দ না করলে, অনুপস্থিতির সময়টুকুও বরকতময় হবে।

৫৬. মদীনা থেকে সংক্রামক রোগ ও জ্বরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ একে সম্মানিত করেছেন।

৫৭. মদীনার মাটিতে শেফা ও চিকিৎসা রয়েছে।

৫৮. মদীনায় দাজ্জালের প্রবেশাধিকার নেই।

৫৯. তাবারানীর বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল মুসলমানের উচিত মদীনা যিয়ারত করা।

৬০. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাম দেয়া যায় ও উত্তর পাওয়া যায়।

৬১. মদীনায় ঈমান পুনরায় ফিরে আসবে।

৬২. মদীনার প্রহরা ফিরিশতাদের উপর অর্পিত।

৬৩. প্রথম মসজিদ (মসজিদে কুবা) মদীনায় নির্মিত হয়েছে।

৬৪. মসজিদে নববী আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সর্বশেষ মসজিদ।

৬৫. মদীনায় অধিক মসজিদ, ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন বিদ্যমান। তাই ইমাম মালিক বলেছেন, কিভাবে আমি মদীনাকে ভাল না বাসি, যেখানে এমন কোন রাস্তা নেই যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলেননি এবং জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে প্রতি ঘণ্টায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসেছেন?

www.nagorikpathagar.org

৬৬. মদীনার স্নিগ্ধ বাতাসে ও মাটিতে বিশেষ সুঘ্রাণ রয়েছে।

৬৭. মদীনার জীবন যাপন আরামদায়ক ও সুখকর।

৬৮. মসজিদে নববীর মিম্বারের পার্শ্বে মিথ্যা শপথকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুমকি রয়েছে।

৬৯. মদীনার এক রাস্তা দিয়ে প্রবেশ ও ভিন্ন রাস্তা দিয়ে বের হওয়া উত্তম। (বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করতেন)।

৭০. মদীনায় প্রবেশের জন্য গোসল করা উত্তম।

৭১. মদীনায় দোয়া করা ও মৃত্যু প্রার্থনা করা উত্তম।

৭২. মদীনা চিরন্তন দারুল ইসলাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'শয়তান এ অঞ্চলে তার পূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

৭৩. মদীনা হচ্ছে হজ্জ ও উমরার দূরতম মীকাত। মদীনাবাসীদের সম্মানে আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছেন।

৭৪. মদীনা থেকে ইহরাম পরা উত্তম। কেননা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ইহরাম পরে হজ্জ ও উমরাহ করেছেন।

৭৫. মদীনাবাসী ৩৬ রাকাত তারাওয়ীহের নামায পড়ত।

৭৬. মক্কার চাইতেও মদীনায় বরকত বেশী। এক হাদীসে রয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য মক্কার চাইতে ৬ গুন বেশী বরকতের দোয়া করেছেন।

৭৭. নাসাঈ, বাজ্জার ও হাকিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে : এক সময় 'মানুষ উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আলেম তালাশ করতে থাকবে। তবে মদীনার আলেমের চাইতে বেশী জ্ঞানী আলেম কোথাও পাবে না।'

৭৮. চিকিৎসার উদ্দেশ্য ব্যতীত, মদীনার মাটি ও পাথর অন্যত্র স্থানান্তর করা হারাম।

৭৯. মদীনায় অস্ত্র বহন করা হারাম।

৮০. ঘোষণা দানের উদ্দেশ্য ছাড়া মদীনায় পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবেনা।

৮১. মদীনায় শিকার করা ও গাছপালা কাটা নিষেধ।

৮২. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারতের মানত করলে তা পূরণ করা জরুরী (ওয়াজিব)। না করলে গোনাহ হবে।

৮৩. মদীনার চারপাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎ সতর্কবাণী অনুযায়ী হেজাযের অগ্নিকা সংঘটিত হয়েছিল।

৮৪. মদীনার বাজারের বরকতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন।

৮৫. মদীনার বাজারের ব্যবসায়ী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য বলে হাদীসে বর্ণিত আছে।

৮৬. মদীনার মওজুদদার আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত কাফিরের সমান।

৮৭. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি বেহেশতের একটি কূপের কাছে গেছে। সে দিন তিনি গারস কূপের কাছে ভোরে জেগে গিয়েছিলেন।

৮৮. হাদীসে রয়েছে, 'মদীনার আজওয়া হচ্ছে বেহেশতের খেজুর।'

৮৯. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসবাসের জন্য মদীনাকে সবচেয়ে উত্তম মনে করেছেন এবং বাস্তবেও তাই করেছেন।

৯০. মদীনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন; এখনও শুয়ে আছেন এবং কিয়ামতের দিন এখান থেকেই উঠবেন।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ খণ্ড

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের উৎসসমূহ

পরম দয়ালু ও মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী; মহাবিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ; মানব জাতির চরম ও পরম অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ; স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ইতিহাসের অনন্য কীর্তিমান ও সর্বাধিক প্রভাবশালী মহামানব। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলের; জ্ঞানী-গুণীর; বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকের জীবনী, ইতিহাসে পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি। বিশ্ব ইতিহাস একমাত্র তাঁরই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূতপবিত্র জীবনকে শত-সহস্র বছর ধরে সংরক্ষণ (পুরোপুরি) করে আসছে। ইতিহাসের লিখনীতে ও মেমরীর সিলিকনে তাঁর জীবন আলোকিত হয়ে আছে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন ভাষা নেই, এমন কোন সময় নেই, যেখানে শেষনবীর জীবনী আলোচিত হয়নি। বিশ্বের সব মনীষী ও নবী-রাসূলের মধ্যে তাকে নিয়েই সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর সুবিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী বিশ্বের প্রতিটি দেশে, প্রতিটি এলাকায়, প্রতিটি ভাষায় আজ পাওয়া যায়। আরবী, ইংরেজি, রাশান, চীনা, ল্যাটিন, ফরাসী, স্পানিশ, পর্তুগীজ, তুর্কী, উর্দু, সাওহালী, হিন্দি, ফার্সি, জার্মানী, আইরিশ, ডেনিশ, জাপানী, কোরিয়া, থাই, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় রচিত হয়েছে শত-সহস্র বিশ্বনবীর জীবনী। এমনকি শেষ নবীর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে শত শত গ্রন্থ। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, লেনদেন, উপদেশ, কথাবার্তা, পছন্দ-অপছন্দ, আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন খাদ্য, গতিবিধি, চালচলন, চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিশ্বময় সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উৎস বা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের উপকরণ ও উপাদানের ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত দশটি বিষয় হতে ঃ

www.nagorikpathagar.org

ক। মহাবিশ্বের একমাত্র বিশুদ্ধতম ও সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন।

খ। বিশিষ্ট সাহাবীদের (রা.) বিশুদ্ধ কাব্যকীর্তি।

গ। পবিত্র হাদিস গ্রন্থসমূহ।

ঘ। সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থসমূহ।

ঙ। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহ।

চ। প্রিয়নবীর অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলী সম্বলিত গ্রন্থসমূহ।

ছ। শামায়েল গ্রন্থসমূহ।

জ। মক্কা-মদীনার ইতিহাস এবং কা'বার ইতিহাস গ্রন্থসমূহ।

ঝ। সীরাত সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা গ্রন্থসমূহ।

ঞ। উল্লেখযোগ্য মিডিয়া ও ওয়েব সাইটসমূহ।

বিশ্বব্যাপী সীরাত গ্রন্থের আলোকিত উৎস হিসেবে এ দশটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের অবদান অতি নগণ্য/সামান্য।

ক) ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআন ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে প্রামাণ্য উৎস হচ্ছে আল্লাহর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন। এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জীবন-চরিত্রের উৎস পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সমস্ত কুরআনই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে অনেক বিধান বা বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এর মূখ্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উদাহরণ হিসেবে নিম্নের আয়াতগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও আখলাক বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

১। বিশ্বনবী ছিলেন ইয়াতীম, নিঃস্ব ও মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণকারী তাঁকে আল্লাহ আশ্রয় দেন, অভাবমুক্ত করেন এবং পথের দিশা দেন। (সূরা ৯৩ : আয়াত ৬-৭)

২। তিনি দিনের বেশীরভাগ সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তাই নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব বহনের জন্য তাঁর রাত্রি জাগরণ আবশ্যক হয়ে পড়ত। (৭৩/১-৮)

৩। বিশ্বনবীর শিশু পুত্র ইন্তিকাল করলে কাফিররা তাকে 'নির্বংশ' বলে উপহাস করে। আল্লাহপাক তাদের এ আচরণের জবাব দেন। (১০৮/১-৩)

৪। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হওয়া। (৯৬/১-৫)

৫। ওহীর ভার বহনের জন্য তাঁর হৃদয়ের প্রশস্তকরণ। (৯৪/১-৩)

৬। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে ভুলে না যান, সে জন্য ওহী এলে তা তিনি বারে বারে আবৃতি করতেন। কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠদানের দায়িত্ব আল্লাহর। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁকে অধীর হতে নিষেধ করা হয়। (৭৫/১৬-১৯)

৭। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়স্বজনদের সতর্ক করার নির্দেশ। (২৬/২১৪-২০)

৮। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের বৈরিতা ও এর পরিণাম। (১১১/১-৫)

৯। শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কুরাইশ ধনকুবের মালিক অলীদ ইবনে মুগিরার আচরণ ও এর পরিণতি। (৫৩/৩৩, ৩৪, ৬৮/১০-১৬, ৭৪/১১-৩০)

১০। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আবু জাহলের আচরণ ও এর পরিণতি। (৮/৩২, ৭৫/৩১-৩৫)

১১। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাফিরদের আপোষ প্রস্তাব। (১০৯/১-৬)

১২। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের অর্থ ব্যয়। (৯০/৫-৭)

১৩। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাখলার জীনদের সাক্ষাৎ ও তাদের ঈমান আনয়ন। (৪৬/২৯-৩২)

১৪। হিজরতের পূর্বে মিনায় কাফিররা তাঁর কাছে মু'জেযা দেখতে চাইলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। (৫৮/১-৮)

১৫। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ এক রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা ভ্রমণ করান। (১৭/১)

১৬। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্ময়কর মি'রাজের বিবরণ। (৫৩/৫-১৭)।

১৭। মক্কা হতে মদীনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত। (৯/৪০, ৪৭/১৩)

www.nagorikpathagar.org

১৮। কুবায় মসজিদ নির্মাণ। (৯/১০৮-১০৯)

১৯। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সশস্ত্র যুদ্ধ ও অভিযান প্রসঙ্গ-

ক) বদরের জিহাদ। (৩/১৩, ১২৩, ৮/৫-১৯, ২৬, ৪১, ৫০, ৬৫-৭২)

খ) ওহুদের জিহাদ। (৩/১২১-১২৬, ১৪৯-১৫৫, ১৬৫-১৬৮)

গ) হুদাইবিয়ার সন্ধি। (৪৮/২৭)

ঘ) খন্দকের জিহাদ। (৩৩/৯-২০)

ঙ) খায়বারের জিহাদ। (৪৮/২৭)

চ) হুনাইন অভিযান। (৯/২৫-২৬)

ছ) তাবুক অভিযান। (৯/৩৮-৪৯, ৮১-৯৬, ১১৭, ১২০, ১২১)

২০। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুষ্ঠিত কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গ প্রসঙ্গ। (৮/৫৬,৯/৪,৭-১০,১৩)।

২১। বনী কায়নুকা, বনী কুরায়যা ও বনী নযীরের আচরণ ও পরিণতি। (২/৮৩-৮৫, ৮৯-৯১)

২২। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নাজরানের খ্রীষ্টানদের মুবাহালা। (৩/৬১)

২৩। আহলে কিতাবদেরকে দাওয়াত। (৩/৬৮-৭১)

২৪। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্পর্কে। (৩৩/২৮-৩৩৪)

২৫। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের বিশেষ অনুমতি। (৩৩/৫০-৫৩)

২৬। বিশ্বনবীর স্ত্রী আয়িশার প্রতি অপবাদ রটনা ও এর অপনোদন রহস্য উন্মোচন। (২৪/১১-২৬)

২৭। যুদ্ধ ও অভিযানলব্ধ গনীমত ও ফায়-এ তাঁর হিস্যা। (৮/১, ৪১, ৩৩/৫০, ৫৯/৬-৭)।

২৮। শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আদব তরবীয়ত মোতাবেক আচরণ প্রসঙ্গে। (২৪/৬৩, ৩৩/৫৩-৫৬,৪৯/১-৫)

২৯। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান চরিত্রের অধিকারী। (৬৮/৪-৬)

www.nagorikpathagar.org

৩০। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। (৩৩/২১)

৩১। পবিত্র কুরআনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' চার স্থানে এবং 'আহমদ' এক স্থানে উল্লেখ আছে।

৩২। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিবিধ গুণবাচক নামে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- নবী, শাহেদ, মুদদাসসীর, নযীর, সিরাজাম মুনিরা, রহমাতুল্লিল আ'লামিন, আল-মযামমিল, হারীস, রাহীম, রউফ, বশীর, উম্মী, ইয়াসীন, উসওয়াতুন হাসানা প্রভৃতি। এসব প্রতিটি শব্দ তার পবিত্র সীরাত নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

খ) সাহাবীদের কাব্যকীর্তি সম্বলিত গ্রন্থসমূহ ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময় আরবে কাব্যচর্চার বহুল প্রচলন ছিল। আরবের লোকদের অনেকেই ছিলেন স্বভাব কবি ও কাব্যমনা। সাহাবীদের (রা.) অনেকেই কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সাহাবীদের অনেকেই রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে নিকট থেকে দেখে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাকওয়ার প্রভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সেসব বিশ্বাসী মানুষগুলো কবিতায়, গানে কিংবা আলেখ্য রচনার মাধ্যমে স্ব-স্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এসব বর্ণনাকারীর সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল। সেসব বর্ণনা বা কাব্যসমূহ এতটাই হৃদয়গ্রাহী যে, তা কালজয়ী আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়। আবার অনেক সাহাবী আবেগময় মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসংশায় কবিতা লিখেছেন। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরোধানে বা ইন্তিকালে সাহাবীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁদের অনেকেই সে শোককে গেঁথেছেন কাব্য কীর্তির অপূর্ব মালায়। যা হয়েছে আরবী সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। হযরত আয়িশার (রা.) শোক গাঁথাটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাঙ্গ সুন্দর আদর্শ চরিত্রের একটি সত্যিকার চিত্র ফুটে উঠেছে। হযরত সাফিয়া (রা.) ও হযরত ফাতিমার (রা.) শোকগাঁথাগুলো অপূর্ব সুন্দর ও মূল্যবান সাহিত্যকর্ম। রাসূলের সভাকবি ও মহাকবি হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) মহানবীর ওফাতে যে দীর্ঘ শোক গেঁথেছেন তাঁর অনবদ্য কাব্যকীর্তির মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাজীবনের অনেক তথ্য ও আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি

www.nagorikpathagar.org

জিহাদের বা যুদ্ধগাঁথা নিয়ে তিনি বিরাট কবিতা লিখেছেন যা 'মাগাযী' বিদ্যার উত্তম উপাদান হয়ে আছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন হযরত আলী (রা.), আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), কা'ব বিন জুহাইর (রা.), কা'ব বিন মালিক (রা.), লাবিদ বিন রবীয়া (রা.) প্রমুখ মহামতি কবিগণ। পরবর্তীতে তাঁদের কাব্য সংগ্রহ বা 'দীওয়ান' প্রকাশিত হয়েছে। এসব 'দীওয়ান' নবীচরিত নির্মাণে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছে। নিচে কয়েকটি 'দীওয়ান' এর নাম উল্লেখ করা হলো।

১। কাসিদা-ই-কা'ব বিন জুহাইর (রা.) ফী মাদহে রাসূলিল্লাহ (সাঃ)।

২। দীওয়ান-ই-কা'ব বিন মালিক আনসারী (রা.)।

৩। দীওয়ান-ই-হাসসান বিন সাবিত আনসারী (রা.)।

৪। দীওয়ান-ই-আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)।

৫। কাসিদাতু বানাত সুআদ-কবি কা'ব বিন জুহাইর (রা)।

৬। দীওয়ান-ই-হযরত আলী (রা.)।

৭। দীওয়ান-ই-খানসা বিনতে আমর (রা.)।

৮। দীওয়ান-ই-হযরত আব্বাস (রা.)।

৯। দীওয়ান-ই-হযরত ফাতিমা (রা.)।

১০। দীওয়ান-ই-হযরত আয়িশা (রা.)।

এসব দীওয়ানের সংকলিত কবিতার অনেক অংশই পরবর্তী ইতিহাস, সাহিত্য সীরাত ও হাদীস গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

গ) পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহ ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালেই অনেক সাহাবী তার পবিত্র বাণী বিশেষত বক্তৃতা, চিঠিপত্র, আলোচনা, নির্দেশনামা ইত্যাদি লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। এগুলো পরে মুহাদ্দিসগণের সংকলিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসনকালে (৯৯-১০১ হি/৭১৭-৭২০ খ্রীঃ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বাণী মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট হতে সংগৃহীত হয়। খলিফার নির্দেশে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হিঃ) মদীনার ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সংগ্রহ করেন। অসংখ্য সাহাবী (রা.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকর্ম ও বাণীর বর্ণনা দেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বর্ণনা দিয়েছেন সাত

www.nagorikpathagar.org

জন বিশিষ্ট সাহাবী। সর্বশেষ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। যিনি ৯৩ হিজরীতে ইন্তিকালের মাধ্যমে সাহাবীদের এ জামাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাবেয়ীগণ দ্বারা আরো ব্যাপকভাবে হাদীস ও সীরাত চর্চা শুরু হয়। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রাহ.) বলেন, "সাহাবায়ে কিরামের জীবদ্দশায় তাবেয়ীগণ দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে যুবক, বৃদ্ধ, নারীপুরুষ প্রত্যেকের নিকট থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি বাণী, কাজকর্ম এবং তাঁর সম্পর্কিত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।" এ কাজে তাবে-তাবেয়ীগণও ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এভাবে সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। এগুলোর মধ্যে ভুল, দুর্বল, সন্দেহপূর্ণ ও মনগড়া হাদীস, মুহাদ্দিসরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পৃথক করেন এবং গ্রন্থে শুধুমাত্র নির্ভুল, বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করেন। কঠোর সমালোচনা ও বাছাই করে সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য মসনদ সংকলিত হয়েছে। এগুলোতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও শিক্ষাসমূহ সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনের পরে এ উৎসটি সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) আল-জামি আস-সহীহ-ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ)।

(২) আল-জামি আস-সহীহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (২০৪-২৬১ হিঃ)।

(৩) আল-জামি আস-সুনান-ইমাম আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ)।

(৪) আল-জামি আস-সুনান-ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ)।

(৫) আস-সুনান-ইমাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে আলী আল-নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হিঃ)।

(৬) আস-সুনান-ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ (২০৯-২৭৩ হিঃ)।

(৭) আল-মুয়াত্তা-ইমাম মালেক ইবনে আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ)।

(৮) সুনান ও শুআবুল ইমাম-ইমাম আবু বকর আহমদ বায়হাকী (মৃতঃ ২৪০ হিঃ)।

(৯) মুসনাদ-ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৬১ হিঃ)।

(১০) মুসান্নাফ-ইমাম আবদুর রাজ্জাক (মৃতঃ ২১১ হিঃ)।

(১১) মুসান্নাফ-ইবনে আবী শায়বা (মৃতঃ ২৩৫ হিঃ)।

www.nagorikpathagar.org

(১২) মু'জাম-ইমাম সুলায়মান ইবনে আহমদ তিবরানী (২৬০-৩৬০ হিঃ)।

(১৩) আল-মুসতাদরাক-ইমাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাকিম (মৃতঃ ৪০৫ হিঃ)।

(১৪) কানজুল উম্মাল ফিস সুনান-শায়খ আলী মুত্তাকী (মৃতঃ ৯৫৫ হিঃ)।

আয়িশা (রা.) বলেন আলকুরআনই হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের/সীরাতের পূর্ণ প্রতিফলন। আর আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তিনিই এ কুরআন নাযিল করেছেন এবং তিনিই এর সংরক্ষক। অতএব, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে।

ঘ) সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থসমূহ ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মজীবন ও বাণী সংগ্রহের মাধ্যমেই সীরাতের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। সাহাবীদের (রা.) আমল থেকেই এ কাজ আরম্ভ হয়। ইসলামের প্রারম্ভিক সময় থেকেই অসংখ্য সাহাবী (রা.), তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী সীরাত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে নবী জীবনী রচনার কাজ কে প্রথম শুরু করেছিলেন এ সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা.)-এর ছেলে আবান (২০-১০৫ হিঃ) বিচ্ছিন্ন আকারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। অতঃপর উরওয়া (২৩-৯৪ হিঃ) ইবনে যুবায়ের ইবনে আওয়াম অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। অনেকে তাকেই প্রথম সীরাত রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু বকরের (রা.) কন্যা আসমার (রা.) পুত্র উরওয়া ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহ নবীপত্নিগণের (রা.) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইসলামের স্বর্ণযুগের জ্ঞানের উপর উরওয়ার অসাধারণ দখল ছিল। প্রথম দিকে নবী জীবনী ও মাগাযী সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ ১। ইমাম শা'বী (মৃতঃ ১০৯ হিঃ), ২। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (মৃতঃ ১১০হিঃ), ৩। আসিম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদা (মৃতঃ ১২১ হিঃ), ৪। শুরাহবিল ইবনে সা'দ (মৃতঃ ১২৩ হিঃ), ৫। আবদুল্লাহ বিন আবু বকর ইবনে হাযম (মৃতঃ ১৩০ হিঃ), ৬। মুহাম্মদ বিন মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হিঃ), ৭। মূসা ইবনে উশবা (৫৫-১৪১ হিঃ), ৮। হিশাম ইবনে উরওয়া (মৃতঃ ১৪৬ হিঃ), ৯। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক।

তবে সীরাত চর্চার প্রকৃত সূত্রপাত হয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরলোক গমনের ৮৫ বছর পর থেকে। তখন ছিল খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ ওরফে দ্বিতীয় ওমরের শাসনকাল। দ্বিতীয় ওমর ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু

www.nagorikpathagar.org

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান সহচর এবং ধর্মপ্রাণ খলিফা ওমরের (রা.) দৌহিত্রীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি আচার-আচরণে হযরত ওমরের মত এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনাড়ম্বর ও ধর্মনিষ্ঠতার বলিষ্ঠ অনুসরণকারী ছিলেন। তিনি সম্রাটের আড়ম্বরতা ত্যাগ করে সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি দ্বীন ইসলামের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিতেন। তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর নবীর আদর্শ বা দ্বীনকে সুপ্রসারিত ও সুরক্ষিত করার জন্য সর্বোপায়ে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী বা হাদীস এবং নবী-জীবনী বা সীরাতুন্নবী চর্চার সুচিন্তিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি মদীনার শাসনকর্তা ইবনে হাযমকে লিখিতভাবে আদেশ দিয়েছিলেন, "আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করতে থাকুন এবং লিখে রাখুন। আমার ভয় হচ্ছে যে, এ ব্যবস্থা না করলে একদিন এ জ্ঞানভা ার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ জ্ঞান ভা ারের রক্ষক সাহাবী ও তাবেয়ীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন।" (বুখারী শরীফ)। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মজীবন সংকলনের সাথে সাথে তাঁর মহিমাময় জীবনচরিত-চর্চা বা সীরাত-চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)। খলিফার অনুরোধক্রমে আসিম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদা দামেস্কের মসজিদে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন চরিত অর্থাৎ সীরাতুন্নবী শিক্ষাদান শুরু করেন। শুরু হয় 'মাগাযী' বা যুদ্ধ-বিগ্রহের তথা সশস্ত্র জিহাদের ইতিহাস শিক্ষাদানেরও পাঠ্যসূচী। কিন্তু সীরাত-চর্চার সূচনালগ্নে কোন সীরাত গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয়নি। আলকুরআন ও হাদীস-চর্চার ঊষালগ্নের মতই সীরাত-চর্চাও সূচনালগ্নে কেবল মৌখিক প্রয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সীরাত-চর্চার প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী উস্তাদতুল্য সর্ববিদ্যাবিশারদ ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ)। ইমাম যুহরী মদীনার ঘরে ঘরে গিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেন; তা যাচাই করে 'কিতাবুল মাগাযী' নামক সীরাত সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান এবং খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইমাম যুহরীর খাঁটি অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন। মূসা ইবনে উশবা, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওমর ইবনে রাশেদ, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ (মৃতঃ ১৬৮ হিঃ) প্রমুখ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকেরা তার ছাত্র ছিলেন। তারাও কিতাবুল মাগাযী রচনা করেন।

www.nagorikpathagar.org

হিজরী প্রথম শতকের সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাত্ত সংগ্রহকারীদের মধ্যে সর্ববিচারে ইমাম যুহরীর নাম শীর্ষস্থানীয়। এছাড়া উপরে বর্ণিত মনীষীরা এবং কায়েস বিন আবি হাযেম (মৃতঃ ৯৮ হিঃ), সাঈদ বিন যুবাইর (মৃঃ ৯৫ হিঃ), আতা বিন আবি রিবাহ (মৃতঃ ১১০ হিঃ), আবু যানাত (মৃতঃ ১৩০ হিঃ) প্রমুখ তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পরবর্তীতে সীরাত ও মাগাযী সংগ্রহের কাজ করেছেন আবু মাশার নাজিহুল মাদানী (মৃঃ ১৭০ হিঃ), আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আল মাখযুমী (মৃতঃ ১৭০ হিঃ), আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ আনসারী (মৃতঃ ১৭৬ হিঃ), আলী ইবনে মুজাহিদ আররাযী (মৃতঃ ১৮০ হিঃ), যিয়াদ ইবনে আবদুল আল বুকাই (মৃতঃ ১৮৩ হিঃ), আলী ইবনে মুসলিম কারাশী (মৃতঃ ১৯৫ হিঃ), ইফনুস ইবনে বুকাইর (মৃতঃ ১৯৯ হিঃ) প্রমুখ মনীষীরা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত্রের উপকরণাদি সংগ্রহ, সংকলন ও গ্রন্থায়ন করার কাজ শুরু থেকেই তিন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়ের কাজ হয় সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে। তাঁদের তথ্য ও উপাত্তের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়। এ পর্যায়ে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ বিভিন্ন শহর থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী একত্রিত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে কাজ করেছেন সিহাহ সিত্তার মহাজ্ঞানী ইমামগণ ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সীরাতবিদগণ। হিজরী তৃতীয় শতকের পরও তাদের কারো কারো কর্মকা অব্যাহত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাবলী তৃতীয় যুগে এসে এক বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয় এবং হাজার হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থে সুনির্বাচিত প্রামাণ্য সম্পদ নবী প্রেমিকদের নিকট উপস্থিত হয়। এসবই আজ পর্যন্ত নবী জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে মওজুদ রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সীরাত সংগ্রহকারকদের উল্লেখযোগ্য হলেন মূসা বিন উশবা, মুয়াম্মার বিন রাশেদ (মৃতঃ ১৫০ হিঃ), মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (৮৫-১৫১ হিঃ)। ইবনে ইসহাকের সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী তথ্য ও তত্ত্বের আলো বিতরণ করেছে। বার খণ্ডে রচিত তাঁর 'সীরাতে রাসূলুল্লাহ' হলো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, সর্বাধিক প্রামাণ্য ও উন্নতমানের সীরাত গ্রন্থ। নির্ভরযোগ্য এ বিশাল গ্রন্থখানা আব্বাসী খলিফা মনসুরের অনুপ্রেরণায় রচিত হয়। এটিই প্রাচীন সীরাত সংগ্রহের প্রধান ভিত্তি বা মূল। দু'একজন মুহাদ্দিস ছাড়া সকলেই ইবনে ইসহাকের জ্ঞান, মেধা, স্মৃতিশক্তি,

www.nagorikpathagar.org

সীরাত ও মাগাযী বিষয়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আস্থাবান ছিলেন। ইবনে ইসহাক তাঁর বিশাল গ্রন্থটিকে খলিফার অনুরোধে সংক্ষিপ্ত করে তিন খণ্ডে পরিবেশন করেন। "তিনি সনাতন মাগাযীর পরিবর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী লেখার সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি পরবর্তীকালে সীরাত সাহিত্যের পথ প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হয়। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন ঐতিহাসিক বিবর্তনের নায়করূপে চিত্রিত করেন। এটা সুনিশ্চিত যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণতিতেই মুসলমানদের অভ্যুত্থান ও ইসলামের প্রসার। ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থ বাংলাসহ বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইবনে ইসহাকের পর সীরাত ও মাগাযী বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেন যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল বুকাই, মুহাম্মদ বিন আমর আল ওয়াকিদী (১৩০-২০৭ হিঃ), আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম (মৃতঃ ২১১ হিঃ), আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মৃতঃ ২১৮ হিঃ), মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ মাদায়েনী (১৩৫-২২৫ হিঃ), মুহাম্মদ বিন সা'দ আয-যুহরী (১৬৮-২৩০ হিঃ) প্রমুখ। ইবনে ইসহাকের পর বসরার প্রখ্যাত জীবনীকারক লেখক আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম মূল সীরাত রচনায় খ্যাতিমান মৌলিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত। তিনি নবী জীবনের কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। ইবনে ইসহাকের বিশাল সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতে রাসূলুল্লাহ'-র মূল নির্যাস অবলম্বনে সম্পাদনা ও সংযোজন করে, পরিমার্জিত আকারে 'সীরাতে ইবনে হিশাম' নির্মাণ করেন। অর্ধশতাব্দী পরে পূর্বোক্ত যিয়াদ আল-বুকাইর এর মধ্যস্থতায় ইবনে হিশাম এ কাজটি করেন। 'সীরাত ইবনে হিশাম' বাংলাসহ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইবনে হিশামের পর উল্লেখযোগ্য সীরাত লেখক হলেন মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আয-যুহরী (১৬৮-২৩০ হিঃ)। তিনি ইবনে সা'দ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি আল-ওয়াকিদীর সচিব ছিলেন। তবে নির্ভরযোগ্যতায় ওয়াকিদীর চেয়ে তিনি অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য। তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। 'কিতাবুত তাবকাত' নামক বিশাল ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত সীরাত গ্রন্থটির জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। পরে অবশ্য গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে সম্পাদিত হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মাদায়েনী বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে নবী জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে প্রথম দিকে নবী জীবনের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি নিষ্ঠাবান সীরাত সংগ্রহক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

সীরাত ও মাগাযী সম্পর্কিত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। ১। আনসাবুল

www.nagorikpathagar.org

আশরাফ-আল-বালাজুরী (মৃতঃ ২৭৯ হিঃ) ২। আর রাউদিল উনুফ-আবদুর রহমান আল সুহায়লী (৫০৮-৮১ হিঃ), ৩। আদ-দুরার ফী ইসতিসারিল মাগাযী ওয়াস-সিয়ার-ইবনে আবদিল বার্র (মৃতঃ ৪৬২ হিঃ), ৪। কিতাবুত তাবাকতিল কবীর-মুহাম্মদ ইবনে সা'দ আল কাতিব (মৃতঃ ২৩০ হিঃ), ৫। আল-ইকতিফা ফী মাগাযী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াস সালাসাতিল খুলাফা সুলায়মান ইবনে মুসা আল-কালায়ী (মৃতঃ ৬৩৪ হিঃ), ৬। উয়ুনুল আসার ফী ফুনুলিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার-ইবনে সাইদুন্নাস (মৃতঃ ৭৩৪ হিঃ), ৭। আস-সীরাতুন নাবাবিয়া-ইবনে কাসির (মৃতঃ ৭৬১ হিঃ), ৮। আল-ইশাবা ইলা সীরাতিন নাবাবিয়া-হাফেজ মুগলতাঈ (মৃতঃ ৭৬১ হিঃ), ৯। বাজাতুল মাহাফিক ফি'স সিয়ার ওয়াল মু'জেযাত ওয়াশ শামাইল-ইয়াহিয়া ইবনে আবি বকর আল-আমিরী (মৃতঃ ৮৯৩ হিঃ), ১০। সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সিরাতে খাইরিল ইবাদ (সীরাতে শামী)-শামসুদ্দীনর আস-সালিহী শামী (মৃতঃ ৯৪২ হিঃ), ১১। আল ওয়াফা ফী আহওয়ালিল মুস্তাফা-ইবনুল জাওযী (মৃতঃ ৫৭৯ হিঃ), ১২। জাওয়ামিউল সীরাহ-ইবনে হাযম (মৃতঃ ৪৫৬ হিঃ), ১৩। সীরাতিল হালাবিয়া-আলী ইবনে বুরহানউদ্দীন আল হালাবী (মৃতঃ ৯৭০ হিঃ), ১৪। সীরাতে দিমইয়াতী-হাফিজ আবদুল মোমেন (মৃতঃ ৭০৫ হিঃ), ১৫। সীরাতে খলাতী-আলাউদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ খালাতী (মৃতঃ ৭০৮ হিঃ), ১৬। সীরাতে গায়বোনী-শায়খ জহিরউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ গায়বোনী (মৃতঃ ৬৯৪ হিঃ), ১৭। যা'দুল মাআদ ফী হাদয়ি খয়রিল ইবাদ-ইবনে কাইয়িম (মৃতঃ ৭৫১ হিঃ), ১৮। আশশিফা বিত'রিফি হুকুকিল মোস্তফা (সাঃ)-আবুল ফযল আয়াজ ইবনে মূসা (মৃতঃ ৫৪৪ হিঃ), ১৯। আস-সারিকুল মাসলুল-শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিঃ), ২০। ইমতাউল আসমা ফীমার রাসূল মিনাল আসমা ওয়াল মাতা-আহমদ ইবনে আলী আল-মাকারীযী (মৃতঃ ৮৪৫ হিঃ)।

(ঙ) প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত চর্চার সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত আলো বিকিরিত হয়েছে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে। মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউ লিখেছেন ইতিহাস গ্রন্থ। নবী জীবনের আলো উৎসারিত হয়েছে ইমাম বুখারীর 'তারিখ' গ্রন্থে। তাঁর পরবর্তী সুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মুফাসসির ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারীর (১৫৮-৩১০ হিঃ) 'তারিখুল রাসূলে ওয়াল মুলক" নামক বার খণ্ডের গ্রন্থে বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমহান জীবন

www.nagorikpathagar.org

চরিত-চর্চা বিদ্যমান। যুগশ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ মুসলিম ইবনে কুতায়রার (২১৩-২৮৪ হিঃ) রচিত 'কিতাবুল মায়ারিফ" এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিত্রের আলোচনা রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে। ১। আল কামিল ফিত-তারিখ ইবনে আসীর (৫৫৫-৬৩০ হিঃ), ২। আল খিতাত-আল মাকারিযূ (মৃতঃ ৮৪৫ হিঃ), ৩। তারিখুল খামিস আন-ফাসী নাফীস-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আদ-দিয়ারবাকরী (মৃতঃ ৯৬৬ হিঃ), ৪। আল-আখবারুতি ওয়াল-আবু হানিফা আদ-দীনাওয়ারী (মৃতঃ ৩৮২ হিঃ), ৫। তারিখ-আল-ইয়াকুবী (মৃতঃ ২৮৪ হিঃ), ৬। তারিখ-আল মাসূদী (মৃতঃ ৩৪৫ হিঃ), ৭। আল নুজুমুয যাহিরা ফি মুলকি মিসর ওয়াল কাহিরা আবুল মাহাসিন ইবনে তাগরিবির্দী (মৃতঃ ৮৭৪ হিঃ), ৮। তারিখে ইবনে হিব্বান (মৃতঃ ৩৫৪ হিঃ), ৯। তারিখে ইবনে আলী খায়সামা (মৃতঃ ২৯৯ হিঃ) ।

(চ) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক কার্যাবলী সম্বলিত গ্রন্থসমূহ ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মজীবনে এমন কিছু বিশিষ্টতা ছিল যা অন্য কোন নবীর ছিল না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক কার্যাবলী নবী চরিতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অনেক মনীষী সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ সেসব বিষয়কে মহানবীর রিসালাত ও নবুওয়াতের অকাট্য দলীল-প্রমাণ, ভিত্তি বা মেরুদণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সম্পর্কে রচিত প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে 'দালায়িলুন নবুওয়াত'। এছাড়া আরও কিছু উল্লেখযোগ্য মু'জেযার গ্রন্থসমূহ বিদ্যমান। ১। হাফেয আবু নুঈম আল-ইসপাহানী (৩৩৪-৪৩০ হিঃ), ২। ইমাম বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ), ৩। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ওয়াকেদ আল-ফারাবী, ৪। আবুল আব্বাস জাফর ইবনে মুহাম্মদ মু'তায, ৫। ইবনে কুতাইব ৬। ইসহাক হারাবীর (মৃতঃ ২৫৫ হিঃ) ৭। সা'দী ইয়াসীনের 'আন-নবুওয়াত', ৮। আলামা আবুল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল বকরীর "কিতাবুল আনওয়ার ওয়া মিসবাহুস সুরুরী ওয়াল আযকার ওয়া যিকরী নূরে মুহাম্মদ মুস্তফা আল মুখতার", ৯। ইমাম জালালউদ্দিন সিউতির (৮৪৯-৯১১ হিঃ) খাসায়েসুল কুবরা ।

(ছ) শামায়েল গ্রন্থসমূহ ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলী ও দৈনন্দিন কর্মপন্থার বিশিষ্টতা নিয়ে অনেক মনীষী গবেষণা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোকে বসবাসকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহারিক জীবন ও

www.nagorikpathagar.org

চরিত্রশোভা সূর্যের ন্যায় প্রস্ফুটিত। আর কোন নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ বিশিষ্টতা নেই। হাদীসবিদ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (২০৯-৯৭ হিঃ) মহানবীর ব্যক্তিগত জীবন পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে, "শামায়েলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা 'শামায়েলে তিরমিযী', নামে খ্যাত। এ এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ১। শামাইলু রাসূল-আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (মৃতঃ ৭৭৪ হিঃ) ২। শামায়িলুন নবী (সাঃ)-আবুল আব্বাস আল মুসতাগফিরী, ৩. কিতাবুশ শামায়িল-আবুল হাসান ইবনুয জাহহাক, ৪। যুবদাতুশ শামায়িল-আলী ইবনে সুলতান আল-হারবী ৫। বুলগাতুশ সায়িল আন মাকাসিদিশ শামায়িল-ইব্রাহীম আল হালাবী ৬। ওসায়িলুর রাসূল ইলা শামায়িলির রাসূল (সা.)-শায়খ ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল আন নাবহানী. ৭। আল মুখাতাসার ফিশ শামায়িলিল মুহাম্মদী ওস্তাদ মাহমুদ সামী, ৮। আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া বিল মিনাহিল মুহাম্মদীয়া-শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর আল খতিব আল কাস্তালানী (৮৫১-৯২৩ হিঃ) ৯। আখলাকুন নবী ওয়া আদাবুহু-হাফিয আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে হায়ান আল ইসপাহানী আবুল শায়খ (মৃতঃ ৩৬৯ হিঃ) ১০। খাসায়িসুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মুরূফা বি খাসায়িসিল মুস্তাফা (সা.)-হাফিয নাসির উদ্দীন মুগলতাঈ (মৃতঃ ৭৬১)।

(জ) মক্কা-মদীনা ও কা'বার ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ঃ এসব ইতিহাস গ্রন্থসমূহে নবী চরিত্রের বিস্তারিত উপকরণ ও উপাত্ত রয়েছে। এজন্য সীরাতবিদরা মহামানবের জীবন আলোচনার সময় এগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। ইতিহাস সনদগুলো হতেও তথ্য নিয়েছেন। মক্কা মদীনা এবং কাবা শরীফের ইতিহাস সম্পর্কিত বেশ কিছু উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে ঃ ১। তারীখু মক্কা (আখবারুল মক্কাতিল মুশার্রাফ আও কিতাবু ফাজিলিল কা'বা)- আযরাকী-আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (মৃতঃ ২২৩ হিঃ) ২। তারিখুল মদীনাতিল মুনাওয়ারা-আবু যায়দ ওমর ইবনে সিব্বা আলবসরী (মৃতঃ ২৬৩ হিঃ) ৩। ইতহাফুল ওয়ারা বিআখবারি উম্মিল কুরা-ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কুরাইশী ৪। আত-তুহফাতুল লতীফা ফী তারীখিল মদীনা-আল্লামা সাখাবী ৫। আত-তারীখিল কারীম লি মক্কাতা ওয়া বায়তিল্লাহিল কারীম-মুহাম্মদ তাহের ইবনে আবদুল কাদের আলকুর্দী ৬। আত-তারীখিল বিদারিল হিজরাহ-আসাদ

www.nagorikpathagar.org

দরাবেবোনী ৭। আখবারু মক্কা তিল মুশাররাফা-শায়খ কুতুব উদ্দীন নাহরাওয়ানী ৮। আখবারু মক্কা-আল্লামা ওয়াকেদী ৯। আখবারু মদীনা-আল হাজরী ১০। আখবারুল মদীনা-আবদুল্লাহ মারজানী ১১। আখবারুল মদীনা-ইয়াহিয়া ইবনে হুসাইন ১২। আল আরযুল মিসকী ফিত তারিখিল মক্কী-আলী ইবনে আবদুল কাদের তাবারী ১৩। তারীখুল মদীনা-আল মারাগী ১৪। তারীখু মক্কা-আহমদ সিবায়ী ১৫। হাওলাল মদীনা-মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে যাবালা আল-মাখযুমী ১৬। আদ-দুর্রাতুস সামীনা ফী ফাযলিল মদীনা-মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে হাসান ১৭। মক্কা ওয়াল মদীনা ফিল জাহিলিয়া ওয়া আহদির রাসূল (সা.)-আহমদ ইব্রাহীম আশশরীফ ১৮। মিরআতুল হারামাইন-ইব্রাহীম রিফআত পাশা ১৯। নাফাহাতুম মিনাল হারাম-আলী তানতাবী ২০। ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তফা (সা.)-আলী ইবনে আবদুল্লাহ আশ শামহুদী।

(ঝ) সীরাত সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা গ্রন্থসমূহ ঃ বর্ণিত আট প্রকার মৌলিক গ্রন্থাদি ছাড়া আরো কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ হতে সীরাতুন্নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপকরণ গৃহীত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রাচীন যিয়ারত গ্রন্থ, অর্থনীতি এবং সমাজ নীতির উপর লিখিত গ্রন্থও রয়েছে। এসবের মাঝে বেশ কিছু উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে ঃ ১। আস-সারাখসীর 'শরহুস সিয়ারিল কবীর' ২। ইবনুল ইমাম আল হাম্বলীর "শাজারাতুয যাহাব" ৩। আবু ওবায়েদ কাসিম ইবনে সালামের (মৃতঃ ২২৪ হিঃ) 'কিতাবুল আমওয়াল' ৪। ইমাম আবু ইউসুফের (১১৩-৮২ হিঃ) 'কিতাবুল খারাজ' ৫। আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসের 'জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব'। (তথ্য ঃ বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা; লেখক ঃ মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা)

বাংলা ভাষায় সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে রচিত উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ

১। মুহাম্মদের জীবনচরিত্র ঃ রেভারেন্ড জেমস্ লং। সত্যার্ণব প্রেস, কলকাতা, (১৮৮৫)।

২। ধর্ম বীর মুহাম্মদ (নাটক জীবনী) ঃ অতুল কৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯২২) ১ম খণ্ড, নববিধান সমাজ, কলকাতা, (১৮৮৫)। ২য় খণ্ড, গুলদাস চ্যাটার্জী, কলকাতা (১৮৮৬)।

৩। মুহাম্মদ চরিত ও মুসলমান ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কৃষ্ণ কুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬)। শ্যামা প্রেস, কলকাতা, (১৮৮৬)।

www.nagorikpathagar.org

৪। মহাপুরুষ মুহাম্মদের জীবন চরিত (তিন খণ্ড) ঃ গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)। নববিধান সমাজ, কলকাতা, (১৮৮৬)।

৫। হযরত পয়গম্বরের জীবনী (নবীজীর যুদ্ধাবলী) ঃ শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)। মুন্সী মেহেরুল্লাহ, যশোর, (১৯০৪)।

৬। হযরত মুহাম্মদ ও হযরত আবু বকর ঃ রামপ্রাণ গুপ্ত, (১৮৬৯-১৯২৭)। শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত এন্ড সন্স, ঢাকা, (১৯০৪)।

৭। মোসলেম পতাকা ঃ হযরত মুহাম্মদের (দঃ) জীবনী ঃ ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯২৯)। হাশেম কাশেম, কলকাতা, ১ম খণ্ড (১৯০৮), ২য় খণ্ড (১৯২৪)।

৮। হজরত মুহাম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও ধর্মোপদেশ ঃ সৈয়দ কাজী শারাফৎ আলি। যুগলকৃষ্ণ সিংহ, কলকাতা, (১৯১০)

৯। শেষ পয়গম্বর ও তাঁহার পবিত্র ধর্ম ঃ বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। হাওড়া, (১৯১০)।

১০। হীরক কণা ঃ আবদুল হামিদ। নওয়াব আলী আহমদ, ময়মনসিংহ, (১৯১১)।

১১। শান্তিকর্তা বা হযরত মুহাম্মদ ঃ ডাঃ সূফী ময়েজ উদ্দিন আহমদ (মধু মিয়া) (১৮৫৫-১৯৩০)। কলকাতা, ১ম খণ্ড (১৯১০), ২য় খণ্ড (১৯১২), ৩য় খণ্ড (১৯১৪)।

১২। মাসুম মোস্তফা (দঃ)ঃ শেখ মোঃ জমির উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০)। আলীম উদ্দীন আহমেদ, মলনদী, জলপাইগুড়ি, (১৯১৭)।

১৩। ইসলাম রবি বা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ঃ ফরীদ উদ্দীন খাঁ (১৮৮৫-২৯৫৭)। শ্যামগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, (১৯১৯)।

১৪। শফিউল মোজনেবিন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ঃ আবদুল আজিজ খান। বৈঠকখানা রোড, কলকাতা, (১৯২০)।

১৫। মেফতাহুল ফোরকান বা কোরান তত্ত্ব (তিন খণ্ডের, ৩য় খণ্ড নবী জীবনী) ঃ মোবিনউদ্দীন আহমদ জাহাঙ্গীরনগরী (১৯৪১), হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, (১৯২৫)।

১৬। হযরত মুহাম্মদের (দঃ) জীবনী ঃ মফিজ উদ্দীন আহমদ। বরিশাল, (১৯২৫)।

১৭। মোস্তফা চরিত ঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, (১৯২৫)।

www.nagorikpathagar.org

১৮। খাঁ ছাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ ঃ আল্লামা মোঃ রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫)।

১৯। খাঁ ছাহেবের বাজে কথা ঃ মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ খাঁ। আনজুমানে এশায়াতে ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, (১৯৩২)।

২০। মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, (১৯৩২)।

২১। ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ ঃ খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯২৬)।

২২। মানব মুকুট ঃ মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, (১৯২৬)।

২৩। শান্তিকর্তা বা হযরত মুহাম্মদ ঃ মোঃ কোরবান আলী (মৃতঃ ১৯৬০)। ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, (১৯২৮)

২৪। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন চরিত ঃ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)। মনির উদ্দীন আহমদ এন্ড সন্স, কলকাতা, (১৯২৯)।

২৫। পাক পাঞ্জতন (১০৩০ পৃষ্ঠায় পাঁচটি জীবনী) ঃ মুহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ। মনির উদ্দীন আহমদ এন্ড সন্স, কলকাতা, (১৯২৯)।

২৬। সম্রাট পয়গাম্বর ঃ খানবাহাদুর তসলিম উদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭)। ইসলামিয়া আর্ট প্রেস, কলকাতা, (১৯২৮)।

২৭। আদর্শ মানব ঃ আফতাব উদ্দীন আহমদ। কমরুদ্দীন আহমদ, মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রিট, কলকাতা, (১৯৩১)।

২৮। হজরত মুহাম্মদের জীবনী ঃ অধ্যাপক ওসমান গনী। মুঃ আবদুল হাই, ২০ রাজার দেউড়ী, ঢাকা, (১৯৩১)।

২৯। আখলাকে মোহাম্মদী ঃ আবু মুহসেন মুহম্মদ এহসানুল হক আফেন্দী। সোনারাই, ডোমার, (১৯৩২)।

৩০। মি'রাজ ঃ সি. রহমান। আহছান উল্লাহ বুক হাউস লিঃ, কলকাতা, (১৯৩৫)।

৩১। মরু ভাস্বর ঃ মোঃ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, (১৯৪১)।

৩২। নবী পরিচয় ঃ ইমারত হোসেন। মুহম্মদপুর, ঢাকা, (১৯৪১)।

www.nagorikpathagar.org

৩৩। বিশ্বনবী ঃ কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)। কবিপত্নী মাহফুজা খাতুন, ভুদেব ভবন, চুঁচড়া, (১৯৪২)।

৩৪। রাসূল্লাহর সৈনিক জীবন ঃ এ, এফ, এম, আবদুল মজিদ রুশদী। সৈয়দ আবুল ফজল, পুরান নওয়াব বাড়ি, কুমিল্লা, (১৯৪৬)।

৩৫। আদর্শ মানব বা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আদর্শ জীবনী ঃ মাওলানা ফজলুল করীম (১৯০০-৮২)। ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৪৭)।

৩৬। বিশ্ব শিক্ষক ঃ খানবাহাদুর আহছান উল্লাহ। মখদুমী এন্ড আহছান উল্লাহ বুক হাউস, কলকাতা, (১৯৪৯)।

৩৭। ছাইয়েদুল মুরছালীন (দুই খ) ঃ মাওলানা আবদুল খালেক (মৃতঃ ১৯৫৫)। ইষ্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, (১৯৫১)।

৩৮। ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ ঃ খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ। কোরান প্রচার লাইব্রেরী, বেহালা, ২৪ পরগনা, (১৯৫২)।

৩৯। নবুওতে মোহাম্মদী ঃ আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (১৮৯৬-১৯৬০)। আল হাদীছ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা, (১৯৫৬)।

৪০। সত্যপথ প্রদর্শক ঃ সাইফুল ইসলাম, কলকাতা।

৪১। নবীগৃহ সংবাদ ঃ মুহম্মদ বরকতুলাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)। গ্রেট ইষ্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬০)।

৪২। নবীয়ে দুজাহা (দুই খণ্ড) ঃ মীর রহমত আলী (১৮৮১-১৯৮৭)। মমতাজ পাবলিশিং হাউস, নরসিংদী।

৪৩। ওফাতে রাসূল ঃ মোঃ মহিউদ্দীন। নোয়াখালী, (১৯৬১)।

৪৪। শেষনবীর সন্ধানে ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, (১৯৬১)।

৪৫। খাতেমুল আম্বিয়া বা হযরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী ঃ কাজী মোঃ গোলাম রহমান (১৮৯৬-১৯৮১)। রাহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬২)।

৪৬। বিশ্বনবীর মহান আদর্শ ঃ মোঃ মোছলেহুদ্দীন। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬২)।

৪৭। মু'জেযাত ও কেরামত ঃ আবু লায়েছ আনছারী। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬২)।

www.nagorikpathagar.org

৪৮। বিশ্বনবীর ভাষণ ঃ আবু লায়েছ আনছারী। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬১)।

৪৯। বিশ্ব-রহমত মোহাম্মদ মোস্তফা ঃ সূফী হাবিবুর রহমান। প্যারাডাইস বুক ডিপো, বরিশাল, (১৯৬৩)।

৫০। নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)। গ্রেট ইষ্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬৩)।

৫১। দিওয়ানে নূরে মোহাম্মদী ঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম এম.এ। চট্টগ্রাম, (১৯৬৪)।

৫২। বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন ঃ মাহমুদুর রহমান (১৯৩৫-৭০), সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬৪)।

৫৩। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ মুহম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী (১৮৯৬-১৯৭০)। হামিদিয়া লাইব্রেরী, খুলনা।

৫৪। ইনক্বেলাব (তিন খণ্ড) ঃ মাওলানা জিল্লুর রহমান নদভী। দেবীনগর, রাজশাহী। সাহিত্য কুটির, বগুড়া, (১৯৭৩)

৫৫। হযরতের জীবন নীতি ঃ ডঃ মুঃ গোলাম মাকসুদ হিলালী (১৯০০-৬১)। হুমায়ুন খালিদ, রাজশাহী, (১৯৬৫)।

৫৬। খাতেমুল আম্বিয়া বা মাহবুবে এলাহী ঃ কাজী মোঃ গোলাম রহমান। রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৭৫)।

৫৭। স্বপ্নেদেখা দ্বীনের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মহিউদ্দীন আল মাহী। ২১৮, শান্তিনগর, ঢাকা, (১৯৬৯)।

৫৮। বিশ্বনবীর বিশ্ব সংস্কার ঃ আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (১৯৬১-৮৩)। খন্দকার মজিদ আলী, বগুড়া, (১৯৬৯)।

৫৯। বিশ্বভ্রাতৃত্বে মোহাম্মদ (দঃ) ঃ মোঃ ওয়াজেদ আলী ঃ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, (১৯৬৯)

৬০। তবলীগে নববী বা রাসূলের আদর্শে চরিত্র গঠন ঃ মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ। মোজাম্মেল হক, তালতলা, নোয়াখালী, (১৯৭১)।

৬১। মহানবীর জীবন দর্শন ও দাম্পত্য জীবন ঃ মোঃ আবিদ আলী (১৯০৭-৮৭)। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, (১৯৭৩)।

৬২। জগৎগুরু মুহাম্মদ (দঃ) ঃ মুহাম্মদ নূরল ইসলাম। সাহিত্য কুটির, বগুড়া, (১৯৭৪)।

www.nagorikpathagar.org

৬৩। মানব মর্যাদায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম। পাকিস্তান একাডেমী, ঢাকা, (১৯৭১)।

৬৪। মহানবী ও ইসলাম ঃ ডঃ এ. কে. এম ইয়াকুব আলী। রেজাউর রহীম, রাজশাহী, (১৯৭৪)।

৬৫। পথ প্রদর্শক ঃ হাফেয মোক্তার হোসেন (মৃতঃ ১৯৯২)। আবদুন নূর, কুমিল্লা, (১৯৭৫)।

৬৬। বিশ্বসভ্যতায় মহানবীর (দঃ) অবদান ঃ মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম। সদগ্রন্থ পরিবেশনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (১৯৭৫)।

৬৭। মধ্যদিনের সূর্য ঃ আবদুর রউফ মাহমুদ। সদগ্রন্থ প্ররিবেশনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (১৯৭৫)।

৬৮। হিজজুল বয়ত ও জিয়ারতুর রছুল ঃ আসাদ উদ্দীন সিদ্দিকী। সিলেট, (১৯৭৫)।

৬৯। স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, (১৯৮৮)।

৭০। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম ঃ মাওলানা মুঃ আবদুর রহীম (১৯১৯-৮৭)। পলাশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৭৬)।

৭১। শেষনবী মাওলানা মুহাম্মদ তাহের (১৯১৫-৯৪), মদীনা বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৭৬।

৭২। সিরাজাম মুনীরা (সংকলন) ঃ মুহাম্মদ আবুল আসাদ। খোশরোজ প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, (১৯৭৬)।

৭৩। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান ঃ সা'দ আহমদ। গ্রন্থকার, কুষ্টিয়া, (১৯৭৬)।

৭৪। মি'রাজুন্নবী (দঃ) ঃ খন্দকার মোঃ বশির উদ্দীন। কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, (১৯৭৭)।

৭৫। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) (৪ খ) ঃ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। সাহিত্য কুটির, বগুড়া, (১৯৭৭-৯৪)

৭৬। নূরের জ্যোতি এলো দুনিয়ায় ঃ মাওলানা মোঃ আবদুল ওহহাব (১৯০১-৮০), গুলশান বুক ডিপো, ঢাকা, (১৯৭৯)।

৭৭। নূর-এ-আখলাক ঃ সৈয়দ এ, এম, মোখতার। হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, (১৯৭৯)।

www.nagorikpathagar.org

৭৮। ওসওয়াতুন হাসানা ঃ মোঃ আবিদ আলী। ই ফা বা, সিলেট, (১৯৮০)।

৭৯। ইসলাম রশ্মি ঃ সৈয়দ শহীদ উদ্দীন। ই ফা বা, চট্টগ্রাম, (১৯৮০)।

৮০। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রাবলী ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ঢাকা, (১৯৮০)।

৮১। শাশ্বত নবী (সংকলন) ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮০)।

৮২। সূরাত ও সীরাত-ই-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মোঃ জয়নাল আবেদীন। ঢাকা, (১৯৮০)।

৮৩। আছসালাতু ওয়াছসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ঃ মাওলানা আ. খা. মোঃ নূরুল্লাহ। হয়রতনগর, কিশোরগঞ্জ, (১৯৮১)।

৮৪। মহানবী আল-মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ, রাহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮১।

৮৫। ইসলামের ইতিহাস বিশ্বের জাগরণ ও মানবতার ইতিহাস ঃ ডঃ ওসমান গণী। রত্নাবলী, কলকাতা, (১৯৮২)।

৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কা বিজয় ঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। ই. ফা. বা. (১৯৮২)।

৮৭। সেনানায়ক মহানবী (দঃ) ঃ যুদ্ধ ও শান্তি তমিজুল হক বার-এট-ল। সৈয়দ ফারুক আজম, ঢাকা, (১৯৮২)।

৮৮। হেরা পর্বতের সেই কোহিনুর ঃ শেখ শাহ সূফী শামস উদ্দীন আহমাদ। ন্যাশনাল প্রিন্টিং, পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, (১৯৮৩)।

৮৯। আমাদের নবী (দঃ) ও তাঁর আদর্শ (সংকলন) ঃ মোঃ আবদুর রহমান (১৯১৫-৯১)। জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা, (১৯৮৪)।

৯০। নূরে মোহাম্মদী বা বিশ্বের মহানবী ঃ মাজহার উদ্দীন আহমদ। কৌড়ী বুক হাউস, ঢাকা, (১৯৮৫)।

৯১। নূরে মোহাম্মদী ঃ মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, (১৯৮৫)।

৯২। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজ বা রকেট ঃ মাওলানা দেলোয়ার হোসেন আনছারী। ফরিদপুর, (১৯৮৬)।

৯৩। মহারাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করিম (দঃ) ঃ মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম। আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৮৭)।

www.nagorikpathagar.org

৯৪। প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ শ্রী শিশির দাস। অরুপ ঘোষ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, (১৯৮৭)।

৯৫। আনসারে মোস্তফা (রাসূল রহস্য) ঃ পীরজাদা খাজা মোজাম্মেল হক। ডাঃ খাজা সলিমুল্লাহ, এনায়েতপুর, পাবনা, (১৯৮৭)।

৯৬। রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত ঃ মাওলানা মুঃ আবদুর রহীম (১৯১৯-৮৭)। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৮৮)।

৯৭। মক্কাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী। ঢাকা, (১৯৮৮)।

৯৮। বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, (১৯৮৯)।

৯৯। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংগ্রামী জীবন ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, (১৯৮৯)।

১০০। অন্ধকারে সূর্যোদয় নবী কামলিওয়ালা (দঃ) ঃ আলহাজ্ব এম, এ ওহাব। কল্যাণপুর, ঢাকা, (১৯৮৯)।

১০১। বিশ্বনবীর কর্মসূচী ঃ আবদুল খালেক। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮৮)।

১০২। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ এ. কে. এম ফজলুর রহমান মুন্সী। শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৮৯)।

১০৩। শানে নবুয়াত ঃ মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (১৯০৫-৮৭)। শাহ ওয়ালী উল্লাহ একাডেমী, ঢাকা, (১৯৯০)।

১০৪। সর্বজাতির মহান আদর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ সৈয়দ শামসুল ইসলাম, কাফেলা প্রকাশনী, সিলেট, (১৯৯০)।

১০৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত ও তবলীগ ঃ এ. এ. এম মোস্তাকুর রহমান। সময় প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯০)।

১০৬। জীবন আদর্শে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মাওলানা এনামুল হক নিযামী। বিদ্যাভা ার, ঢাকা, (১৯৯২)।

১০৭। শানে মোহাম্মদ (দঃ) ঃ মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী। রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯২)।

১০৮। আমি তো দিয়েছি তোমাকে কাওসার ঃ ড. কাজী দীন মুহম্মদ। প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, (১৯৯৩)।

www.nagorikpathagar.org

১০৯। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী। উম্মে হাজেরা, মুড়াপাড়া, নারায়ণগঞ্জ, (১৯৯৩)।

১১০। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ জীবন বা শানে মাহবুব ঃ মাওলানা মোঃ শাখাওয়াত উল্লাহ। তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, (১৯৯৩)।

১১১। বিশ্বনবীর বিস্ময়কর সাফল্য ঃ হাফিজ উদ্দীন আহমদ। গ্রন্থাকার, ঢাকা, (১৯৯৪)।

১১২। মহানবী ঃ সৈয়দ আলী আহসান। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, (১৯৯৪)।

১১৩। প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, (১৯৯৫)।

১১৪। রেসালতের মিশন ও আমরা ঃ মোহাম্মদ উল্লাহ। ৫৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা, (১৯৯৪)।

১১৫। নবী করীম (দঃ) এর কথা ঃ গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-৯৮)। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, (১৯৯৫)।

১১৬। বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মুহাম্মদ আমিনুল এহসান। মম প্রকাশ, ঢাকা, (১৯৯৫)।

১১৭। সীরাতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন ঃ মাওলানা আঃ কাঃ মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী। মোসাম্মত মমতাজ বেগম, ঢাকা, (১৯৯৬)।

১১৮। তুমিই পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয় ঃ অধ্যাপক আবু জাফর। আইনুদ্দীন ৫২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, (১৯৯৬)।

১১৯। মক্কার সেই এতিম ছেলেটি ঃ মাওলানা হোসেন বিন সোহরাব। আল মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯৭)।

১২০। বিশ্বনবীর পারিবারিক জীবন ঃ মাওলানা আবদুচ্ছালাম। সালাউদ্দিন বইঘর, ঢাকা, (১৯৯৭)।

১২১। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন ঃ উবায়দুর রহমান। কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা, (১৯৯৭)।

১২২। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ঘটনাবলী সংকলক ঃ মাওলানা মুফতী ছিফাতুল্লাহ। ইয়াসীন ফাউন্ডেশন, ঢাকা, (১৯৯৭)।

www.nagorikpathagar.org

১২৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মু'জেযা ঃ মুফতি মোহাম্মদ ইদ্রিস। ইদ্রিসিয়া লাইব্রেরী, লক্ষ্মীপুর, (১৯৯৭)।

১২৪। রহমতে দু'আলম (সাঃ) ঃ মুহাম্মদ আবদুস সামাদ। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৯৭)।

১২৫। চরিত্র ও সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ ডঃ ওসমান গণী। ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, (১৯৯৭)।

১২৬। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন কাহিনী ঃ মাওলানা শাহ আলম মীর্জা, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১২৭। বিশ্বনবী বিশ্বনেতা (প্রবন্ধ সংকলন) ঃ মোসাম্মৎ কবিতা সুলতানা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১২৮। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ঃ শাহ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন (১৯০৫-৯৫)। ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর পক্ষে এ. কে. কামরুল বারী, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১২৯। বিশ্বের সর্বকালের বিস্ময় ঃ আবুল কালাম আজাদ ও আবদুল মান্নান। মদিনাতুল উলুম আসলামিয়া মাদ্রাসা, পালিশারা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর, (১৯৯৮)।

১৩০। কেমন ছিল প্রিয় নবীর পানাহার, পোশাক ও সহায়সম্পদ ঃ (সংকলনে) মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১৩১। মুক্তির দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। নকীব পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১৩২। বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা ঃ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা। তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১৩৩। বিশ্বনবীর জীবনী ঃ প্রফেসর ডঃ এ. বি. এম সিদ্দিকুর রহমান। মীনা বুক হাউস, ঢাকা (১৯৯৯)।

১৩৪। শেষনবীর জীবনকথা ঃ হাকিম মশিহুর রহমান কোরেশী, (১৯২৭)।

১৩৫। পাক কোরআনের আলোকে বিশ্বনবী ঃ মোঃ আবদুল ওহহাব এম, এ।

১৩৬। হাবিবে খোদা ঃ মাওলানা আবদুর রব, পীরপুর, নরসিংদী।

১৩৭। তাওহীদ রেসালাত ও নূরে মোহাম্মদীর সৃষ্টি রহস্য ঃ মুহাম্মদ ফজলুল করিম।

www.nagorikpathagar.org

১৩৮। চিকিৎসক বেশে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ঃ ডাঃ মুঃ কুদরতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৬৯)।

১৩৯। মহানবী ঃ মূল ঃ টমাস কারলাইল, অনুবাদ ঃ নবী মুন্সী।

১৪০। মহানবী ঃ মূল ঃ মুহাম্মদ হোসেন তাবাতাবায়ী, অনুবাদ ঃ মনজুরুল আলম (১৯৮৪)।

১৪১। বিশ্বনবীর কোরআনী পরিচয় ঃ মূল ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম। আধুনিক প্রকাশনী, (১৯৮৫)।

১৪২। সীরাতে রসূল (সাঃ)ঃ মূল ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী। অনুবাদ ঃ অ.ন.ম. লুৎফর রহমান। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১৪৩। নবীজীবনের আদর্শ ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম। দারুস সালাম পাবলিশার্স, ঢাকা, (১৯৬০)।

১৪৪। বিশ্বনবীর অর্থনৈতিক সমাধান ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯১৯-৮৭)। জাঃ পুঃ সঃ, ঢাকা, (১৯৭০)।

১৪৫। হযরতের পত্রাবলী ঃ মোস্তফা হারুন। জাঃ পুঃ সঃ, ঢাকা, (১৯৭০)।

১৪৬। মহামানব হযরত মুহাম্মদঃ কবি মহীউদ্দিন (১৯০৬-৭৫)। ই. ফা. বা. ফরিদপুর, (১৯৮০)।

১৪৭। মহানবীর বিদায় হজ্ব ও ইন্তিকাল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অনু ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, (১৯৯৪)।

১৪৮। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮০)।

১৪৯। শান্তি ও প্রগতির মহানবী ঃ ছদরুদ্দীন। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৭৮)।

১৫০। আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ মূল ঃ জাস্টিস এস. এ. রহমান। অনু ঃ এ. বি. এম. কামালুদ্দীন শামিম। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮০)।

১৫১। অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ সৈয়দ মুরতাজা আলী (১৯২০-৮১), ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮০)।

১৫২। বিশ্বমানবতার মুক্তিদাতা ঃ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী। অনু ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। ই.ফা.বা. ঢাকা, (১৯৯৫)।

www.nagorikpathagar.org

১৫৩। হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ ঃ সিরাজুল হক। সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্ট্যাডিস, ঢাকা, (১৯৭০)।

১৫৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের টুকরো কথা ঃ খঃ মুস্তাক আহমদ শরিয়তপুরী, দুরুল কিতাব, ঢাকা, (১৯৯৭)।

১৫৫। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা ঃ আমিরুল আসলাম ফরিদাবাদী গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

১৫৬। নূরুন্নবীর শুভাগমন ঃ ডঃ শেখ আহমদ পেয়ারা বাগদাদী।

১৫৭। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচার ব্যবস্থা ঃ ডঃ জিয়াউর রহমান আজমী। অনু ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯৮)।

১৫৮। দ্য স্পিরিট অব ইসলাম এবং এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্যা সায়াসিনস। মূল ঃ স্যার সৈয়দ আমীর আলী। অনু ঃ মাশহুদ হাস্য়ান। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, (২০০৬)।

১৫৯। বিশ্বনবী ও চার খলিফার জীবনী। মূল ঃ আল্লামা তালিবুল হাশেমী। অনু ঃ মাওলানা সামছুল হক। সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা (২০০৪)।

১৬০। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী ঃ প্রফেসর ড. এ বি এস সিদ্দিকুর রহমান। মীনা বুক হাউস, ঢাকা (২০০৫)।

বাংলায় অনূদিত সীরাত সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ

১। পয়গামে মোহাম্মদী। মূল ঃ মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী আল কাদেরী আল মুঙ্গেরী। অনু ঃ কবি মোঃ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪)। মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, (১৯২২)।

২। হাদি-এ-আলম। মূল ঃ আবদুল মজিদ ফার্সী। অনু ঃ আবুল ফজল আবদুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭)। আঞ্জুমানে তালিমে ইসলাম, কলকাতা, (১৯৩০)।

৩। নবী সম্রাট। মূল ঃ খাজা কামালউদ্দীন (লাহোরী)। অনুবাদ ও প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ শায়েকুল্লাহ, হরিনাথপুর, রংপুর, (১৯৩২)।

৪। মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ)। মূল ঃ মিঃ মোহাম্মদ আলী লাহোরী। অনু ঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ, কলকাতা, (১৯৩০)।

৫। সাহারাতে ফুটলরে ফুল। মূল ঃ আবুল কালাম আজাদ (১৮৭০-১৯৫৮)। অনু ঃ তাজা কলম (মোশাররফ হোসেন)। সিটি পাবলিশার্স, ঢাকা, (১৯৬০)।

www.nagorikpathagar.org

৬। রহমতে আলম। মূল ঃ আলামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩)। অনু ঃ মাজহার উদ্দীন আহমদ। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৬০)।

৭। খতমে নবুয়াত। মূল ঃ কাজী মুহাম্মদ নাযির লায়েলপুরী। অনুঃ মুহাম্মদ সুলায়মান। ঢাকা, (১৯৬২)।

৮। রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন। মূল ঃ আবু সালিম মুহাম্মদ আবদুল হাই। অনু ঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৬৩)।

৯। বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। মূল ঃ আল্লামা আবদুল কাদির আজাদ সোবহাসী (১৮৯৬-১৯৬৩)। ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, (১৯৬৬)।

১০। বিপ্লবী নবী। মূল ঃ আল্লামা আজাদ সোনহানী (১৮৯৬-১৯৬৩)। অনু ঃ মাওলানা মুজিবর রহমান (১৯৩৮-৯২)। ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, (১৯৬৮)।

১১। হায়াতুর রাসূল 'তারিখে হাবিবে ইলাহ'। অনু ঃ মাওলানা শামসুল হক কুফী। মোস্তফা লাইব্রেরী, ভোলা, (১৯৬৮)।

১২। খাসায়েলে নববী (দঃ) বা নবী চরিত। মূল ঃ মৌলানা মোহাম্মদ ছায়াদ হাছান। অনু ঃ মৌলভী আহমদ হাছান। আঞ্জুমানে হেদায়েতুল ইসলাম, চট্টগ্রাম, (১৯৬৯)।

১৩। আয়নায়ে রাসূল। মূল ঃ মোঃ ইউসুফ আশিয়ারী। অনু ঃ হাফিয হাফিজুল্লাহ। আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, (১৯৭১)।

১৪। সীরাতুন নবী (তিন খণ্ড)। মূল ঃ আল্লামা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৫) ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদকম লীর পক্ষে প্রধান অনুবাদক ও সম্পাদক ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৮৮২)।

১৫। মি'রাজের দার্শনিক তত্ত্ব। মূল ঃ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী। অনু ঃ মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মসরুর ইসলামাবাদী (১৯২৯-৯১)। আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, (১৯৮২)।

১৬। নবী চিরন্তন। মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনু ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। বকু সোসাইটি, ঢাকা, (১৯৭৫)।

১৭। আদাবুন্নবী বা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ। মূল ঃ ইমাম গাজ্জালী (মৃতঃ ১১১১ খৃঃ)। অনু ঃ কাজী আসাদুল্লাহ মাজহারী। হাবিবিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, (১৯৭৭)।

www.nagorikpathagar.org

১৮। নূরে মোহাম্মদী। মূল ঃ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-৭৩)। অনু ঃ শাহ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সীরাত লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৭৭)।

১৯। স্পর্শমণি। মূল ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী। অনু ঃ আবুল মোজাফফর মোহাম্মদ হোসেন। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৭৮)।

২০। যে ফুলের খুসবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা। আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩)। অনু ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৮০)।

২১। সীরাতে সরওয়ারে আলম। মূল ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-৭৯)। অনু ঃ আব্বাস আলী খান।

২২। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিরক্ষা কৌশল। মূল ঃ জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খান। অনু ঃ আঃ সাঃ মুঃ ওমর আলী। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮৪)।

২৩। সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া। মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-৯৬ হিঃ)। অনু ঃ মোঃ সিরাজুল হক। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮৪)।

২৪। রাসূল মুহম্মদ (সাঃ)। মূল ঃ জয়নাল আবেদীন রাহনুমা (ফারসী বই 'পয়গম্বর' এর ইংরেজী অনুবাদ হতে)। অনু ঃ অধ্যাপক আবু জাফর, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৮৪)।

২৫। রাসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন। মূল ঃ ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ, (১৯১০-৯৮)। অনু ঃ আবদুল মতিন জালালাবাদী। প্রকাশক ঃ ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮৫)।

২৬। মি'রাজ ও বিজ্ঞান। মূল ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)। অনু ঃ শাহ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। সীরাত লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৮৫)।

২৭। নবীভাস্কর। মূল ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব (১৮৯৭-১৯৮)। অনু ঃ আবদুল জলিল। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮৬)।

২৮। ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম। মূল ঃ আবদুল হাই আরিফবিল্লাহ (১৮৯৬-১৯৮৬)। অনু ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, (১৯৮৫)।

২৯। বিশ্বনবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মূল ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব। অনু ঃ মোহাম্মদ আনিসুল হক। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮৭)।

www.nagorikpathagar.org

৩০। সীরাতে ইবনে হিশাম (সংক্ষিপ্ত)। মূল ঃ ইবনে হিশাম (মৃতঃ ২১৮ হিঃ)। অনু ঃ আকরাম ফারুক। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা (১৯৮৮)।

৩১। এক নজরে সীরাতুন্নবী (সাঃ)। মূল ঃ আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিনুল এহসান মোজাদ্দেদী (১৯১১-৭৪)। অনু ঃ অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির। হিকমাহ দুরুত্তাসনিফ, নেছারাবাদ, ঝালকাঠি, (১৯৮৮)

৩২। জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মূল ঃ ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ (১৯১০-৯৮)। অনু ঃ মুহাম্মদ লুৎফুল হক। ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৯১)

৩৩। সীরাতুল মুস্তফা (সাঃ)। মূল ঃ আল্লামা মোঃ ইদ্রিস কান্দালভী (১৩১৭-৯৪ হিঃ)। অনু ঃ মাওলানা বশির উদ্দীন। মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা (১৯৯১)।

৩৪। বিশ্বনবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'জেযা। মূল ঃ ওয়ালিদ আল আযমী। অনু ঃ আবদুল কাদের। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯২)।

৩৫। সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জীবনী অংশ)। মূল ঃ আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। আনসারনগর জনকল্যাণ ট্রাষ্ট, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, (১৯৯২) এবং কলকাতার মলিক ব্রাদার্স, (১৯৯৩)।

৩৬। বিশ্বনবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন শত মো'জেযা। মূল ঃ মাওলানা আহমদ ছাইদ। অনু ঃ মোহাম্মদ খালেদ। মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯২)।

৩৭। প্রিয় নবীজীর অন্তরঙ্গ জীবন। অনু ঃ সম্পাদনায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, (১৯৯৫)।

৩৮। শানে মাহবুব। মূল ঃ মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (মৃতঃ ১৪১৭ হিঃ)। অনু ঃ মাওলানা মুহাম্মদ শাখাওয়াতুল্লাহ। তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, (১৯৯২)।

৩৯। দি প্রফেট। মূল ঃ কবি খলিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১)। অনু ঃ সালাদীন। অনিবার্য প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯৩)।

৪০। মাদারেজুন নবুওয়াত। মূল ঃ আল্লামা আবদুল হক দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ)। অনু ঃ মাওলানা মমিনুল হক। সেরহিন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১ম খণ্ড, (১৯৯৪), ২য় খণ্ড (১৯৯৬)।

৪১। আখলাকুন নবী (সাঃ)। মূল ঃ হাফেয আবু শায়খ আল ইসপাহনী (মৃতঃ ৩৬৯ হিঃ)। অনু ঃ ই. ফ. বা, ঢাকা, (১৯৯৪)।

www.nagorikpathagar.org

৪২। আর-রাহীকুল মাখতুম। মূল ঃ শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী। অনু ঃ মাওলানা আবদুল খালেক রহমানী। আল হিলাল বুক হাউস, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, (১৯৯৫)।

৪৩। সীরাতে রাহমাতাল্লিল আলামীন। মূল ঃ আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (১৭০২-৭৩ খৃঃ)। অনু ঃ নজরুল আসলাম। আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, (১৯৯৫)।

৪৪। মোজেযায়ে রসূলে আকরাম। মূল ঃ মাওলানা সাঈদ আহমদ দেহলভী। অনু ঃ আঃ কাঃ মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯৫)।

৪৫। শেষনবী। মূল ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যব (মৃতঃ ১৯৮৩)। অনু ঃ কারামাত আলী নিজামী। কারামাতিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯৫)।

৪৬। সীরাতে সাইয়েদুল মুরছালীন। মূল ঃ তালেবুল হাশেমী। অনু ঃ মুফতী মোহাম্মদ নূরউদ্দীন। আল হেরা প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯৬)।

৪৭। শাওয়াহেদুন নবুওত। মূল ঃ আল্লামা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২ খৃঃ)। অনু ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, (১৯৯৬)।

৪৮। ইরশাদে রাসূল (সাঃ)। মূল ঃ মাওলানা মোহাম্মদ তাকী ইসমানী। অনু ঃ মাওলানা সাঈদ আল মেছবাহ। মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯৬)

৪৯। আশকে রাসূল ও উলামায়ে দেওবন্দ। মূল ঃ মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গোহী। অনু ঃ রুহুল আমীন খান উজানভী। আল আমীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৯৬)।

৫০। সীরাতে রসূলে আকরাম (সাঃ)। মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী। অনু ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, (১৯৯৭)।

৫১। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাটক (ইংরেজী হতে অনুবাদ)। মূল ঃ তাওফীকুল হাকীম মিশরী। অনু ঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী। আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা কার্যালয়, (১৯৯৭)।

৫২। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তিম জীবন। মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অনু ঃ মাওলানা মাজহার উদ্দীন। উজ্জ্বল প্রকাশনী, ঢাকা, (১৯৯৭)।

৫৩। নশরুতে পেয়ারা হাবীব (ছাঃ) এর নুরানী জীবন। মূল ঃ মাওলানা আশরাফ

www.nagorikpathagar.org

আলী থানভী। অনু ঃ মাওলানা সাঈদ আল মেছবাহ। মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা (১৯৯৭)

৫৪। তিব্বে নববী (সাঃ)। বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান। মূল ঃ হাফেয নযর আহমদ। অনু ঃ মাওলানা নুরুয্যামান। হক লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯৭)।

৫৫। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ছিলেন। মূল ঃ মাওলানা হিফজুর রহমান কাসেমী। অনু ঃ মোহাম্মদ খালেদ। মোহাম্মদী লাইব্রেরী, (১৯৯৭)।

৫৬। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন ও শিক্ষা। অনুবাদকবৃন্দ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৯৭)।

৫৭। মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন চরিত। মূল ঃ ডঃ মুহম্মদ হোসাইন হায়কাল। অনু ঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, (১৯৯৮)।

৫৮। তোমাকে ভালবাসি হে নবী। মূল ঃ গুরুদত্ত সিংহ। অনু ঃ মাওলানা আবু হাতের মেছবাহ। দারুল কাউসার, ঢাকা, (১৯৯৮)।

৫৯। খাসায়েসুল কুবরা। মূল ঃ আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউতি (৮৪৯-৯১১ হিঃ)। অনু ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, (১৯৯৮)।

৬০। বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী। মাওলানা মুহাম্মদ আশেক এলাহী বুলন্দশহরী। অনু ঃ আলহাজ্ব ইসহাস আহমদ। হাছানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯৮)।

৬১। ডাঃ সূফী মুয়জুদ্দীন আহমদ (১৮৫৫-১৯৩০)। "ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ)", (১৯০২)।

৬২। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। "প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী,"(১৯৫২)।

৬৩। ডাঃ মুহাম্মদ কূদরতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৬৯)। "বেদপুরাণে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কলির অবতার" (১৯৫২)।

৬৪। অধ্যাপক মুঃ আবুল কাসেম ভূইয়া। "বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বাভাস" ই. ফা. বা. ঢাকা, (১৯৮০)।

৬৫। শ্রী সুশান্ত ভট্টাচার্য। "বেদপুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ"। ঢাকা, (১৯৮১)।

৬৬। অধ্যাপক শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য। অধ্যাপক

www.nagorikpathagar.org

ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ধর্মাচর্য। "বেদপুরাণে হযরত মুহাম্মদ"। কলকাতা ও ঢাকা হতে প্রকাশিত।

৬৭। বাইবেল কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তুরস্কের আল্লামা হুসাইন হিলমী ইশিকের লিখিত পুস্তক। অনুবাদ ঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন। অনন্যা, ঢাকা, (১৯৯৭)।

শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলায় লিখিত উল্লেখযোগ্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনী গ্রন্থসমূহ

১। হজরতের জীবনী (১৯০১) ঃ গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)।

২। হযরতের (দঃ) জীবনী (১৯১৪) ঃ শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮)। আলবার্ট লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩। নূরনবী (১৯১৮) ঃ মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)। মঈনুদ্দীন হোসাইন, কলকাতা।

৪। শিশুদের মোস্তফা (দঃ) ঃ শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫)। ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

৫। পেয়ারা নবী (১৯৪০) ঃ খানবাহাদুর আহছান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)। মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহছানউল্লাহ বুক হাউস লিঃ, কলকাতা।

৬। আমাদের নবী (১৯৪১) ঃ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-৮১)। আল হামরা লাইব্রেরী, কলকাতা।

৭। ছোটদের হজরত মোহাম্মদ (দঃ) (১৯৪১) ঃ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)। দেবসাহিত্য কুটির, কলকাতা।

৮। আমাদের নবী (১৯৪৬) ঃ আ. ই. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬)। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

৯। আমাদের নবী (১৯৪৭) ঃ বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-৭৯)। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা।

১০। মরু দুলাল (১৯৪৮) ঃ কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)। মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, কলকাতা।

১১। কামেল নবী (১৯৪৯) ঃ বিচারপতি আবদুল মওদুদ (১৯০৩-৭১)। বেগম হিদায়েতুন্নিসা, টাঙ্গাইল।

www.nagorikpathagar.org

১২। আরবের আলো (১৯৫০) ঃ মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন। বেগম হালিমা খাতুন, ফরিদপুর।

১৩। ছোটদের মহানবী (১৯৬১) ঃ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)। আইডিয়াল পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১৪। আমাদের মহানবী ঃ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৮৭)।

১৫। আমাদের শেষ নবী (১৯৬২) ঃ আহসান হাবিব (১৯১৭-৮৫)। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৬। নয়া জীবনের দিশারী (১৯৬২) ঃ হেমায়েত হোসাইন মোরশেদ। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

১৭। সারাজাহানের নবী (১৯৬২) ঃ কাজী মাসুম। বুক সাপ্লাই, ঢাকা।

১৮। আমাদের বিশ্বনবী (১৯৬৮) ঃ খোন্দকার মোহাম্মদ বশির উদ্দীন। কোরান মহল লাইব্রেরী, বরিশাল।

১৯। মরু সুন্দর ঃ বেগম নূর জাহান খানম।

২০। আখেরী নবী (১৯৭৭) ঃ আবদুল খালেক। ফেডারেল পাবলিশার্স, ঢাকা।

২১। ছোটদের মহানবী (১৯৭৭) ঃ হোসেন মীর মোশাররফ। মুক্তধারা, ঢাকা।

২২। আমার রসূল সাল্লি আলা ঃ নিলুফার বেগম, লেখিকা, ঢাকা, (১৯৭৮)।

২৩। আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ অনু ও সম্পা ঃ মুঃ নাসির উদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪)। বেগম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮।

২৪। মানুষ যাঁকে ভোলেনি (১৯৭৮) ঃ সানাউল্লাহ নূরী। হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা।

২৫। আদর্শ জীবন (১৯৮০) ঃ আবুল হোসেন (১৮৫৭-১৯৫০)। ই. ফা. বা, ঢাকা।

২৬। আমার রাসূল (১৯৮০) কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪), কবির শিশুতোষ একটি গ্রন্থ নতুন নামে ই. ফা. বা প্রকাশ করে।

২৭। সেই ফুলেরই রওশনিতে ঃ আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-৯৪)। ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।

২৮। ছারকারে মদীনা বা আমাদের প্রিয় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১৯৭৯) ঃ মোহাম্মদ ছাখাওয়াত উল্লাহ। তবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা।

২৯। সোনালী শাহজাদা (১৯৮১) ঃ সাজ্জাদ হোসাইন খান। ই. ফা. বা. ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

৩০। ধরার নবী (১৯৮১)ঃ আবদুল গনি খান। ফার্মা কে, এল, (প্রাইভেট) লিঃ, কলকাতা।

৩১। আলোর নবী আল আমীন (১৯৮১) ঃ কাজী গোলাম আহমদ। ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।

৩২। নতুন চাঁদ (১৯৮১) ঃ সম্পাদনায় মুহাম্মদ লুৎফুল হক ও হাসনাইন ইমতিয়াজ। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৩৩। মরু দুলালের গল্প শোন (১৯৮১) ঃ মাহবুবুল হক। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

৩৪। সত্য সমুজ্জল (১৯৮১) ঃ সম্পাদনায় মাসুদ আলী ও আবদুল মান্নান। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৩৫। মহানবীর মহাগুণ (১৯৮২) ঃ রাজিয়া মজীদ। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৩৬। গল্পে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১৯৮৫) ঃ মুহাম্মদ লুৎফল হক। ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৭। নিখিলের চির সুন্দর (১৯৮৬) ঃ নূরুল আবসার। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৩৮। আলোর আবাবিল (১৯৮৩) ঃ আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-৯৪)। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

৩৯। আলোর রাসূল আল-আমীন (১৯৮৬) ঃ আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-৯৪)। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

৪০। ছোটদের প্রিয়নবীর আদর্শ ঃ খোন্দকার মোঃ বশির উদ্দীন। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৪১। ছোটদের মহানবী (১৯৮৯) ঃ মাওলানা মাজহার উদ্দীন। রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

৪২। কুঁড়েঘরের রাজা (১৯৯০) ঃ ইবনে ইমামা। ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা।

৪৩। আখিরী নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১৯৯৩) ঃ মোঃ কাউসারুল আলম। উজ্জ্বল প্রকাশনী, ঢাকা।

৪৪। আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১৯৯৪) ঃ ফজলুর রহমান। নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

৪৫। ছোটদের আল-আমীন (১৯৯৪) ঃ হাফেজ আবু সাঈদ খন্দকার। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৪৬। নবী মোর পরশমণি (১৯৯৫)। জামান মনির। ই. ফা. বা. ঢাকা।

৪৭। আমাদের বিশ্বনবী মোস্তফা ঃ এ. বি. এম. মাহবুব।

৪৮। মরু ঝর্ণা ঃ হোসনে আর শাহেদ।

৪৯। প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন (১৯৯৮) ঃ মোঃ আবদুল হাই নদভী। শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম।

৫০। মুক্তির দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১৯৯৮) ঃ হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নকীব পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

বাংলায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথ্যপঞ্জি, স্মরণিকা, গ্রন্থ ও পত্রিকাসমূহ

১। ইসলামী বিশ্বকোষ (২০শ খণ্ড)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ঢাকা, (১৯৯৬)।

২। বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি সংকলন। অধ্যাপক আলী আহমদ। বাংলা একাডেমী। ঢাকা, (১৯৮৫)।

৩। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। অধ্যাপক মুহম্মদ মুনসুর উদ্দীন। হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা, (১৩৭১ বাংলা)।

৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। ডঃ কাজী আবদুল মান্নান। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, (১৯৬৯)।

৫। হাদীস সংকলনের ইতিহাস। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, (১৯৭৫)।

৬। আসমাউর রিজাল। অনু ঃ এম. আফলাতুন কায়সার। এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৯৯৫)।

৭। মাকতুবাত শরীফ। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মোজাদ্দেদে আলফে সানী। অনু ঃ শাহ মো মুফতি আহমদ আফতাবী। আফতাবিয়া খানকা শরীফ, সাভার, ঢাকা।

৮। বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত। ডঃ মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, (১৯৯৩)।

www.nagorikpathagar.org

৯। পরধর্ম গ্রন্থে শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা। মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, (১৯৯৭)।

১০। সীরাত স্মরণিকা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা । (১৪১৫-১৯ হিঃ)।

১১। সাহাবীদের (রা.) কাব্যচর্চা। মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা। মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, (১৯৯৭)।

১২। ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি। আফজাল চৌধুরী। ই.ফা.বা. ঢাকা। (১৯৮৭)।

১৩। ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থপঞ্জি ঃ সাইয়েদ ইবনুল কাদের (মৃতঃ ১৯৭৬)।

১৪। বিভিন্ন সীরাত স্মারক ও স্মরণিকাসমূহ।

১৫। মাসিক পত্রিকাসমূহ ঃ মাসিক মদীনা, মাসিক দ্বীন দুনিয়া, মাসিক কাফেলা, মাসিক আত-তাওহীদ, মাসিক আত তাহ্রীক, মাসিক পৃথিবী, মাসিক কলম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, মাসিক অগ্রপথিক, হক পয়গাম।

১৬। বাংলা একাডেমী, ইাসলামিক ফাউন্ডেশনসহ ঢাকার প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার পুস্তক ও স্মরণিকাসমূহ।

অন্যান্য ভাষায় (বিশেষভাবে ইংরেজী) বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থসমূহ

1. Muhammad: A Prophet for our Time : Karen Armstrong

2. Muhammad: His life Bored Based on the Earliest Sources: Martin Lings.

3. Muhammad: A Biography of the Prophet: Karen Armstrong

4. The life of Holy Prophet of Islam: Maulana M A Cheema

5. Holy Prophet of Islam- Hadhrat Muhammad Mustafa: Dr. Karimullah Zirvi.

6. Prophet or King: Sheikh Mubarak Ahmed.

7. Holy Prophet: In the eyes of Non-Muslim: Prof K.S. Ramakrishna Rao.

8. The Life of Prophet Muhammad (SA): Mustafa as Sibaa'ie.

9. Holy Prophet's Kindness to Children: Rashid Ahmad Chaudhury. Islamic International Publication Ltd.

www.nagorikpathagar.org

10. Prophet Muhammad Pattern of Communication: Ali Zohery.

11. Biography of the Prophet Muhammad Illustrated (Vol I): Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abi Sarh.

12. Tell me about: The Prophet Muhammad (PBUH): Saniyasnain Khan.

13 The Prophet Muhammad – A Biography: Barnaby Rogerson.

14. The book of Hadith saying of the Prophet: Charles Le Gai Eaton.

15. After the Prophet: The Epic story of the Shia: Lesley Hazleton.

16. The Noble life of the Prophet (PBUH) 3 Vol. : Dr Ali Muhammad as Sallaabee, Darussalam Pub.

17. The Life of the Muhammad (A Translation of Ibn Ishaq's).

18. Marvellous Stories from the life of Muhammad: M Aldrich Tarantino.

19. Life of Prophet Muhammad (PBUH) : Mrcamelman.

20. Life of Prophet Muhammad (PBUH) : Salahaddins.

21. A book Report of Life of the Prophet Muhammad SAW : B Salem Foad.

22. The Life of Muhammad : Ibne Ishaq.

23. A Brief view on the Biography of the Prophet Muhammad in the west :

24. The Life of Prophet Muhammad : Al-Khawarizmi.

25. Prophet Muhammad- Aspect of Life: Fallullah Gulen (Turkish Scoholar)

উল্লেখযোগ্য ওয়েব সাইটসমূহ

www.amajon.com

www.alislam.org

www.ahlalhdeeth.com

www.prophetmuhammadleadership.org

www.faithfreedom.org

www.bookcenter.co.uk

www.nagorikpathagar.org

www.amazon.co.uk
www.rohama.org
www.fordham.edu
www.esnips.com
www.searchtruth.com
www.islamfortoday.com
www.ummah.com
www.al-bab.com
www.wikipedia.org
www.adherents.com
www.islamhouse.com
www.IslamReligion.com
www.muslimmatch.com
www.islamicarea.com
www.islamic-world.com
www.whyislam.org
www.islam_qa.com
www.ikhwanweb.com
www.talkislam.com
www.islamicity.com
www.islam-invitation.com
www.annoor_bd.com
www.emunion.com
www.muslimphilosophy.com
www.bestmuslim.com
www.turntoislam.net
www.shariahprogram.ca
www.oneummah.net
www.shjnaqvi.com
www.islaam.net

www.nagorikpathagar.org

www.equraninstitute.com
www.mirajschool.org
www.muslima.com
www.islamic-awareness.org
www.harunyahya.com
www.2muslims.com
www.muslimheritage.com
www.islamicsupremecouncil.org
www.islamicthinkers.com
www.muslima.ca
www.irf.net
www.islamicreform.org
www.thereligionofpeace.com
www.muslimcenter.org
www.saudiacademy.net
www.oxcis.ac.uk
www.islamicbankingandfinance.com
www.islam.about.com
www.dawatetabligh.com

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ISBN-978-984-8808-28-3

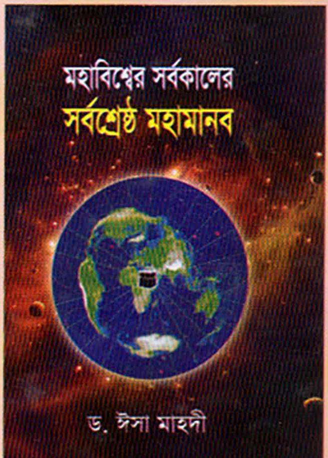

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com